ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ৫, গ্রীণ পার্ক, নিউ দিল্লী-১৬ দ্বারা
প্রকাশিত এবং নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৪ দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

বিশাল দেশ এই ভারত। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে অভিন্ন হলেও একটি শক্তিশালী প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে একে গড়ে তুলতে হলে একতার সূত্রগুলিকে আরও সুদৃঢ় ক'রে তোলা প্রয়োজন।

বহু ভাষার দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন। পৃথিবীর অন্য দেশের চাইতে আমাদের দেশের ভাষার সংখ্যা বেশী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রতিবেশী প্রদেশগুলির ভাষা শেখবার বা জানবার ঔৎসুক্য আমাদের খুবই কম। অন্যান্য প্রদেশের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্পদের বিষয়ে জ্ঞানতো আরও সীমিত। ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জর্মণ ইত্যাদি য়ুরোপীয় ভাষার সাহিত্য ও সমাজের বিষয়ে আমরা যতটুকু খোঁজখবর রাখি, এদেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে সেটুকুও জানিনা।

দেশের ভাবাত্মক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আমাদের বিভিন্ন ভাষার উৎকৃষ্ট সাহিত্য প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা নিতান্ত জরুরী, সাহিত্যের মাধ্যমেই অন্যান্য প্রদেশের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক চিন্তার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয় ঘটবে।

এ এক অদ্ভুদ বিরোধাভাস চোখে পড়ে; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বহু রাষ্ট্র, প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন, তাদের ভাষাও পৃথক পৃথক, তবু সেখানকার মানুষ একে অন্যের সাহিত্য ও চিন্তাধারার যত সূক্ষ্ম ও বিশদ জ্ঞান রাখেন, আমরা নিজেদের ভাষাগুলি সম্পর্কে ততখানি রাখি না। য়ুরোপের সব ভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলি প্রকাশের অনতি-বিলম্বে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়ে যায়। অথচ ভারত এক অভিন্ন রাষ্ট্র হওয়া সত্বেও এক অন্যের ভাষায় কি ঘটছে, তা জানার আগ্রহ আমাদের নেই। অবশ্য এই পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করেছে যদিও খুবই মন্থর গতিতে।

ভূমিকা

এই অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখেই ভারত সরকার প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার সমকালীন সাহিত্যের নির্বাচিত বই অন্য সব ভারতীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই সব বই বাছাই করা হবে যা সাধারণ পাঠক পড়তে ভালবাসেন, যেমন গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, আত্মজীবনী ইত্যাদি। এই গ্রন্থমালার বই বাছাই করার সময় বইগুলি যাতে উত্তম, জনপ্রিয় এবং সেখানকার সমাজের জীবনযাত্রা, তাদের ধ্যানধারণা আর আশা-আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

আশা করা যায়, এই পরিকল্পনা আমাদের বহুভাষী সমাজের বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভাবাত্মক ঐক্য সৃষ্টিতে বেশ কিছুটা সাহায্য করবে।

বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির নির্বাচন ও তার অনুবাদ অনায়াস-সাধ্য কাজ নয়। আমরা আমাদের উপদেষ্টা সমিতির সদস্যদের ও অনুবাদকদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের নির্দেশ ও সহযোগিতা ছাড়া এ ধরণের পরিকল্পনাকে সাফল্যের সঙ্গে কার্যে রূপায়ণ করা সম্ভব হতো না।

প্রস্তাবনা

একটা মোটা বাঁশের লাঠির ওপর খোদাই করা ছিল—এই লাঠি সব কিছুকেই ভাঙ্গতে পারে। এই লাঠিটির মালিক ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ফ্রান্সের হেনরী বাল্জক। বিংশ শতাব্দীর জার্মান ঔপন্যাসিক ফ্রেন্জ কাফ্কা এই লাঠির প্রতাপ শুনে, একটি ছোট্ট ছড়ির ওপর খোদাই করলেন—তাঁর এই ছড়িটি সব কিছু দিয়েই ভাঙ্গা যায়। সমলোচকেরা বলেন, এ ছড়ি দু'টি হচ্ছে—য়ুরোপীয় উপন্যাসের ক্রমবিকাশের প্রতীক। বাল্জকের উপন্যাসই হচ্ছে সেই লাঠি যা দিয়ে তিনি যুগের যাবতীয় পঙ্কিলতা, গতানুগতিকতা আর বিকৃতিকে বিনষ্ট করেছিলেন। বস্তুতঃ, উপন্যাসের অভিধায় সাহিত্যের এই কথা-রূপ, জাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্যিক অভিব্যঞ্জনা হওয়ার দরুণ, গোড়া থেকেই সমাজ আর মানুষের সহাবস্থান, সংঘাত আর সমস্যাবলীর প্রতি উন্মুখ হয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সর্বেন্টিজে; আর হিন্দী সাহিত্যে লালা শ্রীনিবাস দাসের প্রথম উপন্যাস "পরীক্ষা গুরু" গ্রন্থেও ...্যক্রমে এই জাগরণেরই সূত্রপাত দেখা যায়।

কথা-কাহিনী কেবল মনোরঞ্জনের জন্যেই নয়, আদি যুগে এর ...য়োগ হয়েছে উপদেশ বর্ষণের মাধ্যমরূপে। কিন্তু আধুনিক ...বনের প্রাণশক্তিকে স্বীকার করে, বাস্তবের ভিত্তিভূমিতে বিবিধ ...াজিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে সমস্যাবলীকে সম্যক্ অবগত হয়ে, ...ধিগত করে, সাহিত্যকর্মে মূর্ত করে তোলবার সজ্ঞান প্রচেষ্টা ...বপর হয়েছে এই আধুনিক কথা-রূপেরই আঙ্গিকে। মনোরঞ্জনী ...ণালংকৃত হওয়ার ফলে, আনন্দ তো মেলেই; উপরন্তু, ছকে ...ধা উপদেশ প্রদানের পরিবর্তে এই সমস্যাসংকুলতার বিশ্লেষণে একটি বিশেষ শক্তি যা, প্রকাশ পেয়ে থাকে লেখকের সচেতনতা, ...বুদ্ধি আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচায়ক। জীবন্ত চরিত্র ...যোজন, প্রত্যয়ীভূত ঘটনাবলী আর পরিস্থিতি অর্থাৎ যে মূল-

কেন্দ্রের ওপর বিবিধ বিধি-নিষেধের নিদর্শন যোগে রচনা বর্ণিত ও চিত্রিত হয়, তার ফলে, উপন্যাস-রচনাকে গল্প রচনার আদিম পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাদপীঠে দাঁড় করিয়ে দেয়। এর অগ্রগতির ফলে, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্যকারণ পরম্পরার প্রশ্নগুলি কালক্রমে প্রধান হয়ে দেখা দিল। বলা বাহুল্য, উপন্যাসের ভিত্তিরচনার এই প্রশ্নগুলি গৌণ।

যাই হোক, হিন্দী উপন্যাস গোড়া থেকেই আধুনিকতার সেই বীজটিকে স্বীকার করে নিয়েছে। যে গতানুগতিকতা, পঙ্কিলতা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে ভারতেন্দু বা প্রতাপ নারায়ণ নাটক অথবা প্রবন্ধ রচনা করে আঘাত হানছিলেন; সেই নেহাই-এর উপর রেখে, লালা শ্রীনিবাস ও বালকৃষ্ণ ভট্ট নিজেদের উপন্যাসগুলিকে শানিয়ে নিচ্ছিলেন। সমস্যাগুলিকে বুঝে নেবার আর তাদের সঙ্গে যুঝে যাবার সেই প্রেরণায়। শুনতে বোধ হয় অদ্ভুত লাগবে, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে এই, "চন্দ্রকান্তা সন্তুতি"-র যাবতীয় অতি-রঞ্জন এবং চমৎকারিত্বের মূলে এই মানবীয়, লৌকিক ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয় ছিল, এবং তা ধ্বংসপ্রায় সামন্তবাদ আর নবগঠিত পুঁজিবাদকে প্রতীক অথবা "ফেন্টেসী" রূপে উপস্থাপিত করছিল।

ভারতেন্দু যুগের সেই প্রথম উপন্যাসের সুখ্যাতি সত্ত্বেও একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক, এই দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে স্থূল ; চরিত্র এবং ঘটনার উপাদানগুলিকে একটি সংহত রূপদান করা সম্ভবপর হয় নি। সমস্যার অনুরূপ চরিত্র এবং ঘটনার কাঠামো আগে থেকেই ছকে নেওয়ার ফলে, তাঁর মধ্যে যথার্থ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির অভাব ছিল। এই ঘাটতি পুরণ করলেন প্রেমচন্দ্। তাঁর উপন্যাসে সমস্যা হল ঘটনাবলীর সহজাত। প্রেমচন্দের সত্যানুসন্ধান সমস্যার সমাধানকল্পে প্রযুক্ত হয় নি—(সে শুধু আরোপিত ব্যাপার, ফলতঃ অসুন্দর) ; পক্ষান্তরে, তিনি করেছেন উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি, পরিস্থিতি-সমাবেশ, সুসংহত গঠনরীতি এবং সর্বোপরি একটা যথাযোগ্য ভাষার অনুসন্ধান। গভীর বাস্তবদৃষ্টি, সর্বাতিশায়ী

মানবীয় সংবেদনা, গল্পকারের সমমর্মিতা এবং ভাষার পরিশীলিত সৃজনাত্মক প্রয়োগ প্রেমচন্দের বিশিষ্ট ক্ষমতা। তাঁর উপন্যাস ব্যক্তি বিশেষের অনুভূতি এবং সামাজিক ঘটনাবলীর মিলন প্রচেষ্টা মাত্রই নয়—এ হল তাঁর সাহিত্য-রথের চৌরাস্তা। তাঁর উপন্যাস ব্যক্তি প্রধান না সমাজ প্রধান এই প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট 'হ্যাঁ' বা 'না' বলা শক্ত। চরিত্রগুলি যেখানে পরস্পরকে লঙ্ঘন করে, আঘাত হানে, সেই বিন্দুকে ঘিরেই তাঁর সমগ্র উপন্যাসের প্রোথিত ভিত্তিভূমি। প্রেমচন্দের মানসিক প্রবণতা স্বাভাবিক ও নিত্যব্যবহার্য। তাঁর গোড়ার দিকের উপন্যাসে দেখা যায়, অপরাজেয় সংকল্প এবং দুর্দম বিশ্বাস, যার মূলে ছিল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রথম পর্বের উজ্জ্বল প্রত্যাশা এবং প্রত্যয়ের প্রতীক। কিন্তু, বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দিকে এই আন্দোলনের ব্যর্থতা তাঁর জাগ্রত প্রবুদ্ধ চেতনাকে আঘাত হানছিল আর যথার্থ শিল্পীর সততার সঙ্গে প্রেমচন্দ এই তিক্ত বাস্তবকেও গোচরে এনে উপস্থাপিত করেছেন।

পরাজয়ের গ্লানি, ব্যর্থতা এবং নিরাশায় আচ্ছন্ন রাষ্ট্রীয় পরিবেশের মধ্যেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের দিকে সাহিত্যিকদের একটি নবগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, তারা এখন মাত্র স্ব-স্বরূপই নয়, তারা নিজ নিয়তিকেও চিনতে শুরু করেছিল। এদিকে, দেশে শিক্ষা, পরিকল্পনা, বিজ্ঞানাদির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, নবজাগরণ এবং বিশেষীকরণের পরিবেশও প্রবর্ধমান ছিল। মার্ক্স, ফ্রয়েড, ডারউইন, সকলেই এই সময় এই পরিবেশকে আরো ঘনীভূত করে তুলছিলেন। এই চিন্তানায়কগণ মানব জাতির অদ্যাবধি বদ্ধমূল এবং যুগসিদ্ধ মূল্যবোধগুলিকে সমূলে নাড়া দিয়েছিলেন। এহেন বৈদ্যুতিক আবেশের পরিবেশে তৃতীয় দশকে এই নবযুগের উন্মেষ হচ্ছিল। এর মধ্যে একদিকে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যষ্টিগত স্বাধীনতাবাদী দর্শন আর অপর দিকে প্রত্যক্ষ জীবনে—হোক্ সে প্রেমের ক্ষেত্র বা রাজনীতির রঙ্গস্থল—ক্রমাগত ব্যর্থতার অনুভূতি। এঁদের ক্ষুব্ধ অহঙ্কার ঘুরে-ফিরে

দোষারোপ করছিল পরিবেশের উপর। নবোদিত বিচারের আলোকে এই লেখককুল সুনীতি-দুর্নীতি, পাপ-পুণ্য, প্রেম-বাসনারও পুনর্মূল্যায়ন করতে চাইছিলেন। এঁদের কেউ কেউ বৃহত্তর সমাজ থেকে মানুষের মনের অপরিমিত গভীরতার পরিমাপ করতে চাইলেন। আবার কেউ দ্রুতপরিবর্তনশীল এবং পরাজয়াত্মক পরিণতির দিকে অগ্রসরমান জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে উপভোগ করে নিতে চাইলেন। জীবনকে উপভোগ করবার এই আকুলতায় বহুধা সুনীতি-দুর্নীতি, পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হল। আবার কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে ধ্বংসাত্মক হিংসামূলক আর উচ্ছৃঙ্খলতার দর্শনতত্ত্বকে স্বীকার করে নিতেও বাধ্য হলেন।

তৃতীয় দশকের এই গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন ভগবতীচরণ বর্মা। তিনি ছিলেন তৎকালীন এই তরুণ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাঁকে জীবন জোয়ার তার তরঙ্গমালার সঙ্গে ক্রীড়া বিলাসের জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, তার বিশালতায় অভিভূত হয়ে আপন মহতী বিনষ্টি সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত। তাঁদের অহমিকা ক্ষুব্ধ হয়ে অনুভব করতে লাগলো যে, দেশে কালে পরিব্যাপ্ত এই জোয়ার তাঁদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। সমাজ জীবনে পরাভূত মানুষের আর্ত মহিমাগীতি সে-যুগে সমগ্র সাহিত্যরূপে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বাংলার শরৎচন্দ্র, হিন্দী সাহিত্যের জৈনেন্দ্র, ইলাচন্দ্র যোশী ও ভগবতীচরণ বর্মা এর ব্যতিক্রম নন। 'বচ্চন,' 'অঞ্চল' বা নরেন্দ্র শর্মার গীতিরচনারও এই হল প্রেক্ষাপট। কিন্তু এ কথা স্মরণে রাখতে হবে, আখেরে এই বিদ্রোহ নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হলেও এই পরাজয়ের স্তব্ধতার মধ্যেও বিদ্রোহক্ষুব্ধ স্বরগ্রাম নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রেখে ভগবতীচরণ বর্মার উপন্যাস পাঠ করলে তাঁর অর্থ এবং প্রতীকধর্ম সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। 'চিত্রলেখা' 'তিনবর্ষ' ও 'টেঢ়ে-মেঢ়ে রাস্তে'—তাঁর গোড়ার দিকের এই তিনটি

উপন্যাসে তার মুখ্য চরিত্রগুলি বিশিষ্ট, ব্যক্তিগত অহংবোধে মণ্ডিত এবং প্রত্যেকটি চরিত্রই তার কোনো-না-কোনো কেন্দ্রে অসফল। 'চিত্রলেখা' গ্রন্থে অতীতের প্রেক্ষাপটে রয়েছে পাপ-পুণ্যের সমস্যা, 'তিনবর্ষে' দেখা যায়, বর্তমানের ভিত্তিভূমিতে বিবাহ, প্রেম ও বাসনার জটিলতা এবং 'টেঢ়ে-মেঢ়ে রাস্তে'-তে সমকালের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সামনে রয়েছে একটি জিজ্ঞাসা। সর্বত্র কাজ করছে একই চিন্তাধারা—'মানুষ পরিস্থিতির দাস।' পূর্বনির্ধারিত মূল্যবোধের ওপর সর্বত্র আঘাত হানছেন: কেউই পাপী বা পুণ্যাত্মা নয়, বেশ্যা কুলকন্যার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে পারে এবং সমগ্র রাজনৈতিক বিশ্বাস মিথ্যা। এটাকে এক ধরণের ক্ষয়িষ্ণু জীবনদর্শনও বলা যেতে পারে। যদিও এই দর্শনই সমকালের মানুষকে শক্তি যোগায়। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত আলোচ্য 'ভুলে বিসরে চিত্র' গ্রন্থে জ্বালাপ্রসাদ এই বলেই নিজের মনকে হাল্কা করেছেন: "মানুষের হাতে নেই কিছু, একেবারেই নেই কিছু, তাহলে আর কিসের জন্য চিন্তা করব। যা হবার, তা হয়েছে, তাকে আর ঠেকানো যাবে না।"

সমকালীন ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে ভগবতী বাবু ছিলেন আপন বৈশিষ্ট্যে একক। জৈনেন্দ্র, ইলাচন্দ্র যোশী প্রমুখ লেখকগণ যখন মানব-মনের বিশ্লেষণে অধিক সময় ব্যয় করছেন তখনও ভগবতী বাবু সামাজিক বাস্তব চরিত্র চিত্রনে তন্ময়। তাঁর চরিত্রাঙ্কণের প্রেক্ষাপট প্রেমচন্দের মত ব্যাপক নয়; কিন্তু, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিবিধ সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র এবং সমস্যাবলী তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসের মূল কাঠামো বহুধা-পরিবার কেন্দ্রিক। এই ধরণের গ্রন্থে তিনি প্রেমচন্দের পরম্পরার সমধর্মী। গল্প বলার আকর্ষণ তাঁর ছিল প্রেমচন্দের মতোই—সমকালীন ঔপন্যাসিকদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। আর একটি তথ্যও লক্ষণীয়, চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রতি তাঁর প্রবণতাও সে সময় কমে আসছিল, কিন্তু তখন

অন্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সম্ভবত, যে-দর্শনকে ভগবতী বাবু গ্রহণ করেছেন তার প্রত্যাশিত পরিণতি হল—ঘটনা-বাহুল্য।

আলোচিত প্রথম তিনটি উপন্যাসের পরে, ভগবতী বাবুর সাহিত্য-কলায় কিছু অবনতি ঘটেছিল। 'আখিরী দাঁও' তাঁর অপেক্ষাকৃত দুর্বল উপন্যাস। কিন্তু আলোচ্য 'ভুলে বিসরে চিত্র' ও 'সামর্থ ও সীমা' গ্রন্থে পুনরায় তিনি পর্যাপ্ত শক্তি ও শৈলীর প্রমাণ দিয়েছেন। 'ভুলে বিসরে চিত্র' রচনা করে তিনি 'সাহিত্য একাডেমী' ও 'হিন্দুস্থানী একাডেমী'র সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছেন।

ভুলে বিসরে চিত্র

'ভুলে বিসরে চিত্র' উপন্যাসখানি মূলতঃ বিশালাকার। ৭০০—৭৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী সমগ্র গ্রন্থখানির এটি হল সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। উপন্যাসের প্রধান ঘটনাবলীর ক্রমবিকাশকে স্মরণে রেখে এর এই সংক্ষেপ সংস্করণ। উপন্যাসের কিছু মনোজ্ঞ অংশ এবং জীবনের নানা রঙের বৈচিত্র্যাবলী বিলুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে, এই সংক্ষেপীকরণের ফলে উপন্যাসটি যেন অধিকতর দৃঢ়পিনদ্ধ এবং সুন্দর হয়ে উঠেছে।

এতে রয়েছে একটি পরিবারের চার পুরুষের কাহিনী। এই চারপুরুষের সামনে ছিল সমকালীন সংঘাত। এই পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতেই তাঁদের উত্থান-পতন। এই পরিবার ও সমাজ আজ অতীতের বিষয়, ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। ফলতঃ, যেন এই সকল ব্যক্তি, পরিবার আর সমাজের মিলন ঘটেছে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে। এক কথায়, গ্রন্থখানিকে যুগধর্মী উপন্যাস বলা যায়। এর ঘটনার ব্যপ্তি হল ১৮৮০—১৯৩০ সাল। অর্ধশতাব্দীব্যাপি ভারতবর্ষের সমাজ-চিত্রটিকে পরিস্ফুট করা হয়েছে রাজনৈতিক পরিদৃশ্যে। বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে সজাগ রাখবার জন্যেই সম্ভবত বর্মাজী কথাবস্তুকে ১৯৩০ সালের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন।

কারণ, এরপর থেকে লেখক স্বয়ং ভোক্তা, ফলে, পূর্বনির্ধারিত মূল্যবোধ-সমাবেশের আধিক্যের আশঙ্কা থেকে যেত। ভুললে চলবে না, বর্মাজী ১৯৩০ সালের দিকে লিখতে শুরু করেছেন।

বলা যেতে পারে, আলোচ্য গ্রন্থের চতুর্থ পুরুষ 'নবল' বর্মাজীর যুগের প্রতীক ; তাকেই তিনি রণক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে নিজে বিরাম নিয়েছেন—বিনা মন্তব্যে।

যৌথ পরিবার প্রথার বিলোপ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, পুঁজি-বাদের কাছে সামন্তবাদের পরাজয় ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশ এই চারিটি মৌলিক ভিত্তির ওপর সমগ্র গ্রন্থের কথাবস্তু আধারিত। এই চারিটি ধারার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসের সমগ্র অন্তর-রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। আদি পুরুষ মুন্সী শিউলাল, কাছারির হাতায় বসে যিনি মুহুরিগিরি করতেন। কিন্তু, তাঁর ইংরাজিনবিশ পুত্র ইংরেজ কলেক্টরের কৃপায় প্রতিষ্ঠিত হলেন নায়েব তসিলদারের পদে। এ হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুত্থানের প্রথম সোপান। এর সমকালীন প্রভাব মুন্সী শিউ-লালের যৌথ পরিবারের ওপর পড়ল। ছেলের সঙ্গে তাঁর বৌ-এর বাইরে যাওয়াই হল এই যৌথ-পরিবার প্রথায় প্রথম ফাটল। পরে মুন্সী শিউলালের ভাই মুন্সী রাধেলালের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই যৌথ পরিবারটি শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গেই গেল। এই সমস্যাটি পরেও উদ্ভূত হতে পারতো,—সম্ভবতঃ এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থকার জ্বালাপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ এবং নবল তিনজনকেই ক্রমান্বয়ে একমাত্র বংশধর বলে দেখিয়েছেন।

ভূমিকায় বলেছি, ১৯৩০ সালের দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকটকাল উপস্থিত হয়েছিল। পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায় তার বিকাশ ঘটছিল ; কিন্তু, আর্থিক অসাচ্ছল্য ধীরে ধীরে তাকে স্বাধীনতাকামী করে তুলছিল। 'ভুলে বিসরে চিত্র' গ্রন্থেও এই সমস্যাই চিত্রিত হয়েছে। জ্বালাপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ আমলাতন্ত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতীক। গঙ্গাপ্রসাদের কলেক্টর হওয়া মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর চরম অভ্যুত্থান। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে, নবল তার পিতামহের আরব্ধ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি, তার ক্ষুব্ধ অহমিকা কারো অনুগ্রহের পরোয়া করে না, জীবন-জোয়ারে ভেসে পড়ার জন্যে সে পূর্ণ আবেগে সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে ঝাঁপ দিল। চতুর্থ পুরুষের নবলের মধ্যে এই চরিত্র আর নিয়তির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে। সব মিলিয়ে, চার পুরুষের পারিবারিক স্তরেই এই উপন্যাস সফল।

কাহিনীর গোড়ার দিকেই উপন্যাসের বস্তুরূপের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্ভব : সামন্তবাদ বনাম পুঁজিবাদ। ঘাটমপুর তসিলে নায়েব-তসিলদার পৌঁছান মাত্রই, ঠাকুর গজরাজসিংহ, ঠাকুর বরজোরসিংহ আর লালা প্রভুদয়ালের সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিল। কুলাভিমান এবং পুরাণো সামন্ত-সজ্জায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত দু'জন ক্ষত্রিয় ঠাকুরকে সামান্য বেনের ছেলে প্রভুদয়াল ক্রমশঃ লঘু করতে লাগল। পরিস্থিতিকে অনুধাবনের ব্যাপারে তার ছিল শ্যেনদৃষ্টি। সে জানে আমলাতন্ত্রকে ট্যাঁকে রাখা চাই। আমলাতন্ত্রের প্রতীক জ্বালা-প্রসাদ তার অনুকূলে থাকতে বাধ্য হলেন, ন্যায়-নীতি আর আইন-কানুনের জোরে। এইভাবে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের গাঁঠছড়া বেঁধে গ্রন্থকার সামন্তবাদের পরাজয়ের ঐতিহাসিক তথ্যকে চিত্রিত করেছেন। গ্রন্থকার পুঁজিবাদের ঘৃণিত মূর্তির অবগুণ্ঠনকে বারবার তুলে ধরেছেন। এই পুঁজিবাদ অসহযোগ-আন্দোলনের সহযোগী; এর ফলে, বিদেশী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নিজেকে দৃঢ়মূল করায় সে মদত পেয়ে থাকে; কিন্তু, কাজ হাসিল হওয়া মাত্রই সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই পুঁজিবাদ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকেও সাহায্য করে থাকে, আর তার বদলে 'স্যার' খেতাবে ভূষিত হয়ে অভিজাত সামাজিক অধিকার লাভ করে কৃতার্থ হয়। পরের ধন হজম করে নেবার বেইমানীতে তার আর কিছুমাত্র দ্বিধা জাগে না, এমন-কি, মৃত্যুশয্যায় শায়িত আপন জননীকে পর্যন্ত কটূক্তি করতেও সে কসুর করে না—এই টাকার জন্যেই।

জ্ঞানপ্রকাশের একটি টিপ্পনীতে এই পুঁজিবাদের যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—"কিন্তু গঙ্গা, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই পুঁজিপতিরা মোটা লাভ করে। সেই লাভের অতি ছোট্ট ভাগ দেয় সরকারকে, যাতে সরকারের কাছ থেকে তারা সব রকমের সুবিধা পায়। এই লাভের একটি ছোট ভাগ দেয় কংগ্রেসকে যাতে স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হয় আর তাদের মালপত্রের বিক্রি বাড়ে। আবার এই লাভের আর একটি ভগ্নাংশ দেয় জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গঙ্গাপ্রসাদকে যার আড়ালে লক্ষীচন্দ যা লুটপাট, বেইমানী করে, সেদিক থেকে সরকারী কর্মচারীদের চোখ বন্ধ থাকে। টাকা এযুগের সব চেয়ে বড়ো হীলিং বাম।"

অর্থনীতির দিকে পা বাড়ালে রাজনীতির অনুপ্রবেশ স্বাভাবিক। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে রাজনৈতিক পরিবেশের বিবরণ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রস্তুত খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বিদেশী শাসন, তার প্রভাব এবং সাম্প্রদায়িকতা—জাতীয়তাবাদ বিকাশের আলোচনা স্থান লাভ করেছে। রাউলাট অ্যাক্ট. অসহযোগ-আন্দোলন, চৌরি চোরা কাণ্ড, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, ধর্মঘট, দাণ্ডী-যাত্রা, লবণ-সত্যগ্রহাদি একের সঙ্গে আর সবই এসে গেছে। রাজনৈতিক বিন্দুতেই উপন্যাসের সমাপ্তি। আলোচ্য গ্রন্থে যে পর্যায়ের চর্চা স্থান পেয়েছে সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর নির্ভর ; এক থেকে অন্যের উদ্ভব। এই পর্যায়ের আধারীভূত মূল ভাব-বিন্দুর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সামগ্রিক মূল্যবোধ ও আত্মবিশ্বাসের পুরাণো দুনিয়াটাকে ভেঙ্গে যে নতুন দুনিয়া তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে তার স্বরূপ আর বিকাশ-প্রদর্শনই এর প্রধান আলোচ্য। সামন্তবাদের কৌলীন্য এবং আভিজাত্যের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের সমর্থন করতে গিয়ে জ্বালাপ্রসাদ বলেছেন "বাপ্পা, এ হল নতুন যুগ! এখন নিজেকে তো আর ছুতোরগিরি করতে হবে না! সে তো খুলবে কাঠের কারখানা। হাজার হাজার ছুতোর মিস্ত্রি সেখানে কাজ করবে। কাজ চলবে কলের মত সুন্দর—নতুন

হালফ্যাশানের সব জিনিষ তৈরী হবে। লক্ষ কোটি টাকার মতো কাজ হতে পারবে। নতুন কালের হবে নতুন রূপ।" মুন্সী শিউলালের মাথায় একথা ঢুকল না তবুও তাঁর ছেলে যখন বলেছে, 'যে নতুন যুগের মানুষ,' সেজন্যে তিনি এটা মেনে নিলেন। এই কারণে লক্ষ্মীচন্দ (পুঁজিপতি) আর জ্বালাপ্রসাদ (আমলাতন্ত্র আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর) নতুন যুগের মানুষ। এ পরিবারের মধ্যেও এই নতুন যুগ প্রবেশ করছিল: "শিউলাল ভাবতে লাগলেন, অধিকার আর শক্তি তাদের জায়গা বদলাচ্ছে। পরিবারের পরম্পরার শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

কিন্তু জ্বালাপ্রসাদেরও জগৎ পালটে গেল। তিনিও পিছু হটলেন। ডেপুটি কলেক্টর সোমেশ্বর দত্ত গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে বলছেন, "সাহসী আর উচ্চাভিলাষী ছেলে, মীর সাহেব, এ আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। এ নবীন-যুগের মানুষ, নতুন দুনিয়ার উন্নতি করবে যথেষ্ট।" আর এই নবীন-যুগের নবীন-মানুষের গুণ হল এই,—তারা সাহসী, কারো তোষামোদ করতে জানে না। ইংরেজদের সঙ্গেও তাদের সমান ব্যবহার। তারা ভেতর বাইরে সমান। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখন এতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু সুখ, সুরক্ষা এবং চাকরীর প্রশ্নে এখনও এই আত্মপ্রত্যয় তলিয়ে যায়। তার অন্তর্লীন ভীরুতা তাকে ভেঙ্গে দেয়। অসহযোগ-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও অপমানিত গঙ্গাপ্রসাদ চাকরি ছাড়তে পারলেন না। এই শক্তির সমাবেশ ঘটল তাঁর পরের পুরুষে। অসুস্থ পিতার সেবার উদ্দেশ্যে ভবালি যাবার জন্যে প্রস্তুত নবলের দিকে তাকালেন গঙ্গাপ্রসাদ—শক্ত-সামর্থ, আত্মবিশ্বাসী ছেলে, ভবিষ্যৎ বংশধর। নবীন যুগের এই প্রতীক নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। তার মতে, মেয়েদের চাকরির প্রশ্নকে নবীন দুনিয়ার লোকে যথার্থ মনে করবে। ওকালতি পেশা সে অবজ্ঞা করে, কারণ মিথ্যে, তোষামোদ আর ছল-চাতুরি তার

দ্বারা সম্ভবপর নয়। সে বলছে, "আমি নিরাশাতে জেলে যাচ্ছি না। যে পথ আমি ধরেছি, এ তারই পরিণতি। সংঘর্ষ—সংঘর্ষ—সংঘর্ষ! আজীবন সংঘর্ষ! এ সংঘর্ষ আমার অন্তরের আহ্বান……।" সে অনুভব করে যে নবীন যুগ সে গড়ে তুলতে চায় সেটা খুবই মহার্ঘ। "যা কিছু পুরাতন সেগুলো নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গতে হচ্ছে।"

উপন্যাসের প্রারম্ভে যে জ্বালাপ্রসাদকে নবীন যুগের মানুষ বলা হয়েছিল, সেই আবার পঞ্চাশ বছর পরে উপন্যাসের শেষে, নবতর যুগের সামনে নিজেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অনুভব করছে—দ্রুতপরিবর্তিত এই নতুন দুনিয়ার এর চেয়ে উজ্জ্বলতর ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্র আর কী হতে পারে: "বুঝতে পারছি না ভিখু, এ সব কি হচ্ছে আর কেনই বা হচ্ছে। এই নানা রঙের চিত্রগুলি আপনিই অঙ্কিত হচ্ছে আবার মুছে মুছে যাচ্ছে কেন?" এই টিপ্পনী দিয়েই গ্রন্থকার তাঁর উপন্যাসের যবনিকা টেনেছেন।

"তুই বৃদ্ধ যারা অনেক যুগ দেখেছে, জীবনের নানা পতন-অভ্যুদয় দেখেছে। তাদের অন্তরে ছিল অনুভূতির অক্ষয় ভাণ্ডার। তারা হয়ে উঠেছিল বিবশ, নিরুত্তর। দূরে বহুদূরে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে জীবনের আর গতির প্রেরণায়, নবোদ্যমে আর নবোল্লাসে একটা নতুন জগৎ রচনা করার সংকল্প নিয়ে।"

বিস্তৃত দেশকালের মধ্যে প্রসারিত এই উপন্যাসের রূপায়ণ সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি সর্বাগ্রে নিবদ্ধ হয় লেখকের বাচনভঙ্গির দিকে। যে জীবন-চর্যাকে গ্রন্থকার চিত্রিত করেছেন তাকে প্রস্ফুটিত করার জন্যে প্রয়োজন, নিরাসক্ত বস্তুনিষ্ঠা। তিনি কাহিনীটিকে উপস্থাপিত করেছেন নির্লিপ্ত দ্রষ্টার নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে; এ ছাড়া, প্রশস্ত দেশ-কালের জের টানা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। এই নির্লিপ্তির নাটকীয় যোজনায় গ্রন্থকার তাঁর কাহিনী পরিবেশনে একঘেয়েমি থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন; নাটকীয়তার উজ্জীবন করেছে মর্মস্পর্শী সংলাপ। তটস্থ দ্রষ্টার

দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত ঐতিহাসিক শৈলী-প্রয়োগের ফলে, গ্রন্থকার যে কোন দিক থেকে প্রবেশ করে কথার সূত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছেন ; অথবা টীকা-টিপ্পনী জুড়ে চরিত্রের রূপরেখা ও ঘটনার গূঢ়ার্থটিকে স্পষ্ট করতে পেরেছেন। কিন্তু এই সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কাহিনীর গঠন-পদ্ধতিতে তাঁর কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। আকস্মিক ঘটনা প্রবাহের সমাবেশ করে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তারমধ্যে একটি। বুদ্ধ্ ও জগ্‌গু পালোয়ানদের অকস্মাৎ আর্বিভাব অপ্রধান কাহিনীর মধ্যে স্থান পেতে পারে (অবশ্য, বিষণলালের যাবতীয় গৌণ কাহিনী মূল কাহিনীতে কিছু মাত্র সংযোগ করে না, বা, কাহিনীটিকে কোনো প্রকারে অর্থবানও করে না)। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের আকস্মিক অসুস্থতা ও মৃত্যু ঘটানোতে মনে হয়, যেন লেখক এই পাত্রটির হাত থেকে নিষ্কৃতি চাইছেন। গঙ্গাপ্রসাদ চরিত্রের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা-গুলিকে কাজে লাগানো হয়েছে বলে মনে হয় না। এই একই কথা বলা যায়, বড়জোর সিংহের আত্মহত্যা সম্পর্কেও। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও কাহিনীকে সুসম্বদ্ধ করার জন্য লেখক বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। চার পুরুষের কাহিনী বলবার সময় খেই না-হারাবার জন্যে যে কেনো একজনকে কেন্দ্র করা কাহিনীকারের পক্ষে আবশ্যক ছিল। তার জন্য বর্মাজী নির্বাচন করলেন জ্বালাপ্রসাদকে পিতা শিউলালের পরম্পরা পেয়েছিলেন জ্বালাপ্রসাদ উত্তরাধিকার সূত্রে, আর পেয়েছিলেন যৌথ পরিবারের জটিলসমস্যা। তৃতীয় পুরুষে এলেন তাঁর পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ, যিনি তাঁরই বিকশিতরূপ। তিনি আপনার আর আত্মজের পরম্পরাটির সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অবহিত থাকতে পারেন। চতুর্থ পরম্পরায় পৌত্র নবল, তার দিকে তিনি শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ; বুঝতে পারেন না। এইভাবে জ্বালাপ্রসাদই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের মেরুদণ্ড হয়ে বিরাজ করছেন। তাঁর চরিত্রে যখন সক্রিয়তা দেখা যায় না,

তখনও তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট সম্পর্ক দ্রষ্টা। এইভাবে গ্রন্থকার জ্বালাপ্রসাদের পূর্ণ সম্ভাবনা ও ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পূর্ণ করেছেন।

উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের শক্তিমত্তা বিশ্লেষণের সময় অনবরত চোখে পড়ে যে, তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত গভীরতা ও সুসমতার অভাব। এই দুর্বলতার জন্যে দায়ী খুব সম্ভব, বিস্তৃত দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত সামাজিক জীবন-চিত্রণ। অন্যথায় গ্রন্থকার 'চিত্রলেখা,' 'তিনবর্ষ' ও 'টেঢ়ে-মেঢ়ে রাস্তে' গ্রন্থে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-প্রতিষ্ঠা-শক্তির যথেষ্ঠ প্রমাণ দিতে পেরেছেন। 'টেঢ়ে-মেঢ়ে রাস্তে' গ্রন্থের পণ্ডিত রামনাথ অবিস্মরণীয়-নায়ক-চরিত্র পরম্পরায় উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু, আলোচ্য উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীগণের অনেকই সরল ও ছঁকে বাঁধা। তাঁদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত, এমনকি তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেও আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব। বৈধ বা অবৈধ প্রণয় প্রসঙ্গেই হোক অথবা বাৎসল্য সম্পর্কেই হোক্—কোথাও এমন গভীর ভাবপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না, যা যাবতীয় তর্কবিতর্ক এবং কার্য-কারণের পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষের সম্পর্কের মধ্যে বিশিষ্টরূপ দান করে। বাহ্যিক এই চরিত্র-চিত্রণ কেবলমাত্র পরিবার প্রসঙ্গেই নয়, আধিকারিক, পুঁজিপতি, রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের সম্পর্কেও সংবাদ মাত্র পরিবেশন করে, তাঁদের জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে না। ছিনকি বা ভিখুর মতন চরিত্রগুলিই হ'ল বিশিষ্টতম, সুপুষ্ট মানবীয়ভাবে আধারিত। কিন্তু, কাহিনীর মধ্যে এই চরিত্রগুলির বিশেষ বিকাশ ঘটেনি। সম্ভবত, লেখকের পরিকল্পনায় এর কোনো সুযোগ ছিল না।

কিন্তু পাত্র-পাত্রীদের যেখানে শ্রেণীগত প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন, সেখানে বর্মাজী প্রেমচন্দের প্রায় সমধর্মী। মুন্সী শিউলাল পাটোয়ারী, মুহুরীদের সেই কায়েতী-বুদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করছেন, যারা নানা-প্রকারের ফন্দি এঁটে আর বেইমানী করে সর্বদা স্বার্থসিদ্ধির অনুসন্ধানে রত। যখন তাঁর পুত্র এই ধরণের হীন কার্যে অসম্মতি জানায়, তখন আবেগভরে তিনি আত্মহত্যা করে বসেন। মুন্সী

রাধেলাল তাঁর অগ্রজের পরিপূরক। জ্বালাপ্রসাদ হলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, যিনি নিজের যোগ্যতা ও সততার দ্বারা এবং বৈধভাবে সরকারী চাকরীতে পদোন্নতি ক'রে থাকেন। এরই বিকাশ গঙ্গাপ্রসাদ; তফাৎ এই যে তাঁকে নিজের পরিবেশের সঙ্গে যুঝতে হয়নি। পরিবেশ তাঁর উন্নতির সহায়ক, আর তিনি অপেক্ষাকৃত সমতলভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ফলত তিনি সহজেই কুপথে এগিয়ে অবশেষে ভেঙ্গে পড়েছেন। নবল এলো নবযুবক-পরম্পরার প্রতিনিধি হয়ে, যাদের প্রাণে, সংঘর্ষের আহ্বান, এক ধরণের অরূপ-লক্ষের সংঘর্ষ। অন্য চরিত্রাবলীর মধ্যে ঠাকুর গজরাজসিংহ, বরজোরসিংহ, সরোহনের রাজা প্রমুখ ধ্বংসপ্রায় সামন্তশ্রেণীর এবং প্রভুদয়াল আর লক্ষ্মীচন্দ নবগঠিত পুঁজিবাদের প্রতিনিধি। জ্ঞানপ্রকাশ রাজনৈতিক চেতনার প্রতীক, আর বিদ্যা নবীনা বিদ্রোহিনী নারীর। মীর সাহেব হলেন আংশিকভাবে গ্রন্থকারের নিজের বিবেকের এবং পুরাতন ধর্মবোধ এবং নীতিবোধের সদংশের প্রতিনিধি। কিন্তু, তিনি নবযুগের যোগ্য না হওয়ায়, গ্রন্থকার রঙ্গমঞ্চ থেকে অনতিবিলম্বে তাঁর যবনিকা টেনে দিয়েছেন। পাত্র-পাত্রীর চরিত্র সৃষ্টিতে স্মরণ রাখতে হবে যে, গ্রন্থকার যে ঘটনাবহুল কাহিনীকে আশ্রয় করেছেন, তার মধ্যে শ্রেণীগত চরিত্রের উপস্থিতির সম্ভাবনাই বেশী।

ঘটনা সমাবেশ এবং চরিত্রের যথাযোগ্য পরিবেশ পরিবেশনে গ্রন্থকার নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের পরিচয় দিয়েছেন। জ্বালা-প্রসাদের নায়েব তসিলদারির পদ পাবার ঘটনাই হোক্ অথবা আল্লামাউহশী বা স্বামী জটিলানন্দের শাস্ত্র বিচারই হোক, কিংবা নবলের জেল যাবার পরিবেশে উপস্থিতি মিছিল বা "শ্লোগান"— সর্বত্রই গ্রন্থকার অনুকূল প্রসঙ্গ স্মরণে রেখেছেন, এবং এতে তাঁর কাহিনী ও চরিত্রাবলী সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য যে, পরিবেশ সম্পর্কে গ্রন্থকার কোনোরূপ মোহের আতিশয্য দেখান নি। কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাঠকের মন অন্যত্র কোথাও আটকে রয়েছে

গ্রন্থকার পাঠককে তার আভাসমাত্র দেন নি। পরিবেশ-সৃষ্টির দিক্ থেকে এটাই বিশেষ সার্থকতা।

উপন্যাসের ভাষায়, পাত্র-পাত্রীদের বাচনভঙ্গিতে প্রেমচন্দের অনুরূপ সহজ-সরল সুর ধ্বনিত। গ্রন্থকার আলঙ্কারিক বা অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ভাষার প্রয়োগ না-করে, ভাষায় যে গঠন আর শৈলী গ্রহণ করেছেন, তার ফলে উপন্যাসখানি অধিকতর সার্থক হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ এই উপন্যাসে যে বিগত অর্ধ-শতাব্দের ভুলে-যাওয়া বা বিস্মৃত ছবিগুলিকে পুনরায় স্মৃতিপটে অঙ্কিত করা হয়েছে, সেগুলি আমাদের মন ভুলিয়ে রাখে। এই উপন্যাসখানি স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে হিন্দী সাহিত্যের একটি সার্থক কৃতি। গ্রন্থখানি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে যেমন জ্ঞান বাড়ায়, তেমনি প্রেরণা যোগায়।

প্রথম অধ্যায়

এক

আর্জিখানা হাতে নিয়ে মুন্সী শিউলাল বললেন, "ঠাকুর, এমন মুসাবিদে করেছি, শালা মৈকুলাল পুরোপুরি পাঁচ বছরের মতন আটকে পড়বে।"

আর্জিটি শুনে ঠাকুর ভূপসিংহ আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, "শাবাশ মুন্সী! সত্যিই কী ফন্দীই না এঁটেছ। এই বলে ঠাকুর ভূপসিংহ একটি আধুলি মুন্সী শিউলালের দিকে নজরানা এগিয়ে দিলেন।

মুখ বেঁকিয়ে মুন্সী শিউলাল বললেন, "শোন ঠাকুর, আমি এক টাকার এক পয়সাও কম নেবনা। যদি মোক্তার-উকিলের ফাঁদে পড়তে তো পুরো দু'টাকা আদায় ক'রে ছাড়ত। তার ওপর মামলাটাও দিত কেঁচিয়ে।"

অনেক তকরার ক'রে শেষে ঠাকুর ভূপসিংহ আর একটি সিকি মুন্সী শিউলালকে ছাড়লেন। সিকি নিয়ে মুন্সী শিউলাল আর্জিটা ঠাকুর ভূপসিংহের হাতে দিয়ে বললেন, "ঠাকুর, শীগ্‌গীরই মামলার শুনানি হবে, সোজা কালেক্‌টার সাহেবের আদালতে চলে যাও। আর হ্যাঁ শোন, আর্জিটি দেওয়ার সময় পেশকারের হাতে একটা সিকি গুঁজে দিতে ভুলনা যেন—বুঝলে!"

মুন্সী শিউলালের মাঝারী গড়ন, রোগা, বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, নিপুণ-ছাঁট গোঁফ, সাদা-কালো ছোপ মারা মনে হয়; বসন্তের দাগ না থাকলে তাঁর মুখের গড়নটি ভালোই বলা যেতে পারতো; রং উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ; কিন্তু মুখে বসন্তের দাগের জন্যে ময়লা দেখায়। ঠাকুর ভূপসিংহ চলে গেলেন। মুন্সী শিউলাল সুপুরির বটুয়া বের ক'রে সুপুরি কাটতে কাটতে ডাক দিলেন, "ওরে, ও ঘসিটা!"

ফতেপুরের কালেক্টারী আদালতের হাতায় মান্ধাতা আমলের

একটা খুব বড়ো বটগাছ ছিল তারই তলায় মাটির জালা রেখে ঘসিটা কাছারিতে মক্কেলদের জল খাওয়াত। ঘসিটা ঢুলছিল। মুন্সী শিউলালের ডাকে সে চমকে উঠল। চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে জিজ্ঞেস করল, "কি গো মুন্সী, তুমি ডাকছিলে নাকি?"

মুন্সী শিউলাল বললেন, "হ্যাঁরে! একটু এদিকে আয় তো।"

ঘসিটা জাতিতে কাহার। সে মুন্সী শিউলালের বাড়ীর কাছেই থাকত। ঘসিটার বৌ ছিনকি মুন্সী শিউলালের বাড়ি ঝি-গিরি করত আর ঘসিটা কাছারিতে লোকেদের পানি খাওয়াত। মুন্সী শিউলাল ঘসিটার দিকে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "সন্ধ্যে-বেলা কাছারি থেকে ফেরার পথে চার আনার মদ নিয়ে আসবি।"

ঘসিটা আশ্চর্য হয়ে মুন্সী শিউলালের দিকে চেয়ে বলল, "ছিঃ ছিঃ মুন্সী! তোমার লজ্জা করে না, কালই কণ্ঠী নিলে আর আজ থেকেই শুরু করেছ।"

মুন্সী শিউলাল কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ভেবে বললেন, "ঠিক কথাই বলেছিস! কেল্লা ফতে! মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি খেলেছে। দেখ, বাড়িতে যে গঙ্গাজলের বোতলটি আছে, তা থেকে চার ফোঁটা গঙ্গাজল মদে মিশিয়ে নিস। গঙ্গাজলে সব কিছুই শুদ্ধ হয়ে যায়।"

ঘসিটা হেসে ফেলল, বলল, "তোমার ঘটে বুদ্ধি আছে বটে!" সিকিটি তুলে নিয়ে সে বটতলায় দু-চার জনকে জল খাওয়াতে চলে গেল।

মুন্সী শিউলাল সুপুরির টুকরো মুখে দিয়ে মক্কেল শিকারের খোঁজে পায়চারি করতে লাগলেন। এমন সময় কালেক্টারের চাপরাসি চন্দন সিংহ ছুটতে ছুটতে এসে মুন্সী শিউলালকে বলল, "মুন্সীজী, আমি তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি, সাহেব তোমাকে এক্ষুণি ডেকেছেন।"

সাহেবের নাম শোনা মাত্র মুন্সী শিউলালের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ঠাকুর ভূপসিংহের আর্জিতে মুন্সী শিউলাল যা কেরামতি

ফলিয়েছেন, তাতেই সাহেব তার ওপর চটে যাননি তো। চন্দন সিংহ মুন্সী শিউলালের মনের ভাব বুঝতে পেরে সান্ত্বনার স্বরে বললে, "মুন্সীজী কোন ভয় নেই, সাহেব পেশকারের সঙ্গে বেশ হেসে কথা বলছিলেন, তোমার ওপর রাগ করেননি।"

মুন্সী শিউলাল দম্ভ ভরে বললেন, "রেগেই বা তিনি আমার কি করতে পারেন? সৎপথে খেটে অন্ন খাই, ভগবানের নাম নিই।"

কালেক্টার নিজের চেম্বারে বসে পেশকারের মুখে সেদিনকার দেওয়ানী মামলার আর্জিগুলো শুনছিলেন আর অর্ডার লিখে দিচ্ছিলেন। তিনি মুন্সী শিউলালকে দেখামাত্র বললেন, "ওয়েল মুন্সী, তুমি বড়ো চালু লোক দেখছি।"

"সবই হুজুরের দয়া!" শিউলাল বললেন, "এই অধমের কি কোনো অপরাধ ঘটেছে?"

কালেক্টার পেশকারকে ভূপসিংহের আর্জিটা বের করতে হুকুম দিয়ে বললেন, "বেনে মারল ঠাকুরকে আর ষাঁড় তুলে আছাড় মারল বেনেকে?—বাঃ! বেশ চমৎকার গল্প! তুমি কি ভাবছো আমি একথা বিশ্বাস করব; ঠিক্ করে বলতো, ব্যাপারটা কি? আমি পুলিশ অনুসন্ধানের আদেশ দিয়ে দিয়েছি।"

মুন্সী শিউলাল গলা খাঁক্‌রে বললেন, "হুজুর অভয় দেন তো বলি।"

কালেক্টার সেদিন ভাল মুডে ছিলেন, মুচ্‌কি হেসে বললেন, "আচ্ছা তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু সত্যি কথা বলবে, একবিন্দুও মিথ্যে না।"

"হুজুর এই মৈকুলালটা বড় পাজি। শত শত চাষীর সর্বনাশ করেছে, এর কাছে ধার নিয়ে কেউ কখনো ঋণমুক্ত হতে পারেনি।"

"উঃ! তাহলে তো এই মৈকুলাল সুদখোর বেনে—এবারে বুঝেছি। তবে সত্যি সে বড় পাজি, বেইমান। হাঁ, তারপরে কি হল?"

"তাই বলছি হুজুর! ভূপসিংহ সরল চাষী, মানুষ চেনেনা। সে

মৈকুলালের ফাঁদে পড়ে গেছে। আজ পর্যন্ত মৈকুলাল তার কাছ থেকে আসলের তিন গুণ আদায় করে নিয়েছে, তবুও ছাড়ছে না। এখন নজর পড়েছে তার ঘর-বাড়ি ও জমির ওপর। ফলে ভূপসিংহ যদি ক্ষেপে গিয়ে থাকে তো আশ্চর্য কি!"

কালেক্টার জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কি এই আবেদনপত্রটি ঝুটো?"

"হুজুর, সত্যি-মিথ্যে তো প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। অধীন যা নিবেদন করল, সে শুধু হুজুর—মালিকের খোদ সওয়াল, আদালতের এক্তিয়ারে নয়। হুজুর, বদলোকের সঙ্গে বদ ব্যবহার না করলে তার বিষ-দাঁত ভাঙ্গে না।"

কালেক্টার হেসে বললেন, "তুমিও খুব ঘোড়েল লোক মুন্সী, কিন্তু আমি তোমার ওপর খুব খুশী আছি! হ্যাঁ, তুমি তোমার ছেলে জ্বালাপ্রসাদের জন্যে বলেছিলে না?"

"হুজুর বড়োই দীন-দরদী। ছেলেটাকে যদি কানুনগো, অহলমদ[1] কিম্বা নাজিরের কাজ দিয়ে দেন তো হুজুর আমাদের দু'মুঠো অন্নের একটা সুরাহা হয়।"

এবারে কালেক্টার জোরে হেসে উঠলেন, বললেন, "ওয়েল মুন্সী, তোমার আর কি বলার থাকতে পারে! আমি তোমার ছেলে জ্বালাপ্রসাদকে নায়েব তসিলদার পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

মুন্সী শিউলালের নিজের কানকে বিশ্বাসই হচ্ছিল না, বিস্ফারিত চোখে কালেক্টারের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কি বললেন হুজুর, জ্বালাপ্রসাদকে নায়েব তসিলদারের পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আপনি? আমি সজ্ঞানে ঠিক্ ঠিক্ শুনছি তো হুজুর!"

কালেক্টার সরকারী আদেশপত্র শিউলালের হাতে দিয়ে বললেন, "এটা সরকারী নিয়োগপত্র। পনের দিন বাদে জ্বালাপ্রসাদকে

[1]আদালতের কর্ম্মচারী বিশেষ।

কানপুর জেলার ঘাটমপুর মহকুমার কাছে জয়েন করতে হবে। সে যেন আমার সঙ্গে যত শীঘ্র পারে দেখা করে, আমি তাকে সব বুঝিয়ে দেব।"

মুন্সী শিউলাল খপ্ করে কালেক্টারের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললেন, "হুজুর আমাদের মা-বাপ। আমরা বংশ পরম্পরায় আপনার ঋণী হয়ে থাকব।" উঠে দাঁড়িয়ে পেশকার সাহেবকেও একটা লম্বা সেলাম ঠুকলেন।

বিদ্যুৎবেগে ফতেপুর শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে মুন্সী শিউলাল মুহুরির ছেলে জ্বালাপ্রসাদ নায়েব তসিলদার পদে নিযুক্ত হয়েছে। মুন্সী শিউলাল যখন বাড়ীতে সুসংবাদটি দিতে গেলেন, তার আগেই খবরটি বাড়িতে পৌঁছে গেছে। মুন্সী শিউলালের ছোট ভাই মুন্সী রাধেলালকে পাড়া-প্রতিবেশীরা ঘিরে রেখেছিল। তিনি বলছিলেন, "আমাদের বংশকে তোমরা কি মনে করেছ! সিপাই বিদ্রোহের আগে আমাদের ঠাটবাট ছিল দেখবার মতন। ইতিহাসে লেখা আছে, আমাদের বনেদী বংশের জোরেই নবাবী চলত। সে সবই কালেক্টার সাহেব জানেন। তাই, দেখনা, কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই কেমন চট্ করে জ্বালাকে নায়েব তসিলদারের পদে নিয়োগ করে দিলেন।"

প্রতিবেশীরা রাধেলালের তিন পুরুষের পরিচয় তো জানতোই। রাধেলালের ঠাকুর্দা মুন্সী কুন্দনলাল ফতেপুরে সর্বপ্রথম পাটোয়ার হয়ে আসেন। নিজের চালাকি, বেইমানি, জাল-জুয়াচুরির জন্যে খুবই দুর্নাম কিনেছিলেন। কুন্দনলাল একটা পাকা বাড়ি তৈরী করেছিলেন, প্রচুর টাকা জমিয়েছিলেন। তিনি জমিদারী কেনবার মতলব করেছিলেন। এই সময় ঠাকুর ঝুমর সিং-এর সঙ্গে অকারণ ঝগড়া বাধালেন। ঠাকুর ঝুমর সিং শুধু জমিদারই ছিলেন না, ডাকাতও ছিলেন। তারপর একদিন রাত্রে মুন্সী কুন্দনলালের বাড়িতে ডাকাত পড়ল। নগদ গয়নাগাটি নিয়ে মুন্সী কুন্দনলালের

হাত-পা ভেঙ্গে দিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাতরা শাসিয়ে গেল, বেশী গোলমাল বাধালে পুরো পরিবারটাই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

কুন্দনলালের রোজগারের শুধু সেই পাকা বাড়িটিই মাত্র পেলে তাঁর ছেলে বনোয়ারি। কুন্দনলালের একমাত্র ছেলে বনোয়ারি অশিক্ষিত ও বখাটে। সে খুব সুখে-বিলাসে জীবন কাটাল। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হল, সেটা কেউই জানতে পারল না। বনোয়ারিলালের দুটি ছেলে—মুন্সী শিউলাল আর মুন্সী রাধেলাল। মুন্সী শিউলাল ছিলেন মুহুরী আর মুন্সী রাধেলালের পেশা ছিল মোকদ্দমার আর উকিলদের দালালী।

মুন্সী রাধেলালের আত্মম্ভরিতার টীকা-টিপ্পনী করার বা তাঁর ঠক্‌বাজী ফাঁস করার সাহস কোন পড়শীরই ছিলনা। তারা সবাই মুন্সী রাধেলালকে ভীষণ ভয় পেত। কে জানে কখন মুন্সী রাধেলাল কার সঙ্গে কি বিবাদ বাধিয়ে বসবেন। মুন্সী শিউলাল এসে পৌছতেই প্রতিবেশীরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "অভিনন্দন জানাই! বলুন কবে ভোজটা হচ্ছে?"

মুন্সী শিউলাল হাসতে হাসতে বললেন, "আপনাদের শুভেচ্ছাতেই ভগবান্ আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। দু-চার দিনের মধ্যেই সত্য নারায়ণের পূজো হবে। জ্বালাও এখানে আসুক, সেদিনই হবে।"

প্রতিবেশীরা চলে গেলে মুন্সী শিউলাল নিজের ঘরে কাপড় ছাড়তে গেলেন। সেই সময় ছিনকি মুন্সী শিউলালের ঘরে এসে ঢুকল। ছিনকি কাহারিনের বয়স প্রায় তিরিশ। সুগঠিত দেহ, শ্যাম বর্ণ, মুখে সবসময় সরল হাসি লেগেই আছে। ছিনকি ঘসিটার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার, প্রথম পক্ষের রাধিয়া প্রায় বার বছর আগে নিজের আট বছরের ছেলে ভিখুকে ঘসিটার হাতে সঁপে দিয়ে মারা যায়। ছিনকির ছেলেপুলে হয়নি, আর হবারও কোন আশা নেই। ঘসিটার বয়সও ষাট বছর হতে চলল।

হাসিমুখে ছিনকি বলল, "ছেলে নায়েব তসিলদার হয়েছে এবার আমাকে রূপোর হাঁসুলি তৈরি করিয়ে দিতে হবে।"

মুন্সী শিউলাল বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, কালকেই স্যাকরাকে হাঁসুলির জন্যে বলে দেব। বৌমা কি করছেন?"

মুন্সী শিউলাল বিপত্নীক। প্রায় আট বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা যায়। সে সময় জ্বালাপ্রসাদের বয়স ছিল চৌদ্দ। তার দু'বছর আগেই জ্বালাপ্রসাদের বিয়ে হয়েছিল! মুন্সী শিউলাল স্ত্রী মারা যাবার পরে আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেননি। তিনি উত্তর দিলেন, "ছেলে-বৌ, ছোট ভাই, তার পরিবার এরা সকলে তো আছেই, বিয়ের আর দরকার কি? বুড়ো হচ্ছি রামের নামই এখন একমাত্র অবলম্বন!"

ছ'মাস আগে জ্বালাপ্রসাদের বউ যমুনা প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। রাধেলালের সংসারে তার স্ত্রীর শাসন ছিল। যমুনা তখন নেহাৎ বৌ। যমুনার বয়স তখন ষোল।

ছিনকি রেগে রুক্ষ গলায় বলল, "সে রান্না করছে। শোনো, ছোট গিন্নি বৌমার ওপর বড়ই কাঁটকী। জ্বালার বৌ বেচারা ছেলেমানুষ, তবু দিন-রাত ওকেই খাটায়। বলি, ছোট গিন্নিকে তুমি বারণ করনা কেন?"

মুন্সী শিউলাল ছিনকির কথাটা এড়াবার জন্যে বললেন, "যাক্‌গে ওসব কথা! রাধের বউ তো আর পর নয়। সেই তো এ বাড়ির গিন্নি, যা ভালো বোঝে তাই করে।"

ছিনকি দমে গিয়ে বললে, "বেশ বেশ এখন আসি, বৌয়ের রুটি কখান বেলে দিইগে, বেচারার একটু সুরাহা হবে।"

ফতেপুরে জ্বালাপ্রসাদের সময়টা বেশ হৈ-চৈ-এর মধ্যে কাটল। মুন্সী শিউলাল জ্বালাপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বড়ো বড়ো অফিসারের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়ে আনলেন। ফতেপুরের কায়স্থরা আর পড়াশীরা জ্বালাপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালো এবং মুন্সী শিউলালও মন খুলে নাচ-গান আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করলেন। যেদিন জ্বালাপ্রসাদের ফতেপুর থেকে ঘাটমপুরে রওনা হবার কথা, তার দু'দিন আগে ছিনকি যমুনাকে জিজ্ঞেস করলে,

"শুনলাম, তোমার মাসিমা লিখে পাঠিয়েছেন, তোমাকেও যেন ওর সঙ্গে ঘাটমপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তোমার যাবার কোন উপায় দেখছিনা। তুমি কি জ্বালাকে সে-কথা বলনি ?"

যমুনা উদাসভাবে বললে, "কি আর বলি, ছিনকি কাকী, আমি ওঁকে তো অনেক করে বললাম কিন্তু উনি কিছু শুনছেনই না। বলছেন, বাবা যা ভালো মনে করেন, করবেন।"

"তাহলে কি জ্বালা একাই যাচ্ছে ? ছোট গিন্নীতো কোন গোছ-গাছ করছেন না।"

"বোধহয় একাই যাচ্ছেন ; আমাকে তো কিছু বলেন না। দুজনে যে একটু কথা বলব সে সুযোগ কোথায়, দিনরাত তো খানাপিনার পালা চলছে।"

ছিনকি কিছু ভেবে নিয়ে বলল, "বেশ, সবুর কর। আমি বড়ো মুন্সীর সঙ্গে কথা বলে দেখি। জ্বালার সঙ্গে তোমার যাওয়া বিশেষ দরকার, তা নাহলে সেখানে ওর দেখাশোনা কে করবে ?"

ছিনকির কথা শুনে যমুনা ভয় পেল। সে ছিনকির হাত ধরে বলল, "জোড় হাত করে বলছি ছিনকি কাকী, দোহাই তোমার, এখন তুমি এসব কথা তুলো না। কাকীমা মনে করবেন এ আমারই কাজ। তাহলে উনি আমাকে আর আস্ত রাখবেন না, তুমি তো জানই।"

ছিনকি হাত ছাড়িয়ে বললে, "এত ভয় পেলে চলবেনা বউ। আমি কি আর বড়ো মুন্সীকে বলতে যাব যে তুমি এসব বলিয়েছ। তোমাকে কোন রকমে পাঠানোর ব্যাপারে আমি তাঁকে রাজী করাব—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসো।" যমুনার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছিনকি চলে গেল।

মুন্সী শিউলাল স্নান সেরে পূজোয় বসতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ছিনকি তাঁর ঘরে ঢুকল। তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছিনকির দিকে তাকালেন, ছিনকি বলল, "একটা বিশেষ দরকারী কথা বলার ছিল।"

মুন্সী শিউলাল বিরক্তির সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "কথাটি কি আমার পূজো শেষ হবার পরে বলা যায় না?" "যদি তাই হতো, তাহলে কি আমি তোমার পূজোয় বাধা দিতাম! বল দেখি কোনোদিন আমি এমন অবুঝের মতো কাজ করেছি?"

মুন্সী শিউলাল শান্ত স্বরে বললেন, "বেশ, চট করে তোর কথা বলে নে, আজ আমার অনেক কাজ আছে। জ্বালার সমস্ত গোছ-গাছ করতে হবে।"

ছিনকি একটু ঠেস দিয়ে বলল, "তোমাদের সংসারে আমার কোন অধিকার নেই, তা আমি জানি আর তার জন্যে আমার কোন অভিযোগও নেই। তবু তোমাকে জিজ্ঞেস না করে পারছিনা, জ্বালা কি একা যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, রামুর স্ত্রীর তো সন্তান হবে, তাই আমি ছোট গিন্নীর যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। যদিও সে যাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল।"

"তাহলে জ্বালার খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?"

"বারে, ওখানে কোন ঠাকুর-টাকুর রেখে নেবে। বড়ো অফিসার হয়ে যাচ্ছে, ওর কি আর চাকর-বাকরের অভাব হবে? আমি জ্বালাকে সে সব বুঝিয়ে দিয়েছি, তুই এসব নিয়ে ভাবিস নি।"

"বলিহারি যাই তোমার বুদ্ধির!" মুখ ঝামটা দিয়ে ছিনকি বলল, "চাকর দিয়ে কার কোথায় সংসার চলে যে জ্বালার চলবে! বিদেশ-বিভুঁইয়ের ব্যাপার, ক্ষমতার জোর, তার ওপর ভরা যৌবনের সময়।"

মুন্সী শিউলাল ছিনকিকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "কি আজে-বাজে বকছিস?" তারপরে চোখবুজে কিছু ভাবতে লাগলেন। মুন্সী শিউলাল ছিনকিকে ধমকে তো দিলেন কিন্তু ছিনকি যা বলল তাতে তিনি আশঙ্কিত না হয়েও পারলেন না। তিনি তো এদিকটা একদমই ভাবেননি অথচ এটা অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক দিক।

ছিনকি মুন্সী শিউলালের মনের ভাব আঁচ করে নিলে। সে বুঝতে পারল যে তার তীর ঠিক জায়গায় বিঁধেছে। নিজের কথাটার

জের টেনে সে বলল, "না, না আমার বলার উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। জ্বালার মতো সুলক্ষণ ছেলে পাওয়া কঠিন, যেমন ভালোমানুষ তেমনই সরল। তবে আমি বলছিলাম যে চাকর-বাকরদের মধ্যে এমন মায়ামমতা কোথায়, যে তারা জ্বালাপ্রসাদের ভালো করে দেখাশোনা করতে পারবে। একা একা জ্বালার শরীর-মন কেমন করে সুস্থ-সবল থাকবে তা ভাবনার কথা।"

শিউলাল চোখ খুললেন—এই সমস্যার সমাধান তো তাঁকে করতেই হবে। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ছিনকির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, বল্‌তো দেখি তোর মতলবটা কি ?"

ছিনকি একটু অভিমানের সুরে বলল, "তোমার সঙ্গে তো কথা বলতেই ভয় করে, কিছু মনে না কর তো বলি ; আমার কথা কিন্তু রাখতে হবে।

"আগে বলবি তো, রাখার মত কথা হলে রাখব বৈকি।"

"আমি বলি কি, তুমি জ্বালার বৌকে জ্বালার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।"

"মুন্সী রামসহায়ও এই কথাই লিখেছেন। কিন্তু বউকে জ্বালার সঙ্গে পাঠাই কেমন করে ? সে ওখানে একা থাকবেই বা কি করে ?"

"একা কেন ? জ্বালা তো সঙ্গে যাচ্ছেই।"

"সে কথা ঠিক্। কিন্তু বউকে তার কাজে সাহায্য করার জন্যেও তো একজন থাকা দরকার।"

"তাহলে আমি বলি কি। জ্বালা তো বড়ো অফিসার হয়ে যাচ্ছে, ওর সঙ্গে একজন সেবক ভৃত্য দরকার। তোমার মত থাকলে ভিখুকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

ভিখুকে সঙ্গে পাঠাবার প্রস্তাবে মুন্সী শিউলালের আসন টলল। এটা ঠিক্‌ই, যে নায়েব তসিলদার হয়ে যাচ্ছে, আর কিছু না হোক, অন্ততঃ বড়মানুষী ঠাট বজায় রাখার জন্যেও তার কাছে একজন খাস খিদমতগার থাকা দরকার। ভিখু ঘরের ছেলে, মুন্সী শিউ-

লালের পাড়াতেই তার জন্ম, তাঁর বাড়িতেই সে মানুষ। ভিখু সঙ্গে থাকলে বিদেশে জ্বালার বউয়ের যে কোন কষ্ট হবেনা সে কথা বলাই বাহুল্য; ঠিক্ আছে। জ্বালার বউকে বলে দে সে যেন তৈরী হয়ে নেয়। পরশু দুপুরে এখান থেকে যেতে হবে। আমি ছোট গিন্নীকে জানিয়ে দেব। আর শোন, ভিখুকে যাবার জন্যে তৈরী হতে বল।"

দুই

ভিখুকে জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে পাঠাবার ব্যাপারে ঘসিটাকে রাজী করান ছিনকির পক্ষে মোটের কঠিন ছিল না। তসিলদার বা নায়েব তসিলদারের চাকরি কোন রাজা মহারাজার চাকরির চেয়ে কম নয় —ঘসিটা তা জানত। তা ছাড়া ভিখু মুন্সী শিউলালের বাড়ির ছেলেদের মধ্যে গণ্য ছিনকির প্রস্তাবটি ঘসিটা সহর্ষে স্বীকার করলে। ঘসিটা ভিখুকে যখন জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে ঘাটমপুরে যাবার কথা বলল তখন সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। নতুন জায়গায় যাবার আনন্দে এবং নিজে কাজ করে জীবিকা অর্জনের খুশীতে সে মা-বাবার বিয়োগ-ব্যথা অনুভবই করতে পারলো না।

জ্বালাপ্রসাদ ও যমুনার সঙ্গে ঘাটমপুরে পৌঁছে ভিখু অনুভব করল তার দায়দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। ভিখুই জ্বালাপ্রসাদের সংসারে একরকম কর্মকর্তা ছিল। সরকারি কাজ-কর্ম থেকে জ্বালাপ্রসাদ অবসর পেতেন না এবং যমুনা বড়ো অফিসারের স্ত্রীর কর্তব্যের খাতিরে বাড়ির পর্দার আড়ালেই থাকতেন; পালঙ্কে বসে শাসন করতেন। বাড়ির খরচপত্রের হিসেব ছিল ভিখুর হাতে, ভাঁড়ারটিও ছিল তারই হাতে। ভিখুই জ্বালাপ্রসাদ ও যমুনার সংসারের এক-রকম মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

শীতের দিন শেষ হয়ে এসেছে। ভিখু বাইরে বারান্দায় বসে

তামাক খাচ্ছিল। জ্বালাপ্রসাদ সেদিন ট্যুরে বাইরে গিয়েছিলেন ও যমুনা গিয়েছিলেন জমিদার গিন্নির সঙ্গে দেখা করতে। এখন বাড়ির পুরোপুরি কর্তা একমাত্র ভিখু। সে মনে মনে খুবই প্রসন্ন, খুবই সন্তুষ্ট এবং খুবই আনন্দিত। হঠাৎ তার সুখের চিন্তায় বিঘ্ন ঘটল। সে দেখতে পেল তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পাশের গাঁ শিবপুরার জমিদার সাহেব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে নায়েব তসিলদার কি বাড়ি আছেন?"

ভিখু দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "না হুজুর, তিনি তো এলাকা দেখতে গেছেন। কাল তাঁর ফেরার কথা।"

জমিদার একা আসেননি, তাঁর সঙ্গে একটি লোক, তার মাথায় ছিল ঝুড়ি। তিনি ভিখুকে বললেন, "তোমার সাহেবকে বলো শিবপুরার জমিদার লাল প্রভুদয়াল এসেছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে আমি আবার তাঁর সেবায় হাজির হব। গিন্নীমার কাছে এই জিনিষগুলি পৌঁছে দিও।" লালা প্রভুদয়াল সঙ্গের লোকটির মাথায় ঝুড়িটি ভিখুর সামনে নামিয়ে দিলেন।

ভিখু একবার লুব্ধ দৃষ্টিতে ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে নিল, তারপরে একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, "কিন্তু গিন্নীমাতো বাড়ি নেই। তা ছাড়া, আমার মনিবের কড়া হুকুম রয়েছে যে কেউ কিছু দিতে এলে তাঁকে না জানিয়ে, না দেখিয়ে যেন না নেওয়া হয়।"

"দূর বোকা, এ ঝুড়ি তোমার মনিবের জন্যে তো আনিনি। এ তো আমার গিন্নী, নায়েব তসিলদার গিন্নীর জন্যে আগামী দোলের উপলক্ষে উপহার পাঠিয়েছেন। আর এর সঙ্গেই তাঁদের দোলে শিবপুরা যাবার নিমন্ত্রণও রইল, বুঝলে!" এই বলে লালা প্রভু-দয়াল নিজের ট্যাঁক থেকে একটি টাকা বের করে ভিখুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এই নে তোর বক্‌শিশ।"

টাকাটি ভিখুকে ধর্ম সঙ্কটে ফেলল। উপহারটি সে নেবে কিনা স্থির করতে পারছিল না। কিন্তু টাকাটি সহজেই তার যুক্তি-তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিল। "হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে নেই"—এই শাস্ত্র

বাক্যাট তার মনে পড়ে গেল। সে বলল, "বেশ ঠিক্ আছে জমিদার সাহেব, আমার বক্‌শিশের কথা মালিককে জানাবেন না, তিনি রাগ করবেন।"

জমিদার প্রভুদয়াল চলে যাবার পর ভিখু ঝুড়িটি খুলল, খুলে চম্‌কে উঠল। ঝুড়িটির মধ্যে ছিল পেস্তা, বাদাম, কাজু, আখরোট ইত্যাদি দামী মেওয়া—এক থান মখমল, একখান কিংখাব ও একটি ভারি রুপোর রেকাবিতে রেশমী রুমালে বাঁধা একশটি টাকা। ভিখু জিনিষগুলি আবার তেমনি করে ঝুড়িতে রেখে দিয়ে ঝুড়িটি ভাঁড়ার ঘরে রেখে এল, তারপরে বাইরে বসে আবার তামাক খেতে লাগল। কিন্তু তার মনটা এবার একটু ভারী ভারী ঠেকছিল. তার মনে হতে লাগল ঝুড়িটি রেখে নিয়ে সে ভালো করেনি।

যমুনা সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরলেন। ভিখু ঝুড়িটি তাঁর সামনে এনে বলল, "বৌদি! শিবপুরার জমিদার গিন্নী তোমার জন্যে এই উপহার পাঠিয়েছেন। জমিদার প্রভুদয়াল নিজে নিয়ে এসে-ছিলেন। জমিদার গিন্নী দোলের নেমন্তন্নও করেছেন। প্রথমে তো ভাবলাম, দাদাকে জিজ্ঞেস না করে নেবনা, সেজন্যে না-ও করে দিয়েছিলাম। কিন্তু জমিদার সাহেব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বললেন, উপহার জমিদার গিন্নী পাঠিয়েছেন বৌদির জন্যে। তখন আমি আর কিছু বলতে পারলাম না, রেখে দিলাম।"

যমুনা ঝুড়িটি খুলতে বললেন। মখমল ও কিংখাবের থান দেখে তাঁর যেন চোখ ঝলসে গেল। থান দুটি খুলে নিয়ে খুব ভালো করে উল্টে-পাল্টে দেখলেন, তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপরে তাঁর দৃষ্টি রুপোর রেকাবিতে রাখা রেশমের রুমালে বাঁধা একশ টাকার ওপর পড়ল। একশ'টি টাকা দেখে তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি ভিখুকে জিজ্ঞেস করলেন "ভিখু উপহার হিসেবে মেওয়া এবং কাপড় পাঠিয়েছেন, বেশ করেছেন, কিন্তু এটাকা পাঠিয়েছেন কেন?"

"তা আমি কি জানি। তবে আমার মনে হয় জমিদার গিন্নী

ভেবে থাকবেন, গয়না নিজের পছন্দ-সই যা ভালো হয় গড়িয়ে নেবে তাই টাকা পাঠিয়েছেন।

ভিখুর এই যুক্তিতে যমুনার মন সন্তুষ্ট হলনা, কিন্তু এখন তাঁর করারই বা কি আছে? কোন্‌টা উচিত, কোন্‌টা অনুচিত তার বিচার একমাত্র জ্বালাপ্রসাদই করতে পারেন। তিনি ভিখুকে বললেন, "ঠিক্‌ আছে, এই জিনিষগুলি বন্ধ করে এখন ভাঁড়ারেই রেখে দাও। উনি এলে যা ভালো বুঝবেন করবেন।"

পরের দিন জ্বালাপ্রসাদ ফিরে এলে, যমুনা ভিখুকে জিনিষগুলি আনতে বললেন। ভিখু জিনিষ আনবার সময় রুপোর রেকাবি ও তাতে রাখা একশ'টি টাকা বের করে ভাঁড়ারেই রেখে এল। জ্বালাপ্রসাদ জিনিষপত্র দেখে হেসে যমুনাকে বললেন, "মখমল কিংখাব! সেদিন রাজপুরা থেকে ফিরে এসে তুমি আমাকে বলেছিলে আমি যেন তোমার জন্যে একটি মখমলের ঘাঘরা করিয়ে দিই, যাক্‌ তোমার মনের সাধ মিটল। একটি মখমলের আর একটি কিংখাবের ঘাঘরা।"

ভিখু যখন দেখল জ্বালাপ্রসাদ উপহার গ্রহণ করে নিলেন তখন সে ভাঁড়ারঘর থেকে রুপার রেকাবি ও একশ'টি টাকা বের করে আনল, এনে জ্বালাপ্রসাদের সামনে রেখে দিল। জ্বালাপ্রসাদ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "এ রেকাবি ও একশ টাকা কিসের?"

"এই ঝুড়ির মধ্যেই ছিল, এগুলি আলাদা বের করে রেখে ছিলাম।"

"হুঁ, তাহলে এটা উপহার নয়, ঘুষ। বুঝেছি।" জ্বালাপ্রসাদ কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এ ঝুড়ি লালা প্রভুদয়ালের কাছ থেকে নিলে কেন?"

ভিখু বুঝে নিয়েছিল এখন তার পক্ষ সবল হয়ে উঠেছে। সে বলল, "এই কিংখাব ও মখমল, এই পেস্তা-বাদাম মেওয়া, এগুলি যদি উপহার হতে পারে তাহলে রুপোর থালায় গয়নাও উপহার হতে পারে। তফাৎ শুধু এই যে জমিদার গিন্নী গয়নার বদলে টাকা

পাঠিয়েছেন—যাতে বৌদি নিজের মনের মতো গয়না গড়িয়ে নিতে পারেন।”

ভিখুর যুক্তি অকাট্য; জ্বালাপ্রসাদ মনের কোন দিক থেকেই তা খণ্ডন করতে পারলেন না। “হ্যাঁ, তা তো ঠিকই বলছ, কিন্তু —কিন্তু, বেশ, যাকগে! আচ্ছা, লালা প্রভুদয়াল কিছু কাজ-টাজ করাবার কথা তো বলেননি?”

ভিখু সগর্বে হেসে বলল, “আরে না না, আমি তো তাঁকে বলেছিলাম যে তুমি রাগ করবে। বৌদিও নেই, আমি এ উপহার রাখবনা। তখন বললেন যে এ উপহার তো জমিদার গিন্নী বৌদির জন্য পাঠিয়েছেন। আমি তখন আর কি বলতে পারি? রেখে নিলাম!”

জ্বালাপ্রসাদ যমুনাকে বললেন, “দর্জিকে ডেকে ঘাঘরা সেলাই করিয়ে নাও আমি কানপুর থেকে জরি আনিয়ে দেব। আর স্যাকরাকে ডেকে যেমন ইচ্ছে হয় গয়না গড়িয়ে নাও।”

লালা প্রভুদয়াল জমিদার হিসেবে বড়ো না হলেও তাঁর যথেষ্ট মান-মর্যাদা ছিল। তিনি ক্রমাগত জমিদারি কিনছিলেন। প্রভুদয়াল ছিলেন জাতিতে বেনে, তাঁর বাবার ছিল মুদির দোকান। প্রভুদয়াল মহাজনী কারবার আরম্ভ করলেন। লোকে বলে, প্রভুদয়ালের কাছে যে ধার নিয়েছে শুধু সেই নয়, আজীবন তার বংশধরেরাও প্রভুদয়ালের ঋণী হয়ে থাকে। তাসত্ত্বেও লালা প্রভুদয়ালের প্রতি কারো রাগও ছিলনা, ঘৃণাও ছিলনা। তাঁর প্রাসাদের প্রবেশমুখেই ছিল রাধা-কৃষ্ণের একটি বড়ো মন্দির, সেটি সাত-আট বছর আগে তিনি তৈরি করিয়েছিলেন। সেখানে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে আরতি এবং প্রসাদের ব্যবস্থা ছিল। মন্দিরে রামায়ণ ভাগবত পাঠও হত প্রায়ই, দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা তা শুনতে আসত। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই বড়ো বড়ো অফিসারদের ভোজ লেগেই থাকত।

ঘাটমপুরে এসে জ্বালাপ্রসাদ প্রভুদয়ালের বিষয় অনেক কিছু শুনেছিলেন, প্রভুদয়ালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও বহুবার হয়েছে। কিন্তু তিনি এখনও প্রভুদয়ালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেননি।

তাঁরা ঘাটমপুর আসার পরেই প্রভুদয়ালের স্ত্রী জয়দেই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নিজে এসে আগ বাড়িয়ে যমুনাকে সঙ্গে করে নিজেদের শিবপুরার মন্দিরের জাঁক দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। জয়দেই যমুনাকে দুদিন নিজেদের বাড়িতে আটকে রাখেন; সে দুদিনেই জমিদার-গিন্নি ও নায়েব-তসিলদার-গিন্নির মধ্যে বেশ গলাগলি ভাব হয়ে গিয়েছিল। বিদায়ের সময়ে লালা প্রভুদয়াল জ্বালাপ্রসাদকে কিছু উপহার দিতে চাইলেন—কিন্তু জ্বালাপ্রসাদ রাজী হলেন না।

যমুনা সেদিনই দর্জিকে ডেকে কিংখাব ও মখমলের থান দুটি ঘাঘরা তৈরি করতে দিয়ে দিলেন। আর স্যাকরাকে ডেকে পাঁচ ভরি ওজনের কাঁকণ তৈরি করতে দিলেন। জিনিষগুলি তাড়াতাড়ি তৈরি করা দরকার। দু-তিন মাস পরেই ঘাটামপুরের জমিদার ঠাকুর গজরাজ সিংহের মেয়ের বিয়ে। ঠাকুর গজরাজ সিংহ সামন্তদের মধ্যে তালেবর ছিলেন। তাঁর মেয়ের বিয়ে অবধের এক তালুকদারের ছেলের সঙ্গে স্থির হয়েছিল। শোনা যাচ্ছিল বিয়েতে বরযাত্রীর সংখ্যা হবে হাজার খানেক। এমন বিরাট বরযাত্রীদল যাঁদের বাড়ি আসবে, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের দু-এক মাস আগে থেকেই তাঁদের বাড়িতে এসে ভিড় করা খুবই স্বাভাবিক।

বয়সে জ্বালাপ্রসাদের চেয়ে যথেষ্ট বড়ো হলেও ঠাকুর গজরাজ সিংহ জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করতেন। কারণ জ্বালাপ্রসাদের মামা মুন্সী রামসহায় ও ঠাকুর গজরাজ সিংহের পরিবারের মধ্যে পুরনো ঘরোয়া সম্পর্ক ছিল। সেইজন্যে ঠাকুর গজরাজ সিংহ জ্বালাপ্রসাদকে সরকারী অফিসার হিসেবে না দেখে সমান সামাজিক সম্মান দিতেন। গজরাজ সিংহের বাড়িতে যমুনার স্থান ছিল বাড়ির বউয়ের মতো।

ঠাকুর গজরাজ সিংহের স্ত্রী রাণী দেব কুঁওর বয়সে যমুনার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। যমুনার সঙ্গে তার ব্যবহারও ছিল বয়স্ক গুরুজনদের মতোই। মেয়ের বিয়ের সময় রাণী দেব কুঁওর অতিথি-আপ্যায়নের ভার দিয়ে ছিলেন যমুনার ওপর। বড়ো লোকের

আদর-অভ্যর্থনা করতে হলে নিজেও বড়োলোক সাজতে হয়; কিন্তু বড়োলোক সাজবার জন্যে যমুনার না ছিল জমকালো সাজ-পোষাক, না ছিল দামী অলঙ্কার-টলঙ্কার। কেতা মতো অল্প-সল্প মামিমা মহারাণীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু শাড়ী-সমস্যার কোন সমাধান তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কয়েকটি নতুন ও দামী পোষাক তাকে করাতেই হবে। কিছুদিন থেকে যমুনা বারবার তাগাদা দিয়ে জ্বালাপ্রসাদকে তিক্ত-বিরক্ত করে তুলেছিলেন। দামী শাড়ী জামা কেনবার জন্যে চাই টাকা। কিন্তু সব কিছু থাকা সত্ত্বেও জ্বালাপ্রসাদের কাছে অভাব ছিল টাকার। বেতনের সিকি ভাগ তিনি পাঠিয়ে দিতেন বাবাকে, আর বাকি টাকা নিজের পদ-মর্যাদা রক্ষার জন্যে খরচ করতে হত। উপরি-আয় তার হতে পারতো, কিন্তু এই উপরি আয়ে তার আগ্রহ ছিলনা।

প্রভুদয়ালের সেই উপহারটি জ্বালাপ্রসাদের একটি বড়ো সমস্যার সহজেই সমাধান করে দিল। সমস্যাটি এত সহজেই মিটে যাওয়ায় জ্বালাপ্রসাদের মনে যে তৃপ্তি হল তারই আনন্দে তিনি রূঢ় বাস্তবের কুৎসিত রূপটি ভালো করে দেখতে পেলেন না। সেই কুৎসিত কুরূপটির প্রথম ক্ষীণ আভাস পেলেন প্রায় তিন মাস বাদে যেদিন গজরাজ সিংহের বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পথে জমিদার গিন্নী জয়-দেইয়ের পাল্কি তাঁর বাড়ির সামনে এসে থামল।

গজরাজ সিংহের বাড়িতে প্রভুদয়ালের নিমন্ত্রণ ছিল। প্রভুদয়ালের স্ত্রী জয়দেই যে সময় পাল্কি থেকে নামলেন সে সময় যমুনা গজরাজ সিংহের বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। লালা প্রভুদয়াল যখন জ্বালাপ্রসাদকে জানালেন যে তাঁর গিন্নী জয়দেই তাঁর সই যমুনার সঙ্গেই জ্বালাপ্রসাদের বাড়িতে থাকতে চান তখন যমুনার মনে এক-প্রকার আনন্দ হল, কিন্তু জ্বালাপ্রসাদের যেন ভালো ঠেকল না। কিন্তু প্রভুদয়ালের আত্মীয়তাকে অস্বীকার করার মতো অশিষ্টতা জ্বালাপ্রসাদ করতে পারলেন না। তাঁর ভেতরে যাই থাক, প্রভুদয়াল ও জয়দেইর অভ্যর্থনা তাঁকে করতেই হল।

সেই দিন সকালেই বরযাত্রীরা গজরাজ সিংহের বাড়িতে এসে পৌঁছল। সবাই বলাবলি করছিল, এমন ধূমধাম করে বরযাত্রী ঘাটমপুরে এর পূর্ব্বে কখন আসেনি। বরযাত্রী গুণতিতে ছিল প্রায় বারোশ'। অতিথি অভ্যাগত ছাড়া বরযাত্রীদলের সঙ্গে এগারোটি হাতী, একান্নটি উট, একশ'টি ঘোড়া ও তিনশ' গরুর গাড়ির ছশ' বলদ। অতিথি আর অবোলা বাহকদের দেখাশোনা করার জন্য প্রায় আটশ' চাকর। ঠাকুর গজরাজ সিংহ এই রকম বিশাল বরযাত্রীদলের থাকবার ব্যবস্থা নিজের পঞ্চাশ বিঘের আম-বাগানের মধ্যেই করেছিলেন। দূর-দূরান্ত থেকে তাঁবু-সামিয়ানা এনে খাটান হয়েছিল।

যজ্ঞপুরের তালুকদার রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহের বড়ো ছেলে লালা ইন্দ্রভূষণ সিংহের সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে ঠাকুর গজরাজ সিংহকে অত্যধিক মূল্য দিতে হল। এমনিতে বিয়ের পণ কিছু স্থির ছিলনা, কিন্তু ঠাকুর গজরাজ সিংহও রাজকীয় ঠাটবাটে হার মানেননি। এই ঠাটবাটের জন্যে ঠাকুর গজরাজ সিংহকে ধার করতে হয়েছিল, তিনি প্রভুদয়ালের কাছে নিজের পাঁচটি গ্রাম বন্ধক রাখলেন।

জমিদার গিন্নী জয়দেই যমুনার সঙ্গে সকাল দশটার সময়ই গজরাজ সিংহের বাড় চলে গিয়েছিলেন ; লালা প্রভুদয়াল জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে দুপুরে গজরাজ সিংহের বাড়ি গেলেন। গজরাজ সিংহ বৈঠকখানায় বসে আত্মীয়-স্বজন, কর্মচারী এবং প্রতিবেশী জমিদারদের সঙ্গে বরযাত্রীদলের তদ্বির-তদারকির পরামর্শ করছিলেন। বরযাত্রীদের দলটি বেশ বড়ো হবে তা তিনি জানতেন এবং সেই মতো ব্যবস্থাও করেছিলেন, কিন্তু দলটি যে এত বিশাল হবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি অতিথি সৎকারের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা এই বিপুল সংখ্যক বরযাত্রীদের জন্যে পর্যাপ্ত না হওয়ায় তিনি মহা সঙ্কটে পড়লেন। অতিরিক্ত ব্যবস্থাদির জন্যে তিনি চারদিকে লোকজন পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদের অপেক্ষায় রইলেন।

জ্বালাপ্রসাদকে দেখামাত্রই তিনি বলে উঠলেন, "শুনেছেন নায়েব সাহেব, শালারা বরযাত্রীদল নিয়ে এসেছে যেন ডাকাতি করতে। আমি আপনার দুজন কানুনগোকে পাঠিয়ে দিয়েছি ব্যবস্থা করতে, আমি আপনার নাম করে চারজন পাটোয়ারকেও ডেকে এনেছি, সে কথাও আপনাকে বলে রাখছি।"

"তাদের নিজের লোকই মনে করবেন ঠাকুর সাহেব, আর আমি স্বয়ং আপনার সেবায় হাজির।" জ্বালাপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, "বড়োলোকেদের ব্যাপারও বড়োই হয়।"

"লজ্জা দিচ্ছেন কেন নায়েব সাহেব!" হেসে বললেন ঠাকুর গজরাজ সিংহ, তারপরে লালা প্রভুদয়ালের দিকে ঘুরে বললেন, "বসুন, বসুন লালা প্রভুদয়াল, এলেন কখন?"

"আমরা সকালেই এসে গেছি, সঙ্গে গিন্নীও ছিলেন, তাঁকে তসিলদার গিন্নী জোর করে নিজের বাড়িতে নামিয়ে নিলেন। এতক্ষণে তারা দুজনেই আপনার এখানে পৌঁছে গেছেন। কি বলব ঠাকুর সাহেব, ওঁদের দুজনার মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তসিলদার গিন্নীর কেরামতি আছে বলতে হবে! কি মমতা ভরা উদার হৃদয় তাঁর। যেমন সাদা-সিধে, সৎ, বিনয়ী আমাদের বাবু জ্বালাপ্রসাদ, তেমনি সৎ, সরল ও ভালোমানুষ তাঁর গিন্নী। ভগবান কি সুন্দর জুড়ি মিলিয়েছেন এ দুজনের!"

"তাতে আর সন্দেহ কি লালা প্রভুদয়াল," ঠাকুর গজরাজ সিংহ হাসি মুখে উত্তর দিলেন, যেমন আমার বাড়ি তেমনি নায়েব তসিলদার সাহেবের বাড়ি। ভালো করেছেন ওখানে থেকে গিয়ে, এ বাড়ি তো কাজেকর্মে ঠাসা এবং ঝামেলায় ভরা। মেয়ের বিয়ে কি কম ঝকমারির ব্যাপার। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি দম নেবারও ফুরসৎ পাচ্ছিনা। যজ্ঞপুরের রাজা সাহেবকে প্রথমেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলাম যে এত বড়ো বরযাত্রী দল যেন না আনেন কিন্তু কথায় আছে না—রাজ জেদ! বড়ো জেদী লোক! বারোশ' লোকের বরযাত্রীদল নিয়ে এসেছেন, উপরন্তু বরযাত্রীদলের

থাকা-খাওয়ার পুরো ব্যবস্থা সঙ্গে করে এনেছেন যেন কোথাও আক্রমণ করতে এসেছেন। আমার তো খুবই রাগ হয়েছে লালা প্রভুদয়াল।

আমি তো পষ্টাপষ্টি বললাম যে আপনাদের ব্যবহারে আমি খুব অপমানিত হয়েছি। তবে জ্বালাবাবু, এত বড়োলোক হয়েও সৎ ও সরল। আমার কথা শুনে চোখ ছলছল করে উঠল। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ভাই গজরাজ আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ইজ্জৎ আমার ইজ্জৎ সমান। আমি কি জানতাম তোমার এত খারাপ লাগবে।"

গজরাজ সিংহের শ্যালক ঠাকুর বরজোর সিংহ সেখানেই ছিলেন। গদ্‌গদ্ হয়ে বলে উঠলেন, "কি বলব জামাইবাবু। রাজা সাহেব মানুষ নয়, দেবতা। আমি তোমাকে বলছি, রাজা সাহেবের মতো বেয়াই পেয়ে তুমি ধন্য হলে।"

গজরাজ সিংহের বুক গর্বে ফুলে উঠল। আর সবার ওপর কি প্রতিক্রিয়া হল, দেখবার জন্য তিনি চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলেন, লালা প্রভুদয়াল মুচ্‌কি হাসছেন। ঠাকুর গজরাজ সিংহ অনুভব করলেন, সে হাসিতে মধু নেই, আছে হুলের কাঁটা। কিছুদিন আগেই তিনি লালা প্রভুদয়ালের কাছে পাঁচটি গ্রাম বন্ধক রেখে কুড়ি হাজার টাকা ধার নিয়েছেন।

ঠাকুর গজরাজ সিংহ বড়ো জমিদার। তাঁর এলাকা থেকে বছরে কুড়ি হাজার টাকা লাভ হত কিন্তু খরচাও ছিল তত বেশী। তাঁর একটা নয়, অগুনতি বদ্‌গুণ ছিল। সেইজন্যে টাকা তিনি জমাতে পারেননি। তাঁর বিচারে মিতব্যয়িতা ছিল অপরাধ। তিনি ভাবতেন ভগবান ব্যয়ের জন্যেই দিয়েছেন আয়। সম্ভবতঃ এই জন্যেই তিনি লালা প্রভুদয়ালকে নীচু নজরে দেখতেন। তাঁর মনে পড়ল কুড়ি বছর আগে প্রভুদয়ালের বাবার একটি ছোট মুদির দোকান ছিল। এই কুড়ি বছরের মধ্যেই লালা প্রভুদয়াল ছ'টি গ্রাম কিনে নিয়েছেন, আর তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকার মহাজনী কারবার

চলছে। ঘাটমপুর তসিলে লালা প্রভুদয়ালের মতো নগদ টাকা আর কারও ছিলনা।

গজরাজ লালা প্রভুদয়ালকে নিজের সন্দেহ দৃঢ় করবার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা লালা প্রভুদয়াল, এই বরযাত্রীদল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?"

প্রভুদয়াল তেমনি মুচ্‌কি হেসে বললেন, "বদযাত্রীদলের বিষয় বলার কি আছে! রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার! যেমন ঠাটবাট, তেমনি তাদের বুকের পাটা!" তারপরে একটু থেমে বললেন, "শুনলাম যজ্ঞপুরের রাজা সাহেবের নাকি তিন লক্ষ টাকা বছরের নিকাশ আয়।"

লালা প্রভুদয়াল কেন যে যজ্ঞপুরের রাজা সাহেবের আয়ের প্রসঙ্গটি তুললেন, জ্বালাপ্রসাদ ছাড়া সে ইঙ্গিতটি সেখাতে উপস্থিত আর কেউই বুঝতে পারলেন না। লালা প্রভুদয়ালের উত্তরে গজরাজ সিংহ সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, "কিন্তু তাঁর খরচাও তেমনি অঢেল, তাঁর টাকা খরচা জলের মতো। একটা বাংলো মুসৌরীতে, আর একটা এলাহাবাদে। আর বছরে ছ'মাস থাকেন কলকাতায়!"

তক্ষুণি ঠাকুর বরজোর সিংহ ভগ্নিপতির কথার টিপ্পনী কেটে বললেন, "আরে রাজবংশের লোক, বেনে মুদি তো আর নয়!"

প্রভুদয়ালের হাসি তেমনি রইল, মুখে কোঁচ পড়লনা একটুকুও, "ঠিক্ বলেছ ঠাকুর বরজোর সিংহ, আমরা বেনেরা তো আপনাদের রাজ বংশেরই প্রজা। আমরা কোন্ সাহসে আপনাদের তুল্য মূল্য হতে পারে!"

ঠাকুর বরজোর সিংহের বাবা এক সময় বড়ো জমিদার ছিলেন। কিন্তু কাল বদলে গেল। আর ধীরে ধীরে বরজোর সিংহের অবশিষ্ট রইল একটি ছোট গ্রাম, অধিকাংশ জমিই যার অফলা। সেই গ্রাম থেকে মোটে আড়াইশ' টাকা লাভ হত বছরে। তবু বরজোর সিংহ জমিদার তো বটে। ঘাটমপুর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে

চুনোঠা গ্রামে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি ছিল। তাঁর বাবার আমলের হাতি বাড়ির সামনে এখনও বাঁধা থাকে। অনেকদিন হাত না পড়ায় হেথা-হোথা থেকে বাড়ি ভেঙ্গে পড়ছিল। বরজোর সিংহের একশ' বিঘের মতন জোত জমি ছিল, সেই তাঁর অবলম্বন। জমিটি যমুনার তীরে। ফলে সুফলা। তিনি ছেলের 'মুণ্ডন' সংস্কারের সময় আয়ের বেশী ব্যয় করে বসলেন। পাঁচ বছর আগে লালা প্রভুদয়ালের কাছে নিজের জোত জমি বন্ধক রেখে নিজের মাথা বিকিয়ে বসলেন। জোত জমি বন্ধক রেখেছিলেন হাজার টাকায়। কিন্তু সুদের-সুদ তস্য সুদ বাড়তে-বাড়তে হাজার টাকা এখন দু'হাজার টপ্‌কে গেছে। প্রভুদয়াল বরজোর সিংহকে বছর খানেক ধরে ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছেন। দু'একবার তো এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঠেসাঠেসি হয়েছিল। বচসার জন্যে তিন মাস আগে এত গরম বেড়ে গিয়েছিল যে লালা প্রভুদয়াল বরজোর সিংহের ওপর এক নম্বর ঠুকে দেবার হুমকী দিয়েছিল।

প্রভুদয়াল বরজোর সিংহকে অতি বিনম্র উত্তর দিলেন, যেন তার বিদ্রূপকে তিনি তামাসা মনে করেছেন এবং তার জন্যে তাঁর একটুও ফোস্কা পড়েনি। কিন্তু আসলে তাঁর তখন বরজোর সিংহের প্রতি জিঘাংসা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। যখন তিনি জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে গজরাজ সিংহের বাড়ি থেকে ফিরলেন তাঁর মুখ কালো হাঁড়ী। প্রভুদয়ালের হাঁড়ী মুখ দেখে জ্বালাপ্রসাদ সহজ ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, "লালা প্রভুদয়ালজি আপনি হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন?"

প্রভুদযাল উত্তর দিলেন, "তসিলদার সাহেব, আমি ভাবছিলাম মানুষ কেন মিথ্যে মান-মর্যাদার জন্যে অন্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে?"

"হ্যাঁ বুঝতে পারছি যে ঠাকুর গজরাজ সিংহ মেয়ের বিয়েতে নিজের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।"—সাধারণ ভাবেই জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন।

"না জ্বালাবাবু, আমি গজরাজ সিংহের সম্বন্ধে ভাবছিনা, ভাবছি বরজোর সিংহের কথা। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমার নাক কেটে কেটে কথা বলছিল। আমি ভাবছি সে এরকম বললে কেন? আমি নিমিষের মধ্যে ওকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারি। তার একশ' বিঘের জোত আমার কাছে বাঁধা। সেটা এখন দু'হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। পাঁচ বছর হয়ে গেছে ক্রমশঃ সুদ বেড়েই চলেছে। আমি আর কতদিন ধৈর্য ধরে থাকব। ওর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতেই হবে। এই অনাবশ্যক অপমানের প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। জ্বালাবাবু, আপনি সাক্ষি রইলেন, আমার কোন দোষ নেই।"

জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে বরজোর সিংহের ভাল পরিচয় ছিল। বরজোর সিংহ সদাশয়, সদালাপী, পরদুঃখকাতর; আবার জেদী আর ঔদ্ধত প্রকৃতির মানুষ। বরজোর সিংহের প্রতি জ্বালাপ্রসাদের সহানুভূতি ছিল। তিনি চিন্তিত হয়ে বললে, "দু' হাজার টাকা ধার আছে! এ আপনি খুবই দুঃসংবাদ শোনালেন। ওর তো এই শুধু একশ' বিঘে জোত। এই গাঁ থেকে আর কি বিশেষ লাভ হয়।"

প্রভুদয়াল হেসে উঠলেন, "আমার তো ইচ্ছা ছিলনা ওর ওপর মামলা দায়ের করি, কিন্তু আজ সে আমাকে বাধ্য করলে। এতো আর সামান্য ক' টাকার ব্যাপার নয়, দু' হাজার টাকার কথা। যেমন কর্ম তেমনি ফল পেতে হবে, এর জন্যে আমি আর কি করতে পারি।"

জ্বালাপ্রসাদ আর উচ্চবাচ্য না করে চুপ করেই রইলেন। প্রভু-দয়ালের কথাবার্তায়, কাজে-ব্যবহারে বা অন্য কোন কারণে তাকে অপছন্দ করার মতো যুক্তি জ্বালাপ্রসাদ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তবুও না জানি কেন এই সঙ্গী লোকটির ওপর একরকম বিতৃষ্ণা তাঁর মনে জাগছিল।

জ্বালাপ্রসাদের বাড়ি প্রভুদয়াল ও জয়দেই তিন দিন ছিলেন। এই তিন দিনেই যমুনা জয়দেইদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জমে

উঠল। শুধু তাই নয়, জয়দেই জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে দেওর-ভাজের সম্পর্ক পাতালেন। কিন্তু প্রভুদয়ালের প্রতি জ্বালাপ্রসাদের মনে জেগে উঠল গ্লানি।

তিন

মীর সখাউত হুশেনকে, তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা বলতেন 'মীর সাহেব', তিনি ছিলেন ফকীর। লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ দেখতে, খাটো করে ছাঁটা দাড়ি আর মাফসই ছাঁটা গোঁফ, মুখ গম্ভীর। তাঁর ব্যক্তিত্ব সহজেই সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতো।

মীর সখাউত হুসেন ছিলেন ঘাটমপুরের তসিলদার। কিন্তু তিনি নিজের সব কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন জ্বালাপ্রসাদের ওপর। মীর সাহেবের বয়স পঞ্চাশের ওপর ; ঝোঁক ছিল ধর্মকর্মের দিকে। অধিকাংশ সময় কাটাতেন খোদাকে স্মরণ করে, অবশিষ্ট সময় কাটাতেন পাশা খেলে। পনের বছর আগে তাঁর একমাত্র ছেলে মারা গেল। ফলে তাঁর মন সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ওঠে। পাঁচ বছর আগে স্ত্রীও যখন গেলেন তিনি তখন সত্যিই যেন ফকীর। মীর সাহেব বাড়ি থেকে প্রায় বের হতেন না ; মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জ্বালাপ্রসাদ তাঁর বাড়ি গিয়ে পরামর্শ নিয়ে আসতেন, আর দরকারী সরকারী কাগজপত্রে সই করিয়ে নিতেন।

মীর সাহেব প্রতি বছর গরমের সময় লক্ষ্ণৌ চলে যেতেন। সেখানে তাঁর বাড়ি ছিল। সে বছরেও লক্ষ্ণৌতে দু'মাস কাটিয়ে যখন ফিরলেন, জ্বালাপ্রসাদ সরকারী কাগজপত্র নিয়ে তাঁর বাড়ি হাজির হলেন।

মীর সাহেব তাঁকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন. "জ্বালাবাবু,

ভালো ছিলে তো! কাজ-কর্ম তো দেখছি সব ভালো ভাবেই চলছে। কোন জায়গা থেকেই কোন রকম অভিযোগ আসেনি। হ্যাঁ, শুনলাম ঠাকুর গজরাজ সিংহের মেয়ের বিয়ে নাকি খুব ধূমধাম করে হ'ল। খুব বড় বরযাত্রীদল এসেছিল নাকি?"

"হুজুর, আমি তো জীবনে কোনদিন এতবড় বরযাত্রীদল দেখিনি। ঠাকুর গজরাজ সিংহের খুব দুঃখ যে হুজুর বিয়েতে যোগ দিতে পারলেন না।"

"কি আর বলব, সত্যি আমিও এজন্যে খুব দুঃখিত। তবে এতো সকলেই জানে যে আমি প্রতি বছর গ্রীষ্মের দু'মাস লক্ষ্ণৌয়েই যাই। এর কোন রকম ব্যতিক্রম হয় না।" মীর সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু বাবা, এ বিয়ে আবার কি রকম, যার জন্যে ধার হাওলাত করতে হয়। একটি বিয়ের জন্যে কুড়ি হাজার ধার! গজরাজ সিংহের সঙ্গে তোমার তো বেশ আলাপ আছে, তবে তুমি তাকে ধার নিতে বাধা দিলেনা কেন?"

"হুজুর আমি তো ধারের কথা জানতে পারলাম বন্ধকী দলিলের রেজিষ্ট্রীর দিনে। তা না হলে অতি অবশ্যই তাঁকে ধার নিতে বাধা দেবার চেষ্টা করতাম, তবে তাঁকে রুখতে পারা যেত বলে আমার মনে হয় না। হুজুর তো জানেনই তিনি কি রকম জেদী।"

মীর সাহেব উত্তর দিলেন, "কি রকম নয়, কী ভীষণ জেদী। কিন্তু তিনি সদাশয় ও ভদ্র। হ্যাঁ বাবা, একটি আরও খবর শুনলাম যে, তিনি নাকি লালা প্রভুদয়ালের কাছ থেকে ধার নিয়েছেন।"

"হুজুর ঠিকই শুনেছেন। গজরাজ সিংহ পাঁচটি গ্রাম বন্ধক রেখেছেন।"

"তাহলে তো এই পাঁচটি গ্রামও প্রভুদয়ালের হয়ে গেল।" মীর সাহেব হাসলেন, "ভাই, এই লোকটির সামর্থ মানতেই হয়! দেখতে দেখতে আমারই চোখের সামনে এত বড়োলোক হয়ে গেল। আচ্ছা বাবা, আমি এও শুনলাম যে এবারে প্রভুদয়াল

নাকি তোমার বাড়িতে এসেছিলেন।" এই বলে মীর সাহেব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালেন।

সে দৃষ্টির অর্থ বুঝে নিতে জ্বালাপ্রসাদের দেরি হল না। তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ হুজুর, তিনি আমার বাড়িতেই উঠেছিলেন। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তাঁকে নিজের বাড়ি আসার জন্যে আমন্ত্রণ করিনি। তিনি জোর করে নিজেই এসে আমাদের ঘাড়ে চাপলেন। ভদ্রতার খাতিরে আমিই বা তাঁকে কি করে বারণ করি।"

মীর সাহেব একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "বাবা, পাপ নিজে হতে এসেই ঘাড়ে চাপে, মহাজন বাক্য মিথ্যে নয়, আমরা সবাই জানি, পাপকে দূরে ঠেলে রাখাতেই কল্যাণ। ধন-দৌলতের প্রতি মানুষের মোহ স্বাভাবিক, তবে ধন-দৌলতের দেবতা আমাদের আসল দেবতাকে গ্রাস করে। দূরে যাবে কেন, এই প্রভুদয়ালকেই দেখনা, সে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়েছে, মদ-মাছ-মাংস স্পর্শও করেনা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সর্বস্ব ধর্ম-ঈশ্বর হ'ল টাকা। তুমি এ বিষয়ে কি মনে কর ?"

"হুজুর যথার্থই বলছেন।" জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "লোকটি খুবই নীচ।"

"নীচ, শুধু নিজেই যদি পতিত হয় তাহলে তো কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এরকম লোকদের যে সঙ্গ করবে, সেও রসাতলে যাবে। বাবা, সেইজন্যেই তোমাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার মনে করি। ধন দেবতার পূজোরীদেরও একটি সম্প্রদায় আছে। সে সম্প্রদায়ের স্বভাবধর্ম হ'ল জালফেলা ; অন্যদের নিজের দলে টানা। দৌলতখোর সম্প্রদায়ের মানুষগুলো খুব সাংঘাতিক। কারণ, তারা তোমার সম্প্রদায়কে বদলে দেবার চেষ্টা করবে।" বলতে বলতে মীর সাহেব জোরে হেসে উঠলেন।

জ্বালাপ্রসাদ মীর সাহেবের কাছ থেকে ফিরে এসে দেখলেন ঠাকুর গজরাজ সিংহ বৈঠকখানায় তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন। ঠাকুর গজরাজ সিংহকে অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর মনে হ'ল।

জ্বালাপ্রসাদ কাপড় ছেড়ে এসে ঠাকুর গজরাজ সিংহের পাশে বসলেন।

গজরাজ সিংহের গাম্ভীর্য ভাঙ্গবার জন্য তিনি বললেন, "ঠাকুর সাহেব, মনে হচ্ছে এবারে যেন বৃষ্টি ঠিক্ সময়ে নামবে। দেখুন না, কি অপূর্ব মেঘের ঘটা!"

কিন্তু গজরাজ সিংহের গাম্ভীর্য দূর হ'ল না, "মেঘের ঘটা তো অতি অবশ্যই, তবে সেটি সুন্দর কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে।" বলতে বলতে ব্যঙ্গের হাসি দেখা দিল তাঁর মুখে।

জ্বালাপ্রসাদ মৌন রইলেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, গজরাজ সিংহ বেশ উত্তেজিত হয়েছেন। তবে উত্তেজনার সঠিক্ কারণটা জ্বালাপ্রসাদ বুঝতে পারলেন না। তিনি গজরাজ সিংহের কথা বলার প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে রইলেন।

গজরাজ সিংহ তো কথা বলতেই এসেছিলেন, "ঘটা যখন দেখা দিয়েছে তখন বৃষ্টি হবেই, তবে এই বৃষ্টির রূপ কি দাঁড়াবে, আমার পক্ষে তা বলা কঠিন, জ্বালাবাবু।"

এবার জ্বালাপ্রসাদের হাসবার পালা, "আপনি যেন হেঁয়ালি ভাঙ্গছেন ঠাকুর সাহেব, হালে বিশেষ কোন ব্যাপার ঘটেছে কি?"

বিশেষ ব্যাপার না ঘটলে এ সময় আমি বাড়ি থেকে বের হতাম না। ঠাকুর গজরাজ সিংহ দুপুরবেলা স্নান না সেরে পুজো না করে যদি বাড়ির বাইরে যান, জানবে, নিশ্চয় কোন বিশেষ ব্যাপার ঘটেছে এবং সেই ব্যাপারটি বেশ গুরুতর।" এই বলে গজরাজ সিংহ কাষ্ঠ হাসি হাসলেন।

মীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই জ্বালাপ্রসাদের মন ক্লান্তিতে ভরে উঠেছিল। এই মানসিক অবস্থাতে গজরাজ সিংহের কথা বলার ভঙ্গী তাঁর ভাল লাগছিল না। বৃষ্টি শুরু হ'ল। পূবের ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া তাঁর বৈঠকখানা ভরে দিয়ে গেল। তারপরে. বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ যেন এক সঙ্গীতের মাধুর্য

সৃষ্টি করল। জ্বালাপ্রসাদ কিছুক্ষণ বৃষ্টির দিকে চেয়ে বললেন, "ঠাকুর সাহেব, আপনার মন খুব ভার দেখছি, বলুন তো ব্যাপার কি?"

গজরাজ সিংহ গলা খাঁক্‌রে উত্তর দিলেন, "নায়েব সাহেব, বেনে রাজা হতে চলেছে।"

"এতে আশ্চর্যের কি?" জ্বালাপ্রসাদ টিপ্পনী কাটলেন, এ যুগে অস্তিত্ব গায়ের জোরে নয়, টাকার জোরে। আর দেখুন ইংরেজরাও তো বেনেই। সাত সমুদ্র পেরিয়ে বিলেত থেকে এসেছিল বাণিজ্য করতে, আর আজ সারা ভারতের ওপর রাজত্ব করছে।"

গজরাজ সিংহ বিরক্তির সুরে বললেন, "ইংরেজ বেনে, এ আপনাকে কে বললে? ইংরেজরা এত বিদ্বান যে আমাদের ব্রাহ্মণরাও ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। এই ইংরেজ মরতে জানে, মারতে জানে, সেই জন্যেই রাজ্য চালাচ্ছে। এদের রাজ্যে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়। আমরা ক্ষত্রিয়েরা তাদের সঙ্গে কি মোকাবিলা করতে পারি। নায়েব সাহেব, আমি কিন্তু অন্য কথা বলছিলাম। আপনি শুনেছেন কি প্রভুদয়াল বরজোর সিংহের ওপর মামলা দায়ের করেছে। বরজোরের জোত ভূমি তার কাছে বন্ধক ছিল।"

জ্বালাপ্রসাদের মনে পড়ল, দু'মাস আগে প্রভুদয়ালের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা। তখন জ্বালাপ্রসাদ প্রভুদয়ালের কথাবার্তাকে ক্ষণিক আবেশ মনে করেছিলেন। কিন্তু কথাগুলো ছিল গম্ভীর, এখন জ্বালাপ্রসাদ তা বুঝতে পারলেন। শেষ অবধি প্রভুদয়াল প্রতিহিংসার পথে পা দিলেন। জালাপ্রসাদ চাপা সুরে বললেন, বোধহয় প্রভুদয়ালের দু' হাজার টাকা বরজোর সিংহের কাছে পাওনা আছে।"

গজরাজ সিংহ বললেন, "তাহলে আমার অনুমান ভুল নয়। আপনিও একথা জানেন। প্রভুদয়ালই বলে থাকবে। কিন্তু নায়েব সাহেব, বরজোর সিংহ শুধু এক হাজার টাকা নিয়েছিল।

আর বরজোর সিংহের বক্তব্য, সে নাকি আজ অবধি প্রভুদয়ালকে বারো'শ টাকা দিয়েও দিয়েছে।"

ধার খুব খারাপ জিনিষ। বিশেষ করে যখন কুখ্যাত পেশাদার সুদখোরের কাছ থেকে নেওয়া হয়। এ ধার না জানি কত সংসারকেই না ছারখার করে ফেলেছে।" জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কি করা যায়।"

"আমার সামনেও ওই একই প্রশ্ন! আর এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি, কি করা যায়!" গজরাজ সিংহ চিন্তিত হয়ে বললেন, "বরজোরের কাছে তো কানা-কড়িও নেই। আমিই যদি কোন উপায়ে চার-পাঁচশ' টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। যদিও মেয়ের বিয়ের ধার এখনও শোধ দিতে পারিনি। লালা প্রভুদয়াল আপনার কথা খুব মানেন। আপনি যদি মধ্যস্থ হয়ে কোনোরকম বন্দোবস্ত করে দেন। তা না হলে……।" বলতে বলতে গজরাজ সিংহ থেমে গেলেন।

"তা না হলে…!" জ্বালাপ্রসাদ অস্ফুট স্বরে পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তো একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু আমার অনুমান বরজোরের কাছে অপমানিত হয়েই প্রভুদয়াল এদিকে এগিয়েছেন। আপনার মেয়ের বিয়ের সময় বরজোর সিংহের কথাগুলো বোধহয় আপনার মনে নেই। সেদিন বরজোর সিংহ প্রভুদয়ালকে অকারণই অপমান করলে। আমাদের সামনে প্রভুদয়ালকে অনাবশ্যক অপমান করার কি দরকার ছিল?"

"আমার তো মনে পড়ছে না," চিন্তা করতে করতে গজরাজ সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভুদয়াল তো আপনার বাড়ি উঠেছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, প্রভুদয়াল আর বরজোর সিংহের মধ্যে কোন কথাবার্তাও হয়নি।"

জ্বালাপ্রসাদ ম্লান হেসে বললেন, "হ্যাঁ, তেমন কোন নরম গরম কথাবার্তা হয়নি যাতে সবার কৌতূহল হয়। কারণ, প্রভুদয়াল বেমালুম অপমান হজম করে নিয়েছিলেন। বরজোর বলেছিল,

'আপনার বেয়াই রাজবংশের লোক, বেনে মুদি তো আর নয়!' কথাটা প্রভুদয়ালকেই লক্ষ করে বলা হয়েছিল।"

গজরাজ সিংহের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল, "হ্যাঁ, একটু মনে পড়ছে যেন। কিন্তু নায়েব সাহেব, বরজোর তো কিছু মিথ্যে বলে নি। আপনারা সবাই তো জানেন, প্রভুদয়াল কত নীচ প্রকৃতির। বরজোর তো কেবল সত্যি কথাই বলেছিল, সত্য কথা খারাপ লাগা উচিত কি?"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "ঠাকুর সাহেব, শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'অপ্রিয় সত্য বলবে না।"

"হ্যাঁ, বলা তো হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে সেটা ঠিক্‌ই।" গজরাজ সিংহ আবার বললেন, "তবে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তীর থেকে ছোঁড়া বাণ আর মুখ থেকে ফস্‌কে যাওয়া কথা কি কখনও ফেরান যায়!" গজরাজ সিংহের মুখের হাসি এতক্ষণে মিলিয়ে গেল, "এদিকে নালিশের শমন পেয়ে বরজোরের ঘাড়ে ভূত চেপেছে। চাষ-বাস ছেড়ে কাছারি আদালতে ছুটোছুটি করতে কার ভালো লাগে। সে আজ ভোরেই লালা প্রভুদয়ালের বাড়ি গেছে। আমি তাকে সেখানে যেতে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শোনে কে! সে সকাল সাতটায় শিবপুরার জন্যে রওনা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ফেরেনি। প্রভুদয়ালের বাড়ি তো মাত্র তিন ক্রোশ পথ, কিছু বুঝতে পারছিনা।"

"এতে চিন্তার কিছু নেই, বোধহয় ফিরছেই। বৃষ্টিও জোরে নেমেছে।" জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "আর এখন তেমন বেশী বেলাও তো হয়নি!"

কিছুক্ষণের জন্যে দু'জনেই চুপচাপ রইলেন। বাইরে বৃষ্টির দিকে চেয়ে দুজনেই ভাবছিলেন নানা ভাবে। ইতিমধ্যে গজরাজ সিংহ বলে উঠলেন, "মনে হচ্ছে যেন ঐ হাতীর ওপর বরজোর ফিরছে!"

জ্বালাপ্রসাদ দেখলেন, শিবপুরার দিক্‌ থেকে একটি হাতী

আসছে। তার পিঠে বরজোর সিংহ আপদমস্তক জলে ভিজে বসে আছে। বরজোর সিংহের মাথায় পাগড়ি, তবে গা খালি। কাছা দিয়ে ধুতি পরা, পূর্বপুরুষদের তলোয়ার কোমরে ধুতির সঙ্গে বাঁধা। হাতী গজরাজ সিংহের বাড়ির দিকে এগচ্ছিল। গজরাজ সিংহ হাঁক দিলেন, "বরজোর, ও বরজোর আমি এখানে আছি।"

বরজোর সিংহ জ্বালাপ্রসাদের বাড়ির দিকে হাতী ঘোরালেন। তিনি হাতী থেকে নেমে ভিজতে ভিজতে জ্বালাপ্রসাদের বৈঠকখানার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, "জামাইবাবু! উনি নিলেন না এ হাতী। উনি চান শুধু আমার একশ' বিঘে জমি।" বলতে বলতে তিনি পাগলের মতো জোরে হেসে উঠলেন।

বরজোর সিংহের করুণ স্বর আর পাগলের মতো হাসি! জ্বালা-প্রসাদ অনুভব করলেন কত অসহায়, কত চাপা বেদনা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ঋণের বদলে এ হাতীটি প্রভুদয়ালকে দিতে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, নায়েব সাহেব, নিজের জমি বাঁচাবার জন্যে আজ এই হাতীটিকেও ছাড়তে প্রস্তুত ছিলাম। তিনি বললেন, 'হাতী পোষা সহজ, কিন্তু খোরাক যোগানো কঠিন।' বেনে জাত কি হাতী পুষতে পারে। সেইজন্যে ফিরে এলাম।" বলতে বলতে বরজোর সিংহ জোরে হেসে উঠলেন, "কিন্তু জামাইবাবু, আমি আর থাকতে পারলাম না, তার দরজায় থুথু ফেলে বললাম, 'বেনে কি হাতী পুষবে, এ কাজ তো আমাদের রাজবংশেরই।"

জ্বালাপ্রসাদ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে গজরাজ সিংহের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে গজরাজ সিংহের দেরি হ'ল না। তিনি বললেন, "বরজোর, তোমার গালাগালি করার দরকার কি ছিল? এই গালাগালির জন্যেই তো সে তোমার নামে নালিশ দায়ের করেছে। নায়েব সাহেব আমি মনে করি, যদি তুমি এর জন্যে প্রভুদয়ালের কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে এ মামলা সহজেই মিটে যায়।"

"ক্ষমা চাইবো আমি? সেই বেনের কাছ থেকে? নায়েব সাহেব, আপনি বলেন কি?" বরজোর সিংহ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। "নায়েব সাহেব, সময় অনেক বদলে গেছে। তা নাহলে প্রভুদয়ালের রাতারাতি সব লুট করিয়ে দিতাম।" তারপরে প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, "যাক্‌গে, নায়েব সাহেব, আপনি আর জামাইবাবু এই ব্যাপারে বৃথাই মাথা ঘামাচ্ছেন, এ আমাদের নিজেদের মামলা। আমি নিজেই প্রভুদয়ালের সঙ্গে এর বোঝাপড়া করব। অপরের এতে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।" বলতে বলতে বরজোরের হাত আপনা হতেই তলোয়ারের হাতলে গিয়ে ঠেকল।

বরজোর সিংহ হাতীর ওপর চেপে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে গজরাজ সিংহও ওঠে দাঁড়ালেন, "আচ্ছা জ্বালাবাবু, তাহলে আমিও এখন আসি। বৃষ্টি এখন থামবেনা। তাছাড়া আমার স্নান পূজোরও সময় হয়ে গেছে। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে এই বৃষ্টিতেই আমার স্নান হয়ে যাবে। তবে প্রভুদয়ালের সঙ্গে যত শীঘ্র পারেন দেখা করে এই মামলাটি মিটমাট করবার চেষ্টা করবেন। বরজোর সিংহ নিজের হাতী বিক্রি করতে তৈরী আছে। আমিও কিছু সাহায্য করব।"

এতদিনে জ্বালাপ্রসাদ প্রভুদয়ালকে একটু-আধটু চিনতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর শত অপছন্দেও প্রভুদয়াল আর তাঁর পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা বেড়েই চলেছিল। এই আত্মীয়তার কারণ ছিলেন জয়দেই। লালা প্রভুদয়ালের স্ত্রীকে লোকে জমিদার গিন্নী বলত। তিনি হাসি-খুশী, মিশুকে স্বভাবের ছিলেন। জমিদার গিন্নী জ্বালা-প্রসাদের সঙ্গে দেওর সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন আর তাঁকে বৌদি বলতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বামীর উল্টো—দিলদরিয়া ও উদার। তাঁর হৃদয়ে ছিল দরদ, মমতা, আরও প্রচুর গুণ।

জয়দেই ও যমুনার বয়সের তফাৎ ছিল যথেষ্ট, তবে দেখলে বোঝা যেতনা। জমিদার-গিন্নী জয়দেইয়ের বয়স প্রায় পঁইত্রিশের কাছা-

কাছি কিন্তু তাঁকে উনিশ-কুড়ি বছরের যমুনার সমবয়স্কা দেখতে। যমুনার সঙ্গে সখীর মতো ব্যবহার ছিল তাঁর। এর কারণ মনে হয়, জয়দেইয়ের প্রথম সন্তানের পর আর সন্তানাদি হয়নি। তাঁর প্রথম সন্তান পুত্র লক্ষ্মীচন্দ।

বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান লক্ষ্মীচন্দ অভিমানী ও উদ্ধত প্রকৃতির ছিল। বাপের সব গুণই সে পেয়েছিল। লক্ষ্মীচন্দের বয়স ষোল, অত্যন্ত সাহসী। আশেপাশে বেশ আতঙ্ক ছিল। বেনের ছেলের মধ্যে সাহস আর শক্তির কারণ ছিল দুটি।..প্রথমতঃ লালা প্রভুদয়াল বড়ো জমিদার ছিলেন। জমিদার বলে তাঁকে শাসন করতে হত। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্মীচন্দ নিজের মামার বাড়ি কানপুরে থেকে ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছিল। শহরে থেকে থেকে তার সাহস বেড়েছিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে জ্বালাপ্রসাদ শিবপুরার দিকে রওনা হলেন। লালা প্রভুদয়ালের প্রাসাদের সামনে পৌঁছে তিনি অভ্যাস মতো ফটকে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সামনে প্রণাম করলেন। তারপর ফটকের মধ্যে ঢুকলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে কিছু উঁচুতে লালা প্রভুদয়ালের বাইরের উঠান। তার লাগোয়া মস্ত বড় বারান্দা। তিনি বারান্দায় একটি তক্তাপোশের ওপর লালা প্রভুদয়ালকে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। নীচে মেঝেতে শতরঞ্চির ওপর প্রভুদয়ালের মুহুরি লচ্ছীরাম আর চুনৌঠার পাটোয়ার শীতলাপ্রসাদ কাগজ পত্রাদি খুলে বসে আছেন। তক্তাপোষের কিছু দূরে ডানদিকে দারোগা আমজাদ আলী আরাম কেদারায় পা ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর হাত মেসিনের মতো সামনে রাখা মদের বোতল থেকে রূপার গেলাসে ক্রমাগত মদ ঢালছে আর মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। খালি গেলাসটি আবার মদে ভরছে। লক্ষ্মীচন্দ উঠান থেকেই চেঁচিয়ে বাবাকে বলল, "বাপ্পা, কাকাবাবু এসেছেন।"

লক্ষ্মীচন্দের স্বরে প্রভুদয়াল চোখ তুলে জ্বালাপ্রসাদকে দেখে উঠে

দাঁড়ালেন। মুহুরি পাটোয়ারও কাগজপত্র বন্ধ করে দিলে। পাটোয়ার শীতলাপ্রসাদ হাত জোড় করে দূরে সরে দাঁড়াল। দারোগা আমজাদ আলী নিজের জায়গা থেকেই বসে বসে বলে উঠলেন, "ঠিক্ সময়েই এসেছেন নায়েব সাহেব! লালা প্রভু-দয়াল, আর একটি গেলাস আনতে বলুন। এমন সুন্দর দিন! দিনভর পান কর, পান করে যাও। এত পান কর যাতে পূরোপুরি বুঁধ হয়ে যাও। দেহ মনের হুঁস যেন না থাকে।" বলেই আমজাদ আলী হেসে উঠলেন।

কিন্তু জ্বালাপ্রসাদের মনে বর্ষার কোন উৎসাহই ছিলনা। তিনি একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন, "আপনি তো জানেনই দারোগা সাহেব, আমার মদ খাওয়ার অভ্যাস নেই। তার ওপর আবার এই দুপুর-বেলা! আমি ঘাটমপুর থেকে যে পায়ে হেঁটে এখন চলে আসছি তা নিশ্চয় কোন বিশেষ প্রয়োজনেই।" এই বলে পাটোয়ার শীতলাপ্রসাদের দিকে ফিরে বললেন, "কি হে শীতলাপ্রসাদ, তুমি এখন নিজের এলাকায় না থেকে, এখানে কি করছ?"

"আজ্ঞে হুজুর, জমিদার মশাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আপনাদের বন্ধু লোক, তাঁর কথার অবমাননা করার সাহস কি আমার আছে!" শীতলাপ্রসাদ একটু উদ্ধত স্বরে উত্তর দিল। শীতলাপ্রসাদের এই উদ্ধত ভাবটি জ্বালাপ্রসাদের ভালো লাগল না। কিন্তু সে যে কোনো অন্যায় বলেনি তা তিনি অনুভব করলেন। মদ্যপানরত আমজাদ আলীকে তিনি দেখলেন। চোখের সামনে তাঁর নিজের চেহারা ভেসে উঠল। শীতলাপ্রসাদ আর লচ্ছীরামকে তিনি বললেন, "আচ্ছা, এখন তোমরা দুজনে এখান থেকে যাও, লালা প্রভুদয়ালের সঙ্গে আমার একটু দরকারী কথা আছে। আমার কথা শেষ করে তোমাদের ডেকে পাঠাবো।

শীতলাপ্রসাদ ও লচ্ছীরাম ওখান থেকে চলে গেলেন। আমজাদ আলী জোরে হেসে উঠলেন, "নায়েব সাহেব, আমি কিন্তু এ বোতলটি শেষ না করে এখান থেকে নড়ছিনা। আর আমি এতই

বহু স য়ে আছি যে আপনাদের কোন কথাই আমি শুনতে পাব না। যদি শুনি তবু বুঝতে পারব না। সেজন্যে আমার উপস্থিতিতেও আপনারা বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে কথাবার্তা বলতে পারেন।”

জ্বালাপ্রসাদের মনের উত্তেজনা এতক্ষণে নরম হয়ে এল। মৃদু হেসে তিনি বললেন, “আমি আপনার কথা বলিনি দারোগা সাহেব। আপনি যদি কষ্ট করে আমাদের কথাবার্তায় যোগ দেন তা আমি খুবই খুশী হব। মামলাটি বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার পরামর্শে সমস্যা সমাধানে সাহায্যই হবে।”

“গোলাম হাজির,” বলে আমজাদ আলী নিজের চেয়ারটি তক্তাপোশের কাছে টেনে আনলেন। জ্বালাপ্রসাদ প্রভুদয়ালের পাশে তক্তার ওপর বসলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “লালা প্রভুদয়াল সাহেব, বরজোর সিংহের মামলাটিতো বেশ বিশ্রী হয়ে পড়েছে।”

প্রভুদয়াল মুচকে হাসলেন, “তাহলে আপনিও জেনেছেন। দারোগা আমজাদ আলী সাহেবকে আমি এই প্রসঙ্গেই কষ্ট দিয়েছি। ভেবেছিলাম অবসর মতো পরে আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। আজ ভোরে সে আমাকে শাসিয়ে গেছে। আমার নিজের রক্ষার জন্যে তো কিছু করা দরকার। ইংরেজ সরকারের রাজত্বে পুলিশ আছে, সৈন্য আছে।”

“কিন্তু, কিন্তু,” জ্বালাপ্রসাদ বলতে বলতে থেমে গেলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না প্রভুদয়ালকে নিজের কথা কেমন করে বলবেন। তাঁর সামনে যে দৃশ্যটি ছিল সে অনুযায়ী বরজোর সিংহ অপরাধী, নিয়ম ভঙ্গকারী, উৎপীড়ক। লালা প্রভুদয়ালের নিরাপত্তা আবশ্যক, সাহায্য আবশ্যক। লালা প্রভুদয়াল এক বিচিত্র অসহায় ভঙ্গীতে বসেছিলেন।

“আজ্ঞে এই ‘কিন্তু’ কি? নায়েব সাহেব, আপনি নিজের কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন?”—আমজাদ আলী প্রশ্ন করলেন।

"আমজাদ আলী সাহেব, আমি এসেছিলাম লালা প্রভুদয়ালকে বলতে, বরজোর সিংহের মাত্র একশ' বিঘে জমি আছে। সেটাই তার জীবিকা, তার অবলম্বন। কোন উপায়েই কি তার জমি তার কাছে থাকতে পারে না?" জ্বালাপ্রসাদ প্রভুদয়ালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন।

প্রভুদয়াল উত্তর দিলেন, "নায়েব সাহেব, ধার ফেরৎ নেওয়ার জন্যেই দেওয়া হয়। সে তো আর দান-দক্ষিণা নয়। এখন আপনিই ধার আদায়ের উপায় বলুন। সে আজ নিজের হাতী আমাকে দিতে এসেছিল। সে ঠিকই বলেছে, হাতী রাজবংশেই পালা হয়, আমরা বেনে মুদি কি আর হাতী পালতে পারি। আমি আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি, নিজের বড়ো মানুষী দেখিয়ে আমাকে গালাগালি করার সময় কেন ভাবেনি যে, সে ভিখারি কাঙ্গাল। যেমন কর্ম, তেমনি ফল পেতে হবে, এতো বিধাতারই বিধান!"

"কিন্তু সে যে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে লালা প্রভুদয়াল, আপনি একটু ভেবে দেখুন।" জ্বালাপ্রসাদ করুণামিশ্রিত স্বরে বললেন।

প্রভুদয়াল জোরে হেসে উঠলেন, "নায়েব সাহেব, যদি আমি অপরের সর্বস্বান্ত হওয়ার কথা ভাবতে আরম্ভ করি, তাহলে আমাকে মহাজনী কারবারই বন্ধ করে দিতে হবে। একজন দেউলে হয় আর অপর জন গড়ে ওঠে। যে অযোগ্য, বুদ্ধিহীন, অসংযমী তাকে তো দেউলে হতেই হবে। বিনাশ থেকে তাকে কে বাঁচাতে পারে! এ সব চিন্তা ছাড়ুন। নিয়তির বিধানের বিচিত্র গতি, আর সেই গতিতেই সে চলবে। এ সংসারে যার সামর্থ আছে সেই বেঁচে থাকবে।"

প্রভুদয়ালের উত্তরে জ্বালাপ্রসাদের মন তিড়বিড়িয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর অধীরতা মনের মধ্যেই গুমরে রইল। তিনি আর একবার চেষ্টা করলেন, "কিন্তু লালা প্রভুদয়াল, লোক হিসেবে তার ব্যবহার হওয়া উচিত। আমি মনে করি, বরজোর সিংহ যা বলে গেছে সে শুধু শাসাবার জন্যে নয়। আমার মধ্যে যদি কিছুমাত্র লোক

চেনার ক্ষমতা থাকে তাহলে বলতে পারি, লোকটি নিজের কথা মতো কাজও করবে। আপনি কি মনে করেন দারোগা সাহেব? আপনি তো পুলিশের লোক। আপনি তো রোজই নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশেন। আমি ভুল বলিনি তো?"

আমজাদ আলী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "নায়েব সাহেব, আপনি ঠিক্ই বলেছেন। আমি জানি, এই বরজোর সিংহ বরাবরই অতি ভদ্র আর ভদ্র বলেই তার কথা অনড়। ভীরুতা তাকে স্পর্শও করেনি। আমরা সাধ্যমতো প্রভুদয়ালের শরীরে আঁচড়ও লাগতে দেবোনা। কিন্তু এঁকেও নিজের দিক্ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। আমি এই বরজোর সিংহকে হাজতে বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু গজরাজ সিংহ তার ভগ্নিপতি হন। আর কলেক্টার, কাপ্তান সাহেব পর্যন্ত ঠাকুর গজরাজ সিংহের অবাধ গতি।"

অবাক হয়ে জ্বালাপ্রসাদ দেখলেন, প্রভুদয়াল তাকিয়ার তলা থেকে একটি রিভলবার বের করে সামনে রাখলেন, "আমি জানি নায়েব সাহেব, জমিদারি হাসি-ঠাট্টা নয়। মৃত্যুর সঙ্গে খেলতে যে দ্বিধা করে না, সেই বেঁচে থাকে। আমি সেকালের ভীরু ও কাপুরুষ বেনে নই। যদি বরজোর সিংহের মতো লোকেদের শাসানোতে ভয় পেয়ে যাই তবে তো হয়েছে। তাহলে ঠাকুর গজরাজ সিংহের যে পাঁচটা গ্রাম বন্ধক রেখেছি, সেগুলি কোন দিন কিনে নেবার কল্পনাই ছেড়ে দিতে হবে। নায়েব সাহেব, আপনি আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, ফৌজদারিতেও আমি বরজোর সিংহের চেয়ে সবলই থাকব।"

জ্বালাপ্রসাদ লালা প্রভুদয়ালের যে রূপটি আজ দেখলেন তা তিনি কল্পনাও করেননি। জ্বালাপ্রসাদ অনুভব করলেন, একটা বিরাট দানব তাঁর সামনে বসে আছে। তার ভয় নেই, ভাবনা নেই, শঙ্কা নেই, দ্বিধা নেই। সেই সঙ্গে তিনি আরো অনুভব করলেন, তিনি তাঁর তুলনায় ছোট, অনেক ছোট—একটা বামনের

মতো। শুধু তাই নয় অসংখ্য লোক তার পায়ের তলায় ঘুর ঘুর করছে, তার হুকুম তামিল করছে।

এ দুঃস্বপ্নে ঘাবড়ে গিয়ে তিনি মাথা ঝাঁকা দিলেন, অমনি দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। এখন তাঁর সামনে বসেছিল বুড়ো, রোগা অশান্ত একটি মানুষ। তার মুখের চামড়া কুঁচকে এসেছিল আর হাত রিভলবারের ভারে কাঁপছিল। কিন্তু তার ভয়ানক বিশ্রী মুখের ওপর সেই দানবীয় নিষ্ঠুর সংকল্পের ছায়া পড়েছিল।

জ্বালাপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন, "লালা প্রভুদয়াল, আমি নিজের কর্তব্য পালন করলাম, সেজন্যে আমার মন হাল্কা লাগছে। কিন্তু আমি অবশ্যই বলব যে আপনার কথা আমি বুঝতে পারিনি। আমি আন্দাজ করছি, আমার কথাও আপনি বুঝতে পারেননি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। আচ্ছা, এখন অনুমতি দিন আমি তবে আসি।"

তখনই লক্ষ্মীচন্দ এসে বলল, "কাকাবাবু, মা বলে পাঠিয়েছেন 'মার হাতের মিষ্টি না খেয়ে আপনি যেতে পাবেন না।' তিনি আপনাকে ভেতরে ডেকেছেন।"

চার

লালা প্রভুদয়াল বরজোর সিংহের সঙ্গে মামলায় জিতে গেলেন। দু' হাজারের ডিক্রি অনুসারে টাকা আদায় করতে বরজোর সিংহের একশ' বিঘে জোত জমি বেদখল হ'য়ে গেল। জমির নীলামের দিন ডাকের জন্যে প্রভুদয়াল ছাড়া অন্য কেউ আসেনি। তাঁর ডিক্রির যত টাকা ছিল তা দিয়েই তিনি সে জোতটি কিনে নিলেন।

আদালত থেকে সেই জমির খারিজ-দাখিল করিয়ে যখন লালা

প্রভুদয়াল ফিরলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তাঁর ঘেরা গোরুর গাড়ি ঘাটমপুরে উপস্থিত ছিল। ঘেরা গোরুর গাড়িতে চেপে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আকাশে 'মেঘের' ঘটা। লালা প্রভুদয়ালের সঙ্গে তাঁর মুহুরি লচ্ছীরাম আর পাটোয়ার শীতলাপ্রসাদ ছিলেন। ঘাটমপুর থেকে শিবপুরা যাবার কাঁচা রাস্তাতে তাঁর গোরুর গাড়ি বাঁক নিল। তিনি বরজোর সিংহের স্বর শুনতে পেলেন, "লালা প্রভুদয়াল, একটু দাঁড়াও!"

গোরুর গাড়ি থামল। লালা প্রভুদয়াল নিজের রিভলবারটি বের করে হাতের মধ্যে চেপে ধরলেন। ততক্ষণে বরজোর সিংহ তাঁর গোরুর গাড়ির কাছে এসে গেলেন। তাঁর হাত খালি ছিল বটে তবে মুখটা রাগে থমথম করছিল। আসামাত্র তিনি বললেন, "তাহলে খাজির-দাখিল করিয়ে এলে লালা প্রভুদয়াল। মনে হচ্ছে তোমার মাথার উপর মরণ নাচছে।"

"কি বাজে বকছ, মাথা ঠিক রেখে কথা বল!" লালা প্রভুদয়াল কড়া স্বরে বললেন।

প্রভুদয়ালের হাতের রিভলবারের ওপর বরজোর সিংহের নজর পড়ল। তিনি হেসে উঠলেন, "আচ্ছা, রিভলবার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কিন্তু লালা প্রভুদয়াল, এ রিভলবার বেনেদের শোভা বাড়ায় না।" এই বলে বরজোর সিংহ নির্ভীকভাবে এক ঝট্‌কায় রিভলবারটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন। প্রভুদয়াল ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। শীতলাপ্রসাদ আর লচ্ছীরাম জোড় হাতে চুপ করে বসে রইলেন। "ভয় পেওনা লালা, আমি তোমাকে মারব না। কিন্তু তোমাকে এ'টুকু বলে রাখছি, তুমি জীবিত থেকে আমার জমির ওপর দখল নিতে পারবে না আর তোমার মরার পর এই দখল তোমার খাজির হয়ে যাবে। সেজন্যে আমার জমির ওপর দখল নেবার বোকামি যেন করো না!"

এই বলে বরজোর সিংহ রিভলবারটা প্রভুদয়ালের সামনে ফেলে দিয়ে দ্রুতবেগে ঘাটমপুরের দিকে চলে গেলেন।

প্রভুদয়াল নিজের ঘেরা গোরুর গাড়ি শিবপুরার দিকে না চালিয়ে জ্বালাপ্রসাদের বাড়ির দিকে ঘোরালেন। তাঁর মনে এক বিচিত্র ভয় ঢুকল।

জ্বালাপ্রসাদের শরীর দু-তিন দিন থেকে একটু খারাপ যাচ্ছিল। ভীষণ সর্দি হয়েছিল। যমুনা মুন্সী রামসহায়ের বাড়ি রাজপুরা চলে যাওয়ায় জ্বালাপ্রসাদ বাড়িতে একা ছিলেন। তিনি ভেতরের ঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। বাইরে দালানে বসে ভিখু আগুন পোহাচ্ছিল আর তামাক টানছিল। প্রভুদয়ালকে দেখামাত্র সে উঠে দাঁড়াল, "দাদাবাবু তো সর্দি-জ্বরে পড়ে আছেন, বোধহয় এখন ঘুমোচ্ছেন। যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে ওঁকে জাগাব।"

প্রভুদয়াল বিরক্তির স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, বিশেষ দরকারী কাজ আছে। এখুনি জাগিয়ে দাও। গিয়ে বল, বাঁচা-মরার প্রশ্ন নিয়ে আমি এসেছি।"

"ও বাবা গো!" ভিখু চেঁচিয়ে উঠল, "হুজুর, আপনি দাঁড়ান, আমি এখুনি বৈঠকখানা খুলে দিচ্ছি।" বৈঠকখানা খুলে ভিখু জ্বালাপ্রসাদকে প্রভুদয়ালের আসার খবর দিতে চলে গেল।

জ্বালাপ্রসাদের কাছ থেকে ফিরে এসে ভিখু বলল, "দাদাবাবু ভেতরের ঘরে আপনাকে ডাকছেন। তিনি একাই আছেন। বৌদি রাজপুরা চলে গেছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলে আসুন।"

জ্বালাপ্রসাদ খাটের ওপর বালিসে ঠেস দিয়ে প্রভুদয়ালের অপেক্ষায় বসেছিলেন। "আসুন, লালা প্রভুদয়াল সাহেব, কি বলব, দু-তিন দিন থেকে ভীষণ সর্দি হয়েছে আর একটু জ্বরও আছে। বাড়িতে তো কেউ নেই। তাই একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। বসুন বসুন, আরে আপনি তো বেশ ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার?"

সামনের খালি খাটের ওপর বসতে বসতে প্রভুদয়াল বললেন, "নায়েব সাহেব, আজ আমি বরজোর সিংহের জোত জমির খারিজ-দাখিল করিয়ে শিবপুরা ফিরছিলাম......।"

প্রভুদয়ালের কথার মাঝখানেই জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "বরজোর সিংহের জোত জমি আপনি কি কিনে নিয়েছেন?"

"আপনি জানেন না কি? কি করবো, ওর ভয়ে জমির ওপর কেউ ডাক দিতে আসেনি, সেজন্যে জবরদস্তি আমাকেই ডাক দিতে হল।"

"হুঁ!" জ্বালাপ্রসাদ কিছু ভাবছিলেন। তারপর উদাস দৃষ্টিতে প্রভুদয়ালের দিকে দেখলেন, "আমি এ সব কিছুই জানিনা। নিজের কাজ-কর্মে বড় ব্যস্ত ছিলাম। তাতে আবার শরীরও ভাল ছিল না।" তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "তাহলে আপনি ও জমিটা কিনে নিয়ে নিজের নামে জমির খারিজ-দাখিলও করিয়ে নিয়েছেন, না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আজই ডেপুটি সাহেবের কাছারি থেকে খাজির-দাখিল করিয়ে কানপুর থেকে ফিরছি। বরজোর সিংহের ছেলেদের দিক থেকে আপত্তি তো তোলা হয়েছিল, কিন্তু আদালতে কেউ উপস্থিত হয়নি," প্রভুদয়াল বললেন। তারপরে তাঁর স্বর সহসা ঢিমে হয়ে গেল যেন ভয়ে শঙ্কিত, "নায়েব সাহেব, আমার গোরুর গাড়ি যেই শিবপুরার দিকে বাঁকল, বরজোর সিংহ এসে গাড়িটা থামাল। পাগলের মতো তার চেহারা। আমার প্রাণ নেবে বলে শাসিয়ে গেছে।"

জ্বালাপ্রসাদের মন সামনে বসা লোকটির প্রতি ঘোর গ্লানিতে ভরে উঠল। তিনি রুক্ষ স্বরে বললেন, "লালা প্রভুদয়াল, আপনি তো জানেনই এ শাসানো নতুন নয়। যেদিন আপনি ওর ওপর মামলা দায়ের করেছেন সেদিন থেকেই ও পাগল হয়ে গেছে। সেজন্যে এর মধ্যে আমি তো কিছু নতুনত্ব দেখছি না। রিভলবার তো সব সময় আপনার কাছেই থাকে। দারোগা আমজাদ আলী

নিজে আপনার ভার নিয়েছেন। তবে আবার আপনার কিসের ভয় ?”

দ্বিধা স্বরে প্রভুদয়াল উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তা তো বটে। ভয় করা উচিত নয়। কিন্তু আমার মন বলছে, কিছু অঘটন ঘটবে। আমাকে কালকেই জমির দখল নিতে হবে।”

জ্বালাপ্রসাদ অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, “হ্যাঁ, আইন মতো জমির দখল নেবার আপনার পুর্ণ অধিকার আছে, তবে ভালো হত যদি আপনি ফসলটা কেটে নিতে দিতেন।”

“এ জমি এখন আমার, আর ফসল জমির। সেজন্যে এখন ফসলও আমার। নায়েব সাহেব, জমির ওপর দখল নিতে আমাকে সাহায্য করতে হবে, আমি এ কথাই আপনাকে বলতে এসেছি।”

জ্বালাপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে হঠাৎ যেন সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে বললেন, “লালা প্রভুদয়াল, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি এ মামলায় জড়িয়ে পড়তে প্রস্তুত নই। আমি জানি আইন আপনার দিকে। কিন্তু সুনীতি আপনার সঙ্গে নেই। তাছাড়া, আপনি তো নিজেই দেখছেন, আমার শরীরও ভালো নেই। এখনও আমার গায়ে জ্বর।”

লালা প্রভুদয়ালের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, “ঠিক বলেছেন নায়েব সাহেব,সুনীতি আমার ধাতে নেই। কিন্তু, আছেই বা কার সেটা কে কাকে বলবে ? আপনার কাছে এসেছিলাম, আপনজন মনে করে ; আপন মনে করেই সাহায্যও চেয়েছিলাম। তবে ভুলে গিয়েছিলাম যে, ঠাকুর গজরাজ সিংহের সঙ্গেও আপনার ঘনিষ্ঠতা আছে। ওদিকে বরজোর সিংহও তো গজরাজ সিংহের শ্যালক। ঠিক আছে, আমি আর আপনাকে বেশী কষ্ট দেবো না।” এই বলে চুপচাপ মাথা নীচু করে চলে গেলেন।

কিন্তু জ্বালাপ্রসাদের মনটাকে প্রভুদয়াল খুঁচিয়ে দিয়ে গেলেন।

জ্বালাপ্রসাদ বিস্মৃতির প্রলেপ দিয়ে ঘুমবার অনেক চেষ্টাই করলেন, কিন্তু পারলেন না। ঘণ্টা দুই তিন এপাশ-ওপাশ করে

কাটালেন। শেষমেষ উঠে পড়তে হ'ল। কাপড় ছেড়ে ভিখুকে বললেন, "ভিখু, ঠাকুর গজরাজ সিংহের বাড়ি যাচ্ছি, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

তখন গজরাজ সিংহের বাড়িতে মজলিস জমেছিল। সকালে গজরাজ সিংহের বেয়াই রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহ এসেছিলেন। তাঁরই আপ্যায়নে নাচ-গান হচ্ছিল। জ্বালাপ্রসাদও দুপুরের ভোজে আর মজলিসে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তবে, তাঁর শরীর বিশেষ ভালো ছিল না। সেজন্যে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি যেতে পারবেন না। হঠাৎ জ্বালাপ্রসাদকে কাপড় মুড়ি দিয়ে আসতে দেখে গজরাজ সিংহ অবাক হয়ে গেলেন। তিনি স্বাগত জানিয়ে বললেন, "আসুন আসুন জ্বালাবাবু, মনে হচ্ছে, বাড়িতে একা ছিলেন তাই মন টেকেনি। সর্দ্দি আবার কোন রোগ না কি! এই নিন, একটু গরম হয়ে নিন! বরজোর, নায়েব সাহেবের জন্যে লাল পানি ভরো।"

বরজোর সিংহ রূপোর ছোট গেলাস ভরতি ক'রে জ্বালাপ্রসাদের হাতে দিলেন। এক ঢোঁক খেয়ে তিনি গেলাসটি সামনে রাখলেন। তারপরে নিজের চার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। ঘরের মধ্যে দু'-চার জনের বেশী লোক ছিল না। কানপুর থেকে একটি বাইজী এসেছিল. সে গান করছিল। রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহ চোখ বুজে তাকিয়া হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। প্রথমে জ্বালাপ্রসাদের মনে হল রাজা সাহেব যেন ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু পরেই তিনি দেখলেন, রাজা সাহেবের হাত সামনে রাখা গেলাসটিকে নিয়ে ওঠা নামা করছে। রাজা চন্দ্রভূষণের পাশেই বরজোর সিংহ বসেছিলেন। তাঁর চোখ দুটি জ্বলছিল আগুনের গোলার মতো। রাজা চন্দ্রভূষণের গেলাসটিকে তিনি যত তাড়াতাড়ি ভরে দিচ্ছিলেন, তার দ্বিগুণ বেগে ভরছিলেন নিজের গেলাসটি। মজলিসে দু-একটি নতুন মুখও দেখলেন জ্বালাপ্রসাদ। সম্ভবতঃ তাঁরা রাজা চন্দ্রভূষণের সঙ্গী।

সামনে নৃত্য চলছিল। কিন্তু রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহ অন্ততঃ সে

নাচ দেখছিলেন না। জ্বালাপ্রসাদ অনুভব করলেন, সে মজলিসে নেই কোন উল্লাস আর না আছে কোন উৎসাহ। জ্বালাপ্রসাদ কিছুক্ষণ গান শুনে গজরাজ সিংহের কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "ঠাকুর সাহেব, আপনার সঙ্গে কিছু দরকারী কথা ছিল, না হলে এই অসুস্থ শরীরে আসতাম না।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, পাশের ঘরে যাব কি?" গজরাজ সিংহ জিজ্ঞেস করলেন।

"না, এই ঘরের এক কোণে সরে বসলেই হবে। তবে বরজোর সিংহকেও ডাকতে হবে। কারণ তার সম্বন্ধেই কথা।" জ্বালা-প্রসাদ উত্তর দিলেন।

গজরাজ সিংহ গম্ভীর হয়ে বললেন, "জ্বালাবাবু, যা হবার তা হয়ে গেছে। যা পরে হবে, তা মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমি জানি আপনি কি বলতে চান; প্রভুদয়াল কাল বরজোর সিংহের জমির দখল নেবে। এই তো?"

জ্বালাপ্রসাদ চমকে উঠলেন, "আপনি সব জানেন। আশ্চর্য তো।"

"এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? প্রভুদয়ালকে যে চেনে সেই একথা বলবে। নিজের নামে জমির খারিজ-দখিল করিয়ে সে তো আর চুপ করে বসে থাকবে না। মাঠে ফসল। ভগবানের দয়ায় এবারে ফসল খুব ভালো হবে আশা করা যায়। বিঘে পিছু দশ মনের কম তো নয়ই। প্রভুদয়াল কি এ ফসল ছেড়ে দেবে, মনে করেন? সে কালই বরজোরের জমির দখল নেবে।"

"কিন্তু কালকেই নেবে, তা আপনি কি করে বলতে পারেন?"

"নায়েব সাহেব, সন্ধ্যেবেলা সে আপনার কাছে গিয়েছিল কি না? আপনার কাছ থেকে বোধহয় হতাশ হয়ে সে দারোগা আমজাদ আলীর কাছে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিজের গ্রামে গেছে। সে সদলে কাল বরজোরের জমির ওপর দখল নিতে আসবে। দুর্ভাগ্যের

কথা এই, তার সঙ্গে থাকবে সরকারী বল, সরকারী আইন, সরকারী সেপাই। নইলে আমরা দেখিয়ে দিতাম কি করে জমির দখল নিতে হয়।"

"কি হবে তাহলে?" হতাশার স্বরে জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"রামের ইচ্ছাই ইচ্ছা। গজরাজ সিংহ তুলসীদাসের বচন আওড়ালেন। আপনি গিয়ে এখন বিশ্রাম করুন জ্বালাবাবু। এই অসুস্থ শরীরে আমাদের কথা চিন্তা করে আপনি ছুটে এসেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু চিন্তা করে কিছুই হবে না, সে তো আপনি দেখলেন। নিয়তির গতি কেউ বদলাতে পারে না।"

"এত ফিসফাস কি কথা হচ্ছে, আমরাও একটু শুনি।" নিজের জায়গায় বসে বসেই বরজোর বললেন। রাজা চন্দ্রভূষণও সামলে উঠে বসলেন।

গজরাজ সিংহ উত্তর দিলেন. "আর কিছু নয়, নায়েব সাহেব লালা প্রভুদয়ালের কথা বলছিলেন।"

বরজোর সিংহ হেসে উঠলেন, "আপনারা প্রভুদয়ালের কথা বলুন, কিন্তু এর মধ্যে যেন বরজোর সিংহকে টানবেন না। বরজোর সিংহ নিজের মামলা নিজেই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবে।"

বরজোর সিংহের সুরে এমন কিছু ছিল যা জ্বালাপ্রসাদের ভালো ঠেকল না। ইতিমধ্যে রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহ বলে উঠলেন, "দৃঢ় থেকো বরজোর। আমরা তোমার সঙ্গে আছি। রাজবংশ এখনও এত কমজোর হয়নি যে কাপুরুষের মতো চুপচাপ বসে থাকবে। এই বেনের এত দুঃসাহস যে সে আমাদের অপমান করে।"

জ্বালাপ্রসাদ মর্মাহত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মন ভীত হয়ে উঠল। তিনি হতাশার সুরে গজরাজ সিংহকে বললেন, "আচ্ছা, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, বাড়ি গিয়ে ঘুমোই। উদ্বিগ্ন হয়েই চলে এসেছিলাম। এখন যা হবে সে তো আপনাদেরই হাতে।"

গজরাজ সিংহ জ্বালাপ্রসাদকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন। এ মামলা আমাদের, কোননা—

কোনো উপায়ে এর বিহিত করব। হ্যাঁ, আপনাকে শুধু একটি অনুরোধ, এবারে এ মামলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবেন। যেন এ সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না আর জানতেও চান না। ন্যায়তঃ যা আপনি করাতে পারলেন না, এখন তাকে নিজের পথেই যেতে দিন।"

জ্বালাপ্রসাদ বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর, মন, প্রাণ ভয়ানক ক্লান্তিতে ভরে ছিল।

তিনি যে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন তা নিজেই জানতে পারলেন না। লচ্ছীরাম মুহুরি এসে জাগিয়ে দেবাব পরে চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার?" লচ্ছীরাম বড়ো ব্যাকুল স্বরে বললে, "জমিদার-গিন্নী হুজুরকে এই মুহূর্তে ডেকে পাঠিয়েছেন। জমিদার সাহেব আর নেই। কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে কেউ খুন করেছে। দারোগা আমজাদ আলীকে শিবপুরায় পাঠিয়ে দিয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি।"

জ্বালাপ্রসাদ চমকে উঠলেন, "কি বললে, লালা প্রভুদয়ালকে শেষ করে দিয়েছে? কে মারলে? কেমন করে মারলে?"

"ওখানে গেলে জমিদার-গিন্নীর কাছে সব জানতে পারবেন। চাকরবাকরদের কাছ থেকে শুধু এইটুকু জেনেছিঃ প্রায় রাত দশটা-এগারোটার সময় দারোগা আমজাদ আলীকে প্রাসাদের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে জমিদার সাহেব ফিরছিলেন। তিনি যখন বাইরের কোঠায় উঠছিলেন, তখনই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাঁচাও বাঁচাও, মেরে ফেললে।' ওঁর চীৎকার শুনে চাকররা ছুটে এল। তারা এসে দেখলে জমিদার সাহেব মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন আর পিঠ দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। এই দেখে তো জমিদার-গিন্নী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনি একটি চাকর ছুটে আমাকে ডাকতে এল। জেগে উঠে আমিও সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। জ্ঞান হবার পরে জমিদার-গিন্নী আপনাকে আর দারোগা সাহেবকে ডাকতে পাঠালেন।"

একটা কিছু হবেই, জ্বালাপ্রসাদ তার আভাস পেয়েছিলেন। তবে এত তাড়াতাড়ি হবে, তা তিনি ভাবতেও পারেননি। তিনি চট্ করে উঠে কাপড় জামা পরলেন। একবার মনে হ'ল ঠাকুর গজরাজ সিংহকে প্রভুদয়ালের খুনের খবর দিয়ে আসেন। পরক্ষণেই মনে হল—বৃথাই। কেন জানি তখন তাঁর মনে এই ধারণা হল, 'ঠাকুর গজরাজ সিংহ এই খুনের কথা জানেন।' তিনি লচ্ছীরাম আর চাকরদের সঙ্গে করে তক্ষুনি এক্কা করে শিবপুরার দিকে রওনা হলেন।

দ্বিতীয় দিন রাত্রে প্রায় দশটার সময় প্রভুদয়ালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর জ্বালাপ্রসাদ যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর বেশ জ্বর এসেছে। তিন দিন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন। ভিখু লোক মুখে তাঁর অসুখের খবর মুন্সী রামসহায় আর যমুনার কাছে রাজপুরায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। যমুনার তখন আসবার মতো অবস্থা ছিল না। মুন্সী রামসহায় নিজেই জ্বালাপ্রসাদকে দেখতে এলেন। চারদিন বাদে জ্বালাপ্রসাদের জ্বর ছাড়ল। জ্বালাপ্রসাদের অসুস্থতার জন্যে মুন্সী রামসহায় ঘাটমপুরেই থেকে গেলেন।

সুস্থ হবার পরে জ্বালাপ্রসাদ মুন্সী রামসহায়কে প্রভুদয়ালের খুনের সব কাহিনী শোনালেন। সমস্ত কেচ্ছা শুনে রামসহায় গম্ভীর হয়ে গেলেন, "বাবা জ্বালা, ভাগ্যে তুমি এই মামলা থেকে দূরে ছিলে। প্রভুদয়ালের একদিন না একদিন এ গতি হতোই। বেইমানী আর অত্যাচার বেশী দিন টেকেনা।"

"কিন্তু কিন্তু মামাবাবু, এই আইন, এই ব্যবস্থা, তাহলে কিসের জন্যে?" দুর্ব্বল স্বরে প্রশ্ন করলেন জ্বালাপ্রসাদ। তারপরে হঠাৎ যেন তাঁর কিছু মনে পড়ে গেল, "আচ্ছা মামাবাবু, বরজোর সিংহ ধরা পড়ল কিনা আপনি কি কিছু শুনেছেন?"

"বরজোর সিংহ ধরা পড়েনি কারণ সে ঘাটমপুরে ছিল না। তার স্ত্রী-ছেলেপুলেরা গজরাজ সিংহের বাড়িতে রয়েছে। প্রভু-দয়ালের খুনের সপ্তাহখানেক আগেই তারা চুনোঠা থেকে এখানে এসেছে। গজরাজ সিংহের বক্তব্য, যে দিন খুন হয়েছে সেদিন

সন্ধ্যাবেলা সে রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহের সঙ্গে কানপুরের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল।"

"এ মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে।" জ্বালাপ্রসাদ উত্তেজিত হয়ে বললেন। সেদিন রাতে গজরাজ সিংহের বাড়ি মজলিস বসেছিল, নাচগান হচ্ছিল, মদ খাওয়া চলছিল। এসব আমার নিজের চোখে দেখা। রাত ন'টায় আমি মজলিস থেকে ফিরি। আমি নিজে সে মজলিসে উপস্থিত ছিলাম।"

রামসহায় বললেন, "গজরাজ সিংহের বক্তব্য, তোমার যাবার পরেই মজলিস শেষ হয়ে যায় কারণ বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। বৃষ্টির জন্যে তাঁদের যেতে দেরী হয়েছিল।" তারপরে তিনি চাপা স্বরে বললেন, "গজরাজ সিংহ আমাকে অনুরোধ করেছে আমি এ মামলার মধ্যে তোমাকে যেন জড়াতে না দিই।"

জ্বালাপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে বললেন, "মামাবাবু, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, "আমার এ ব্যাপারে চুপ করে থাকা কি উচিত হবে? আমি মৌন হয়ে একটা খুনীকে বাঁচিয়ে ন্যায় আইনের অমর্য্যাদা দেখব? আপনি তো জানেন, এই ইংরেজ সরকার ন্যায় আর আইনের ওপরই টিঁকে রয়েছে। ইংরেজ সরকার আমাকে এই দায়িত্ব-পূর্ণ পদের ভার দিয়ে আমার ওপর বিশ্বাস করেছেন। ন্যায়ের পথে বাধা হয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি কি করে?"

মুন্সী রামসহায়ের কাছে জ্বালাপ্রসাদের প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবলেন, তারপরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বাবা, তুমি ঠিকই বলছ। কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া সর্বদাই অন্যায়। তবে আমার মতে, বরজোর আইনের চোখে দোষী—আমার চোখে নয়। তবুও আইন অনুযায়ী খুন সে অবশ্যই করেছে। প্রভুদয়ালের যে দশা হয়েছে সেজন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। মনে হয় এটাই যথাযোগ্য। কিন্তু ইচ্ছে মতো প্রভুদয়ালকে দণ্ডিত করা বরজোর সিংহের অধিকারের বাইরে। তুমি যা উচিত বিবেচনা কর তাই করবে। আমি তোমাকে বাধা দেব না।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মুন্সী রামসহায় রাজপুরা রওনা হয়ে গেলেন। যাবার সময় তিনি জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "একটু সাবধান হয়ে কাজ করবে, সাবধানে থাকবে। তুমি একজন বড়ো অফিসার, তোমার ওপর হাত তোলবার সাহস কারো হবে না। তবুও সাবধানে থাকা উচিত। শাস্ত্রে বলেছে, 'সাবধানের মার নেই'।"

আট দিন পরে জ্বালাপ্রসাদ ম্যাজিস্টেটের সামনে নিজের বয়ান পেশ করলেন। তাঁর বয়ানের ওপর বরজোর সিংহের নামে ওয়ারেন্ট বেরুল।

প্রভুদয়ালের তেরো দিনের কাজ হল। জ্বালাপ্রসাদ যোগ দিলেন না। শ্রাদ্ধের পনের দিন পরে লক্ষ্মীচন্দকে সঙ্গে করে জয়দেই জ্বালাপ্রসাদের কাছে এলেন। তিনি শ্রাদ্ধের সময় যাননি বলে জয়দেই অভিযোগের সুরে বললেন, "ঠাকুরপো, ভাগ্য কি মন্দ হল, তুমিও আমাদের দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। শ্রাদ্ধের দিন আমি তোমার পথ চেয়ে বসেছিলাম। কিন্তু ওঁর চলে যাবার পরে তোমারও আর দর্শন পেলাম না। এখন নিজের এই অনাথ ছেলেকে নিয়ে তোমার শরণেই এলাম।"

জ্বালাপ্রসাদ জয়দেইয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের দীপ্তি নিভে এসেছিল। জ্বালাপ্রসাদ করুণ সুরে বললেন, "বৌদি, তুমি তো জানই বরজোর সিংহের বিরুদ্ধে আমি এত্তেলা দিয়েছি। আর আমার বয়ানের জন্যেই তার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। এ হেন পরিস্থিতিতে তোমাদের বাড়ি যাওয়া আমার উচিত নয়।"

"হ্যাঁ, ঠাকুরপো, আমাদের তুমিই ভরসা। দারোগা আমজাদ আলি দেখাতেন যে তিনি ওঁর কত ঘনিষ্ট বন্ধু। এখন তিনিই এই মামলাটিকে একেবারে চেপে দিয়েছেন।" জয়দেইয়ের চোখ ছলছল করে উঠল, তিনি বললেন, "ঠাকুরপো, ঘাটমপুরে আর আমাদের কেউ আপনজন নেই। আমার বড়দাদা কানপুর থেকে এসেছেন। তিনি আমাদের কানপুরে গিয়ে থাকতে বলছেন।

এখানে আর আমাদের থাকা চলবেনা। এ বিষয়ে আমি তোমার পরামর্শ নিতে এসেছি।"

"আমি আর তোমাকে কি পরামর্শ দেবো বৌদি, যা ভালো বোঝ কর। হ্যাঁ, আমি শুধু এই ভরসা দিতে পারি যে শিবপুরায় তোমার ওপর কোনরকম অনাচার অত্যাচার হবে না। সরকার আর সরকারী আইন আছে আর আইনের মর্যাদা সবার ওপরে।"

জয়দেই একটা থলে জ্বালাপ্রসাদের সামনে এগিয়ে দিলেন, "ঠাকুরপো, আমি দাদাকে বলে দিয়েছি যে লক্ষ্মীচন্দকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। ওকে তো লেখাপড়া কানপুরে থেকে শেষ করতেই হবে। আমি শিবপুরায় থেকে জমিজায়গা দেখাশোনা করবো। এখানে ওঁর যা কারবার ছড়িয়ে আছে সেগুলিকে তো ক্রমশঃ গুটাতে হবে। ঠাকুরপো, তুমি যা আমাদের উপকার করেছ তারজন্যে একশ'টি মোহর ভেট এনেছি।"

থলেটা দেখে জ্বালাপ্রসাদ মুচকে হাসলেন, "বৌদি, আমি যা করেছি, নিজের কর্তব্য মনে করে করেছি। মমতা আর ন্যায় বিক্রিও হয়না, কেনাও যায়না। এই টাকাকড়ি জীবনে যত নষ্টের গোড়া। বৌদি, আর কোনো দিন যেন লোভ দেখাবার চেষ্টা করো না। আর. যতদূর সম্ভব তুমিও লোভ সামলে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।"

জ্বালাপ্রসাদের ব্যবহারে জয়দেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যে পরিবেশে তিনি জন্মেছিলেন, মানুষ হয়েছিলেন, সেখানে সব জিনিষ কেনা-বেচা যায়। তিনি বলে উঠলেন, "ঠাকুরপো, তুমি মানুষ নও দেবতা। ভগবান তোমার কল্যাণ করুণ!" ভক্তি ভরে জোর করে তিনি জ্বালাপ্রসাদকে প্রণাম করলেন।

জ্বালাপ্রসাদের সেদিন কাগজপত্র নিয়ে মীর সাহেবের কাছে যাবার কথা ছিল। তিনি জয়দেইকে বললেন, "বৌদি, খাওয়া-দাওয়া করে যাবে।" তারপরে ভিখুকে বললেন, "জমিদার-গিন্নী আজ এখানেই খাবেন। ওঁকে বসাও, কথাবার্তা বল। আমি

একটু তসিলদার সাহেবের কাছে যাচ্ছি। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

জ্বালাপ্রসাদ মীর সাহেবের কাছে পৌঁছে দেখলেন ঠাকুর গজরাজ সিংহ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। জ্বালাপ্রসাদকে দেখামাত্র মীর সাহেব বলে উঠলেন, "এসো বাবা, দীর্ঘায়ু হও, আমরা তোমার বিষয়েই কথাবার্তা বলছিলাম।"

গজরাজ সিংহের মুখ একেবারে শুকিয়ে ছিল। তিনি মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বসে ছিলেন। তিনি জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালেনও না। জ্বালাপ্রসাদের বসবার পরে মীর সখাউত হুসেন বললেন, "জ্বালাবাবু, ঠাকুর গজরাজ সিংহের বক্তব্য, তুমিই বরজোর সিংহের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। যদি তুমি তার বিরুদ্ধে বয়ান না দিতে তাহলে বরজোরের নামে ওয়ারেন্ট বেরুত না।"

ঢিমে তালে জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "হ্যাঁ হুজুর, আমি যদি বরজোর সিংহের বিরুদ্ধে বয়ান না দিতাম তাহলে ওয়ারেন্টও বেরুতনা; একটি খুনের মামলা চাপা পড়ে যেত। আমিও তাই মনে করি। কিন্তু হুজুর, সরকারী চাকর হয়ে আমি আইন আর ন্যায়ের হত্যা কি করে করি! কিন্তু এখনও তো কিছু হয়নি, এখন তো মোকদ্দমা চলবে!"

এবার গজরাজ সিংহ চোখ তুলে সোজা জ্বালাপ্রসাদের দিকে চাইলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ আর মলিন, চাউনি নরম, "মড়ার ওপর তো আর মোকদ্দমা চলেনা জ্বালাবাবু। বরজোর সিংহ এ সংসার ছেড়ে চলে গেছে। যা কিছু সে করেছিল তার জন্যে নিজেকে সে দণ্ডিতও করেছে। পরশু রাতে বিধুনাতে সে আত্মহত্যা করেছে। যজ্ঞপুর থেকে ফেরার পথে সে নিজের ওয়ারেন্টের খবর শুনেছিল। আমি কাল সকালে ওর ছেলেপুলেদের নিয়ে বিধুনা গিয়ে তার অন্ত্যেষ্টি সেরে রাতেই ফিরে এসেছি।" গজরাজ সিংহ কাষ্ঠ হাসি হাসলেন, "যাক্, এ ব্যাপারটাও চুকলো। যখন বরজোর সিংহই আর নেই, তখন তার আর কে কি করবে!" গজরাজ সিংহের

চোখের জল সহসা বেয়ে পড়ল, "কিন্তু জ্বালাবাবু, সব হল, তবুও স্বীকার করতেই হবে, বরজোর সৎ লোক কিন্তু বড়োই অভাগা ছিল। জগতে কারো সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার সে কখন করেনি। যতদূর সম্ভব খোলা প্রাণে সকলকে সাহায্যই করেছে। কিন্তু তার পুরস্কার সে পেলে, তার জমি গেল প্রাণ গেল, ছেলেপুলে অনাথ হল, আর স্ত্রী বিধবা হল। তার স্ত্রী বাপের বাড়ি বিধুনাতে বসে বুক ফাটা কান্না কাঁদছে। তার ছ'ছেলে, একটির বয়স চোদ্দ, অন্যটার দশ, আর মেয়েটা বারো-তেরো বছরের হবে, তার বিয়ের চিন্তা। ওদের যে কি হবে? একমাত্র ভগবানই সহায়!"

মীর সাহেব জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালেন, "শুনছ বাবা, তোমার ন্যায় আর ধর্মের কি পরিণাম হল? কিন্তু আমি ঠাকুর গজরাজ সিংহকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। যেখানে ন্যায়-নীতি, দয়া-ধর্ম্মের মধ্যে তফাৎ করা শক্ত হয়ে দাঁড়ায় সেখানে কর্তব্য আর ন্যায়কেই প্রধান্য দেওয়া উচিত। সেজন্যে এ ক্ষেত্রে তুমি যা করেছ সেটাই ঠিক্।"

বরজোর সিংহ আত্মহত্যা করতে পারে, জ্বালাপ্রসাদ কখনও ভাবেননি। বোধহয় একথাও ভাবেননি, বরজোর সিংহের কি হবে। তিনি যা কিছু করেছিলেন নিতান্ত অচেতন ভাবেই। তর্কের খাতিরে স্থির করেছিলেন, 'অপরাধীর দণ্ড হওয়া উচিত'। বরজোর সিংহের আত্মহত্যার খবরে তাঁর হৃদয় হঠাৎ কেঁপে উঠল। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে ভাবতে লাগলেন। এখন তাঁর মনে হতে লাগল, বরজোর সিংহের মৃত্যুর জন্যে যেন তিনিই দায়ী। হঠাৎ মাথা তুলে তিনি মীর সাহেবকে বললেন, "হুজুর, আমি একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, বেআদবী মাফ করবেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় জিজ্ঞেস কর, এতে বেআদবীর কি আছে।" মীর সাহেব উত্তর দিলেন।

"হুজুর যদি আমার পদে থাকতেন তবে কি করতেন?"

মীর সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, "তুমি বড়ো কঠিন

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে জ্বালাবাবু! আমি বলতে পারছি না আমি কি করতাম খুব সম্ভব যা তুমি করেছ, আমি তা' করতাম না, অথবা এও সম্ভব তুমি যা করেছ তাইই করতাম। আমি বললাম তো, তুমি বড়ো কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছ।"

এবার জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "না হুজুর, এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, আমার মতো আপনি কখনই করতেন না। আমার মামাবাবু মুন্সী রামসহায় আমাকে এ ধরণেরই পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় ভুল করেছি।" জ্বালাপ্রসাদের স্বর বড়ো করুণ হয়ে উঠল, "ন্যায় আর সত্যের মধ্যে কোন সীমারেখা নেই। এখন পর্যন্ত আমি ভাবতাম সেখানে ভাবেরও কোন স্থান নেই। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল।"

জ্বালাপ্রসাদের করুণ স্বরে মীর সাহেব গলে গেলেন, "না জ্বালাবাবু, আমি একথা বলিনি যে, আমি চিত্তবৃত্তির দুর্বলতার পৃষ্ঠপোষক। যদি মানুষ এই দুর্বলতার ওপর উঠতে পারে তাহলে আমি তাকে অনেক বড়ো মনে করবো। যদিও কোনো মানুষ চিত্রবৃত্তির ওপরে উঠতে পারে আমি বিশ্বাস করি না।" এই প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে মীর সাহেব বললেন, "যাক্‌গে, ওকথা ছাড়। বাবা, যা হবার তা হয়েছে। তাকে কেউ আটকাতে পারত না। সেজন্যে ও আলোচনায় আর লাভ নেই। হ্যাঁ, কাগজ-পত্রগুলো আন, সই করে দিই।"

জ্বালাপ্রসাদ যখন বাড়ি ফিরলেন, জয়দেই জিজ্ঞেস করলেন, "ঠাকুরপো, তোমার মুখ এত শুকনো কেন? হল কি? এখান থেকে তো ভালোয় ভালোয় গেলে?"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "বৌদি, তসিলদার সাহেবের বাড়িতে ঠাকুর গজরাজ সিংহের মুখে শুনলাম, বরজোর সিংহ পরশু রাতে বিধুনাতে আত্মহত্যা করেছে।"

"আত্মহত্যা করেছে, বরজোর!" চমকে জিজ্ঞেস করলেন জয়দেই। তারপর তিনি বললেন, "যাক্, নিজেই সে নিজের

অপরাধের দণ্ড নিয়েছে। কিন্তু ঠাকুরপো, আমার যা চলে গেছে, সে তো আর আমি ফিরে পাবো না।"

জ্বালাপ্রসাদ জয়দেইয়ের কথার কোন উত্তর দিলেন না, বোধহয় সে কথার কোন উত্তরও ছিলনা। জ্বালাপ্রসাদ তো নিজের চিন্তায় ডুবে ছিলেন। তিনি বরজোর সিংহের স্ত্রী আর সন্তানদের কথা ভাবছিলেন। জয়দেইয়ের যা গেছে সে তো সামান্যই। জয়দেইর অনেক সম্পত্তি। তাতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার। তিনি একশ' মোহর দিতে পারেন। কিন্তু বরজোরের স্ত্রী ! সে নিজের দাদার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তার সন্তানেরা অনাথ হয়েছে !

পাঁচ

জ্বালাপ্রসাদ স্ত্রীকে সন্তান প্রসবের জন্যে ফতেপুরে বাবা-কাকার কাছে না পাঠিয়ে, নিজের মামার বাড়ি রাজপুরা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতে মুন্সী শিউলালের কোন আপত্তি ছিল না। তবে মুন্সী রাধেলাল এই ব্যাপারটি নিয়ে হাঙ্গামা বাধালেন। তিনি মুন্সী শিউলালকে বললেন, "কি দাদা, বৌমার ছেলেপুলে হবার ব্যবস্থা আমাদের বাপ-দাদার ভিটেতে হতে পারতো না ? লোকে শুনে কি বলবে ? ছেলে অফিসার হয়েছে বলে কি আর বাবা-কাকা আর বংশকে পর্যন্ত ভুলে যাবে।"

মুন্সী শিউলাল কথাটা এড়াবার জন্যে বললেন, "না রাধে, আসলে ঘাটমপুর থেকে রাজপুরা কাছে কি না। তার ওপর মুন্সী রামসহায় নিজে এসে বৌমাকে নিয়ে গেছেন। আর সেখানে সেবার জন্যে অনেক চাকরবাকর রয়েছে। এতে আমার তো কিছু অন্যায় মনে হচ্ছে না।"

"বাঃ জ্যাঠামশাই, তাহলে আমরা আছি কি জন্যে ?"

রাধেলালের বড় ছেলে রামলাল বলল, "আমরা যা দেখাশোনা, সেবা-যত্ন করতে পারতাম, তা চাকরবাকরে কি করে করবে !"

মামলালের কথা শিউলালের ভালো লাগল না। রাধেলাল বুঝতে পারলেন। কথাটা সামলে নেবার জন্যে তিনি বললেন, "ঠিক্ই তো বলছে রামু ! রামুর বউ কিসের জন্যে আছে। আমি তো বলি সন্তান হবার পর বৌমাকে দু-চার মাসের জন্যে এখানে আনিয়ে নাও।"

ছিনকি, মুন্সী শিউলালের হুকো সাজিয়ে এনে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, সে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক্ই তো দুবছর হল বৌমা এখান থেকে গেছে। দু-চার মাসের জন্যে এখানে এনে রাখ।" তারপরে যেন কিছু ভেবে বলল, "আমি তো বলি তুমি নিজে একবার ঘাটমপুরে চলে যাও। ছেলের মায়া মমতা একেবারে কাটিয়ে ফেলেছ ! ওখানে গিয়ে বৌমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

মুন্সী শিউলাল হুকোয় টান মেরে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক্ বলেছিস্। অনেকদিন জ্বালাকে দেখিনি। আচ্ছা, আগামী মাসে ঘাটমপুরে আর রাজপুরায় যাবো।" আবার ছিনকিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে ঘসিটার শরীর কেমন ?"

প্রসঙ্গ বদলে গেছে দেখে মুন্সী রাধেলাল আর রামলাল চলে গেলেন। ছিনকির চোখ ছলছল করে উঠল, ছিনকি বললে, কি আর বলব, এখন তো খাট থেকে উঠতে পর্যন্ত পারেন না। তিন দিন থেকে গায়ে জ্বরও রয়েছে। ভগবান ওঁকে কোলে নেন তো ভালো হয়, এরকম বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। এতো কষ্ট চোখে দেখা যায় না। হ্যাঁ, কাল তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।"

"আচ্ছা তুই বাড়ি যা। আমি খানিক বাদে আসছি। কবরেজ মশাইকে ডাকতে চললাম।"

"তোমার কবরেজের মরণ দশা ! দশবার ধরে ওষুধই পাল্টাচ্ছে। শরীর তো আরো খারাপই হয়ে যাচ্ছে। পরশু থেকে ওষুধও ছেড়ে দিয়েছেন।" এই বলে ছিনকি চলে গেল।

শিউলাল ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসা রাতের আঁধারের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন। তারপরে জোর করেই উঠে দাঁড়ালেন। কিছুদিন থেকে তাঁর নিজের শরীরও যেন দুর্বল মনে হচ্ছিল। ঘসিটার অনেকদিন যাবৎ অসুস্থতার জন্যে তাঁর দিনের কাজকর্মও বদলে গিয়েছিল। এখন তাঁকে সন্ধ্যেবেলা একলা বসে মদ খেতে হত বলে মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মদ খেতে খেতে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন! মুন্সী শিউলাল এখন যেন নিজের শরীরের দুর্বলতা বেশ অনুভব করছিলেন। ছিনকি অবশ্য সাধ্যমতো বেশীর ভাগ সময় তাঁর দেখাশোনা করত। তবুও ঘসিটার অসুখের জন্যে তাকে অধিকাংশ সময় ঘসিটার সেবা করতে হতো।

হঠাৎ ঘসিটার মৃত্যুর ফল মুন্সী শিউলালের ওপর ভালো হ'ল না। এতদিন তিনি মৃত্যু সম্পর্কে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করেননি। কিন্তু সেদিন থেকে ভীষণ একটা মৃত্যুভয় তার মনে ঢুকল। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর শরীর যেন খুব তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়ছে। এই ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তিনি বড় ব্যগ্র হয়ে ঘাটমপুর যাবার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ছিনকি ঘসিটাকে হারাল। আবার মুন্সী শিউলালের শরীরের ভাঙ্গন দেখে সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। ঘসিটার শ্রাদ্ধ-শান্তি নিয়মমতো চুকিয়ে দিয়ে মুন্সী শিউলালের বাড়িতেই থাকবার জন্যে চলে এল। সে একদিন শিউলালকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ গো, জ্বালার কাছে কবে যাওয়া হবে? বৌমার ছেলেপুলে তো হয়ে গেছে। এখন তো সে ঘাটমপুরে আসতে পারে।"

"হ্যাঁ, চিঠি এসেছে। বৌমা সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রাজপুরা থেকে ঘাটমপুরে আসবে। ভাবছি, আগামী সোমবার মঙ্গলবার নাগাদ এখান থেকে আমি চলে যাবো।"

"আমিও ভাবছিলাম তোমাকে বলব, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চল। যদি আমার একটা কথা রাখ তো বলি। তুমি আমাকেও ঘাটমপুরে নিয়ে চল।"

অবাক্ হয়ে মুন্সী শিউলাল জিজ্ঞেস করলেন, "তুই ঘাটমপুর যাবি কি করতে?"

"এখানে থেকে আর কি হবে? তিনি স্বর্গে চলে গেলেন, আর তুমিও ঘাটমপুর চললে। আমি তো বলি তোমার আর এখানে ফেরার দরকার নেই। তুমি এখন গিয়ে ছেলের কাছেই থাক। সেইজন্যে আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাইছি। আমি ভেবেছি, আমার দু'ছেলে-জ্বালা আর ভিখু! ওদের কাছেই আমার জীবন কেটে যাবে! এখানে আমার কে আছে?"

মুন্সী শিউলাল বুঝলেন, ছিনকির কথার দাম আছে, "ঠিক্ বলেছিস্, তুইও যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নে। আমরা সোমবারেই যাব।"

মুন্সী শিউলালের সঙ্গে ছিনকির যাবার প্রস্তাবে মুন্সী রাধেলালের টনক নড়ল। 'মুন্সী শিউলাল কি বরাবরের জন্যে ছেলের কাছে থাকতে যাচ্ছেন?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন নিজের মনের মধ্যে। এই খবরে মুন্সী রাধেলালের পরিবারের মধ্যেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। শনিবারে সন্ধ্যেবেলা সুযোগ পেয়ে রাধেলাল শিউলালকে বললেন, "দাদা, ছিনকি চলে গেলে বাড়ির কাজে যে গোলমাল বাধবে। ওকে আপনি মিছিমিছি নিয়ে যাচ্ছেন। দু এক মাসের মধ্যেই তো বৌমাকে নিয়ে আপনি ঘাটমপুর থেকে ফিরবেন।"

মুন্সী শিউলাল শুকনো উত্তর দিলেন, "কেন, বাড়ির কাজের জন্যে ছোট বৌ আর রামুর বউ তো আছেই। আমার দেখাশোনার জন্যেও তো লোক দরকার, সেইজন্যেই ছিনকিকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"সেখানে জ্বালার বউ তো আছে। আপনি তো দু এক মাসের জন্যেই যাচ্ছেন, বৌমাকে নিয়ে তো আবার ফিরেই আসবেন। ততদিন জ্বালার বউ ভালোভাবেই আপনার দেখাশোনা করতে পারবে।"

রাধেলাল দু' দু'বার দু'এক মাস বাদে বৌমাকে নিয়ে ফেরার

কথা বলার পরে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "জ্বালার বউ একজন বড়ো অফিসারের স্ত্রী, আবার হালেই তার সন্তান হয়েছে। তাকে দিয়ে সেবা করাবার জন্যে তো আর ভগবান তাকে নায়েবের স্ত্রী করেননি! না রাধে, তাকে দিয়ে আমি সেবা করাব না। ঠাকুরের দয়ায় জ্বালা এখন বসেছে উঁচু পদে। আর তার পরিবারের মান মর্যাদা বাড়ুক্। আমার এখন বয়স হয়েছে। যদি ঘাটমপুরে মন বসে যায় তো ছ'মাস কি বছরও থাকতে পারি। অবশ্য ফেরার ইচ্ছে আছে দু এক মাসের মধ্যেই। ওখানে গিয়ে প্রথমে দেখি তো। নিজের ছেলে, পর তো আর নয়।"

রাধেলাল বুঝলেন, মুন্সী শিউলালের ফতেপুরে ফেরার ইচ্ছে আর নেই। রাধেলালের সংসার বড়ো আর তাঁদের খরচাও বেশী। রাধেলালের চার ছেলে—রামলাল, শ্যামলাল, কিষণলাল আর বিষণলাল। রামলাল আর শ্যামলাল লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল। রামলালের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বিষণলাল তখনও লেখাপড়া করছিল। রামলাল উর্দু মধ্য পাস করে পাটোয়ারি পদের জন্যে চেষ্টা করছিল। শ্যামলাল তিন তিনবার উর্দু মধ্য ফেল করে বখাটে হয়ে ঘুরে বেড়াত। মুন্সী শিউলাল কিছু টাকা জমিয়ে দশ বিঘে জমি কিনে তার ভার দিয়েছিলেন শ্যামলালের ওপর। কিন্তু শ্যামলাল পরিশ্রমী নয়, সেই জমি থেকে বড়োজোর খাজনার টাকাটা মাত্র উঠতো!

রাধেলাল মুখ নীচু করে বললেন, "দাদা বাড়ির অবস্থা তো আপনি সবই দেখছেন। আপনি চলে গেলে, প্রতিমাসে জ্বালা যে কুড়ি টাকা পাঠাত, সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে।"

মুন্সী শিউলাল মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, "না রাধে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি প্রতিমাসে তোমাকে দশ টাকা করে বরাবরই পাঠাব। যদি কোন সময় কিছু বেশী দরকার হয় তো আমাকে জানাবে, যথাসম্ভব আমি তোমাকে পাঠাব। হ্যাঁ, রামুকে বলবে; সে যদি পাটোয়ারির কাজ না পায় তবে যেন জেলা মাষ্টারীর স্কুলে কাজ

নিয়ে নেয়। মৌলবী সলামতউল্লাকে আমি বলে রেখেছি। আর শ্যামুকে ভাল করে বোঝাতে হবে সে যেন গতর খাটিয়ে কাজ করে। আমাদের জমির কাছেই পঞ্চম ঘোষের পাঁচ বিঘে জমি বিক্রি আছে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে জমিটা কিনে নেবে। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়, আসছে গরমের মধ্যেই শ্যামুর বিয়ে দিয়ে দেবে। খুব সম্ভব বিয়ের পর তার বদ অভ্যাসগুলো শুধরে যাবে।"

শিউলালের এতো আশ্বাস পেয়ে রাধেলালের মনটা অনেকটা হাল্কা হ'ল। কিন্তু তিনি আভাস পেলেন, এবার জীবনের গতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটবে। নিজের ছেলেদের দুর্বুদ্ধি আর কুঁড়েমির জন্যে তাদের ওপর তাঁর রাগ হচ্ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী হিংসে হচ্ছিল জ্বালাপ্রসাদ আর তার পরিবারের সৌভাগ্যের জন্যে। তিনি জানতেন, মুন্সী শিউলালকে বেশী আগ্রহ দেখান বৃথা। তাঁর বড়দাদার ওপর যেন ঘেন্না হচ্ছিল। কিন্তু সেই বিতৃষ্ণা চাপা পড়েছিল তাঁর অন্তরের আতঙ্কে।

ঘাটমপুরে পৌঁছে শিউলালের মনে হল যেন তিনি স্বর্গে পৌঁছেছেন। জ্বালাপ্রসাদ শুধু নামেই নায়েব তসিলদার ছিলেন। তাঁর নিজের অধিকার প্রভাব প্রতিপত্তি সবই ছিল তসিলদারেরই মতো। জ্বালাপ্রসাদের বাবা বলে শিউলালেরও সব জায়গায় সম্মান ছিল আর সকলে তাঁর হুকুম তামিল করত। লোকেরা তাঁর মতামত নিতে আসত, তাঁর পরামর্শের দাম ছিল। তাঁর সংসার ছিল ভরপুর। কোন কিছুরই অভাব তিনি বোধ করতেন না। মীর সাহেবের কাছে প্রায় তিনি যেতেন পাশা খেলতে। মীর সাহেবের সঙ্গে তাঁর বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল।

একটা ব্যাপারে একটু বিব্রত হয়েও তিনি অন্য কথা ভেবে সন্তোষ আর গর্ব অনুভব করতে লাগলেন। জ্বালাপ্রসাদ আপন কর্তব্যে ছিলেন দৃঢ় আর সৎ। নিজের চরিত্র দুর্বল হলেও, চরিত্রবান্‌দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনুভব করলেন, পরিবেশের পরিবর্তনে

তাঁর স্বাস্থ্যেরও দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। তাঁর সামনে ছিল একটা নতুন জীবনের স্বাদ ও উল্লাস। তাঁর পরিবার যেমন বাড়ছিল তেমনি সমৃদ্ধি।

শীত শেষ হল। ফসল পাকা শুরু হল। মুন্সী শিউলাল দুপুরে বৈঠকখানায় বসে তামাক টানছিলেন। এমন সময় একজন ডাকল, "জ্বালাবাবু।"

মুন্সী শিউলাল বাইরে দেখলেন, ঠাকুর গজরাজ সিংহ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঠাকুর গজরাজ সিংহকে চিনতেন না। কারণ এখন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। বরজোর সিংহকে নিয়ে গজরাজ সিংহ ও জ্বালাপ্রসাদের মধ্যে যে মন-কষাকষি হয়েছিল এখনও তা দূর হয়নি। তবে মুন্সী শিউলালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াল না, সামনে দাঁড়ান লোকটা সাধারণ মানুষ নয়। "আসুন, বসুন, জ্বালা ট্যুরে গেছে, কাল সন্ধ্যের মধ্যে ফেরার কথা আপনার বক্তব্য, যদি বলেন তো তাকে জানিয়ে দেবো।"

"তাঁকে বলবেন ঠাকুর গজরাজ সিংহ একটি জরুরী কাজে এসেছিলেন। আমি পরশু সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবো। শুধু এই বলে দেবেন।" কথা শেষ করে ঠাকুর গজরাজ সিংহ যাবার জন্যে উদ্যত হলেন। তারপরে কেন যেন তাঁর পা নিজে থেকেই থেমে গেল। তিনি পেছন ফিরে মুন্সী শিউলালকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন, "আপনাকে এই প্রথমবার দেখছি আপনি জ্বালাবাবুর বাবা কি?"

মুন্সী শিউলাল মুচকি হেসে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি চিনতে ভুল করেননি। আমি জ্বালাপ্রসাদের পিতা বটে। যদি কোনো জরুরী কথা থাকে আমাকে বলে যেতে পারেন, সে এলে আমি বলবো।"

"আপনি কেন কষ্ট করবেন। আমি নিজেই এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।" তারপরে কিছুক্ষণ থেমে বললেন, "আপনি মনোজ্ঞ ব্যক্তি। আপনাকে পুরো বৃত্তান্তটি খুলে বললে কোনো ক্ষতি নেই।

বড়ো ধর্ম সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে ; সম্ভবতঃ আপনি কোনো উপায় বাৎলাতে পারবেন।"

গজরাজ সিংহের মুখে পুরো বৃত্তান্তটি শুনে মুন্সী শিউলালের মন বরজোর সিংহের পরিবারের প্রতি করুণায় ভরে উঠল। তিনি বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ঠাকুর সাহেব, জ্বালা এলে আমি তাকে সব বলবো। কথা দিচ্ছি ওকে দিয়ে যা সম্ভব তাতে কোন ত্রুটি হবে না। এ সম্বন্ধে আপনি ভরসা রাখতে পারেন।"

পরের দিন জ্বালাপ্রসাদের ট্যুর থেকে ফেরার পরে মুন্সী শিউলাল বললেন, "বাবা, কাল দুপুরে ঠাকুর গজরাজ সিংহ তোমার কাছে এসেছিলেন।"

জ্বালাপ্রসাদ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ঠাকুর গজরাজ সিংহ এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে ? কিছু বলে গেছেন কি ?"

"হ্যাঁ, বরজোর সিংহের জমির বিষয় বলতে এসেছিলেন। ফসল পেকেছে, আর শ্রীমতী জয়দেইয়ের নামে জমির খারিজ দাখিল হয়ে গেছে। জয়দেইয়ের মুহুরি লচ্ছীরাম জমির দখল নেবার জন্যে আবেদনপত্র পেশ করেছে। পাকা ফসলের মামলা, তোমার সাহায্য চান।"

জ্বালাপ্রসাদের মাথার ওপর আঁধার ছায়া নেমে এলো। অসহায় করুণ সুরে তিনি বললেন, "বাপ্পা, আমি কি করতে পারি ? যখন জমিদার গিন্নীর নামে খারিজ দাখিল হয়ে গেছে, তখন তো দখল তিনি পেয়ে যাবেনই। আপনিই বলুন এ ক্ষেত্রে তাঁদের আমি কি সাহায্য করতে পারি ?"

"তুমি এটা করতে পারো; বরজোর সিংহের বিধবা শর্ত মত ফসল কেটে, জমিদার গিন্নীকে নিজেই জমির দখল দিয়ে দেবেন। আমার মনে হয় এই শর্তে মামলার সহজেই নিষ্পত্তি হবে।"

"বরজোর সিংহের স্ত্রী ঘাটমপুরে এসেছেন কি ?" জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, নিজের ছেলেপুলেদের নিয়ে তিনি গজরাজ সিংহের কাছেই

রয়েছেন। গজরাজ সিংহ কাল সকালে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, বলে গেছেন।" খানিক থেমে শিউলাল বললেন, "যা কিছু সম্ভব করো বাবা, অনাথ বিধবার মামলা!"

জ্বালাপ্রসাদ উদাসভাবে উত্তর দিলেন, "দেখুন, একটা কিছু করার চেষ্টা করবো। সম্ভবতঃ জমিদারনী জয়দেই আপনার কথামত রাজী হয়ে যেতেও পারেন।"

সন্ধ্যে হবার কিছু আগেই জ্বালাপ্রসাদ শিবপুরার দিকে রওনা হলেন। তিনি যখন শিবপুরা পৌছলেন, অন্ধকার হয়ে আসছে। প্রভুদয়ালের ফটকের ওপর রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে আরতি হচ্ছিল। সেখানে আগের মতোই ভিড় ছিল। জমিদারনীর চাকরেরা হেঁট হয়ে জ্বালাপ্রসাদকে সেলাম করে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকখানায় বসালে। তারপরে জয়দেইকে তাঁর আসার খবর নিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মুহুরি লচ্ছীরামকেও জ্বালাপ্রসাদের আসার খবর পাঠানো হল। তিনি বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। জয়দেই জ্বালাপ্রসাদকে বাড়ির ভেতরে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। উঠে দাঁড়িয়ে জ্বালাপ্রসাদকে স্বাগত জানিয়ে বললেন "তুমি যে এসেছ আমার অনেক সৌভাগ্য ঠাকুর পো। আমি দু চার বার তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তো অফিসার মানুষ। যখন তখন ট্যুরে বাইরে থাক।" এই বলে মৃদু হাসলেন।

জ্বালাপ্রসাদও মুচ্‌কি হেসে বললেন, "কি বলি বৌদি, কাজের চাপে নাজেহাল হয়ে গেছি। একটু আরাম করে যে দু'দণ্ড বাড়িতে বসবো তার জো নেই। নিজের কাজের সঙ্গে সঙ্গেই মীর সাহেবেরও পুরো কাজ আমাকেই সামলাতে হয়। কাল রাত্রে ট্যুর থেকে ফিরে হঠাৎ আজ সকালে মনে হ'ল, অনেক দিন বৌদির সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই সময় করে এখন চলে এলাম।"

"ঠাকুরপো, অসীম দয়া তোমার। আমাদের তুমিই একমাত্র ভরসা। বসো না, দাঁড়িয়ে কেন? আমি তোমার বাড়ি

গিয়েছিলাম। কি সুন্দর হয়েছে তোমার খোকা! আমার সই ভালো আছে তো?"

জয়দেই যমুনাকে সই বলেন, তা জ্বালাপ্রসাদ জানতেন। তিনি উত্তর দিলেন "হ্যাঁ বৌদি, তোমাকে নমস্কার জানিয়েছে।" আবার খানিক থেমে বললেন, "বৌদি, একটা বিশেষ জরুরী কাজে তোমার কাছে এসেছি। একটি প্রার্থনা আছে।"

জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন, "বৌদি, শুনলাম তুমি নাকি বরজোরের জমির দখল নেবে?"

"হ্যাঁ ঠাকুরপো, যা করণীয় সব লচ্ছীরাম সেরে ফেলেছে। দু চার দিনের মধ্যেই জমির দখল নিতে হবে। অনেক দিন থেকে এটা পড়ে আছে।"

"বৌদি, আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম, বরজোর সিংহের স্ত্রী, ছেলেপুলে এখানে এসেছে। তাদের খুবই দুর্দশা। তুমি তাদের ফসল কেটে নিতে দাও। তারপরে তারা নিজে থেকেই জমির দখল তোমাকে ছেড়ে দেবে। লচ্ছীরামকে আদেশ দাও, সে যেন এখন জমি দখলের কাজগুলো বন্ধ রাখে।"

জয়দেইয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি মাটির দিকে চেয়ে উত্তর দিলেন, "ঠাকুর পো, সবাই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে আসে। নির্ধন আর অনাথ তো জগতে ভরা। কত জনের দুঃখ দূর করবে। তবে তুমি এটা তো মানবে যে ঐ জমির ওপর আমার অধিকার আছে।"

জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, ঠিক্ বলছ বৌদি, ফসল সমেত জমির ওপর তোমারই অধিকার। কিন্তু সে অধিকার বর্তেছে বরজোর সিংহের পরিশ্রমের জোরে। এতো হ'ল আইনের কথা, কিন্তু আমি তোমাকে যা করতে বলছি সে হচ্ছে দয়া আর দাক্ষিণ্যের ব্যাপার।"

জয়দেইয়ের মুখের ওপর আবার মুচ্‌কি হাসি দেখা দিল, "ঠাকুরপো, তুমি কত ভালো, কত মহৎ! লচ্ছীরামকে বলে দাও

সে যেন এখন কাজ বন্ধ রাখে। তোমার কথা আমি কি ঠেলতে পারি।" তারপর তিনি বললেন, "ঠাকুর পো, খেয়ে যাবে কিন্তু। আমি এখুনি তোমার জন্যে রান্না করছি। তুমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নাও।"

"বৌদি, আজকের মতো ক্ষমা কর। আমি বাপ্পাকে বলে আসিনি। তিনি খাবার জন্যে আমার অপেক্ষা করে বসে আছেন। এবার যখন আসব, বাড়িতে খাবার কথা বারণ করে আসব। তোমার হাতের রান্না খেয়ে তবে যাব।"

"ভালো কথা। তবে একটু জলটল তো খেয়ে যেতেই হবে।"

জল খাবার খেয়ে জ্বালাপ্রসাদ বেরিয়ে দেখলেন লচ্ছীরাম বাইরের দালানে তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে। জ্বালাপ্রসাদকে আসতে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, "বলুন, আপনি কেন কষ্ট করলেন?"

জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "তুমি এসেছ ভালো হয়েছে। শুনলাম তুমি নাকি ঠিক করছ দু চার দিনের মধ্যেই বরজোর সিংহের জমির দখল নেবে?"

"হ্যাঁ, নায়েব সাহেব, এ গিন্নীমার আজ্ঞা। দখল নিতে অনেক দেরীও হয়ে গেছে। ফসল কাটবার সময় হয়ে এল।"

"হ্যাঁ, ফসল কাটবার সময় তো হয়েই এল লচ্ছীরাম। আর সেইজন্যেই আমি বলতে এসেছিলাম, তারা যত দিন ফসল না কেটে নেয় তত দিন যেন দখল না নেওয়া হয়। বরজোরের স্ত্রী ফসল কেটে নিয়ে নিজেই তোমাদের জমির দখল ছেড়ে দেবে। আমি জমিদার গিন্নীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি রাজী আছেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে জানিয়ে দিতে।"

জ্বালাপ্রাসাদের কথাবার্তা লচ্ছীরামের ভালো লাগলনা। সে বলল, জমিদারনীই মালিক। তাঁর হুকুমই তামিল করা হবে। কিন্তু নায়েব সাহেব, জমি জায়গা, টাকাকড়ির ব্যাপারে দয়াধর্ম্মের স্থান নেই। এর জন্যেই কর্তার প্রাণ গেল। জমিদারনী এ প্রস্তাবে রাজী হলেন কি করে?"

লচ্ছীরামের এই অভিযোগ জ্বালাপ্রসাদের ভালো বোধ হল না। তিনি কড়া সুরে বললেন, "এসব তুমি তোমার গিন্নীমাকেই জিজ্ঞেস কর। আমি শুধু জানি, লালা প্রভুদয়াল আর জমিদার গিন্নীর মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। আর তোমাকে শুধু জানাচ্ছি, জমির দখল নেবার কাজ এখন বন্ধ থাকবে। বুঝেছ!" লচ্ছীরামের উত্তরের অপেক্ষা না করেই জ্বালাপ্রসাদ সেখান থেকে চলে গেলেন।

লচ্ছীরাম জয়দেইয়ের কাছে গেল। জয়দেই পালঙের ওপর চোখ বুজে শুয়ে স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করছিলেন। লচ্ছীরামের পায়ের শব্দে স্বপ্ন-ঘোর যেন চোখে নামতে নামতে দূরে মিলিয়ে গেল। তিনি চোখ মেলে চাইলেন। লচ্ছীরামকে সামনে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "লচ্ছী, ব্যাপার কি?"

লচ্ছীরাম আবেশের সঙ্গে বললে, "গিন্নীমা, এখন এ বাড়িতে কি নায়েব সাহেবের হুকুমই চলবে?"

লচ্ছীরামের ইঙ্গিত জয়দেইয়ের ভালো ঠেকল না। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "লচ্ছী, আমি তো নায়েব সাহেবকে বলেছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বলে নিতে। এতো সামান্য কথা, এ নিয়ে রাগ করা বৃথা।"

লচ্ছীরাম বললে, "গিন্নীমা, প্রথমে আমার সঙ্গে এ বিষয় আপনার কথা বলে নেওয়া উচিত ছিল। এ বাড়ির হর্তা-কর্তা এখন আমাকেই তো করেছেন।"

এবার জয়দেই জোরে হেসে উঠলেন, "হ্যাঁ লচ্ছী, তোমাকেই তো এ-বাড়ির কর্তা করেছি। কিন্তু তুমি কি জাননা নায়েব সাহেব দেবতুল্য মানুষ, আর তিনি আমাদের কত বড়ো একজন সহায়।"

লচ্ছীরাম বললে, "গিন্নীমা, কিন্তু আমার মনে হয় দখল নিয়ে নেওয়াই উচিত।"

জয়দেই একটু গম্ভীর হয়েই বললেন, "লচ্ছী, এই দখলের জন্যেই

কর্তার প্রাণ গেল। এখন আমার একমাত্র ভরসা তুমিই। আর তুমি কি চাও যে আমি তোমাকেও হারাই।"

লচ্ছীরাম সহসা ভীতকণ্ঠে বললে, "এরকম কোন আশঙ্কা আছে না কি? নায়েব সাহেব এসব কথা বলতেই এসেছিলেন বুঝি?"

লচ্ছীরামের মনে ভয় জাগিয়ে জয়দেই মজা পেতে লাগলেন, "ঠাকুরপো এরকমই কিছু খবর শুনেছেন। ঠাকুর গজরাজ সিংহের বেয়াইয়ের কাছ থেকে আটদশজন লাঠিয়াল এসে রয়েছে। যখন নায়েব সাহেব এখানে আসছিলেন তখন বন্দুক হাতে দুজন লোককে এখান থেকে ক্রোশ খানেক দূরে দেখেছিলেন। নায়েব সাহেব বাধা দেওয়াতে বললে, 'গজরাজ সিংহের আত্মীয়, শিকারে বেরিয়েছে'।"

লচ্ছীরাম ঘামতে লাগলেন। "গিন্নীমা, সরকার আর পুলিস কি সব চুপ করে দেখবে?"

"তা আমি কি জানি। তবে তুমি তো স্বচক্ষে দেখলে, দারোগা আমজাদ আলী যথাসময়ে আমাদের বোকা বানালেন। একমাত্র নায়েব সাহেবই আমাদের ভরসা। তবে তোমার তো তাঁর কথাও অপ্রিয় মনে হয়। এখন ভগবানই আমাদের ভরসা!"

"না, না, নায়েব সাহেব যা বললেন তাই হবে। তার একটুও নড়চড় হবেনা।" লচ্ছীরাম বললে।

জয়দেই হাই তুললেন, "লচ্ছী, আমার শরীর ভালো নেই। তুমি এখন বাড়ি যাও। খাবারও সময় হ'ল। আর দেখো, একটু সাবধানে থাকবে। তবে নায়েব সাহেব কথা দিয়েছেন, তিনি সব ঠিক করে দেবেন।"

লচ্ছীরাম প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে একলা নিজের বাড়ি পর্যন্ত যেতে সাহস পাচ্ছিল না। তাই একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ি ফিরল।

ছয়

মুন্সী রামসহায় দোলপর্বে মুন্সী শিউলাল, জ্বালাপ্রসাদ আর যমুনাকে রাজপুরা যাবার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর চিঠি পেয়ে মুন্সী শিউলাল জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "বাবা, আমাদের যাওয়া উচিত। তোমার মামাবাবু বড়ো আগ্রহ ক'রে আমাদের যেতে লিখেছেন। আমারও ইচ্ছে করছে কিছুদিন রাজপুরা গিয়ে থাকি। এখন তো আমার ঘুরে বেড়াবারই সময়।"

"কিন্তু বাপ্পা, আমাকে তাহলে আলাদা করে ছুটি নিতে হবে। এই তীর্থ-টীর্থ, পূজো-পার্বণ বড়ো সরকারী চাকুরেদের জন্যে নয়। এই সময়ে আমাদের কাজ আরও বেড়ে যায়। আপনি আপনার বৌমাকে নিয়ে চলে যান। ছিনকি কাকীকেও সঙ্গে নিয়ে যান। ভিখু একাই আমার যথেষ্ট।"

ছিনকি পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, "বউ তো অনেক দিন ওখানে থেকে এল, আবার কেন যাবে? তার ওপর নিজের বাড়িতে দোল উৎসব। বড়ো অফিসারের বাড়ি লোকজন আসবে নাচ গান হবে। অতিথি আপ্যায়নের জন্যে তো কারো না কারো এখানে থাকা দরকার। তুমি নাহয় একাই ওখানে চলে যাও। বরাবরের জন্যে তো আর থাকতে যাচ্ছ না।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "আমিও একদিনের জন্যে আপনার সঙ্গে রাজপুরা যাব। ওদিককার ট্যুরও সারা হবে আর আপনাকেও পৌছে দিয়ে আসা হবে।"

মুন্সী শিউলালকে পৌছে দিয়ে জ্বালাপ্রসাদ যখন ফিরলেন তখন গজরাজ সিংহ তাঁর বাড়িতে তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলেন। তিনি জ্বালাপ্রসাদকে এক্কা চেপে ফিরতে দেখেছিলেন। কিন্তু জ্বালাপ্রসাদ কিছুক্ষণের জন্যে তসিলে গিয়েছিলেন।

"ক্ষমা করবেন নায়েব সাহেব, আমি তারপর থেকে আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারিনি। মেয়েকে আনতে

রাজপুরা যেতে হয়েছিল। যাওয়া আমার উচিত হয়নি, কিন্তু যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাড়িতে তো আর কুটো ঠেলতে দ্বিতীয় কেউ নেই। বরজোরের ওপর ভরসা ছিল, সেই বা আর রইল কৈ। মেয়েকে নিয়ে কালকেই ফিরেছি। বিয়ের বছরের প্রথম দোল কিনা! আপনার খোঁজ করে জেনেছিলাম, আজ সকালে আপনি ট্যুর থেকে ফিরবেন।”

জ্বালাপ্রসাদ পান আনবার আদেশ দিয়ে বললেন, “ঠাকুর সাহেব, আপনি বরজোরের জমি সম্বন্ধে আমাকে যা করতে বলে গিয়েছিলেন আমি তা করে দিয়েছি। এখন উপস্থিত জমিদারনী জমি দখলের জন্য কিছু করবেন না। ফসল কেটে নিয়ে আপনারা নিজেই জমির দখল তাঁকে ছেড়ে দেবেন। এসবে আর আইন আদালত কেন? সেদিন আমি তাঁকে সব কথা বলে এসেছি।”

“ওই অনাথদের আপনি বড়ো উপকার করলেন, জ্বালাবাবু! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমি বরজোরের স্ত্রীর কাছে খবর পাঠিয়ে দেবো। সে নিজের বাড়ি চুনৌঠায় গেছে। আর জমির দখল দেওয়ার ভার রইল সম্পূর্ণ আমার ওপর।”

ঠাকুর গজরাজ সিংহ খুশী মনে চলে গেলেন।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা তিনি আবার জ্বালাপ্রসাদের বাড়ি এলেন। সে সময় তাঁকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। চার দিকে দোলের ধুমধাম। পরিবেশ আনন্দে উচ্ছল। গজরাজ সিংহ জ্বালাপ্রসাদকে দোলে আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, ‘জ্বালাবাবু, যা হবার তা তো হয়েই গেল। আপনি যা করেছেন ন্যায়ের দিক্ থেকে ঠিক্ই করেছেন। ভুল আমার, আমি আপনার সঙ্গে শত্রুতা করে বসেছিলাম, এখন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। যদি আপনি আমার বাড়ি গিয়ে একটু খানাপিনা করেন তাহলে বুঝবো আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। আর তসিলদারনী সাহেবার জন্যে বিশেষ করে রাণী সাহেবা নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।”

গজরাজ সিংহের নিমন্ত্রণের মধ্যে ছিল আন্তরিকতা। সেজন্যে

জ্বালাপ্রসাদ তা অস্বীকার করতে পারলেন না। "নিশ্চয় আসবো ঠাকুর সাহেব, সংসারে ভালোমন্দ দুই তো আছে। আমরা ভুল করি তাই শাস্তিও পাই। আর মনের আবেগের ওপরে উঠতে পারে এরকম লোক খুবই কম। লোকে ভাবাবেগে পথ ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু আবার যদি ঠিক্ পথে এসে যায়, তখন আর বলার কি আছে।"

চাঁচরের পরের দিন হোলি। জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে আর দোল খেলতে ঘাটমপুরের প্রায় সবাই এলো। আর তাদের আদর অভ্যর্থনাও হ'ল বেশ ভালো ভাবেই। সকাল থেকেই লাল পানির জের আরম্ভ হয়েছিল। আর জ্বালাপ্রসাদকেও অতিথিদের সঙ্গ দিতে হচ্ছিল।

জ্বালাপ্রসাদ যমুনাকে নিয়ে দুপুরবেলা ঠাকুর গজরাজ সিংহের বাড়ি গেলেন। যমুনা অন্দরমহলে চলে গেলেন। গজরাজ সিংহের দেওয়ানী আমে নাচ গানের আসর জমেছিল। গাঁয়ের গায়িকারা নাচছিল আর তার সঙ্গে মদের জোয়ার চলছিল।

প্রায় দুটোর সময় মজলিস শেষ হলে সবাই খেতে বসলেন। গজরাজ সিংহ জ্বালাপ্রসাদকে পাশে বসালেন। বরজোর সিংহের দুই ছেলে পরিবেশন করছিল। গজরাজ সিংহ বললেন, "এই ছেলেগুলোর বাড়ি এবৎসর দোল উৎসব হবে না জ্বালাবাবু। সেইজন্যে এদের আমি এখানে ডেকে এনেছি। বেচারারা জানে না তারা কি হারিয়েছে। এদের মা একা চুনৌঠাতে পড়ে পড়ে কাঁদছে। সাক্ষাৎ যেন মা লক্ষ্মী। জানিনা ভগবান কোন্ পাপের জন্যে তাকে এত বড়ো শাস্তি দিলেন! আপনি এদের কত বড়ো যে উপকার করেছেন জ্বালাবাবু। সেইজন্যে এরা নিজের বাড়ি ফিরতে পেরেছে।"

জ্বালাপ্রসাদের চোখ নেশায় ঝাপসা হয়ে আসছিল। এই করুণ কাহিনী শুনে তাঁর হৃদয় যেন করুণায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। হতাশার সুরে তিনি বললেন, "অজান্তে এদের কাছে আমি অপরাধ করেছি; এখন এদের জন্যে যা করেছি সে তার তুলনায় অতি নগণ্য।"

গজরাজ সিংহ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। উপযুক্ত অবসর দেখে তিনি বললেন, "নায়েব সাহেব, জমিদারনী তো আপনাকে খুব স্নেহ করেন। বরজোর সিংহের একশ' বিঘে জমির দলিল তাঁকে দিয়ে আপনি লিখিয়ে নিতে পারবেন না?"

খানিক ভেবে জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "মনে হয়, এতে কোন বাধা হবে না। তাঁকে শেষ পর্যন্ত জমির দলিল তো কারো নামে লিখতেই হবে। কথা শুধু নজরানা নিয়ে। আমি নজরানার দু-একশ' টাকা তাঁকে বলে কমাতে পারি। বলেন-তো তাঁর কাছে এ সম্বন্ধে কথা পাড়ি?"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে গজরাজ সিংহ বললেন, "রাজবংশের লোককে চাষীবৃত্তি করতে হলে সে বড়ো দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু কি করা যায়, সময় সবই করিয়ে নেয়। বিধাতার লিখন কে কোথায় খণ্ডাতে পেরেছে। উপোস করে মরার চেয়ে তো চাষবাস করা ঢের ভালো। জ্বালাবাবু, আপনি যদি এটা করিয়ে দিতে পারেন তো খুবই ভালো হয়। এদের খাওয়া পরা চলে যাবে।"

গজরাজ সিংহের অসহায়তার সুরে ছিল অভিযোগ। জ্বালাপ্রসাদের মন ধীরে ধীরে ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। তিনি খেতে পারছিলেন না, এটা করুণার জন্যে না মদের নেশায়, বলা শক্ত। খাবার পর তিনি মন ভার করে বাড়ি ফিরলেন। রাণী দেবকুঁওর যমুনা আর ছিনকিকে ছাড়লেন না। ভিখু কাহারদের দলের সঙ্গে দোলে সং সাজাতে আর গান গাইতে চলে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে জ্বালাপ্রসাদ শুয়ে পড়লেন। তিনি বরজোর সিংহের পরিবার ছেলেপুলেদের সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন। শত চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারলেন না। আধঘণ্টা ধরে এপাশ ওপাশ করলেন। চার দিকে গান-বাজনা হচ্ছিল, আনন্দ উৎসব চলছিল। আর তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে শুয়েছিলেন।

সেই উদাস ভাবের ওপর যেন বিদ্রোহ করবার জন্যেই তিনি জোর করে উঠে দাঁড়ালেন। কাপড়জামা পরে এক্কা গাড়িতে

ঘোড়া জোড়ালেন; আর এক রকম ঘোরের মধ্যেই তিনি এক্কা গাড়ি শিবপুরার দিকে হাঁকাতে বললেন।

তখনও রোদ বেশ কড়া আর চারদিকে ধূলো উড়ছে। হোলি খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে চারদিক থেকে ঢোল আর মৃদঙ্গের তালে দোলের মনমাতানো গান শোনা যাচ্ছিল। জ্বালাপ্রসাদের মন থেকেও এতক্ষণে উদাস ভাবটা ঘুচে গিয়েছিল। তাঁর এক্কা গাড়ি শিবপুরা লালা প্রভুদয়ালের প্রাসাদের সামনে এসে থামলো।

প্রভুদয়ালের প্রাসাদের চার দিক ছিল একেবারে শান্ত। রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরের কবাট ছিল বন্ধ আর ফটকে দারোয়ান ছাড়া কেউ ছিল না। প্রভুদয়ালের বাড়ি শিবপুরায় এবারে হোলি হয়নি। বেশীর ভাগ চাকরবাকরেরা ছুটি নিয়ে হোলির জন্যে নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি চলে গিয়েছিল। দু-একজন চাকর এখানে ওখানে বসে ঝিমোচ্ছিল। জ্বালাপ্রসাদের ইচ্ছে হ'ল তিনি ফিরে যান। দোলের দিন জয়দেইয়ের বাড়ি আসা তাঁর অন্যায় হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ভেতর থেকে যেন কে বললে, "কিন্তু তুমি তো আর দোল খেলতে আসোনি। তোমাকে যে বরজোরের পরিবারের সমস্যার সমাধান করতে হবে!" জ্বালাপ্রসাদ জয়দেইয়ের কাছে নিজের আসার খবর পাঠালেন।

জয়দেই পালঙ্কের ওপর শুয়েছিলেন। তাঁর ঘুম খানিক আগেই ভেঙ্গে ছিল, কিন্তু শরীরের আলস্য তখনও দূর হয়নি। জ্বালাপ্রসাদের আসার খবরে তাঁর মনের আলস্য কে জানে কোথায় যেন উবে গেল। তিনি উল্লাসের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। জ্বালাপ্রসাদকে অন্দর মহলের বৈঠকখানায় বসাতে দাসীকে আদেশ দিলেন। আর তিনি নিজে ঠিক্‌মতো জামাকাপড় পরে জ্বালাপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে ছিল সাদা ধবধবে শাড়ী—না ছিল কোন সাজসজ্জা, না অলঙ্কার আভরণ। তিনি মৃদু হেসে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "ঠাকুর পো, তোমার ভারি দয়া যে দোলের দিনও বৌদিকে ভোলোনি।" জ্বালাপ্রসাদের সামনেই তিনি একটু তফাতে বসলেন।

জয়দেইকে সাধারণ কাপড়ে কি সুন্দরই না মানিয়েছিল! কতই না মধুর তাঁর মৃদু হাসি! খানিকক্ষণ জ্বালাপ্রসাদের কথা বলার অপেক্ষায় চুপ করে থেকে জয়দেই বলে উঠলেন, "কি ঠাকুরপো, অমন করে আমাকে দেখছ কেন! বড়ো যে বেশী গম্ভীর হয়ে রয়েছ। মনে হচ্ছে যেন দোলের ছাপ ধরেছে মনে।" জয়দেই এবার জোরে হেসে উঠলেন, "কি বলি, এবার এখানে হোলি হ'ল না। না হলে আমি যা তোমাকে খাওয়াতাম না!"

এবার জ্বালাপ্রসাদের মৌনতা ভাঙ্গল, "না বৌদি, এখানে খেতে আসিনি। দিনভোর তো খেয়েই চলেছি। এখানে একটা দরকারী কাজে এসেছি।"

জয়দেই একটু অভিমানের সুরেই বললেন, "ঠাকুরপো, যখন আসো তখন শুধু কাজকর্মের ঘ্যানঘ্যানানি নিয়েই। তাহলে আসার দরকার কি ছিল, বলে পাঠালেই তো হয়ে যেত। আমি তো তোমাকে বলেই রেখেছি, তোমার কথা আমার কাছে অকাট্য। বলো, কিন্তু হেসে বলো, এতো গম্ভীর হয়ো না!".

জ্বালাপ্রসাদ অনুভব করলেন, তিনি যেন বড়ো বেশী গম্ভীর হয়ে আছেন। মৃদু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "বৌদি, আমি বরজোর সিংহের জমির বিষয় ভাবছিলাম। সে জমিটা কি তার সন্তানেরা পেতে পারে না? তারা যে একেবারে অনাথ হয়ে গেছে।"

জয়দেই উত্তর দিলেন, "ঠাকুরপো, তুমি তো আইন জান। আমি কি করে সে জমিটা তাদের দিতে পারি? হ্যাঁ, যদি তারা ধারের সব টাকাটা চুকিয়ে দেয় তাহলে বোধহয় তারা সে জমিটা পেতে পারে। ঠাকুর পো, তুমিই জানবে এই সব আইনের ব্যাপার। কারণ আমি এখন পর্যন্ত দখল নিইনি।"

"কিন্তু বৌদি, ওই অনাথদের কাছে এত টাকা কোথায় যে তা দিয়ে তারা এই ধার শুধবে! আমার কাছেও নেই; তা' না হলে আমি তাদের টাকাটা দিয়ে দিতাম।" জ্বালাপ্রসাদ একটু ভাব বিহ্বল সুরে বললেন।

জয়দেই জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে জ্বালাপ্রসাদের দৃষ্টির মধ্যে বাঁধা পড়ল। তারপর হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। "ঠাকুরপো, আমি এক্ষুনি আসছি"—বলে দ্রুত ওখান থেকে চলে গেলেন।

জয়দেইয়ের আচরণে জ্বালাপ্রসাদ বিস্মিত হলেন। জয়দেই তাঁর কথা শেষ করার অবসরই দিলেন না। তিনি একটু ভাবলেন, কি ভাবে নিজের কথা তিনি জয়দেইকে বলবেন। এমন সময় জয়দেইয়ের দাসী বলল "হুজুর, গিন্নীমা আপনাকে তাঁর ঘরে ডাকছেন।"

জ্বালাপ্রসাদ যখন জয়দেইয়ের ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন, দাসী সেখান থেকে চলে গেল। তিনি দেখলেন জয়দেইয়ের রূপই যেন পাল্টে গেছে। তাঁর সারা অঙ্গ অলঙ্কারে মোড়া। তিনি একটা দামী জড়োয়া ঘাঘরা পরেছেন, গায়ে রেশমের ওড়না। জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "ঠাকুরপো, দোলের দিন চাঁচর জ্বালাতে এসেছ। বৌদির সঙ্গে হোলি খেলতেও হবে আর হোলি খেলার পুরস্কারও নিতে হবে।" এই বলে মোহর ভরা একটি থলি জ্বালাপ্রসাদের সামনে রাখলেন, "ঠাকুরপো, এই একশ'টি মোহর নিয়ে একদিন আমি তোমার কাছে গিয়েছিলাম। তখন তুমি অফিসার বলে ঘুষ মনে করে ফিরিয়ে দিয়েছিলে, গ্রহণ করনি। আজ আমি তোমাকে সেই একশ'টি মোহরই দিচ্ছি। তবে অফিসারকে নয়, নিজের দেওরকে! আজ আর তুমি না করতে পারবে না। আজ থেকে কোনো দিন যেন আর বলোনা, তোমার কাছে টাকা নেই। যা কিছু আমার আছে, সব তোমারই।" এই বলে তিনি এক মুঠো আবীর জ্বালাপ্রসাদের মুখে মাখিয়ে দিলেন।

জ্বালাপ্রসাদ যখন মোহরের থলি নিয়ে জয়দেইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে। প্রাসাদের বাইরে লোকেরা দলে দলে হোলি গাইছে আর গালি দিতে দিতে এদিক ওদিক বেরিয়ে যাচ্ছে। জ্বালাপ্রসাদকে

জয়দেইয়ের চাকরেরা প্রাসাদের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। তোরণদ্বারে রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরের কবাট খোলা, আরতি হচ্ছিল। জ্বালাপ্রসাদের ঠাকুর-দর্শন করার সাহস হ'ল না। তাঁর মনে হলো, চাকরেরা যেন তাঁকে দেখে উপহাস করছে, বিদ্রূপ করছে। তাঁর হাতে ছিল মোহরের থলি। পা টলমল করছিল। তাঁর মন, চোখ এবং সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরে গিয়েছিল। তিনি তাড়াতাড়ি এক্কা গাড়িতে বসে ঘাটমপুরের দিকে রওনা হলেন।

সাত

ঠাকুর গজরাজ সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণে মীর সখাউত হুসেনকে দেখে জ্বালাপ্রসাদ আশ্চর্য হলেন। তিনি ঝুঁকে মীর সাহেবকে আদাব জানিয়ে বললেন, "আজ হুজুর নিজের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। ঠাকুর গজরাজ সিংহের পরম সৌভাগ্য যে হুজুর তাঁর নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছেন।"

মীর সাহেব মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "বাবা, প্রতিজ্ঞা তো ভাঙ্গার জন্যেই। গজরাজ সিংহের বেয়াই রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহের কথা অমান্য করি কি করে। উনি যেমন গজরাজ সিংহের মান্য, আমারও তো তেমনি।" রাজা চন্দ্রভূষণের দিকে ঘুরে বললেন, "রাজা সাহেব, এটি বড়ো সুশীল আর ভালো ছেলে। এখানে নায়েব তসিলদার হয়ে এসেছে। জানবেন, এখন এই আমার ডান হাত। বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল ও সৎ প্রকৃতির ছেলে। আমি এই এলাকার সব কাজ ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি আর কোথা থেকেও কোন অভিযোগও নেই।"

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ হয়েছে। রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহ এলাহাবাদ থেকে কানপুর হয়ে নিজের এলাকায় ফিরছিলেন। ঠাকুর গজরাজ সিংহের অনুরোধে সপ্তাহখানেকের

জন্যে ঘাটমপুরে এসেছিলেন। তাঁর আগমনের উল্লাসে ঠাকুর গজরাজ সিংহ এই ভোজের আয়োজন করেন।

রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহ খুঁটিয়ে জ্বালাপ্রসাদকে দেখলেন। তাঁর চোখ নেশায় লাল হচ্ছিল। বিদ্রূপের হাসি হেসে তিনি মীর সাহেবকে বললেন, "এঁকে দেখেছি মীর সাহেব। তবে দেখার চেয়েও ঢের বেশী এঁর কথা শুনেছি। ভালোই তো। কিন্তু বড়ো ন্যায়পরায়ণ আর আপন কর্তব্যে খুবই নিষ্ঠাবান।" এবার তিনি জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "আপনি এখানেই ছিলেন, আর আমি আপনাকে দেখিনি! যতদূর আমার মনে পড়ে, বোধহয় লাল পানিতে আপনার কোন আপত্তি নেই। এই নিন, নিজেই ঢালুন। গতবার বরজোর সিংহ আপনার জন্যে ঢেলেছিল। ঢালবার যে পুরস্কার আপনি তাকে দিলেন সে দেখে আপনার জন্যে ঢালতে আমার আর সাহস হয় না!" এই বলে রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

গজরাজ সিংহের মনে হ'ল যেন কথাবার্তা তিক্ততার রূপ নিচ্ছে। স্পষ্টতঃই, প্রকৃত ঘটনা না জেনে ইচ্ছে করে জ্বালাপ্রসাদকে অপমান করা হয়েছে। তিনি রূপোর গেলাসে নিজে মদ ঢেলে জ্বালাপ্রসাদকে দিলেন। তারপরে বেয়াই রাজা চন্দ্রভূষণ সিংহকে বললেন, "রাজা সাহেব, নায়েব তসিলদার সাহেবের সম্বন্ধে আপনার একটু ভুল ধারণা হয়েছে দেখছি। নায়েব সাহেবের অনুগ্রহে সেই জমি বরজোর সিংহের স্ত্রী পুত্রেরা ফেরৎ পেয়েছে।"

মীর সখাউত হুসেন এতক্ষণ তটস্থ হয়ে সহাস্যে এই দৃশ্যটি দেখছিলেন। হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠলেন, "জ্বালাবাবুর দয়ায় বরজোরের স্ত্রী যে নিজের জমি ফেরৎ পেয়েছে, সে তো আমি জানতাম না! এসব কেমন করে হ'ল, কি হ'ল, আমিও শুনতে চাই।"

জ্বালাপ্রসাদ এই প্রসঙ্গটি এড়াবার চেষ্টা করলেন, "বিশেষ কিছুই

নয়, আমার মনে ছিলনা, অতি সাধারণ কথা। আপনাকে পরে বলবো।"

কিন্তু গজরাজ সিংহ জ্বালাপ্রসাদের গুণগান করতে চাইছিলেন, অন্ততঃ রাজা চন্দ্রভূষণের সামনে। যাতে তাঁর মনের ভুল ধারণাটা দূর হয়ে যায়। জ্বালাপ্রসাদের স্বরে যে লজ্জা, সঙ্কোচ ছিল, তা তিনি বুঝতে পারলেন না, "মীর সাহেব, আমি জ্বালাবাবুকে বলেছিলাম জমিদার গিন্নী তো ওঁকে খুব খাতির করেন, সেজন্যে তাঁকে দিয়ে জমির দলিল বরজোর সিংহের ছেলেদের নামে লিখিয়ে দিতে। এর জন্যে জ্বালাবাবু বরজোর সিংহের স্ত্রীকে একশ'টি মোহর দিলেন, তা দিয়ে বরজোরের জমি বন্ধকীর দেনা মিটিয়ে দেওয়া হ'ল। নায়েব সাহেব জমিদার গিন্নী জয়দেইকে জমি ছেড়ে দেবার জন্যে রাজী করালেন। রাজা সাহেব এ সব ব্যাপারের কিছুই জানতেন না, সেইজন্যেই তাঁর ভুল ধারণা হয়েছিল। রাজা সাহেব, ঠিক্ তো?"

সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে গজরাজ সিংহের কথায় মুগ্ধ হলেন। ঠাকুর গজরাজ সিংহ একটি বড়ো গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলেন। প্রত্যেকের কাছে জ্বালাপ্রসাদের সম্মান খুব বেড়ে গেল।

কিন্তু মীর সাহেব মৌন হয়ে বসেছিলেন। তাঁর মুখে না ছিল আনন্দ, না ছিল বিষাদ। মনে হচ্ছিল, তিনি যেন অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন। যে সব কথাবার্তা চলছিল তাতে যেন তাঁর কোন রুচিই ছিল না। গজরাজ সিংহ তাঁর ঔদাসীন্য দূর করবার চেষ্টায় বললেন, "তসিলদার সাহেব, প্রজারা নায়েবের ওপর যা খুশী, তা আর বলার নয়। এত অল্প বয়সে ছোট-বড়, সকলের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। সেজন্যে প্রত্যেকেই নায়েব সাহেবের প্রশংসা করে।"

এবার মীর সাহেবকে বলতেই হ'ল, "আনন্দের কথা, আপনারা সকলে নায়েব সাহেবকে এতো স্নেহ করেন। আরো আনন্দের বিষয়, তিনি ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু। তবে আমি মনে করি যে

জ্বালাবাবু এখনও ছেলেমানুষ, সংসারের অভিজ্ঞতা তাঁর কম। তবে এটা কোন দোষের নয়। জীবনে অভিজ্ঞতা বেড়েই চ'লে। ফলে ক্রমশঃ তার গুণগুলিও বিকশিত হয়ে উঠবে।"

মীর সাহেবের কথায় সকলেই বিস্মিত আর অবাক্ হলেন।

ভোজের পরে বাড়ি ফেরার সময় মীর সাহেব জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "বাবা আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দাও, তোমার সঙ্গে দু-একটা কথাও আছে।"

জ্বালাপ্রসাদের মন একটু ভারি হ'ল। মীর সাহেবের কথা অন্যে না বুঝুক জ্বালা ভালো মতেই বুঝে নিয়েছিলেন। যে বিষয়ে তিনি ভীত, কথাগুলোর মধ্যে তারই যেন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। শঙ্কিত মনে তিনি মীর সাহেবকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলেন।

মীর সাহেব সারা রাস্তা চুপ করেই ছিলেন। বাড়ি পৌঁছে তিনি জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "বাবা, ক্ষমা করো। রাত অনেক হয়েছে, তবে কথা বিশেষ জরুরী। সেইজন্যে তোমাকে সঙ্গে করে এনেছি। তুমি জান না, সে কথাগুলো তোমাকে এখন না বললে সারা রাত আমি ঘুমোতে পারব না।"

জ্বালাপ্রসাদের ভয়ে বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল, "হুজুর, সব কুশল তো?"

মীর সাহেব মুচকি হাসলেন, "আমার তো কুশলই। তবে আমার চিন্তা তোমার জন্যে। তোমার কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে তোমাকে এনেছি।" বলে মীর সাহেব চুপ করলেন।

জ্বালাপ্রসাদের শঙ্কা এবার সত্যিকার ভয়ে পরিণত হ'ল। তিনি মাথা নীচু করে চুপচাপ মীর সাহেবের প্রশ্নের প্রতীক্ষা করছিলেন। প্রশ্নগুলো কি যে হবে তা তিনি জানতেন।

মীর সাহেব কিছুক্ষণ ভাবলেন। যেন বুঝতে পারছিলেন না কি ভাবে সওয়াল আরম্ভ করবেন, আর কথাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আচ্ছা বাবা, বরজোরের বিরুদ্ধে তুমি বয়ান দেবার ফলে তাঁর আত্মহত্যার পর

তার স্ত্রীকে তুমি একশ'টি মোহর দিলে। তুমি যা করেছ তা দেবদূতের কাজ, মানুষের নয়। তোমার জন্যে তোমার বাবার গর্ব যথার্থই। কিন্তু আমি ভাবছি মানুষ কি সত্যিই দেবদূত হতে পারে। আমি দুনিয়া দেখেছি। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে। তবে কি আমাকে নিজের ধারণার অদল বদল করতে হবে?"

জ্বালাপ্রসাদের কাছে একথার কোনো উত্তর ছিল না, তাই তিনি চুপ করেই রইলেন।

মীর সাহেবও এইটুকু বলে চুপ করলেন। যেন তিনি নিজের প্রশ্নের গুরুত্ব নিজেই অনুভব করে মনে মনেই তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মুখে রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। আর সেই অন্ধকার যেন জ্বালাপ্রসাদের মনের মধ্যে জমাট বাঁধছিল। বাতাসের কাঁপন জ্বালাপ্রসাদের প্রতি রোমে যেন সাড়া জাগাচ্ছিল। সেই ধোঁয়াটে, ঠাণ্ডা, পরিবেশ ভঙ্গ করল মীর সাহেবের স্বর। তিনি বললেন, "বাবা, একশ'টি মোহর খুব বড়ো জিনিষ। এই একশ'টি মোহর তোমার কাছে যে ছিল তাতেই আমার আশ্চর্য লাগছে। তোমার বাবাকে আমি চিনি, সেজন্য তোমাদের বংশ পরম্পরা আমার অল্প-স্বল্প জানা আছে। আমি এও জানি তুমি ঘুষ নাওনা। আর যে ঘুষ নেয়না, সে অপরকে এত বড়ো দয়ার দানও দিতে পারে না।"

জ্বালাপ্রসাদ এখনও চুপ করে থাকতে পারতেন। কারণ মীর সাহেব নিজের দিক্ থেকেই বলছিলেন। তিনি জ্বালাপ্রসাদকে একটিও প্রশ্ন করেননি। কিন্তু জ্বালাপ্রসাদের স্পষ্ট মনে হ'ল, যেন মীর সাহেবের কথা গুলোর মধ্যে সত্য বলার আমন্ত্রণ রয়েছে। জ্বালাপ্রসাদের ভেতরের সত্য যেন বেরিয়ে এলো, "হুজুর ওই মোহরগুলো আমার নয়। জমিদারনী জয়দেই বরজোরের স্ত্রীকে দেবার জন্যে দিয়েছিলেন, যাতে সেই টাকা দিয়ে সে জমির ধার শোধ দিয়ে নিজের জমি ফেরত নেয়।"

মীর সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, "নিজের জমি ফেরত নেয়!

যা ছিনিয়ে নেবার জন্যে প্রভুদয়ালকে প্রাণ দিতে হ'ল! আর বরজোর সিংহ আত্মহত্যা করল! এ জগৎ বিচিত্র বাবা, কোনোদিন বোঝা যাবেনা। জমিদারনী জয়দেই বরজোর সিংহের জমি নিজেই ফেরত দিলেন বুঝি? এতে বোধহয় কোনো রহস্য আছে!" মীর সাহেব জ্বালাপ্রসাদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন. "বাবা, এই রহস্যটি নিজের মধ্যেই রেখ, যেন প্রকাশ না পায়! তোমার স্ত্রী, ছেলেপুলে আছে আর আছে সম্মান প্রতিষ্ঠা। সংসারে এগোবার জন্যে, সফল হবার জন্যেই তো দীর্ঘ জীবন। এ হেন পরিস্থিতিতে তোমাকে রহস্যগুলো সযত্নে সামলাতে হবে।"

মীর সাহেবের প্রত্যেকটি শব্দ জ্বালাপ্রসাদের চেতনার ওপর যেন হাতুড়ির ঘা মারছিল। তাঁর মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি চোখ নামিয়ে বললেন, "হুজুর!"

মীর সাহেব জ্বালাপ্রসাদের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, "না বাবা, আর একটা কথাও নয়। যখন মানুষ অপরাধকে লুকোতে চায়, তখনই সেটা অপরাধ! যখন মানুষের মধ্যে অপরাধকে প্রকাশ করার সাহস আসে, তখন অপরাধ আর অপরাধ থাকেনা। কিন্তু বাবা, এ তো স্বীকার করতেই হবে যে সংসারে মানুষের মধ্যে দুর্বলতা আছে, অপরাধ আছে। মানুষ অপরাধকে অপরাধ মনে করে জাহির করে না, দুর্বলতাকে দুর্বলতা মনে করে লুকোয়, এতে সংসারেরই কল্যাণ। তবে মানুষ অপরাধ না করার আর দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করবে।"

কথা শেষ করে মীর সাহেব খানিক চুপ করে ভাবতে লাগলেন। তাঁর ভিতরকার দ্বন্দ্ব তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল। তারপরে তিনি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন। যেন নিজের মধ্যেই এমন কিছু একটা খুঁজে পেয়েছেন যেটা তাঁর নিজেরই ভালো লাগছিল না, কিন্তু সেটা অনিবার্য। "বাবা, জানিনা কেন তোমার জন্যে আমার হৃদয়ে এতো মমতা জেগেছে। বোধহয় আমার আগে পিছে কেউ নেই বলেই হয় অজান্তে আমি তোমাকে ছেলের মতো

ভালোবেসে ফেলেছি। যখন একবার ছেলের মতো ভালোই বেসেছি, তখন পিতৃকর্তব্য পালনের জন্যে তোমাকে বাঁচাতেই হবে। তুমি সৎ, সরল। তুমি চলে গেলে আমি কষ্ট পাবো। সে সব সহ্য করবো। তোমাকে বাঁচাবার শুধু একটি মাত্র উপায় আছে, সে হ'ল, তোমাকে এখান থেকে বদলী করিয়ে দেওয়া। কমিশনার সাহেব আমাকে খুব ভালো নজরে দেখেন। জেলা এলাহাবাদে সোরাঁওয়ের তসিলদারের আসছে বছর পেন্‌শন হচ্ছে। মনে হয়, যদি তাঁকে চাপ দিই তো কমিশনার সাহেব তোমাকে সেখানকার তসিলদার করে দেবেন। তোমার এতো শীঘ্র পদোন্নতিতে অনেকে আপত্তি করতে পারে। কিন্তু আমি বলেছি, এ আমার সন্তানের ব্যাপার। আমি কমিশনার সাহেবকে বলেকয়ে রাজী করিয়ে নেবোই।"

জ্বালাপ্রসাদ হঠাৎ যেন আবেগ সামলাতে পারলেন না। তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল, ধরা গলায় বললেন, "হুজুর, আমি অপরাধী, কিন্তু আমাকে দূর করে দেবেন না। আমি শপথ করে বলছি, ভবিষ্যতে আমি আপনাকে অভিযোগের কোন স্থযোগ দেবো না।"

মীর সাহেব মৃদু হাসলেন, "বাবা, যখন একবার পা উঠেছে, আর পিছু হটতে পারবে না। সেইজন্যেই তোমার প্রতিজ্ঞা, তোমার শপথের ওপর আমি কোন ভরসা করতে পারি না। তুমি তো জান, যেখানে মমতা আর ন্যায়ের মধ্যে বাছাই করতে হয় সেখানে ন্যায়ই প্রাধান্য পায়। কিন্তু সে ন্যায়কে মমতামিশ্রিত হতে হবে। তুমি তো এখানে থেকে পদোন্নতি করেই যাবে।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "আপনি আমাকে শাস্তি দিন।"

"বাবা, তোমাকে শাস্তিই দিচ্ছি। ঘাটমপুরের তালুকদারীর তুলনায় সোরাঁওএর তসিলদারী হাল্‌কাই হবে!" মীর সাহেব খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলেন।

পরের দিন সকালেই মুন্সী শিউলাল জ্বালাপ্রসাদের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। জ্বালাপ্রসাদ একটু চিন্তিত, আর গম্ভীর ছিলেন।

রাতে তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। শিউলাল গজরাজ সিংহের নেমন্তন্নে ছেলের কাজের সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু অপরকে একশ' মোহর দান দেওয়ার মতো ভুল তাঁর ছেলে করবে, এ তাঁর কাছে অসহ্য। তিনি এতদিন ছেলেকে সৎ, চরিত্রবান মনে করতেন। জ্বালাপ্রসাদ নিজের কাছ থেকে একশ' মোহর বরজোর সিংহের স্ত্রীকে দিয়েছে জেনে শিউলালের মনে সন্দেহ জাগল। দু'মাস আগে জ্বালাপ্রসাদের কাছ থেকে আড়াইশ' টাকা রাধেলালের জমি কেনার জন্যে তিনি চেয়েছিলেন। তখন জ্বালাপ্রসাদ নিজের আয়ব্যয়ের হিসেব দেখিয়ে টাকা না দিতে পারার কৈফিয়ৎ দিয়েছিল। গত রাতে একশ' মোহরের কথা জানতে পেরে তাঁর খুব মনে লেগেছিল। তাঁর ছেলে, যাকে তিনি ভালো-মানুষ, সাদা-সিধে বলে জানতেন, সেই কিনা তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

বাবার মুখের চেহারা দেখে জ্বালাপ্রসাদ ঘাবড়ে গেলেন। শিউলাল বসে পরে বললেন, "কাল রাতে জেনে আশ্চর্য হলাম, তুমি কিনা একশ' মোহর বরজোর সিংহের স্ত্রীকে দিয়েছ। রাধে জমি কিনতে চাইলে, সে মাত্র আড়াইশ' টাকার ব্যাপার। কিন্তু তুমি সোজা না করে দিয়েছিলে।"

জ্বালাপ্রসাদ কম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে সে টাকা আমার নয়। বাড়ির হিসেব তো আপনিই রাখেন। মাইনের পুরো টাকা তো আমি আপনার হাতেই দিয়ে দিই।"

মুন্সী শিউলাল আরও গম্ভীর হয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, মাইনের টাকা তুমি পুরো আমাকে দাও ঠিকই, তবে তোমার উপরি-আয় যায় কোথায়? আমি এতদিন মনে করতাম উপরি-আয় তোমার নেই। কিন্তু দেখছি, আমার সে ধারণা ভুল। সেটা জানতে পারলাম আজ।"

জ্বালাপ্রসাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, "আমি আপনাকে সত্যি বলছি, আমার উপরি-আয় কিছু নেই। একশ' মোহর আমার ছিল

না। আমি শপথ করে বলছি, কানাকড়ি ঘুষ নেওয়াকে আমি পাপ বলে মনে করি।"

মুন্সী শিউলাল সমস্যায় পড়লেন। মুহূর্তের জন্যে যেন কি ভাবলেন, তারপরে কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "যখন সবাই মনে করছে টাকা তুমি দিয়েছ, তাহলে সে টাকা কার? এই কলিকালে এমন দরদী মহাপুরুষ কে, একটু তার নামটা শুনি!"

জ্বালাপ্রসাদকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিতে হ'ল, "কাউকে বলবেন না যেন, আপনি বাধ্য করছেন সেজন্যেই বলছি। সে টাকা জমিদারনী জয়দেই বরজোর সিংহের স্ত্রীকে দিয়েছিলেন, যাতে সে ধার শোধ করে নিজের জমি ফেরত নিতে পারে।"

মুন্সী শিউলালের মুখের ওপর যে আঁধার ঘনিয়ে এসেছিল, তা হঠাৎ সরে গেল। তাঁর চোখ দু'টি খুশীতে জ্বলজ্বল করে উঠল, "ও, এবারে বুঝেছি। আমি তো জমিদার গিন্নী জয়দেইর কথা ভাবিই নি। আর যদি মনে করি জামিদার গিন্নী জয়দেই তোমার কথাতেই বরজোর সিংহের স্ত্রীকে টাকা দিয়েছেন তাহলে বোধহয় ভুল হবে না।"

জ্বালাপ্রসাদকে আবার সত্যি বলতে হ'ল, "আজ্ঞে দুনিয়াদারীর ব্যাপারে আপনি ভুল বুঝতে পারেন না।"

আসল ব্যাপারটি জেনে মুন্সী শিউলালের মুখের ভাব পাল্টে গেল। তিনি মৃদু হেসে বললেন, "বাবা জ্বালা, তোমার বরাত খুলেছে। খুব মোটা শিকার ফাঁদে পড়েছে। এবার ভবিষ্যতের জন্যে শপথ করো, এভাবে অন্যকে টাকা দেওয়াবে না। নিজের জন্যে জমিজায়গা কেনো, টাকাবাড়ি করো। জমিদার-গিন্নী জয়দেইয়ের কাছে ক্যাশ আর গয়নাটয়না নিয়ে লক্ষ কোটি টাকার মতো যক দেওয়া আছে।"

জ্বালাপ্রসাদ বাবার কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠেছিল—নিজের ওপর, বাবার ওপর, সারা জগতের ওপর।

আট

ত্রিবেণী স্নান সেরে যখন মুন্সী শিউলাল নিজের চালাঘরে ফিরলেন, তখন বড় বেশী ক্লান্ত বোধ করছিলেন। ছিনকি রান্নাঘর নিকিয়ে, উনুন ধরিয়ে, খিচুড়ি চাপিয়ে দিলো।

মুন্সী শিউলাল এলাহাবাদে ত্রিবেণী তীরে কৃচ্ছ্রসাধন করছিলেন। সোরাঁও আসা থেকে তিনি প্রতি বৎসর মাঘ-মেলাতে কৃচ্ছ্রসাধন করতে আসতেন। সেখানে তিনি সব রকম সুবিধে ভোগ করতেন। তাঁর চালাঘরটি সঙ্গম থেকে প্রায় এক ফার্লং দূরে। সেটি খুব যত্ন করে তৈরী করানো হয়েছিল,—ঝড় জল ঢুকতে পারতো না। ঘরটি বেশ বড়সড়ই করা হয়েছিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ছিনকি স্নান সেরে ফিরে এসে দেখলে, মুন্সী শিউলাল লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন, উনুন প্রায় নিভে এসেছে। সে মুন্সী শিউলালের মাথার কাছে এসে বললে, "কি গো, শরীর ভালো তো? উনুন তো নিভে গেছে। খিচুড়ি কি ফোটেওনি। গড়িমসি করলে তো আর চলবেনা। ওঠ, উনুন জ্বালাও গিয়ে। খিচুড়ি ঠেসে আবার দিব্যি সটান লম্বা হবে।"

মুন্সী শিউলাল লেপের ভেতর থেকেই বললেন, "তুই উনুন ধরিয়ে দে। খিচুড়ি হয়ে গেলে ডাকিস্। নামিয়ে খেয়ে নেবো। উঠতে ইচ্ছে করছে না।"

"ছিঃ ছিঃ, আমি হেঁসেলে ঢুকবো কি করে গো? তুমি যে কৃচ্ছ্রসাধন করছ। ধর্ম-কর্ম ঠিক্ রাখো। আমি হেঁসেলে ঢুকলে হেসেল যে ছুঁতো হয়ে যাবে।"

"হতে দে। রাঁধতে রাঁধতে আমি যে নাজেহাল হয়ে গেলাম। রাধের বৌ কিংবা কোন বউমা আসতো, তাও তো আর হল না। শোন্, খিচুড়ি থালায় বেড়ে দিয়ে আমাকে ডাকবি। এখন একেবারেই উঠতে ইচ্ছে করছে না। আজ হঠাৎ যেন শীতটাও বেড়েছে।"

মুন্সী শিউলালের কথা শুনে ছিনকি একেবারে হতভম্ব, "এ তুমি বলছ কি? তুমি আমার হাতের রান্না খিচুড়ি খাবে কি করে? রাতে তো তোমার জন্যে লুচি তরকারি করে দিই, দুপুরে তুমি নিজে ভাত রেঁধে নাও। যদি এখন রাঁধতে মন না যায় তো দুধ খেয়ে থাক। বেলা করে রেঁধে নিও।"

মুন্সী শিউলাল কড়া স্বরে বললেন, "না, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে আর আমি তোর রাঁধা ভাতই খাবো। আমি বলছি, তুই খিচুড়ি রেঁধে দে।"

ছিনকির চোখে জল এলো, "তোমার পায়ে ধরছি, আমাকে দিয়ে এ পাপ কাজ আর করিও না—আমি ভাতের হেঁসেলে ঢুকতে পারবো না। আমার হাতে তোমার পরকাল ঝরঝরে করবো না।"

মুন্সী শিউলালের ভীষণ রাগ হল। তিনি উঠে ছিনকিকে এক চড় কষিয়ে দিলেন, "পরকালের বড়ো জ্ঞান দিতে এসেছেন। আমি বলছি, যা খিচুড়ি রাঁধ্।" মুন্সী শিউলাল আবার লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ছিনকি চুপচাপ কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সে উনুন ধরাতে লাগল। উনুনে ফুঁ দিচ্ছে আর বিড়বিড় করছে, "হে মা গঙ্গে! তুমি সাক্ষী রইলে। আমি এনার ধর্ম নষ্ট করিনি। এঁর ভীমরতি ধরেছে, এঁর পাপ ক্ষমা করো। রেঁধে খাওয়ালে এঁর ধর্ম নষ্ট হবে আর না রাঁধলে খিদেয় ছট্‌ফট্ করবে আর আমাকে মারবে।"

রান্না শেষ করে ছিনকি বললে, "এস, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, খিচুড়ি হয়ে গেছে। তোমাকে দুপুরে যে ডেপুটি সাহেবের তাঁবুতে যেতে হবে।"

মুন্সী শিউলাল উঠে পাঞ্জাবি ফতুয়া খুললেন। তারপর শাল মুড়ি দিয়ে পিঁড়ের ওপর বসলেন, "দে, দে, তাড়াতাড়ি বেড়ে দে। ডেপুটি সাহেবের কাছে যাবার কথা তো স্রেফ ভুলেই গিয়েছিলাম।"

ছিনকি খাবার বাড়ামাত্রই মুন্সী শিউলাল খেতে শুরু করে দিলেন। "এতদিন বাদে আজ খিচুড়ির স্বাদ সত্যিই পেলাম। রান্না করতে যখন জানিনা তখন আর কি রাঁধব! আচ্ছা, আর এক হাতা খিচুড়ি আর একটু আলুভাতে দে। খুব চমৎকার হয়েছে।"

ছিনকি হাতা করে যেই খিচুড়ি নিয়ে মুন্সী শিউলালের পাতে দিতে যাচ্ছে অমনি মুন্সী রাধেলাল ঘরে প্রবেশ করলেন। রাধেলাল একলা আসেননি, তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন।

রাধেলাল আর তাঁর স্ত্রীকে দেখেই ছিনকি অপরাধিনীর মতো হেঁসেল থেকে বেরিয়ে এলো। মুন্সী শিউলাল বললেন, "এসো রাধে এস, ভালো করেছ ছোট বৌকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ। আমার খাওয়া দাওয়ার বড়ো অসুবিধে হচ্ছিল। বাড়ির খবর সব ভালো তো?"

রাধেলাল উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক্‌ই আছে। কি আর বলব, কিষণুর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা। লোকেরা তাকে কাশীতে সাধুদের দলে দেখেছিল, কিন্তু এখন সেখান থেকেও সে নিখোঁজ হয়েছে। এদিকে ওর বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে, আর সে-ই নিখোঁজ! জ্বালাকে অনেক করে বললাম খোঁজখবর করতে, কিন্তু তার তো সময়ই নেই।"

মুন্সী শিউলাল খেয়ে উঠে হাতমুখ ধুচ্ছিলেন, বললেন, "হ্যাঁ, বিয়ে তো ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোনো তাহলে ওর বিয়ে এখন দিওনা। পরের বাড়ির মেয়েকে বাড়িতে এনে বসিয়ে রাখবে আর এখনও পর্যন্ত কিষণুর কোন পাত্তাই নেই। ওটাতো একেবারে বখাটে হয়ে গেছে।"

নিজের ছেলের নিন্দে মুন্সী রাধেলালের স্ত্রীর ভালো লাগল না। ছলছল চোখে দূর থেকেই তিনি বললেন, "আমার কিষণুর অবুঝ, তাকে কেউ ফুঁ মন্তর দিলে সে তার কথাতেই ওঠে বসে। বিয়ের পরে সব ঠিক্ হয়ে যাবে। বঠ্‌ঠাকুর, জ্বালা বড়ো অফিসার,

ইচ্ছে করলে একদিনেই কিষণুর খোঁজ পেতে পারে। জ্বালা আমাদের কথা আর মোটেই শোনে না। নিজের ভাইয়ের প্রতি তার এই অবহেলা কি ঠিক্?"

জ্বালার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিনকির বিশ্রী লাগলো, "জ্বালা বেচারা সবই তো করছে, এবার অলিগলিতে কিষণুকে খুঁজে বেড়াবে না কি। এটাও এখন অবশ্য বাকি রয়ে গেছে! বলো তো তসিলদারি করুক, আর নয় তো সারা দেশময় কিষণুকেই খুঁজে বেড়াক!"

রাধেলালের স্ত্রী গর্জে উঠলেন, ছিনকি, তুই চুপ কর্। জ্বালার হয়ে বড়ো যে বলতে এসেছিস।"

মুন্সী শিউলালও চাপা গলায় বললেন, "তুই সব তাতে নাক গলাস কেন বল তো!" তারপর রাধেলালের দিকে ফিরে বললে, "রাধে, তোমাদের বোধহয় এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি। ছিনকি যা, দোকান থেকে এক সের লুচি মিষ্টি নিয়ে আয়।"

ছিনকি মুন্সী শিউলালের এঁটো বাসন তুলতে তুলতে বললে, "আমি এক্ষুনি হেঁসেল ঠিক্ করে দিচ্ছি ততক্ষণে ছোট গিন্নী গঙ্গা চান করে আসুন। তারপর এসে রান্না চড়াবেন। বাজারের লুচি মিষ্টিতে কি আর পেট ভরে।"

রাধেলাল বললেন, "না রান্নাঘর ঠিক করবার দরকার নেই। আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন এই অবেলায় স্নানেরও আর সময় নেই। তুই লুচি মিষ্টিই নিয়ে আয় গিয়ে।"

"তাহলে আমিই না হয় লুচি তরকারি করে দিচ্ছি।" ছিনকি আর একবার চেষ্টা করে দেখলে।

এবার রাধেলালের স্ত্রী উত্তর দিলের, "হ্যাঁ, ছিনকি রানী, একবার রান্নাঘরে পা বাড়িয়েছ কি-না। বঠ্ ঠাকুরের ধর্ম তো নষ্ট করলেই নিজের রাঁধা ভাত খাইয়ে; এবার আমাদের পালা। উনি আমাকে মিছিমিছি আনলেন। এখানে তো ছিনকী রানী বঠ্ ঠাকুরকে রুটি তৈরী ক'রে খাওয়াচ্ছেন!"

রাধেলাল বললেন, "হ্যাঁ রে ছিনকি, দাদা না হয় বুড়ো বয়সে সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন, জাত-কুজাতেরও কোনো বিচার নেই। কিন্তু তুই কোন্ আক্কেলে তাঁকে নিজের হাতে রাঁধা ভাত খাওয়ালি!"

ছিনকি করুণ দৃষ্টিতে মুন্সী শিউলালের দিকে তাকালো। মুন্সী শিউলাল বললেন, "রোজ আমি নিজেই রাঁধি। আজও ও সব রান্নার জোগাড় করে দিয়েছিল। কিন্তু কি বলব, গঙ্গা স্নান করে ফেরার পরে এমন আলস্য চাপলো যে, আমি ওকেই বেঁধে দিতে বললাম।" তারপর একটু থেমে বললেন, "আমি মনে করি আমাকে বেঁধে দিয়েছে বলে ও কোনো পাপ কর্ম করেনি, আর আমিও ওর হাতের রান্না খেয়ে কোনো পাপ করিনি।"

রাধেলাল একটু ইতস্তত করে বললেন, "আজ্ঞে, তা তো ঠিক্ই, তবে আত্মীয়স্বজনেরা তো একে পাপই মনে করবেন। যাক্‌গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে: এখন ছোট বৌ তো এসেছে, ও রান্না করবে। কিন্তু, আপনি যে ছিনকির রান্না ভাত খেয়েছেন সে কথা যেন কারো কানে না যায়।"

ছিনকি অপরাধিনীর মতো রাধেলাল আর তাঁর স্ত্রীর জন্যে লুচি মিষ্টি আনতে চলে গেল। আর মুন্সী শিউলাল কাপড় ছেড়ে একঘণ্টা আগেই ডেপুটি সাহেবের তাঁবুর দিকে রওনা হলেন।

ডেপুটি কালেক্টার ঠাকুর থম্মন সিংহ মেলা ঘুরে এসে আরাম-চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে শিউলালকে স্বাগত জানালেন, "আসুন মুন্সী শিউলাল সাহেব। বোধহয় আজ আপনি বিশ্রামও করেননি। এখনও মিটিংয়ের প্রায় ঘণ্টা খানেক দেরি।"

মুন্সী শিউলাল ক্লান্ত পদে সামনের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন, "কি আর বলব, ছোট ভায়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও হঠাৎ এসেছেন, সেইজন্যেই আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম। তাঁরা বিশেষ সমস্যায় পড়েছেন। বেশ কিছুদিন হ'ল আমার ছোট ভাইপোটি

বাড়ি থেমে পালিয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে, সে নাকি সাধু হয়ে গেছে। তাকে কাশীতে সাধুদের একটি দলে দেখা গিয়েছিল কিন্তু আবার তাঁদের মধ্যে থেকেও সে নিখোঁজ হয়েছে। সম্ভবতঃ মাঘ মেলায় এসে থাকবে। সেজন্যেই তার খোঁজে ওঁরা এসেছেন।"

ঠাকুর থম্মন সিংহ মনে মনে কিছুক্ষণ যেন ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তার বয়স কত হবে? তার আকৃতির বিবরণ দিতে পারবেন কি?"

"বয়স প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ। গড়ন ছিপছিপে, মাঝারির চেয়ে একটু লম্বা। রং উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ, মুখ লম্বাটে আর কপালে কাটার দাগ।"

"আকৃতি তো মিলছে।" ঠাকুর থম্মন সিংহ চাপা সুরে যেন আপন মনেই বলে উঠলেন।

"ঠাকুর সাহেব তার আকৃতির কথা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?"

"আজ সকালে মেলায় ওই রকম একজন যুবক সাধুকে মেয়েদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করার অপরাধে ধরা হয়েছে। পরে জানতে পারা গেছে, সে এখানে করীমনের কাছে ছিল। তাকে হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজের নাম ঠিকানা বলছে না কিছুতেই। এক্ষুনি এই মিটিংয়ে দারোগা বিষণদয়াল আসবেন। তাঁর কাছ থেকে সঠিক খবর পাওয়া যাবে। বদমাস বখাটে ধরনের সাধুটা।"

মুন্সী শিউলাল করীমনের নাম শোনামাত্র শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তারপর যেন নিজেরই শঙ্কা দূর করার জন্যে বললেন, "সে কিষণু হতে পারে না। সে করীমনের কাছে কি করে থাকতে পারে! উপরন্তু, তার বদ-খেয়ালের নালিশও কোনো দিন কেউ করেনি।"

ঠাকুর থম্মন সিংহ হাসলেন, "এসব কথা ছেড়ে দিন মশাই! আজকালকার ছেলে-ছোকরারা না-করতে পারে এমন কিছুই নেই। মিটিংয়ের পর দারোগা বিষণদয়ালকে বলে তাকে এখানেই ডেকে পাঠাবো। আপনি নিজেই তাকে দেখে সনাক্ত করে নেবেন।"

যখন দারোগা বিষণলাল সাধুটিকে ঠাকুর থম্মন সিংহের তাঁবুতে আনালেন তখন মুন্সী রাধেলালকেও ডেকে আনা হয়েছিল। সাধুকে দেখামাত্র রাধেলাল বলে উঠলেন, "ওরে কিষণু, একি দশা হয়েছেরে তোর! আমাদের নাক কেটে ছাড়লি যে!"

কিষণলাল পিতাকে দেখে কেঁদে ফেললে, "আমাকে বাঁচাও বাপ্পা! এরা আমাকে প্রাণে মেরে ছাড়বে! আমাকে বাঁচাও!" সে টলমলিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কিষণলালের সারা দেহ ফুলে উঠেছিল, যেখানে সেখানের চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত ঝরছিল। মনে হচ্ছিল তাকে বেদম প্রহার করা হয়েছে এবং আরো কিছু বোধহয় এখনও বাকি। মুন্সী শিউলাল দারোগা বিষণদয়ালকে জিজ্ঞেস করলেন, "দারোগা সাহেব, একে এতো গুরুতর মারা হয়েছে কেন?"

"আজ্ঞে, এই মারের জন্যেই তো জানতে পারা গেল যে ও করীমনের কাছে এক সপ্তাহ ধরে রয়েছে। কিন্তু এর বেশী কিছুতেই বলছে না। নিজের নাম, বাবার ঠিকানা কিছুতেই বলছে না। তাই পেট থেকে কথা বের করানোর চেষ্টা হচ্ছিল আর করীমন যা বলেছে সেটাও একে দিয়ে প্রমাণ করাতে হবে তো। ভদ্রলোকের ব্যাপার!" দারোগা বিষণলাল মুখ টিপে হাসলেন।

ঠাকুর থম্মন সিংহ হাসতে হাসতে বললেন, "যাক্, নাম ঠিকানা তো পাওয়া গেল আর সকালে যা রসিকতা করেছিলেন তার জন্যে শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েছেন। মুন্সী শিউলাল সাহেব, নিয়ে যান, এখন একে সামলান আর কোনো কাজে লাগিয়ে দিন!" এই বলে ঠাকুর থম্মন সিংহ কিষণলালের হাতের বেড়ি খুলিয়ে দিলেন।

মুন্সী শিউলাল কুটীরে ফিরে বাইরে থেকে ভিতরের চেঁচামেচি শুনতে পেলেন। রাধেলালের স্ত্রী আর ছিনকির মধ্যে বচসা হচ্ছিল। রাধেলালের স্ত্রী ছিনকিকে ফতেপুরে পাঠাতে চাইছিলেন। আর নিজের অনুপস্থিতিতে বাড়ি দেখাশোনার ভার ছিনকির উপর ছেড়ে দিতে চাইছিলেন। তবে ছিনকি এ প্রস্তাবে রাজী হচ্ছিল

না কিছুতেই। সে জ্বালাপ্রসাদের স্ত্রী যমুনা আর পুত্র গঙ্গাপ্রসাদের সেবা যত্নের জন্যে সোরাঁও যেতে চাইছিল। রাধেলালের স্ত্রীর মেজাজ খুব চড়া হয়েছিল। মুন্সী শিউলাল ঘরের বাইরে থেকেই রাধেলালের স্ত্রীর কর্কশ স্বর শুনতে পেলেন, "হ্যাঁ, বঠ্ ঠাকুরের তো ধর্ম-কর্ম নষ্ট করে বসে আছ, এখন আমার মুখের ওপর চোপা করছ! জ্বালা তোমার আপন, বঠ্ ঠাকুর তোমার আপন, সামলাও তোমার আপন জনদের, আমি আজিই চলে যাব! নিজের রাজ পাট সামলাও! যদি তুমি ফতেপুরে যাও, তবেই আমি থাকবো! উনি এলে, আজ আমি বঠ্ ঠাকুর আর ওনাকে বসিয়ে এর বিচার করাবো। তুমি কিসের দেমাকে ভুলে আছ?"

রাধেলালের স্ত্রীর কর্কশ স্বরে মুন্সী শিউলাল থতমত খেয়ে গেলেন। মুন্সী শিউলালের পরিবার রাধেলালের স্ত্রীর শাসনে চলতো আর মুন্সী শিউলালও সেই শাসনেই অভ্যস্ত। তাঁর আর ঘরেরভেতরে ঢোকার সাহসে কুলালো না। তিনি বাইরে থেকেই ফিরে গেলেন।

অনাবশ্যক ভাবে তিনি মেলায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনটা বড়ো ভারি হয়ে উঠল, যেন তাঁর প্রাণে কেউ আঘাতের ওপর আঘাত হানছে। মনে হ'ল, তাঁর সামনে থেকে যেন জগতের রূপটাই পাল্টে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জোরে বাতাস বইছে। উত্তর দিক্ থেকে খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ পরিবেশটা যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। মুন্সী শিউলাল অকারণে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন। মাঘমেলার ভিড় দ্রুত বেড়ে চলেছিল। তৃতীয় দিন মকর সংক্রান্তির পর্ব। যখন অসহ্য ঠাণ্ডায় পা আর চলছে না, তখন অনিচ্ছাসত্বেও তিনি নিজের কুটীরে ফিরে এলেন।

এখন ঘরের মধ্যে বেশ হৈ-চৈ হচ্ছিল। ঝগড়া থেমে গেছে। ছিনকি রান্নার ব্যবস্থায় লেগে গেছে। মুন্সী শিউলাল কারো সঙ্গে কথা-বার্তা না বলে চুপচাপ নিজের খাটে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে

পড়লেন। মুন্সী রাধেলাল, তার স্ত্রী, কিষণলাল আর ছিনকির মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। মুন্সী শিউলালের মনে হ'ল যেন অনেক দূর থেকে কলরব এসে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে তিনি চম্‌কে চম্‌কে উঠছিলেন। কথাবার্তা হচ্ছিল, কিন্তু তিনি যেন কিছুই তেঝবু পারছিলেন না ; আর তাতে তাঁর কোনো রুচিও ছিলনা। কথাবার্তা চলছিল কারণ কথা বলাই হল জীবন আর জেগে থাকার ইঙ্গিত। ঘুমে মুন্সী শিউলালের চোখ জড়িয়ে আসছিল—সে ঘুম নৈষ্কর্ম আর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। তার ওপর ঐ কথাগুলো যেন ঝটকার ওপর ঝটকা মারছিল। সহসা তাঁর মনে হ'ল, কে যেন তাঁর দেহটাকে ধরে জোরে নাড়া দিচ্ছে। তিনি চোখ মেললেন, শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিনকি বলছিল, "আরে ওঠো না, আর কত ঘুমোবে! দেখ, জ্বালা এসেছে। আমার রান্না হয়ে গেছে।"

জ্বালার নাম শুনেই মুন্সী শিউলাল ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন।

শিউলাল দেখলেন, তাঁর কুঁড়ে ঘরে লোক গিস্‌গিস্ করছে। মেঝেতে শতরঞ্চির ওপর তোষক পাতা। শতরঞ্চির ওপর যে অচেনা মহিলারা বসেছিলেন, তাঁদের তিনি কোনোদিন দেখেন নি।

জ্বালাপ্রসাদ এগিয়ে এসে মুন্সী শিউলালকে প্রণাম করলেন, "বাপ্পা, ইনি হলেন ঘাটমপুরের জমিদার-গিন্নী আর ইনি লক্ষ্মীচন্দের স্ত্রী মাঘমেলায় সঙ্গম স্নানে এসেছেন। আমি লক্ষ্মীচন্দের উত্তরে লিখেছিলাম, "এখানে আপনার বেশ বড়ো পর্ণ কুটীর, এসে উঠলে কোনোই কষ্ট হবে না।' আজ সন্ধ্যের গাড়ীতেই এঁরা কানপুর থেকে এলেন। আমি সোরাঁও থেকে সোজা এলাহাবাদ ষ্টেশনে এঁদের আনতে গিয়েছিলাম। ষ্টেশন থেকে এঁদের এখানেই নিয়ে এসেছি।"

"ভালো করেছ," শিউলাল বললেন। তারপরে কুটীরের এক কোণে তাকালেন, সেখানে মুন্সী রাধেলাল, তাঁর স্ত্রী আর কিষণলাল বসেছিল। রাধে আর ছোট বৌ দুপুরেই এসেছিল। বিকেলে

কিষণুকেও পাওয়া গেল। "এখানে সবাই যে একত্র হয়েছেন, সে সব ভগবানেরই দয়া," বলে শিউলাল জ্বালাপ্রসাদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

জ্বালাপ্রসাদ যেন সেই দৃষ্টির সঙ্কেত বুঝতে পেরে বললেন, "আমাকে আজ এক্ষুনি সোরাঁওতে ফিরে যেতে হবে। আবার পরশু সবাইকে নিয়ে গঙ্গা স্নানে আসবো। আমি কিষণু আর কাকাবাবুকে আমার সঙ্গে সোরাঁও নিয়ে যাচ্ছি, সেখানেই এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা হবে।"

মুন্সী শিউলালের মনটা যেন হাল্কা হয়ে গেল, "সেই ভালো আর বাবা কিষণুরও একটা হিল্লে করে দিও।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমি আর কাকা মিলে একটা না একটা উপায় বের করবার চেষ্টা করবো।"

শিউলালের মন আরো হাল্কা হয়ে গেল।

জ্বালাপ্রসাদ আবার বললেন, "কাল বোধহয় লক্ষ্মীচন্দ আসবে। সে এখানে কাঠের ঠিকে নিয়েছে। একটা করাত মেশিন বসাবে কাঠের আসবাবপত্রের কারখানা খুলবে। কানপুরে অনেক কাজ ছড়িয়ে ফেলেছে। কাপড়ের কাজ ছাড়া সে অন্য কাজও করতে চায়।"

মুন্সী শিউলাল আশ্চর্য হয়ে জ্বালাপ্রসাদের দিকে দেখলেন "জ্বালা, তার এই ছুতোরের ব্যবসার খেয়াল হ'ল কেন রে? এতে না আছে মান, না আছে প্রতিষ্ঠা। যদি কাজ বাড়াতেই চায় তাহলে এখানে কাপড়ের আড়তের পত্তন করছে না কেন?"

একটু ঘোমটা সরিয়ে জয়দেই বললেন, "আমিও সে কথাই বলেছিলাম বাপ্পা। বংশ মর্যাদার দিকেও তো খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু ঠাকুরপো কোথায় তাকে বারণ করবেন, বোঝাবেন তা না উল্টে তার গরিমাই গাইলেন। ভগবানের দয়ায় ঘাটমপুরে নিজের খাস এলাকা রয়েছে। সেখানে থাকবে, রাজপাট করবে সে সব গেল, লক্ষ্মী দেশে-বিদেশে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে

নাগপুরে গিয়েছিল আবার ওখান থেকে এলাহাবাদে এসেছে। এখন কাঠের কারখানার খেয়াল মাথায় চেপেছে।"

জ্বালাপ্রসাদ হাসলেন "বাপ্পা, এ হ'ল নতুন যুগ! এখন নিজেকে তো আর ছুতোরগিরি করতে হবে না! সে তো খুলবে কাঠের কারখানা। হাজার হাজার ছুতোর মিস্ত্রী সেখানে কাজ করবে। সুন্দর নতুন হাল ফ্যাশানের সব জিনিষ তৈরী হবে।' লক্ষ কোটি টাকার মতো কাজ হতে পারে। নতুন কালের হবে নতুন রূপ!"

এ নতুন যুগের, নতুন রূপ কি হবে! মুন্সী শিউলাল তা বুঝতে পারলেন না। তবুও তাঁর ছেলে যখন বলছে যে নতুন যুগের মানুষ সেইজন্যে এ কথা কখনো ভুল হতেই পারে না! মুন্সী শিউলাল বললেন, "হ্যাঁ, এলাহাবাদ বড়ো শহর। আমাদের এই প্রদেশের রাজধানী। ছোট লাট সাহেব এখানে থাকেন। এখানে ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা আছে।"

এই কথাবার্তার মধ্যে মুন্সী রাধেলাল কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন যেন তিনিও কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চান। তিনি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, কারবারে টাকা আছে, ব্যবসাতে টাকা আছে। কিন্তু যদি এ ব্যবসা বাণিজ্যকে ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচান যায় তবেই! এলাহাবাদের যত সরকারী কেনাকাটা সব বড়ো বড়ো দোকানে আর সেগুলি ইংরেজদের। তাহলে জ্বালা, লক্ষ্মীচন্দকে ইংরেজদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, এঠা মনে রেখো। আর ইংরেজদের সঙ্গে মোকাবিলা করা হাসি ঠাট্টা নয়। আমি ভুল বলেছি কি জ্বালা?"

জ্বালাপ্রসাদ হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। মুন্সী রাধেলাল যা বললেন সেটা সত্যিই, বাস্তব সমস্যা। জ্বালাপ্রসাদ এদিকটা তো ভেবে দেখেননি। জ্বালাপ্রসাদ খানিক ভেবে বললেন, "হ্যাঁ, কল কারখানা তো সব ইংরেজদের হাতেই; সেজন্যে কাঠের কারখানা চালান মুশকিল হতে পারে। আমি লক্ষ্মীচন্দের সঙ্গে

এ বিষয়ে আলোচনা করবো। এদিক্টা আমি কোনোদিন তো ভাবিনি। কিন্তু লক্ষ্মীচন্দ কলকাতা, বোম্বাই সব মোকাম দেখেশুনে এসেছে, সে নিশ্চয় এ দিক্‌টা ভেবেচিন্তে থাকবে।"

মুন্সী রাধেলাল নিজের এই যুক্তিতে মনে মনে খুশী হলেন। তিনি আবার বললেন, "আর বিলিতি কাঠের তুলনায় দিশী কাঠ কি দাঁড়াতে পারবে। ওদের বিলেত থেকে কাঠের আসবাব তৈরি হয়ে আসছে। সেজন্যে জমিদার গিন্নী, তুমি লক্ষ্মীচন্দকে বোঝাবে আর তাতে যদি কাজ না হয়, তো তোমার বউমাকে বলে চাপ দেওয়াবে, যেন এই সব কল-কারখানার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সে না যায়।"

জমিদার গিন্নী জয়দেই জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "ঠাকুরপো, লক্ষ্মী পরশু আসছে। তুমিই তাকে সব বলো। আমাদের কথা তো সে আজকাল উড়িয়েই দেয়। তোমার কথা শুনতেও পারে।"

লক্ষ্মীচন্দ্রের স্ত্রী রাধা এক কোণে বসে সব শুনছিল। সে কিছু কিছু বুঝছিল আবার বুঝছিলও না; কিন্তু স্বামীর বিষয় যে সব টীকা-টিপ্পনী হচ্ছিল তা তার ভালো লাগছিল না। সে শাশুড়ীর কানেকানে বললে, "মা, অনেক রাত হ'ল, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবো কি?"

জয়দেইর এখন মনে পড়ল তাঁকেও তো খেতে হবে। তিনি বউমাকে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, লুচি তরকারি করে নাও গিয়ে, ছিনকি তোমাকে সাহায্য করবে।" তারপর জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "ঠাকুরপো! খেয়ে-দেয়ে সোরাঁও যেও, আর না হয় কাল সকালেই যেও! এখন গেলে সেখানে মাঝরাতে পৌঁছবে। তার ওপর বেজায় ঠাণ্ডা, পথে খুব কষ্ট হবে।"

"আরে কষ্ট কি হবে, জমিদার-গিন্নী, আমরা তিন জন সঙ্গে আছি, আর তার ওপর জ্বালার এক্কাও রয়েছে। বাজার থেকে এখুনি লুচি-মিষ্টি এসে যাবে। বউমাকে কেন কষ্ট দেবে।" মুন্সী রাধেলাল বললেন।

মুন্সী শিউলাল ছিনকির দিকে দেখলেন, সে আবার উনুন ধরাচ্ছিল, "যা, দু'সের লুচি আর দু'সের ভালো মিষ্টি নিয়ে আয়। জ্বালা তাড়াতাড়ি যাবে।"

ছিনকি একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই উত্তর দিলে, "টাকা বড্ড বেশী হয়েছে যেন, যখন খুশী লুচি মিষ্টি আনাচ্ছ। আমি উনুন জ্বেলে দিয়েছি, বাড়ীতেই রান্না হবে। আর অর্ধেক রাতে জ্বালাকে আমি যেতে দেবো না, বলে দিলুম। ওঠো বউমা।"

নয়

ছিনকি গঙ্গাকে গল্প শোনাচ্ছিল, "এক যে ছিল রাজা, তার ছিল সাত রাণী। সেই সাত রাণীর ছিল সাতটা প্রাসাদ। আর একটা করে রাজকুমার............"

এমন সময় রাধেলালের স্ত্রীর গলা শোনা গেল, "ছিনকি, ভাঁড়ারের চাবিটা একটু দে।"

গঙ্গা কোলে বসেছিল, সে উত্তর দিলে, "কি চাই? এক্ষুনি এসে বের করে দিচ্ছি।"

"আমি বলছি আমার চাবি চাই, আমি নিজে বের করে নেবো।" রাধেলালের স্ত্রী একটু চড়া সুরে উত্তব দিলেন।

"তুমি খুঁজে পাবে না। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি। তোমাকে সব ওলটপালট করতে হবে। ওঠো তো ভাই, আমি এক্ষুনি বের করে আনছি," ছিনকি গঙ্গাপ্রসাদকে বললে।

কিন্তু দশ বছরের ছেলে গঙ্গাপ্রসাদের মন গল্পেতে মেতে ছিল। সে বললে, "না ছিনকি দাদী। গল্প না শোনালে আমি তোমাকে যেতে দেবো না। ঠাকুমাকে চাবি দিয়ে দাওনা কেন।" গঙ্গাপ্রসাদ ছিনকির আঁচলে বাঁধা ভাঁড়ারের চাবি খুলে রাধেলালের স্ত্রীকে দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, ছিনকি দাদী, রাণীদের একটি করে রাজকুমার ছিল। তারপর কি হ'ল?"

ছিনকির মন আর গল্পে বসছিল না, গঙ্গাপ্রসাদের কথাও শুনছিল না, সে দেখছিল রাধেলালের স্ত্রীকে, তিনি ক্ষিপ্রগতিতে ভাঁড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। ছিনকি গঙ্গাপ্রসাদকে কোল থেকে নামাতে নামাতে বললে, "এক্ষুনি আসছি ভাই, তুমি ততক্ষণ ভিখুর সঙ্গে খেলা কর।" ছিনকি ভাঁড়ার ঘরের দিকে গেল।

কিন্তু সে ভাঁড়ার ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। মুন্সী শিউলালের ঘর থেকে কাতরানোর শব্দ শুনে সে সেদিকেই ঘুরলো।

মুন্সী শিউলালের মাথার ব্যথা সেদিন বেশী বেড়েছিল।

কৃচ্ছ্রসাধনের সময় তাঁর সর্দি-কাশি আরম্ভ হয়েছিল, তার জের চলেছিল সমানে। প্রথমে হাকিমী চিকিৎসা হ'ল। তাতে কোনো উপকার পেলেন না। কারণ হাকিমী ওষুধে আর মদে আড়ি। কবরেজ উপোসের ওপর জোর দিলেন, তা আবার মুন্সীর সহ্য হতো না। এক মাস এইসবে কেটে গেল। শেষে মুন্সী শিউলালকে ডাক্তারী চিকিৎসা আরম্ভ করতে হ'ল। এখন দু'দিন থেকে ডাক্তারী ওষুধ খাচ্ছিলেন।

ছিনকি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, "কি ব্যাথাটা আবার বেড়েছে বুঝি?"

মুন্সী শিউলাল কোনো উত্তরই দিলেন না। শুধু সমানে কাতরাতে লাগলেন।

ছিনকি তাঁর শিয়রে বসে মাথা টিপে দিতে লাগলো। মাথা টিপে দিতে মুন্সী বোধহয় একটু আরাম পেলেন, কারণ তাঁর কাতর শব্দগুলো ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি চোখ খুলে ছিনকিকে দেখলেন, "হ্যাঁরে, তুই ছিলি কোথায়?"

"গঙ্গাকে ভোলাচ্ছিলাম। তুমি আমাকে ডাকনি কেন? ভাগ্যিস্ ছোট গিন্নীর পেছনে পেছনে ভাঁড়ার ঘরে যাচ্ছিলাম, তাইতো তোমার কাতরানি শুনতে পেয়ে ছুটে এলাম।"

মুন্সী শিউলাল জিজ্ঞেস করলেন, "ছোট বৌয়ের পেছনে পেছনে ভাঁড়ার ঘরে যাচ্ছিলি কেন রে?"

"আমার কাছ থেকে ভাঁড়ারের চাবি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম জিনিষপত্র সব আমার হাতে সাজানো। তিনি খোঁজবার জন্যে সব ওলটপালট করে ফেলবেন। সেজন্যে যা যা দরকার বের করে দেবো।"

মুন্সী শিউলাল চুপ করে ভাবতে লাগলেন, অধিকার আর শক্তি জায়গা বদলাচ্ছে। পরিবারের পরম্পরার শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাচ্ছে। তিনি নীচু গলায় বললেন, "তুই ছোটবৌকে চাবি দিয়ে দিচ্ছিস্ না কেন রে? সেই তো বাড়ির গিন্নী। তারও তো খারাপ লাগতে পারে।"

ছিন্‌কি রেগে বলে উঠল, "এ বাড়ির গিন্নী জ্বালার বউ। এ সব রাজপাট জ্বালার জন্যেই গুষ্টিসুদ্ধ ভোগ করছে। জ্বালার বউ হ'ল কি না ঝি আর বাড়ির গিন্নী হলেন ছোট বৌ!"

মুন্সী শিউলালের মনে ছিন্‌কির কথার কোনো জবাব ছিল না। অবশ্য এ সব কথা তাঁর খুব অদ্ভুত ঠেকল। তিনি চোখ বুজে মনে মনে উত্তর খুঁজছিলেন। তারপরে হঠাৎ কড়া স্বরে বললেন, "সে যাই হোক্, তবে বাড়ির গিন্নী এখন হলেন ছোটবৌ, বুঝলি! যতদিন রাধের স্ত্রী বেঁচে আছে আর এখানে থাকছে, সে-ই এ বাড়ির গিন্নী, জানবি। এ বাড়ির ব্যাপারে তুই নাক গলাবার কে রে?"

ছিনকির চোখ ছলছলিয়ে এল কিন্তু সে সমানে শিউলালের মাথা টিপে দিতে লাগল। এ বকুনি অন্যায় সব কিছু ছিনকির কাছে নতুন নয়। সে আজীবন প্রায় রোজই এ সব অপমান, তাড়না সহ্য ক'রে আসছে। এ সব যেন তার জীবনেরই অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বসে বসে কাঁদছিল আর মুন্সী শিউলালের মাথা টিপছিল। শিউলাল চুপচাপ শুয়েছিলেন যেন ছিনকির মনের ব্যথা এমন কি তার উপস্থিতির সম্পর্কেও উদাসীন। তিনি আরাম বোধ করছিলেন, তাঁর মনও এখন শান্ত! ক্রমশঃ তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ঘুমোবার পরে ছিনকি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

দুপুর গড়াচ্ছিল। রান্নাঘরে লুচি ভাজা চলছিল। রাধেলালের স্ত্রী কিষণুকে নিজের সামনে বসিয়ে লুচি খাওয়াচ্ছিলেন। কিষণু সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, তার খাবার ঢাকা রাখা ছিল। সে খাবার ঘরের এক কোণেই ঢাকা পড়ে ছিল। ছিনকি থাকতে পারল না, সে রান্না ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে কিষণুর খাওয়া দেখতে লাগল। কিন্তু তার দিকে রাধেলালের স্ত্রী আর কিষণুর খেয়ালই যেন ছিল না। তার দিকে কেউ দেখলেও না আর কেউ কিছু বললেও না। মর্মাহত হয়ে সে সেখান থেকে চলে এসে যমুনার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ছিনকি আসতেই যমুনা জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ছিলে ছিনকি কাকী? দেখ গঙ্গা কেঁদে সারা হচ্ছে।

বলছে, "ছিনকি দাদী আমাকে একলা ফেলে ছোট্ ঠাকুমার পেছন পেছন চলে গেলো।"

ছিনকি যমুনার কথার কোনই উত্তর দিল না। সে গঙ্গাকে কোলে তুলে নিয়ে চুপচাপ যমুনার খাটের নীচে মেঝের ওপর বসে পড়লো। কিন্তু সমানে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছিল।

যমুনা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ছিনকির দিকে চেয়ে রইলেন, তারপরে যেন কেমন ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে ছিনকি কাকী, তুমি কাঁদছ কেন? বাপ্পার শরীর ভালো তো?"

ছিনকি চোখের জল মুছে চাপা গলায় বললে, "তাঁর শরীর তো ভালোই, তবে আমি এ সব আর দেখতে পারছি না।"

"কি দেখতে পারছ না?" যমুনা বললেন, "কিছু বলবে তো!"

"তুমি নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে দেখে এসো না কেন। গরম গরম লুচি ভাজা হচ্ছে আর কিষণ্ বসে খাচ্ছেন। দুপুরের খাবারটা ঢাকাই পড়ে আছে। সেগুলো কি ফেলে দেওয়া হবে?"

যমুনাও ঘিয়ের গন্ধ পেলেন। পরিস্থিতি বিলকুল বুঝতে পেরে তিনি বললেন, "ভাঁড়ারের চাবি তো ছিল তোমার কাছে, কাকিমা ঘি ময়দা কি বাজার থেকে আনিয়েছেন?"

"বাজার থেকে আনাবেন ছোট গিন্নী! তাঁর সাধ্য কি? জোর করে আমার কাছ থেকে ভাঁড়ারের চাবি কেড়ে নিয়ে গেছেন। ফতেপুরের বাড়ির গিন্নী, এখানে এসেও গিন্নী সেজে বসেছেন। এবার দেখবে কত খরচা হবে! ওঁর কি আর দরদ আছে। জ্বালা বেচারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটবে আর যত সব হোঁৎকা বখাটে খুড়তুত ভাইগুলো হুমকি দিয়ে দিয়ে বসে বসে গিলবে।"

নিজের মনের কুণ্ঠা চাপা দেবার চেষ্টায় যমুনা বললেন, "ও সব কথা ছেড়ে দাও ছিনকি কাকী, আপন ভাগ্যেই সকলে খায় দায়। যাও গঙ্গাকে বাইরে বেড়িয়ে নিয়ে এসো।"

"নিজের ভাগ্যে খাচ্ছে না—এরা সব গঙ্গার ভাগ্যে খাচ্ছে। গঙ্গা আমার রাজার ছেলে। বড়ো হয়ে লেখাপড়া শিখবে, জমি

জায়গা কিনবে, বড়লোক হবে। যত সব অকর্মণ্য এরই ভাগ গিলে নিচ্ছে।" বলতে বলতে ছিনকি গঙ্গাপ্রসাদকে নিয়ে চলে গেল।

ছিনকির কথা বন্ধ করার ভঙ্গীতেই ব্যাপারটি যেন বেঁচে রইল। 'এরা গঙ্গার ভাগ্যে খাচ্ছে আর গঙ্গার ভাগ খাচ্ছে'—শুনে যমুনা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ছিনকি যা বললে সে তো নিদারুণ কদর্য সত্য। সে সত্যকে অস্বীকার যেমন করা যায় না, আর তা দেখে চোখ বন্ধ ক'রেও থাকা যায় না। এমন সময় রাধেলালের স্ত্রী একটি ডিবেতে লুচি তরকারি নিয়ে যমুনার ঘরে ঢুকলেন, "বিকেলের জল-খাবার তৈরি করলাম। কিষণুর খুব খিদে পেয়েছিল। দুপুরের খাবার এই অবেলায় খেলে শরীর খারাপ করতো সেজন্যে আমি বললাম, "এখন জলখাবার খাও, রাতে দুপুরের খাবারটা খাবে। জ্বালা, গঙ্গা আর তোমার জন্যে এগুলো এনেছি, নাও রাখ।"

যমুনা কাকিমার দিকে তাকালেন, কিন্তু তাঁর কিছু বলার সাহস হ'ল না। রাধেলালের স্ত্রী যমুনার মনের ভাব তার মুখে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন। সন্দেহ দূর করবার জন্যে তিনি বললেন, "আমি ভাঁড়ারের চাবি ছিনকির কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি। আমি যখন এখানে রয়েছি তখন চাকর বাকরের ওপর ঘরসংসার কেন ছাড়বো। এখন থেকে বাড়ির লোকজনদের খাওয়া-দাওয়ার ভার থাকবে আমার ওপর।"

যমুনার মুখ দিয়ে অনায়াসেই বেরিয়ে এল, "হ্যাঁ কাকিমা, ভালো করেছেন। আমিও ভাবছিলাম, তবে ভাবলাম আপনার কষ্ট হবে। তারপরে আপনিই বা এখানে ক'দিন থাকবেন। ফতে-পুরের বাড়িও তো দেখতে শুনতে হবে। এমনিতে ছিনকি কাকীর ওপর আমাদের খুব ভরসা। আপনি তো জানেনই কোনো কাজে তার 'না' নেই। সেজন্যেই ভাঁড়ারের চাবি ছিনকি কাকীর হাতেই আমি দিয়ে রেখেছি। আপনার যাবার পরে সে-ই তো আবার ঘরসংসার সামলাবে! জানেন কাকিমা, সেইজন্যেই তার কাছ

থেকে চাবি নিয়ে আমি আপনাকে দিইনি। তা চাবি নিয়েছেন ভালো করেছেন।”

যমুনার স্বর কোমল আর শান্ত। যা কিছু বললেন তাতে কোন রকম বিরোধ কিংবা সংঘর্ষের ভাব ছিল না। কিন্তু যমুনা রাধে-লালের স্ত্রীকে ফতেপুর যাবার জন্যে যে দু'দু' বার ইঙ্গিত দিলেন তা তাঁর আদপে ভালো লাগল না। সেটা যেন রাধেলালের স্ত্রীর অবস্থিতি আর তাঁর অধিকারের ওপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। উত্তরে তিনি বললেন, তোমাকে এ সব ভাবনা ভাবতে হবে না। আমরা যদ্দিন বর্তমান, তদ্দিন তোমার এসব চিন্তার দরকার নেই। উনি ফতেপুরের বাড়ির ব্যবস্থা করতে গেছেন। হয় ফতেপুর থেকে সবাই এখানে চলে আসবে, না হয় রামু শ্যামুর বউদের ওপর ফতে-পুরের সংসারের ভার ছেড়ে দেওয়া হবে।” এই বলে রাধেলালের স্ত্রী সেখান থেকে চলে গেলেন।

যমুনার হ্যামাতিতে ঘা দিয়ে রাধেলালের স্ত্রী যে উত্তর দিলেন, তাতে যমুনা তিড়বিড়িয়ে উঠলেন। ছিনকি তাহলে ঠিকই বলেছিল। গঙ্গার ভাগ্য আর তার ভাগ অপহরণের জন্যে কাকাবাবুর গুষ্টি এখানে এসে জ্বালাপ্রসাদের ঘাড়ে জেঁকে বসবে।

যমুনা কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মতো বসে রইলেন। তারপরে নিজের ঘর থেকে বের হলেন। তিনি দ্বিধা জড়িত পায়ে মুন্সী শিউলালের ঘরের দিকে গেলেন। মুন্সী শিউলাল তখন জেগে ছিলেন। যমুনা তাঁর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কেমন আছেন বাপ্পা? এই ওষুধটাতে উপকার কিছু হয়েছে কি?”

মুন্সী শিউলাল বললেন, “ভগবানের দয়ায় এখন যেন কষ্টটা কিছু কমেছে।”

যমুনা কিছু না বলে দরজা ঘেঁসে দাঁয়ে রইলেন।

মুন্সী শিউলাল বললেন, “কিছু বলবে?” কিছুক্ষণ আগে ছিনকি যা বলেছিল সহসা যেন তাঁর মনে পড়ে গেল।

“বলার আর কি আছে। তবে শুনলাম যে কাকাবাবুর বাড়ির

সবাই ফতেপুর থেকে এখানে চলে আসছে, এক্ষুনি কাকিমা বলছিলেন। আপনার সঙ্গে কি তাঁদের এ বিষয়ে কোনো কথা-বার্তা হয়েছে ?"

মুন্সী শিউলাল যেন চম্‌কে উঠলেন, "কি বললে ? রাধের গোটা পরিবার এখানে আসছে ! আমাকে তো এরকম কিছু বলেনি। ফতেপুরে ঘরবাড়ি, জমি সবই তো রয়েছে। তবে এখানে তারা আসছে কি করতে ?"

রাধেলালের স্ত্রী যমুনার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সেখানে কখন যে এলেন, যমুনা তা টের পান নি, তাহলে তিনি এ কথা তুলতেন না। রাধেলালের স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন, "বঠ্ ঠাকুর, আপনার অসুখের জন্যে আমরা ভাবলাম, যতদিন আপনি সেরে না ওঠেন, আপনার সেবার জন্যে আমরা এখানেই থাকবো। রামু শ্যামু তো ফতেপুরেই থাকবে আর তাদের বউরা সেখানের সংসার চালাবে। কিষণু তো এখানে আছেই। বিষণুকেও উনি ফতেপুর থেকে নিয়ে আসবেন। বিষণুকেও তো কোনো কাজে লাগানো চাই, জ্বালা ওর কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।"

রাধেলালের স্ত্রীর কড়া স্বরে মুন্সী শিউলাল দমে গেলেন, "হ্যাঁ, তা তো ঠিক্ই। রাধে বুঝদার লোক, যা করবে ঠিক্ই করবে।"

যমুনা পরাজিতার মতো বিষণ্ণ মনে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে জ্বালাপ্রসাদ দেখলেন যমুনার মুখ শুকনো। জ্বালাপ্রসাদের জলযোগের সময় যমুনা বললেন, "শুনছি না কি, কিষণু, বিষণুকে নিয়ে কাকাবাবু কাকিমা বরাবরের জন্যে এখানেই এসে থাকবেন। আজ কাকিমা বাপ্পাকে এ কথা বলছিলেন।"

জ্বালাপ্রসাদের মনে এ সংবাদ কোনো আঁচড়ই কাটলো না। তিনি বললেন, "এ আর এমন কি অন্যায় কথা বলেছেন ! এখানে থেকে ছেলে দু'টা ঠিক্‌মতো কাজে লেগে যাবে, আর ওরা এখানে থাকলে বাপ্পারও এখানে মন বসবে !"

যমুনা এখানেও পরাজিত হলেন। কিন্তু এখানেও পরাজয় হবে

সে প্রত্যাশা তাঁর ছিলই। পরাজয় না হলেই বরং তিনি অবাক হতেন! তিনি আর কথা বাড়ালেন না।

সন্ধ্যেবেলা ফুরসত পেয়ে কাকিমার সমস্ত পরিকল্পনা যমুনা ছিনকিকে শোনালেন। ছিনকির মুখে মুচকি হাসি দেখা দিল, "না, এমনভাবে চলতে পারে না। সাহস করে আমাকেই ছোটগিন্নীর মোহড়া দিতে হবে। আজই দেব, তুমি চুপ করে বসে বসে শুধু দেখে যাও।"

খানিক বাদেই ছিনকি মুন্সী শিউলালের ঘরে ঢুকলো একটা মতলব নিয়ে।

সে সময় সন্ধ্যে গাঢ় হয়ে আসছিল আর মুন্সী শিউলাল ছিনকির অপেক্ষাতেই বসেছিলেন। ভিখু অবশ্য নিয়ম মাফিক মদের বোতল তাঁর শিয়রে রেখেই দিয়েছিল। কিন্তু মুন্সী শিউলালের শরীরে এতটুকু শক্তি ছিল না যে তিনি নিজের হাতে গেলাসে মদ ঢেলে খাবেন। ছিনকিকে দেখামাত্র কড়া স্বরে ধমকে উঠলেন, "কিরে, কোথায় মরতে গিয়েছিলি! এত দেরি হয়ে গেল যে! মদ দে।"

ছিনকি উত্তর দিলে, "তোমাদের বাড়িতে মহাভারতের যে কাণ্ড হতে যাচ্ছে সেই কথাটাই ভাবছিলাম। মনটা বড়ো দমে গেছে সেইজন্যে গঙ্গাকে নিয়ে আমবাগানের দিকে একটু গিয়েছিলাম।" এই বলে রূপোর গেলাসে মদ ঢেলে তাঁর হাতে দিল।

মুন্সী শিউলাল এক ঢোক খেয়ে ছিনকির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ছিনকি যা বলেছিল সে হল লড়াই-এর কথা। তিনি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাভারত কি রকমটা?"

ছিনকি আজ কোমর বেঁধেই এসেছিল। শিউলালের চেঁচানিতে সে ভয় পেল না। নীচু কিন্তু দৃঢ় গলায় সে উত্তর দিলে, "জ্বালার খুড়োর পরিবার জ্বালার রোজগারের ওপর মজা মারতে আসছে। এখানে দুর্যোধনের বংশই তো উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাচ্ছে।"

"দুর্যোধনের বংশ! কি বাজে বকছিস........." মুন্সী শিউলাল ছিনকিকে বকতে গিয়ে থেমে গেলেন। তার মনে হ'ল ছিনকি

যা বলছে সে হয়তো সত্যি হতে পারে। তাঁর আরও মনে হল তিনি যেন পাণ্ডু রাজা, মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করবার জন্যে সর্বক্ষণ ঘোরা-ফেরা করছে। রাধেলাল ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ির মালিকানা রাধেলালের দখলে এসে যাবে। এতো পুরোপুরিই ঠিক্ মহাভারতের রূপক, ছিনকি আদৌ ভুল বলেনি। এই চিন্তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মুন্সী শিউলাল আর এক ঢোকে গেলাসের বাকিটুকু শেষ করে ফেললেন। তাই দৃশ্যমান জগৎ আরও ঝাপসা হয়ে এলো। মহাভারতের চিত্রটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আবার ভরবার জন্যে গেলাসটা ছিনকির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শিউলাল শিথিল স্বরে বললেন, "হ্যাঁ, লক্ষণ তো ভালো দেখছি না। আজ দশ বছর পরে এরা আবার উড়ে আসছে। কিছু ঠাওর পাচ্ছি না কি করা যায়?"

"কি আর করা যাবে! জ্বালার ওপর জোর দিয়ে বলো কিষণুর চাকরিবাকরি একটা ঠিক করে দিক্। কিন্তু সোরাঁও থেকে দূরে। জ্বালা বড়ো অফিসার, সব কিছু করতে পারে। ছোট দাদাবাবু আর ছোটগিন্নী ছেলের দেখাশোনার জন্যে তার কাছে গিয়ে থাকবেন। আর বিষণুও তার বাবা দাদার কাছে থেকে কোনো কাজকর্ম শিখবে।"

মুন্সী শিউলাল ছিনকিকে খুঁটিয়ে দেখলেন। তার কথা কিছু কিছু তিনি বুঝছিলেন, "তুই কি বললি, রাধে, ছোটবৌ, বিষণু এরা সবাই কিষণুর কাছে গিয়ে থাকবে, সোরাঁও থেকে দূরে। তুই এই বললি না? নিয়ে আয়, চেয়ে চেয়ে দেখছিস্ কি? গেলাস ভরে দে!"

ছিনকি মুন্সী শিউলালকে গেলাস ধরিয়ে দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, এই তো বলেছি।"

মুন্সী শিউলাল আর এক ঢোঁক গিলে বললেন, "তুইতো ঠিক্ই বলেছিস্ রে। কিন্তু এই কিষণুটা হ'ল রামবখাটে তার ওপর অকর্মণ্য। ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে কি?"

"সেইজন্যেই তো তুমি ছোট দাদাবাবুকে কিষণুর সঙ্গে পাঠাবে। যোগ্য পুত্রর জন্ম দিয়েছেন, তাকে সোজা পথে আনতে হবে তো। জ্বালার সঙ্গে কথা বলার আমার সাহস নেই। তুমি বলো না কেন? না হয় ঘাটমপুরের জমিদার গিন্নীর ওখানেই কিষণুর চাকরি একটা জোগাড় করে দিক না কেন। তাদের তো বড়ো কারবার, হাজার হাজার চাকর-বাকর রয়েছে।"

পরের দিন সকালে মুন্সী শিউলাল জ্বালাপ্রসাদের বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলেন। জ্বালাপ্রসাদ তখন অফিসের কাগজপত্র দেখছিলেন। শিউলাল একটু তফাতে গিয়ে বসলেন। জ্বালাপ্রসাদ পিতাকে দেখে বললেন, "বাপ্পা, কিছু বলবেন কি? আপনি কেন এলেন, আমাকেই ডেকে পাঠাতে পারতেন?"

"চলেই এলাম, তাতে আর হয়েছে কি! হ্যাঁ, তোমাকে বলতে এলাম যে তোমাকে কিষণুর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তুমি তো এ ব্যাপারে দিব্যি পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছ।"

"আজ্ঞে, আমি আর কিষণুর কি ব্যবস্থা করতে পারি, যা ব্যবস্থা করার কাকাবাবুই করবেন।"

"রাধের দ্বারা কিচ্ছুটি হবার নয়। যত তাড়াতাড়ি পারো তোমাকেই ওর একটা হিল্লে করতে হবে।"

জ্বালাপ্রসাদ সমস্যায় পড়লেন, "মূর্খ আর বখাটের কি ব্যবস্থা হতে পারে?"

"হ্যাঁ, অফিস কিংবা কাচারিতে কাজ পাবার মত লেখাপড়া না জানুক। কিন্তু কোনো জমিদারের কাছে কর্মচারীর কাজ পেতে পারে। মামলা মোকদ্দমা দেখাশোনা করতে পারবে।"

"হ্যাঁ, এরকম কাজ বোধহয় চালাতে পারবে, কিন্তু ওর কাজ হবার মতো এ তসিলে তো তেমন কোনো বড়ো জমিদার নেই।"

মুন্সী শিউলাল গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি? বংশের উপকার আর কল্যাণের জন্যেই একথা আমি বলছি।"

"তা জানি। আপনার কথায় আমি আবার কি মনে করবো। কি বলছেন বলুন।"

মুন্সী শিউলাল ছেলের দিক্ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, "আমার মনে হয় ঘাটমপুরের জমিদার গিন্নী জয়দেইর একটি মাতব্বর লোকের দরকার, যে নালিশ মোকদ্দমার দেখাশোনা করতে পারবে আর উকিলের বাড়ি ছোটাছুটিও করতে পারবে। তিনি তোমার কথা ঠেলতে পারবেন না। কিষণুর চাকরি একটা সেখানেই করিয়ে দাও না কেন। রাধে আর ছোটবৌ ওরা দুজনেও ওখানেই থাকবে। নামটা কিষণুর থাকবে, আসলে কাজকর্ম সামলাবে রাধে।"

এই প্রস্তাব শুনে জ্বালাপ্রসাদ হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ পিতার দিকে চেয়ে রইলেন।

"কেন, কি ভাবছ?"

"আজ্ঞে, আজ্ঞে, এ সম্বন্ধে একটু ধীরে সুস্থে ভাবতে হবে। খুব সংকোচের ব্যাপার। কিষণুকে তো আপনি জানেনই। ওঁদের বাড়িতে শুধু মেয়েরা থাকেন, লক্ষ্মীচন্দ তো বছরে দু-তিন মাস ঘাটমপুরে থাকে মাত্র। আমার মনে হয় কিষণুকে সেখানে পাঠানো ঠিক্ হবে না।"

"সেইজন্যেই তো রাধেকেও কিষণুর সঙ্গে পাঠাচ্ছি। রাধের সঙ্গে ছোটবৌও ওখানেই থাকবে। সেখানে কিষণু বাপ মায়ের শাসনে থাকবে আর এর মধ্যে ওর বিয়েও হয়ে যাবে। বিয়ের পরে তার বদ অভ্যাসগুলোও শুধরে যাবে।" তারপরে চাপা গলায় বললেন, "এতে তোমার লাভই হবে, তুমিও তো বোঝো।"

"আজ্ঞে, সে তো আমি জানি।" রেহাই পাবার জন্যে উত্তর দিয়ে জ্বালাপ্রসাদ ফাইলের পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন। মুন্সী উঠে চলে গেলেন।

জ্বালাপ্রসাদের সামনে শিউলাল যে প্রস্তাবটি রেখেছিলেন, সে সম্বন্ধে জ্বালাপ্রসাদ মনে মনে নানা ভাবনা চিন্তা করলেন, সব দিক্ দিয়েই প্রস্তাবটির ওপর বিচার করলেন কিন্তু কোনো দিক্ দিয়েই

সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি ঠিক্ করলেন, মুন্সী রাধেলালকে বুঝিয়েসুঝিয়ে তাঁকে দিয়েই প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করানোই ভালো। তিনি উদগ্রীব হয়ে রাধেলালের ফেরবার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

তিন দিন পরে ছোট ছেলে বিষণলালকে সঙ্গে নিয়ে মুন্সী রাধেলাল ফিরে এলেন। যখন রাধেলাল সোরাঁও পৌঁছলেন, তখন জ্বালাপ্রসাদ ট্যুরে গেছেন। বড়দাদাকে প্রণাম করে তিনি ফতেপুরের বাড়ির যা ব্যবস্থা করে এসেছেন সে বিষয়ে সব জানালেন। তাঁর সার কথা হ'ল এই—"রামলাল অধ্যাপকের পদে ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্যামলাল নিজের সম্পূর্ণ জমির দলিল করে দিয়েছে। কারণ চাষবাস তার দ্বারা হবে না। আর শ্যামলাল অনায়াসেই একটি গ্রামের অর্ধেক ভাগ পাচ্ছে। কারণ দু'বছর আগে শ্যামলাল গফুর মিঞার বিধবা স্ত্রী সলীমার সেবা করে রহীমপুরা মৌজার অর্ধেক ভাগ নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। সে সেই থেকে শ্রীমতী সলীমার খরচ বহন করে এসেছে। এখন কিছুদিন হ'ল গফুর মিঞার জামাই রহমত খাঁ শ্যামলালের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে। এখন মামলা ডেপুটি সাহেবের আদালত থেকে দেওয়ানী আদালতে গেছে। সাব জজ পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর মিশ্রের সঙ্গে জ্বালাপ্রসাদের ভালো পরিচয় আছে। যদি এর জন্যে জ্বালাপ্রসাদ জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাহলে মোকদ্দমায় অতি অবশ্যই জয় হবে। তাহলে রহীমপুরা মৌজার অর্ধেক ভাগ আমাদেরই হয়ে যাবে। বাকি অর্ধেক ভাগ হ'ল কয়ুম মিঞার, সেটাও সস্তা দামে কিনে নেওয়া যাবে। কারণ কয়ুম মিঞার ছেলেপুলে নেই। তিনি জমিদারি বিক্রি করে হজ করতে যেতে চান।"

মুন্সী শিউলাল বললেন, "কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে? কয়ুম মিঞা নিজের অংশের জন্যে কত চাইছেন?"

"আজ্ঞে তিনি আট হাজারে বেনামী দলিল লিখতে চান। কিন্তু বেনামীর সময় চাইছেন শুধু চার হাজার। বাকি চার হাজার আমরা তিন বছরের মধ্যে দিলেও তিনি রাজী আছেন।"

"এই চার হাজার টাকা আসবে কোথা থেকে?" মুন্সী শিউলাল জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তর না পেয়ে তিনি আবার বললেন, "এই চার হাজার টাকা... এটা আসবে কোথা থেকে?"

"আজ্ঞে আজ্ঞে", রাধেলাল আমতা আমতা করে বললেন, "এক হাজার টাকা তো এদিক্ ওদিক্ থেকে আমি জোগাড় করে নেবো, আর হাজার টাকার মতো ফতেপুর থেকে ধার পেয়ে যাবো। বাকি দু'হাজার টাকার ব্যবস্থা জ্বালাকে করতে হবে। মাত্র দু'হাজারের ব্যাপার! জমিদারি কেনা হবে জ্বালার নামে।"

"আর গফুর মিঞার অংশটা! তার মোকদ্দমার খরচা কত হবে?"

"আজ্ঞে, শ্যামু সে অংশটাও জ্বালার নামে লিখে দেবে। জ্বালার নামে রহীমপুরার মুসলমানী মৌজার লেখাপড়া হয়ে যাবে। আর জ্বালার নামের জমিদারিটার মামলায় পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর আমাদের পক্ষেই মত দেবেন।"

মুন্সী শিউলালের প্রস্তাবটি ভালো লাগলো। "জ্বালা এলে তার সঙ্গে কথা বলে দেখবো। যদি তার কাছে টাকা না থাকে, কোথাও ধার নেবে। কিন্তু যে দু'হাজার টাকার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে, তা হয়ে যাবে তো?"

"আজ্ঞে, এক হাজারের দায়িত্ব তো আমার ওপর। সে আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই যোগাড় করে নেবো। আর বাকি এক হাজারের জন্যে আমি লালা রামকিশোরের সঙ্গে কথা বলেছি। লালা রামকিশোর রাজী আছেন। তসিলদার বংশের একটা সম্মান আছে তো দাদা।"

"তসিলদার বংশের সম্মান আছে বৈকি।" খুশী হয়েই মুন্সী শিউলাল রাধেলালের কথার পুনরুক্তি করলেন, "তসিলদার বংশে জমিজায়গা, টাকাকড়িও থাকা দরকার! তুমি ঠিকই বলেছ রাধে। আমি এই দু'হাজার টাকার ব্যবস্থা যে কোনো উপায়ে করবোই।"

দশ

"এখন কি করবে ঠিক করেছ?" জ্বালাপ্রসাদ বিষণলালকে প্রশ্ন করলেন।

"আমার আর কি ঠিক্ করা করি? আপনি যা বলবেন তাই করবো। তবে একটা কথা বলে রাখি, চাকরি-টাকরি আমার দ্বারা হবে না।"

"তাহলে চাষবাস করছ না কেন?" জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন।

জ্বালাপ্রসাদের এই প্রশ্নের বিষণলাল কোনো উত্তর দিল না। বিষণলাল কিষণলালের চেয়ে দু'বছরের ছোট। বিষণলালের মধ্যে কোন বদ্গুণ ছিল না আর লেখাপড়াতেও সে মন্দ ছিল না। এক বছর আগে সে মধ্য পাস করেছে। তবে সে একটু জেদী স্বভাবের, কারও কাছে মাথা নেয়োনো তার ধাতে নেই। তাই সে নিজেকে চাকরির যোগ্য মনে করতো না। ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত দেহ দীর্ঘাঙ্গ যুবক, মুখের ওপর নিশ্চিত ভাব আর আপনভোলা দৃষ্টি। বিষণ-লালকে সুন্দর না বললেও কুরূপ বলা চলে না। সে একদৃষ্টে জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকিয়েছিল।

জ্বালাপ্রসাদ একটু বিরক্তির সুরে আবার প্রশ্ন করলেন, "আমি বলছি, তুমি চাষবাস করছ না কেন?"

"আজ্ঞে, চাষবাসইতো করছিলাম। কিন্তু শ্যামু দাদা বারণ করলেন। আমি শপথ করে বলছি, তাতে আমার কোনো দোষ ছিল না। তিনি দুটো মোষ পুষেছিলেন, দুধ হতো ষোল সের ক'রে। গ্রামে আর কে দুধ কিনবে সেজন্যে আমি দুধ বিলিয়ে দিতাম। এর জন্যে শ্যামুদাদা গেলেন চটে। বলতেন দুধ জমা করে দই পাতো, দই থেকে ঘোল করো, মাখন তোল, মাখন জাল দিয়ে ঘি তৈরী করো।"

"শ্যামু কিছু অন্যায় তো বলেনি," জ্বালাপ্রসাদ বললেন।

"না, অন্যায় কিছুই বলেননি। আমি ওখানে খেতের কাছে একটি আখড়া করেছিলাম। জগ্‌গু পালোয়ানকে নিজের ওস্তাদ বানিয়ে, অনেক খোশামোদ করে, বড়ো কষ্ট ক'রে তাঁকে সেখানে নিয়ে এসেছিলাম। তাঁর শিষ্যেরাও সব সেখানে জড়ো হতো। আর তাদের জন্যেই ঘি দুধ সব খতম হয়ে যেতো। সেইজন্যেই শেষে রাগ করে শ্যামুদাদা আখড়া ভেঙ্গে দিয়ে, জগ্‌গু পালোয়ান আর তার শিষ্যদের সেখান থেকে দূর করে দিলেন, আমাকেও তাড়িয়ে দিলেন। তাই আমি শপথ করেছি, চাষবাস আর আমি করবো না, বিশেষ করে শ্যামুদাদার অধীনে। সবাই আমাকে দেখে হাসে। জগ্‌গু ওস্তাদও শাপান্ত করেছেন, যে সব দাঁওপ্যাঁচ আমাকে শিখিয়েছেন আমি সব ভুলে যাবো।"

কিষণলালের কথায় জ্বালাপ্রসাদের হাসিও পাচ্ছিল, আবার রাগও ধরছিল। এমন সময় মুন্সী শিউলাল জ্বালাপ্রসাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। শিউলালের সঙ্গে রাধেলালও ঢুকলেন নিজের স্বভাব-কুটিল মুচ্‌কি হাসিমুখে।

জ্বালাপ্রসাদ উঠে দাঁড়িয়ে বাবা কাকাকে স্বাগত জানালেন। মুন্সী শিউলাল বললেন, "শুনছ জ্বালা, রাধে একটি পরিকল্পনা করে এসেছে। তুমিও শোনো, আমি তো এতে কোনো অন্যায় দেখছি না। বরং আমি তো বলি যদি এটাতে কাজ হয় তো খুবই ভালো।"

ততক্ষণে সবাই বসে পড়েছিলেন। জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাধেলালের দিকে তাকালেন।

রাধেলাল গলা পরিষ্কার করে বললেন, "ব্যাপারটা হ'ল এই, ফতেপুরের কাছে যে রহীমপুর মৌজা আছে গফুর মিঞার বিধবার কাছ থেকে শ্যামু তার অর্ধেক ভাগ কিনে নিয়েছে। শ্যামুর নামে সেটা বেনামী দলিল হয়ে গেছে। আর সে দখলও নিয়ে নিয়েছে।"

বিষণলাল বাধা দিয়ে বলে উঠল, "জ্বালাদাদা, এসব ধাপ্পাবাজি। সলীমা চাচীকে আফিম খাইয়ে খাইয়ে শ্যামুদাদা তার বুড়ো আঙ্গুলের

টিপসই করিয়ে নিয়েছে, একটা সাদা কাগজের ওপর আর তাতে নিজেই লিখে নিয়েছে যে সলীমা চাচী নিজের সারা সম্পত্তি শ্যামুদাদাকে দান করছে। সেইজন্যে রহমত খাঁ শ্যামুদাদার নামে নালিশ ঠুকে দিয়েছে, মামলা চলছে।"

মুন্সী রাধেলাল বিষণলালকে ধমক দিলেন, "কি বাজে বকছিস্ ?" জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "এই বিষণুটা শ্যামুর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই একে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। এ পুরোপুরি জগ্‌গু পালোয়ানের বশ হয়ে পড়েছে আর জগ্‌গু পালোয়ান হ'ল রহমত খাঁর পিসে।" তারপর বিষণলালকে বললেন, "খবরদার এ ব্যাপারে যদি একটিও কথা মুখ দিয়ে বের করেছিস............।"

জ্বালাপ্রসাদও বললেন, বিষণু, অন্যদের কথার মধ্যে কথা বলতে নেই। হ্যাঁ কাকাবাবু, এবার আপনি নিজের পরিকল্পনার কথা বলুন। তাহলে রহমত খাঁ শ্যামুর নামে নালিশ দায়ের করেছে। তাতে আর কি ?"

"বলছ কি, সে মোকদ্দমাতে কি হবে ? দেওয়ানী মোকদ্দমা, হাসি ঠাট্টা নয়। অধিকার শ্যামুরই, মোকদ্দমা লড়ে তো লড়ুক ! অনেক দিন চলবে, হাইকোর্ট, প্রিভি কাউন্সিল। ওই যে ঝম্মনলাল পাটোয়ার, আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, আমাদেরই দিকে রয়েছে। আমাদের কাছে সব কাগজ তৈরী আছে। রহমত খাঁ থাকে এলাহাবাদ জেলার মউআইমাতে, এক মুঠো অন্নের জন্যে লালায়িত। সে আর কোন্ সাহসে মোকদ্দমা লড়বে।"

মুন্সী শিউলাল বললেন, "সাব জজ পণ্ডিত গিরিজাশঙ্করের আদালতে মোকদ্দমা রয়েছে।"

জ্বালাপ্রসাদ মুন্সী শিউলালের সঙ্কেত বুঝতে পেরে, চুপ করে থেকে কথাটা এড়িয়ে গেলেন। তিনি রাধেলালকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ, কাকাবাবু আপনার কি প্ল্যান ?"

সে কথাটাই বলছি। রহীমপুরা মৌজার অর্ধেক ভাগ আমাদের নামে হয়েই গেছে, বাকি রইল অর্ধেক। কয়ুম মিঞা হজ করতে

যাচ্ছেন। তিনি নিজের অংশটি বিক্রি করতে চান। খুব সস্তায় দিতে রাজী আছেন চার হাজার টাকা নগদ আর বাকি চার হাজার টাকা তিন বছরে। এর মধ্যে দু'হাজার টাকার ব্যবস্থা আমি ফতেপুর থেকে করবো, বাকি দু'হাজারের ব্যবস্থা তুমি করবে। এই অর্ধেক অংশটি তোমার নামে কেনা হবে, আর শ্যামুও নিজের অর্ধেক অংশ তোমারই নামে লিখে দেবে। তাহলে রহীমপুরার পুরো মৌজা তোমার নামে হয়ে যাবে।"

বিষণু আর থাকতে পারলে না। সে হেসে উঠল, "হ্যাঁ, জ্বালাদাদা, যদি শ্যামুদাদার এই জালিয়াতিতে আপনিও যোগ দেন তাহলে কাজ সহজেই হাসিল হবে। আপনার এমন দাপট, এতো বড়ো নাম! আপনার বিরুদ্ধে কারো কোনো কথা বলার সাহস থাকবে না।"

রাধেলাল বিষণলালের কাণ মলে দিয়ে বললেন, কেন রে হারামজাদা, আবার কথা বললি। এ যে দেখছি, শ্যামুর প্রাণঘাতক শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অকর্মণ্য, বখাটে, বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছে, বেরো এখান থেকে!"

বিষণলাল চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জ্বালাপ্রসাদ কিছুক্ষণ ভেবে তারপর যেন ঠিক্ করে ফেললেন, "আমি দু'হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে পারবো না, আপনি কয়ুম মিঞাকে বলে দেবেন সে যেন জমি অন্যকে বেচে দেয়।"

মুন্সী শিউলাল কঠোর দৃষ্টিতে জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালেন না, হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে নেই। আমি মুন্সী রামসহায়কে চিঠি লিখছি, তিনি দু'হাজার টাকা অতি সহজেই দিয়ে দেবেন। তারপর রাধেলালকে বললেন, "তুমি শ্যামুর অংশটি জ্বালার নামে লেখাপড়া করিয়ে দাও।"

এবার জ্বালাপ্রসাদ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "বাপ্পা! আমার শ্যামুর সম্পত্তিতে দরকার নেই, কোনো অবস্থাতেই নয়। যদি সলীমা চাচী শ্যামুকে দিয়ে থাকেন তবে সে শ্যামুরই।"

"তোমার নামে থাক্ আর শ্যামুর নামেই থাক্ তাতে তফাতটা কি!" রাধেলাল বললেন, "বংশের স্থাবর সম্পত্তিতে সব ভাইদের সমান সমান ভাগ।"

"আজ্ঞে, তা আমি জানি। যদি রহীমপুরার মৌজার অর্ধেক অংশ শ্যামুর নামে থাকে সে তো ভালোই, ফতেপুরের জমিও তো শ্যামুর নামেই রয়েছে। আপনি এর মধ্যে তবে আমাকে আর টানছেন কেন?"

এবারে রাধেলালের দমে যাবার পালা, "বাবা জ্বালা, তুমি একটু ব্যাপারটি বুঝে দেখ······আসলে শ্রীমতী সলীমাও এখন তার জামাইয়ের সঙ্গে একজোট হয়েছে। সে বলছে, আফিমের ঘোরে থাকার সময় তাকে নাকি ধাপ্পাবাজি করে শ্যামুর নামে অংশটা লেখানো হয়েছে।"

"হুঁ, তাহলে বিষণলাল তো ভুল বলেনি। আপনি পষ্ট করে বলছেন না কেন যে এই ধাপ্পাবাজিতে আমাকেও জড়াতে চান!" এবার জ্বালাপ্রসাদের পৌরুষ যেন জেগে উঠল, "কিন্তু আপনি এটা নিশ্চিত জানবেন কাকা, আমি কোনোমতেই এ ব্যাপারে নিজের নাম জড়াতে দেবো না। সে হবে আমার মান মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার ওপর ঘা।"

জ্বালাপ্রসাদের এই দৃঢ়তা দেখে শিউলালের মনে হ'ল তাঁর ছেলে যেন ঠিক্ই বলছে। তিনি সগর্বে ছেলের দিকে তাকালেন, "হ্যাঁ রাধে, জ্বালা তো ঠিক্ই বলছে। সে একজন বড়ো অফিসার তার মানমর্যাদা আছে। তার দুর্নাম রটা ভালো হবে না। শ্যামু মোকদ্দমা জিতে গেলে সম্পত্তি জ্বালার নামে লিখে দেওয়া যাবে, এখন উচিত হবে না। তোড়জোড় করে মামলা জেতার চেষ্টা করো।"

"আজ্ঞে, আসল কথা কি জানেন, উকিলরা বলছেন, মোকদ্দমাটা একটু কাঁচা। দলিলটি রেজিষ্ট্রী হয়নি, তবে দলিল তো রয়েছে, আর শ্যামু হ'ল সে সম্পত্তির মালিক। যদি জজ সাহেবকে একটু

চাপ দেওয়া যায় তাহলে মামলাটা বেশ জোরদার হয়ে ওঠবে।" এবার তিনি জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালেন, "পণ্ডিত গিরিজা শঙ্করকে তো তুমি জানোই, মামলাটি তাঁরই এজলাসে।"

আজ্ঞে, জানি, আবার জানিও না। কিন্তু এ মামলার সম্পর্কে তাঁকে আমি একটি কথাও বলতে পারবো না।" এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটি বন্ধ করার জন্যেই যেন জ্বালাপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন, ডেপুটি সাহেব ট্যুরে এসেছেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

জ্বালাপ্রসাদের এই সুস্পষ্ট উত্তর রাধেলালের আদৌ ভালো লাগলো না। জ্বালাপ্রসাদ যাবার পর তিনি শিউলালকে বললেন, "দাদা বংশে জমিদারি আনার জন্যে শ্যাম্ এতো সব কাণ্ড করলে। আপনি জ্বালাকে বোঝান। এ সুযোগ একবার ফসকালে আর আসবে না। জ্বালার যে রকম মতিগতি তাতে সে কোনোদিন জমি জায়গা, ধনসম্পত্তি জমাতে পারবে ভরসা হয় না। সে নিজে কিছু নাই বা করলে, করবার জন্যে তো তার ভাইরাই রয়েছে। কিন্তু দরকার পড়লে ওপর থেকে তো তাকে চাপ দিতে হবে।"

মুন্সী শিউলাল ক্লান্ত স্বরে বললেন, "বলছ তো তুমি ঠিক্ই, তবে কি আর করা যায়? ছেলে এখন বড়োসড়ো হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাকে তো আর শাসানো ধমকানো চলবে না। হ্যাঁ, তবে একটা কথা বলছি, খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ আদায় করতে হবে।"

"কি বলুন, আমার দিক্ থেকে কোনো ঘাটতি হবে না।"

"আমি ভাবছিলাম কিষণুর সম্বন্ধে আর জ্বালাকেও বলেছি তাকে যে কোনো জায়গায় কাজে লাগিয়ে দিতে হবে; তাতে তার বদ অভ্যাসগুলোও শুধরে যাবে। আর শেষ পর্যন্ত তার বিয়েও তো দিতে হবে।"

রাধেলাল কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, "এই কিষণুটা যে এতো অপদার্থ আর বখাটে হয়ে যাবে তা কি আমি আগে জানতাম।

মিডিল ক্লাসও পাস করতে পারেনি। তাকে জ্বালা কোন্ কাজে লাগাবে?"

তাই বলছি। ঘাটমপুরের জমিদার গিন্নীকে তো চেনো। তুমি মাঘ মেলার সময় তাঁকে দেখেও ছিলে। তাঁর মস্ত বড়ো জমিদারি। তিনি জ্বালাকে খুব খাতিরও করে থাকেন। তাঁর সঙ্গে ব্যবহার ঘরের লোকের মতো। সেখানে যদি কিষণ্ কর্মচারী হয়ে যায় তো কেমন হয়?

মুন্সী রাধেলালের মলিন মুখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সত্যি দাদা যদি এমন হয় তো জানবেন কিষণুর বরাত ফিরেছে।"

"শুধু কিষণুরই কেন গোটা বংশের! কিন্তু একটি শর্ত। কিষণুর সঙ্গে তোমাকেও সেখানে যেতে হবে। তা না হলে সে তো সেখানকার সব কাজকর্ম পণ্ড করে বস্‌বে। নাম হবে কিষণুর তবে কাজ সামলাবে তুমি, বুঝলে। যদি এতে রাজী হও তবে আমি জমিদার গিন্নীকে চিঠি লিখে তোমাদের দু'জনাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

"ও দাদা, এ সুবর্ণ সুযোগ কি হাত ছাড়া করতে পারি? তোমার আদেশ মাথা পেতে পালন করবো। তবে জ্বালা বোধহয় আমাদের ঘাটমপুরে যাওয়া পছন্দ করবে না।"

"হ্যাঁ, সে তো বটেই, সেজন্যেই আমি চিঠি লিখে দেবো, বলছি। তুমি এ সম্বন্ধে জ্বালার সঙ্গে যেন কোনো কথা বলতে যেওনা।"

তিন দিনের মধ্যেই তিনি জমিদার গিন্নী জয়দেইকে কিষণুর চাকরির সম্বন্ধে চিঠি লেখার জন্যে জ্বালাপ্রসাদকে রাজী করিয়ে নিলেন। পনেরো দিনের মধ্যেই রাধেলাল, তাঁর স্ত্রী আর কিষণু ঘাটমপুর রওনা হলেন।

জ্বালাপ্রসাদের বাড়ির শান্তি আবার ফিরে এলো। বিষণলাল ছিল শান্ত সৌম্য স্বভাবের। সে জ্বালাপ্রসাদ যমুনাকে শ্রদ্ধা করতো। বিষণলাল হল আত্মভোলা আর আমুদে। অন্য তিন ভাইদের তুলনায় সে ছিল আশমান জমিন ফারাক। গঙ্গাপ্রসাদও

বিষণলালের খুব নেওট হয়ে পড়েছিল। তবে বাড়ির গণ্ডির মধ্যে আটক থাকার ধাত বিষণলালের নয়, অধিকাংশ সময় কাটতো তার বাইরে বাইরে।

সোরাঁওয়ের হাট বসতো মঙ্গলবারে। শুধু আশ পাশের গ্রাম থেকেই নয় দূর দূরান্ত থেকেও লোকে কেনাকাটার জন্যে আসতো সে হাটে। হাট হতে প্রায় ছ' ফার্লং দূরে, সোরাঁওয়ের বস্তির বাইরে একটা আম বাগান ছিল। সেটা পড়েছিল বেওয়ারিশ। আমবাগানে ভাঙ্গা একটা মন্দির ছিল। ঘুরতে ঘুরতে বিষণলালের চোখ সেই আম বাগানে গিয়ে পড়লো। তার মনে হ'ল, এই বাগানে খাসা একটা আখড়া বানানো যায়। সেখানে তখন ঘুমরু মিসিরও আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সহসা তার মনে হল, মহাবীরকে জাগানো উচিত। বিষণলাল আর ঘুমরু মিসির একসঙ্গেই আম বাগান থেকে ঘুরলো বস্তির দিকে। উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয়ে গেল। ঘুমরু মিসির বেচু মিসিরের ছোট ভাই। কয়েক মাস আগে সে পালিয়ে এসেছে কাশী থেকে। তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল সংস্কৃত পড়তে। এদিকে ঘুমরু পণ্ডিতের মনে হতো সংস্কৃতের সঙ্গে তার যেন সহজাত শত্রুতা। সে যখন ব্যাকরণের অগাধ সমুদ্রে ডুবতে যাচ্ছিল, তখন তার বোধ হল যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ঘুমরু মিসিরের বয়স প্রায় কুড়ি-একুশ হবে। উচ্চতায় আর গড়নে সে বিষণলালের সঙ্গে উনিশ-বিশ। ললাট তিলকচর্চিত। ব্যাকরণ তার কণ্ঠস্থ হল না, কিন্তু অনেকগুলি শ্লোক আয়ত্তে ছিল। সেগুলি সে পড়তো সুর করে। কাশী থেকে পালিয়ে আসার জন্যে বেচু মিসির ঘুমরুকে ধমকালেন খানিক। কিন্তু ঘুমরু বড়ো হয়েছে, সেজন্যে জোর করে তাকে দিয়ে তো কোনো কাজ করানো যায় না।

বেচু মিসির সোরাঁওয়ের নায়েব তসিলদার আর বাসিন্দে সেখানকারই। তাঁর কোনো দিন বদলিও হয়নি আর আশাও

ছিল না। গাঁয়ের লোক যতই অবাক্ হোক্ কিন্তু বেচু সোরাঁওতে জেঁকে বসেছিলেন। বদলীতে রাজী হলে এতদিনে বোধহয় ডেপুটি কালেক্টার হয়ে যেতে পারতেন।

ঘুমরু আর বিষণলালের দোস্তি হয়ে গেল। উভয়েই যুবক, হৃষ্টপুষ্ট আর জেদী। পথেই প্লান রচনা হয়ে গেল। আম বাগানে আখড়া করা হবে, বিষণলাল হবে গুরু, ডন-কুস্তির প্যাঁচ শেখাবে আর ঘুমরুজি বাবা মহাবীরের মন্দিরে পূজারী হয়ে জেঁকে বসবে।

হোলি শেষ হয়েছে। আশপাশের ফসল পেকেছে। ফসল-কাটার কাজও শুরু হয়েছে। জমজমাট হয়ে উঠেছে মঙ্গলবারের হাট। আশপাশের গাঁ থেকে হাটুরেরা চাল-গুড় ও নানা বেসাতি নিয়ে বাজারে আসছিল। বাজারের হাট্টগোল বেড়েই চলেছিল। মহাবীরের সামনে ভোগ আর ভেট ঝলমল করছে। আখড়ার যাবতীয় হাতখরচ চলতে লাগলো মহাবীরের ভোগরাগ থেকেই। ঘুমরু মিসির এখন 'ঘুমরু পণ্ডিত' আর বিষণলাল 'বিষণগুরু'।

সেদিনকার হাটে পালোয়ান বুদ্ধু সিংহের আসা নিয়ে নানা জনের নানা মত। পালোয়ান বুদ্ধু সিংহের আখড়াই ছিল সোঁরাওয়ের একমেবাদ্বিতীয়ম্। দশ বছর আগে পূর্বদেশের জেলাসমূহের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সেরা পালোয়ান। কিন্তু এখন তাঁর বয়স হয়েছে তাই ঠাকুর বীরভান সিং তাঁর জন্যে একটা আখড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন।

অনেকে বলে, সোরাঁওতে আর একটা আখড়া ওঠায় তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছিল। আবার অনেকে বলে তিনি নাকি খুশীই হয়েছিলেন। যাই হোক, পালোয়ান বুদ্ধু সিংহ নিজের পয়লা নম্বর চেলা মৈকুসিংহকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন মঙ্গলবারের হাটে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য হাটবাজার নয়, কাছাকাছি নতুন আখড়াটা দেখা।

পালোয়ান বুদ্ধু সিংহ যখন বিষণগুরুর আখড়ায় এসে পৌছলেন, তখন বিষণ গুরু লাল রংয়ের ল্যাঙ্গোট খেঁচে বাবা মহাবীর

বিগ্রহের সামনে বৈঠক ভাঁজছিলেন। বিষণলালের সন্ধ্যাবেলার কাজ ছিল একশ'টা ডন আর পাঁচশ' বৈঠক শেষে মহাবীরের দোয়া নিয়ে আখড়ায় গিয়ে সাকরেদদের প্যাঁচ শেখানো। পালোয়ান বুদ্ধুসিংহ যখন আখড়ায় এলেন তখন বিষণ গুরু ডন শেষ করে বৈঠক শুরু করেছিলেন। এতো নিখুঁতভাবে পাঁচশ' বৈঠক দিতে দেখে বুদ্ধুসিংহ পুলকিত হলেন। সেখান থেকেই তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "বাঃ বেটা শাবাশ!"

পালোয়ান বুদ্ধুসিংহের সঙ্গে বিষণগুরুর এই প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু তাঁর দেহের গড়ন আর সাজ দেখে সে ঠিক বুঝেছিল, কোনো ওস্তাদ কুস্তিগীর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শিষ্য মৈকুসিংহও পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বয়সে মৈকুসিংহ বিষণলালের মতোই। কিন্তু দেহের গড়নের দিক্ দিয়ে সে কিছু বেশী শক্তি ধরে। পালোয়ান বুদ্ধুসিংহ মৈকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখ্‌রে মৈকু, আর একজন তোর জুটি পয়দা হচ্ছে।"

মৈকুসিংহ খপ্ করে বুদ্ধুসিংহের পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, "গুরু, দু' মিনিটের মধ্যেই ওকে চিৎপটাং করে দিতে পারি। আমি হলেম ওস্তাদ বুদ্ধুসিংহের চেলা।"

বুদ্ধুসিংহ হেসে উঠলেন, "ও রে তুই হলি শিষ্য আর এ যে গুরু। কি হে বাবা, তোমার নাম বিষণ গুরু তো! যখন শুনলাম এই সোরাঁওতে আর একজন গুরু আখড়া খুলেছে তখন মন আর মানল না, চলে এলাম দেখতে। এখন তো তুমি নয়া জোয়ান, এখন থেকেই বসেছ গুরু হয়ে!"

বিষণগুরু দিক্‌পাল পালোয়ান বুদ্ধুসিংহের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল থতমত খেয়ে। ঘুমরু পণ্ডিত এতক্ষণ মন্দিরে বসে বসে তামাশা দেখছিল। তার মনে হ'ল, এবার রণক্ষেত্রে নামা দরকার। সে বিষণগুরুকে একদিকে সরিয়ে দিয়ে পালোয়ান বুদ্ধুসিংহের সামনে এগিয়ে এসে বলল, "বুদ্ধুগুরু, সিদ্ধি ঘোঁটা হচ্ছে। এক ঘটি সেবা হোক্! এই আখড়ার কথা ছেড়ে দাও। এই আখড়া তো আমরা

শিক্ষানবিশরা শখ করে করেছি। এর জন্যে রাগারাগির কি আছে।”

পালোয়ান বুদ্ধুসিংহ অট্টহাস্য করে উঠলেন, “তোমরা গাঁজাখোর, সিদ্ধিখোর ছেলে-ছোকরা, পালোয়ানী করবে কি করে! সে আমি ভালোভাবেই জানি। এই সোরাঁওতে গুরু শুধু একজনই হতে পারে। আর সে হ'ল বুদ্ধুসিংহ পালোয়ান।” তারপর তিনি বিষণলালকে বললেন, “আমি মাদুলি এনেছি বেঁধে নাও!”

এবার বিষণলালকে বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল, “মাদুলি তো শুধু একজন ওস্তাদেই বাঁধে। আমি জগু পালোয়ানের কাছে মাদুলি বেঁধেছি। আর এখন তো আমি নিজেই মাদুলি বাঁধতে এসেছি।”

বুদ্ধুসিংহ মৈকুরের দিকে তাকালেন, “কি রে মৈকু, শুনলি এই ছোকরাটার কথা। গুরু হয়ে এসেছে। মাদুলি বাঁধার দাবি করছে! এর মহড়া নিতে পারবি তো?”

এরমধ্যেই বেশ ভীড় আশেপাশে জমা হয়ে গিয়েছিল। নানারকম টিটকিরিও শোনা যাচ্ছিল। যাতা শ্লোগান দিয়ে চেঁচাচ্ছিল। বুদ্ধুসিহের কথায় সমবেত জনতা সায় দিল, “হয়ে যাক্। হয়ে যাক্! দেখা যাক্ কার কুদরতি বেশী!” কোলাহল বেড়েই চলতে লাগল।

ঘুমরু পণ্ডিত ঘটনার মোড়কে আবার সামলে নিলেন। ভীড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমরা সবাই কুস্তির লড়াই দেখতে এসেছ, খালি হাতে তা হতে পারে না। তবে আমাদের বিষণ গুরু আর মৈকুসিংহের লড়াই আজ থেকে পনেরো দিনের দিন মঙ্গলবার ঠিক্ রইল। বুদ্ধু পালোয়ান নিজের ইচ্ছামত সেখানে বা এখানে ঠাঁই বাৎলাতে পারেন। বিষণগুরু পেছবার মরদ নয়। বিষণ গুরু মৈকু পালোয়ানের কাছে হেরে গেলে তাকে বুদ্ধু গুরুর কাছে মাদুলি বাঁধতে হবে আর তিনি যদি মৈকুকে চিৎ করে দেন, তাহলে বিষণ গুরুর আখড়া থাকবে আগের মতোই। বুদ্ধু পালোয়ান আর কোনো দিন এমুখো হতে পারবেন না।

মৈকুসিংহ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বিষণলালকে দেখে বললে, "মঞ্জুর!"

যখন রাত্রে ঘুমরু পণ্ডিত মহাবীরের প্রসাদ নিয়ে বাড়ি পৌঁছলেন, তখন বেচু মিসিরের মজলিশ পুরো দমে জমে উঠেছে। ঘুমরুকে দেখে বেচু মিসির জোরে হেসে উঠলেন, "কি রে ঘুমরু, মন্দির তো বেশ জেঁকে উঠেছে, মনে হচ্ছে বাবা মহাবীরই ফলিয়েছেন।"

ঘুমরু পণ্ডিত জমায়েতে প্রসাদ বিতরণ করতে করতে বললেন, "এই নাও, বাবা মহাবীরের প্রসাদ। তাঁর প্রতাপ আবার গর্জে উঠেছে। কিন্তু দাদা আজ সত্যিই মজা হয়েছে। পালোয়ান বুদ্ধু সিংহের চেলা মৈকুসিংহ আর বিষণ গুরু রাজী হয়ে বাজি ধরেছে, পঞ্চদশ দিন, আসছে মঙ্গলবারে!"

বেচু মিসির খাড়া হয়ে শুধলেন, "এই বিষণ গুরুটি কে হে?"

"সে কি, আপনি জানেন না! বিষণ হ'ল তসিলদার সাহেবের খুড়তুতো ভাই। তারই সঙ্গে ভাগাভাগি করে আমরা এই মন্দির আর আখড়া চালাচ্ছি। মন্দিরের ভার আমার ওপর, আর আখড়ার ভার বিষণ গুরুর ওপর!"

বেচু মিসিরের বয়স পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশের মাঝামাঝি। তিনি সোরাঁওয়ের সমাজ জীবনের নেতা হিসেবে গণ্য। বেচু মিসির নায়েব তসিলদারি করতেন, পঞ্চায়েতী কাজকর্ম করতেন আর করতেন যজমানী। দু-চার বার ডেপুটি সাহেব ইঙ্গিত করেছিলেন, একজন দায়িত্বপূর্ণ বড়ো সরকারী চাকুরের এসব শোভা পায়না। কিন্তু বেচু মিসিরের উত্তর ছিল, "অভ্যাস বদলাবার নয়। নইলে তো এতদিনে নিজেই ডেপুটি কালেক্টার হয়ে যেতে পারতেন, তিনি নির্ভীক, প্রতাপশালী, বদমেজাজী আর ঝগড়াটে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ, সমভাবে সবার সঙ্গে মেলামেশা করতেন আর সুখদুখে সকলের সঙ্গী ছিলেন বলে লোকে তাঁকে ভালোবাসত।

জ্বালাপ্রসাদ ছিলেন বেচুর ওপর খুব সদয়। বরং বেচু মিসিরকে তিনি সম্মানই করতেন। সরকারী ব্যাপারে সব সময় বেচু

মিসিরের পরামর্শে চলতেন। বেচু মিসিরেরও জ্বালাপ্রসাদের ওপর একরকম মমতার ভাব ছিল। তিনি জ্বালাপ্রসাদের সৎ চরিত্রে আর সততায় মুগ্ধ ছিলেন।

মৈকুসিংহ আর বিষণ গুরুর মধ্যে বাজি হয়েছে, এ খবরটি বেচুর কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রধান কারণ, কিছু দিন আগে ঠাকুর বীরভান সিংহ বেচু মিসিরকে অপমান করেছিলেন সামাজিক সম্মান আর নেতৃত্বের ব্যাপারে।

এই খবরটি শুনে বেচু মিসির উঠে দাঁড়ালেন। তিনি জামা-কাপড় ছেড়ে জ্বালাপ্রসাদের বাড়ির দিকে চললেন। পথে দারোগা শহাবুদ্দীনের সঙ্গে দেখা। মৃদু হেসে দারোগা শহাবুদ্দীনকে বললেন, "শুনেছেন মিঞা সাহেব, তসিলদার সাহেবের খুড়তুতো ভাই এসেছে এখানে। খাসা পালোয়ান।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ মিসিরজি, আমি তাকে দেখেছি! শুনলাম যে বুদ্ধু পালোয়ান নাকি তার ওপর বেজায় খাপ্পা। একদিন তার আখড়ায় যাবেন। বুদ্ধুসিংহের বড়ো দেমাক হয়েছিল যাক্, এখন তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী তো হ'ল!"

"আরে ঐ বুদ্ধু আজ আবার তার আখড়ায় ঘুরেও এসেছে। তসিলদারের ভাই আর বুদ্ধুর চেলা মৈকুর মধ্যে পনের দিনের দিন কুস্তি লড়ার বাজি হয়েছে। তাহলে তো পুলিশের দিক্ থেকেই এই কুস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত!"

"আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন, নায়েব সাহেব! এখানে আজকাল খুব ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছিল। আমি আজ থেকেই সব ব্যবস্থা শুরু করে দিচ্ছি। প্রথমে ঠাকুর বীরভান সিংহের সঙ্গে এ বিষয় কথা বলে ঢোল মারফৎ শহরে ঘোষণা করিয়ে দেবো। তবে এরা দু'জনেই হ'ল কাঁচা ছোকরা, একটি বড়ো জুটি না হলে, টিকিট বিক্রি হবেনা।"

বেচু মিসির মুখ টিপে হাসলেন, "তবে, এই বুদ্ধুসিংহের জোটের পালোয়ান খোঁজা চাই। তারই চেষ্টা করুন। সেইজন্যেই তো

আপনাকে সব বললাম। চলুন তসিলদার সাহেবের সঙ্গেও পরামর্শ করা যাক্!"

এগারো

সোরাঁওয়ের পথে রাত ন'টার সময় দু'জন হৃষ্টপুষ্ট অপরিচিত লোককে এক্কা গাড়িতে করে আসতে দেখে দারোগা শহাবুদ্দীন এক্কা দাঁড় করালেন, "তোমরা কে, কি রে গাড়োয়ান, কোথা থেকে এঁদের আনছিস্?"

গাড়োয়ানের বদলে উত্তর দিলে একটি পঁচিশ বছরের ছিপছিপে যুবক, "হুজুর, আমরা এলাহাবাদ থেকে আসছি এক্কা করে। কিন্তু আমরা ফতেপুরের বাসিন্দে। তসিলদার সাহেবের কাছে একটু কাজে এসেছি।"

"কাজের জন্যে আসছ তো ঠিক্ই, তবে তোমরা কারা, সে পরিচয়টা তো দিলেনা।"

এক্কায় বসা বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহী লোকটি বললে, "হুজুর, এই ছেলেটি রহমত খাঁ, ফতেপুরের জমিদার, এখন মইআইমায় থাকে। আর আমাকে লোকে বলে জগ্‌গু পালোয়ান। এটি আমার শ্যালকের ছেলে, সেজন্যেই আমিও সঙ্গে এলাম। তসিলদার সাহেবের ছোট ভাই বিষণলাল আমার চেলা। হুজুর, তসিলদার সাহেবের বাড়ি বলে দিন তো বড়োই মেহেরবানি হবে।"

শহাবুদ্দীনকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বেচু মিসির গাড়োয়ানকে বললেন, "সামনে যে তেঁতুল গাছটি দেখছ, সেখান থেকে প্রায় একশ' পা এগিয়ে বাঁদিকে একটি মোড় পাবে, সেখান থেকে এক্কা ঘোরাবে। সেখান থেকে এক ফার্লং দূরেই তসিল, তারই সামনের বাড়িটা তসিলদার সাহেবের।"

এক্কা চলে যাবার পরেই বেচু মিসির বললেন, "মিঞা সাহেব,

কুস্তির ব্যবস্থা তো হয়েই গেল!" তারপরে উভয়েই পা-চালিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

তাঁরা জ্বালাপ্রসাদের বাড়ি যখন পৌঁছলেন তখন জ্বালাপ্রসাদ, জগ্‌গু মিঞা আর রহমত খাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আর বিষণলাল বৈঠকখানায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করছিল। এঁরা দুজনে পৌঁছবামাত্র কথাবার্তা বন্ধ করে জ্বালাপ্রসাদ উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন, "আসুন মিসিরজি, আসুন শহাবুদ্দীন সাহেব, এত রাতে কেন এত কষ্ট করলেন, ভালো তো সব! কিছু ঘটেছে নাকি?"

বেচু মিসির বসতে বসতে বললেন, "আজ্ঞে বিশেষ ঘটেনি কিছু। বাড়িতে মন টিকলোনা। ভাবলাম অনেক দিন হুজুরের বাসায় আসা হয়নি, তাই বেরিয়ে পড়লাম। এদিকে আসছিলাম, পথে দেখা হ'ল মিঞা সাহেবের সঙ্গে। আমি বললাম আজ তসিলদার সাহেবের ওখানেই বসে গল্প-গুজব হবে, তাই ইনিও সঙ্গে চলে এলেন।" তারপরে হ্যারিকেনের আলোতে জগ্‌গু পালোয়ানকে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "আজকাল তো সোরাঁওতে কুস্তির ধূম লেগে গেছে। বুদ্ধুসিংহের আখড়া তো ঠাকুর বীরভান্ সিংহের ছত্র-চ্ছায়াতেই চলছে। শুনলাম শ্রীমানের পক্ষপুটে নাকি শ্রীমানের ছোটভাই বিষণলাল ওরফে বিষণগুরু মহাবীর বাবার মন্দিরের বাগানে একটা আখড়া করছে।"

জ্বালাপ্রসাদ সতর্ক হয়ে বসলেন, "উড়ো উড়ো খবর তো আমিও শুনেছি। কিন্তু এসব বিষয়ে আমি বিশেষ কান দিইনি।" জ্বালা-প্রসাদ ডাকলেন, "বিষণ্। একটু এদিক এসো তো।"

বিষণলাল ছুটটে এলো, "বলুন।"

"নায়েব সাহেব বলছেন তেঁতুলে মহাবীর বাবার বাগানে তুমি নাকি আখড়া খুলেছ?"

বিষণলাল একথার কোন উত্তর দিলনা, চুপ করে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

জগ্‌গু পালোয়ান জোরে হেসে উঠলেন, "বাঃ রে আমার বাহাদুর, সোরাঁওতে আসামাত্র গুরু হয়ে বসেছ। জগ্‌গু পালোয়ানের শিষ্য কি না! হুজুর, বড়ো পরিশ্রমী আর ভাল ছেলে। একটু ভালো মতো রগ্‌ড় করলে আশপাশে এর জোটের পালোয়ান জুটবে না।"

বেচু মিসির সুযোগ বুঝলেন, "শ্রীমান্‌! মিঞা সাহেব বলছেন অনেক দিন থেকে সোরাঁওতে কোন ক্রীড়া কৌতুক হয়নি। পুলিশের দিক্‌ থেকে একটি কুস্তি-প্রদর্শনী হলে কেমন হয়। সৌভাগ্যক্রমে জগ্‌গু পালোয়ানও এখানে এসে পড়েছেন। বুদ্ধু সিংহ আর জগ্‌গু পালোয়ানের কুস্তির জোটে দর্শকের ভীড় ভেঙ্গে পড়বে। দ্বিতীয় কুস্তির জোট হবে বিষণ আর মৈকু সিংহের। বাকি চার পাঁচটি কুস্তির জোটের ব্যবস্থা পুলিশের জোয়ানদের মধ্যে থেকে হয়ে যাবে।"

খানিক ভেবে জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "হ্যাঁ, সে তা' মন্দ হবেনা।"

বেচু মিসির আর শহাবুদ্দীন চলে যাবার পরে জ্বালাপ্রসাদ বিষণলালকে জগ্‌গু পালোয়ান আর রহমত খাঁয়ের খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন। বিষণলালকে পাঠিয়ে দিয়ে জ্বালাপ্রসাদ আবার প্রসঙ্গ তুললেন, "রহমত খাঁ, আমি শ্যামুর সঙ্গে কথা বলার পরে সত্যি মিথ্যে জানতে পারবো। কিন্তু আমি তোমাকে স্থির বলতে পারি যে এতে আমার হাত নেই আর এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমি সলীমার সম্পত্তি একদম চাই না।"

রহমত খাঁ কিছু বলার আগেই জগ্‌গু পালোয়ান বললে, "হুজুরের মেহেরবানির জৌলুস চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হুজুর যেমন ন্যায়নিষ্ঠ, উদার হৃদয়, সৎ আর ভালো মানুষ জগতে তার জুড়ি কম। সেজন্যে শ্যামলাল যখন বললে যে সলীমার অংশটি সে হুজুরের নামে করে দিয়েছে তখন অন্ততঃ আমার তো তা বিশ্বাস হ'ল না। হুজুর, রহমত খাঁ বড়ো গরীব। মামলাবাজি করার মতো তার সাধ্য নেই। মউতে চুড়ির দোকান করে পেট চালায়।

স্বামী-স্ত্রী ছুটোছুটি করে কোনোমতে ছু'বেলা ছু'মুঠো অন্ন জোটায়। সে যদি কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে মামলা টামলা করে বেড়ায় তাহলে তো তাদের উপোসই থাকতে হবে।

এই প্রসঙ্গে জ্বালাপ্রসাদের মন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, জগ্‌গু পালোয়ান, মামলা যখন দায়ের হয়েছে তার উপায় তো করতেই হবে, আর ফয়সালা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তবে, কথা দিচ্ছি, আমার দিক্‌ থেকে অফিসারদের ওপর কোন রকম অন্যায় চাপ আমি দেবো না ঃ আমি এ মামলায় কোনো উৎসাহ দেবো না। জজ পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর খুব ন্যায়নিষ্ঠ, তাঁর ওপর ভরসা রেখে মামলায় ঠিক্‌ করে তারিখ করো।"

জগ্‌গু পালোয়ান আর রহমত খাঁ যে আশা নিয়ে এখানে এসেছিলেন তা পূর্ণ হ'ল। জ্বালাপ্রসাদের বিষয় যা তাঁরা শুনেছিলেন, সেটা যে ষোল আনা খাঁটি তা প্রমাণ হয়ে গেল। পরের দিন সকালে রহমত খাঁ চলে গেলেন কিন্তু জগ্‌গু পালোয়ানকে বিষণলাল, বেচু মিসির আর শহাবুদ্দীন খাঁ মিলে রেখে দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা দারোগা শহাবুদ্দীন খাঁর সঙ্গে বেচু মিসির ঠাকুর বীরভান সিংহের কাছে কুস্তি-প্রদর্শনীর প্রস্তাবটি নিয়ে গেলেন। প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল থানার দিক্‌ থেকে। ফতেপুরের জগ্‌গু আর সোরাওয়ের বুদ্ধু পালোয়ানের কুস্তির জোট ছিল প্রধান। দ্বিতীয় জোট পালোয়ান মৈকুসিংহ আর পালোয়ান বিষণের। আর অন্য পাঁচটি জোট হয়েছিল থানার জোয়ানদের। ঠাকুর বীরভান সিংহ বুদ্ধু সিংহকে ডেকে এনে তাঁর সামনে রাখলেন প্রস্তাবটি। বুদ্ধু সিংহ এড়াবার খুবই চেষ্টা করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রস্তাবটি স্বীকার করতেই হ'ল।

তোড়জোড়ের সঙ্গে প্রদর্শনীর প্রস্তুতি হয়ে গেল। এলাহাবাদ শহরে আর অন্য তসিলেও হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হ'ল। দুটি আখড়াতেই পরোদমে মহড়া চলতে লাগল।

প্রদর্শনীর দু'দিন আগে বুদ্ধু পালোয়ান বিষণ গুরুর আখড়ায় গিয়ে হাজির হলেন। তখন জগ্‌গু ওস্তাদ বিষণ গুরুকে তালিম দিচ্ছিলেন। কসরৎ শেষ হবার পরে জগ্‌গু পালোয়ানকে নিভৃতে ডেকে বললেন, "জগ্‌গু ওস্তাদ, আমার লজ্জা ঢাকতে হবে তোমাকে, তোমার শরণ নিতে এসেছি।"

বুদ্ধু পালোয়ানের কাচুমাচু মুখ দেখে জগ্‌গু পালোয়ানের হাসি পেল. "কি চাও হে?"

"কি আর বলব, ঠাকুর বীরভান সিংহের খেয়ে পরে আছি। যদি হেরে যাই তো খাওয়া পরা বন্ধ হয়ে যাবে।"

আজকাল জগ্‌গুও আপন কব্‌জার ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলেন। বুদ্ধু সিংহের কথা শুনে মনে তাঁর সাহস জাগল. হ্যাঁ, এতো খারাপ হবে, কি করা যায় বলো তো?"

বুদ্ধু পালোয়ান খ্যানিক ভেবে বললেন, "কুস্তিতে তুমি হেরে যাবে ভাবাও অন্যায়। আচ্ছা, যদি আমাদের কুস্তির জোট দাঁড়ায় সমান সমান কেমন হয় তাহলে? তাহলে কিন্তু দু'জনেরই মান রক্ষে হয়।"

এবার জগ্‌গু নিজের তুরুপ ছাড়লেন, "একটি শর্তে—বিষণ মৈকুকে ঘায়েল করতে পারবে।"

বুদ্ধু পালোয়ান এবারে প্রমাদ গণলেন। মৈকুসিংহ উদ্ধত নওজোয়ান। বিষণলালের কাছে তাকে হেরে যেতে রাজী করানো কেবল কঠিনই নয়, অসম্ভব।

বুদ্ধু সিংহ করুণ স্বরে বললেন, ওস্তাদ, এই মৈকু সিংহ আমার বশে নেই, অন্য কোনো উপায় ভাবো।"

জগ্‌গু ওস্তাদ বললেন. "কথাটা হ'ল এই, তোমার প্রতিপালক হলেন ঠাকুর বীরভান সিংহ আর বিষণলাল হ'ল তসিলদার সাহেবের ছোট ভাই। বিষণলাল হেরে গেলে তসিলদার সাহেবের মানে লাগবে।"

বুদ্ধু সিংহ খানিক ভাবলেন, পালোয়ান, তুমি তো ঠিক্‌ই বলছ। খামকা কেন যে আমি এই অফিসার বাড়ির ছেলে ছোকরাদের

সঙ্গে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলাম। এসব হ'ল ঐ মৈকুর উস্কানীতে। আচ্ছা যদি বিষণের কাছে মৈকুকে হার মানতে রাজী না করতে পারি তাহলে সে পরশু কুস্তির খেলাতেও আসবে না। রাজী তো?"

"হ্যাঁ, রাজী।"

কুস্তি প্রদর্শনীর দিন বহু লোক দূর দূরান্ত থেকে আসতে লাগলো টিকিট কিনে কুস্তি দেখতে। সোরাঁওতে যেন একটি মেলা বসে গেল। ছোটখাট কুস্তির জোটের পর বিষণ গুরু আর মৈকু সিংহ পালোয়ানের নাম ডাকা হ'ল। বিষণলাল ল্যাঙ্গোট খেঁচে তৈরীই ছিল, সে এক লাফে আখড়ায় দর্শন দিলে। কিন্তু মৈকুসিংহের কোন পাত্তাই মিললো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে ঘোষণা করা হ'ল, মৈকুসিংহ ময়দান থেকে কেটে পড়েছে। সবাই কানাকানি করতে লাগল, কোথাও কোনো গোলযোগ ঘটেছে। এমন সময় বুদ্ধু সিংহ পালোয়ান আর জগ্‌গু পালোয়ানের ডাক পড়ল।

বুদ্ধু সিংহ আর জগ্‌গুর কুস্তি সবে শুরু হয়েছে। হঠাৎ মৈকুসিংহ কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলো প্রদর্শনীর শামিয়ানার মধ্যে। মৈকুসিংহ সোজাই হাজির হ'ল জ্বালাপ্রসাদের সামনে গিয়ে। "হুজুর, আমি ময়দান থেকে পালাইনি। আমার গুরু বুদ্ধু সিংহ পালোয়ান আমাকে জোর করে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে এসেছিল। এখন সে নিজেই জগ্‌গু পালোয়ানের দলে মিলে গেছে। স্থির হয়েছে, কুস্তিটা যেন সমান সমান দাঁড়ায়।" মৈকুসিংহ কথাগুলি বেশ জোরেই বলতে লাগলো যাতে সবাই শুনতে পায়।

মৈকুসিংহের অভিযোগে দর্শকদের মধ্যে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, "এ সব ধাপ্পাবাজি চলবে না, আমাদের টাকা ফেরৎ দাও!"

সঙ্কট দেখে জগ্‌গু পালোয়ান আর বুদ্ধু সিংহ অবাক্ হয়ে গেলেন। জগ্‌গু বুদ্ধু সিংহের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। বুদ্ধু সিংহ জগ্‌গুর কানে কানে বললেন, "শালা মৈকু বেরিয়ে এল

কেমন করে রে। আমি তো তাকে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। ভগবানই জানেন দরজা ভাঙ্গলো কি করে!" এখানে এতো ভীড় না থাকলে এক্ষুনি ওর ঘাড় মটকে দিতাম!"

জগ্‌গু বুঝতে পারছিলেন বুদ্ধু মিথ্যে বলছে না। বুদ্ধু সিংহের মুখ দেখে জগ্‌গুর দয়া হ'ল। বুদ্ধুর কানে কানে বললেন, "পালোয়ান, চিন্তা করো না। তুমি আমার কথা রেখেছ। খোদা তোমার মঙ্গল করবেন।" উভয়ে তাকালেন পরস্পরের দিকে।

এবার জগ্‌গু আখড়ায় এগিয়ে এসে প্রদর্শনীর কর্তাদের ধমকালেন, "লোকেরা কি রকম চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছে। যদি কুস্তি আর না হয় তো আমরা যাই।"

জগ্‌গু পালোয়ানের হাঁক শুনে দর্শকেরা ভয় পেয়ে গেল। ক্রমশঃ হট্টগোলও কমতে লাগল। বেচ্‌ মিসির উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "কুস্তি আবার শুরু হোক্‌। মৈকুসিংহের কথা পরে শোনা হবে।"

জগ্‌গু পালোয়ান আর বুদ্ধুসিংহ পালোয়ান পরস্পরে এগিয়ে এসে হাত মেলালেন। তারপর শুরু হ'ল কুস্তি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে জগ্‌গু পালোয়ান বুদ্ধুর তুলনায় বেশী তেজী। কিন্তু শাবাশ বুদ্ধুসিংহ! দুই পালোয়ান একের পর এক ওস্তাদী প্যাচ মারছিলেন তেমনি প্যাচ কেটেও যাচ্ছিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক চললো এই ভাবেই। তারপরে হঠাৎ জগ্‌গু বুদ্ধুসিংহকে মাটিতে ফেলে প্রচণ্ড বেগে ঘসটাতে লাগলেন। কিন্তু বুদ্ধুসিংহ চিৎ হলেন না কিছুতেই।

দর্শকেরা বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে কুস্তি দেখছিল। তাদের বেশ মজা লাগছিল। তবে বেশীক্ষণ আর ধৈর্য রইল না। তারা কানাকানি করতে লাগল, মনে হচ্ছে মৈকুসিংহের কথাটাই তবে ঠিক্‌। এমন সময় বুদ্ধুসিংহকে চিৎ করবার জন্যে জগ্‌গু পালোয়ান যেই প্যাচ কষেছেন, সহসা তাঁকেই দেখা গেল চিৎ আর বুদ্ধুসিংহ সওয়ার তাঁর বুকের ওপর। বুদ্ধুসিংহ উঠে দাঁড়িয়েই আখড়ার

বাইরে ছুটে এসে জ্বালাপ্রসাদকে সেলাম করলেন। তারপর ঠাকুর বীরভান সিংহের পদধূলি নিলেন। হৈ হৈ পড়ে গেল, বুদ্ধু সিংহ জগ্‌গু পালোয়ানকে চিৎ করেছে। জগ্‌গু পালোয়ান মাথা হেঁট করে আখড়ার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এবার মৈকুসিংহকে তার বক্তব্য বলতে বলা হ'ল। বুদ্ধু সিংহের জগ্‌গুর সঙ্গে ঘোঁটের কথা মিথ্যে প্রমাণ হ'ল। মৈকুসিংহ ইতস্তত করতে লাগল। এমন সময় জগ্‌গু পালোয়ান এগিয়ে এসে বললেন, "হুজুর, ছোকরা কোথাও কিছু ভুল বুঝে বসে আছে। আপাততঃ বিষণ তো আখড়াতেই হাজির রয়েছে। এদের কুস্তির জোট হয়ে যাওয়া উচিত।"

চারিদিকে হাততালি পড়ে গেল। কিন্তু বিষণলাল যেন হতভম্ভ হয়ে গেল। জগ্‌গু চুপে চুপে বিষণকে ধমকালেন, "কি রে, ফ্যাল-ফ্যাল করে দেখছিস্ কি, যা যা আগে এগিয়ে যা। খোদার মর্‌জি হলে জিত তোর হবেই।" তারপর তিনি বুদ্ধু সিংহকে বললেন, "ওস্তাদ, দু'জনেই গোঁয়ার ছোকরা। উত্তেজনাবশতঃ কোথাও কোন ভুলভাল প্যাঁচ কষে না বসে, সেজন্যে এদের ওপর চোখ রাখার ভার তোমার ওপর।"

জোট আখড়ায় নামল। বুদ্ধু সিংহ মধ্যস্থ হলেন। মৈকুসিংহ বিষণলালের সঙ্গে হাত মেলাতে না মেলাতেই এমন প্যাঁচ কষলে যে বিষণলাল গজখানেক ওপরে উঠে নীচে ছিটকে গিয়ে পড়ল। সহসা বুদ্ধু সিংহ, মৈকুসিংহ আর বিষণলালের মাঝে এসে পড়লেন। বিষণলাল মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বুদ্ধু সিংহ মাঝে এসে পড়াতে মৈকুসিংহ বিষণলালের ওপর সওয়ার হয়ে চেপে বসবার আর অবসরই পেলে না। মাটিতে পড়ামাত্র বিষণলাল এক লাফে উঠে দাঁড়াল। এমন সময় বুদ্ধু সিংহ এদের মধ্যে থেকে সরে এসে আখড়ার পাশে দাঁড়ালেন।

এবার উভয়ের আসল কুস্তি শুরু হ'ল। দেখা গেল, বিষণলাল আর মৈকুসিংহ আখড়ার চার পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, আগে আগে

বিষণলাল আর পিছু পিছু মৈকুসিংহ। কিন্তু কেউই কারো কবলে ধরা পড়ছে না। দর্শক হাসছে, বিদ্রূপ করছে, হৈ চৈ করছে। প্রায় মিনিট পাঁচ ধরে এই রকম চলল। শেষে বিদ্রূপে বিরক্ত হয়ে মৈকুসিংহ বিষণলালকে ধরে ফেলল। দু'জনে পরস্পরকে জাপটে আখড়ার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। বুদ্ধুসিংহকেও তাদের প্যাঁচ লক্ষ্য করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে হচ্ছিল।

মৈকুসিংহের মনে হ'ল হঠাৎ যেন কোথাও ধাক্কা খেয়ে সে জোরে পড়ে গেল। পড়তে পড়তে সে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলে কিন্তু পেটের ভরে ডান দিকে কাৎ হয়ে গেল। আর বুদ্ধু-সিংহের স্বর শোনা গেল, "শাবাশ বেটা, বিষণলালের জিত হ'ল।" তিনি বিষণলালকে মৈকুসিংহের কবল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। বিষণলাল সোজা জগ্‌গু পালোয়ানের কাছে ছুটে এসে সেলাম করল। আরপর তসিলদার সাহেবকেও সেলাম করলে।

দর্শকের ভীড় অনুভব করছিল যে এই দুটো কুস্তিতেই কোথাও যেন কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু কোথায় এবং কিভাবে এটা হ'ল সেটা কেউই বুঝতে পারলে না। মৈকুসিংহ নিজেই বুঝতে পারলে না। যা কিছু দেখা গেল সেটা কি অবিশ্বাস করবার মতন।

কুস্তি প্রদর্শনীর পরের দিন পালোয়ান বুদ্ধুসিংহ পালোয়ান জগ্‌গুর সঙ্গে দেখা করতে এলো। গত সন্ধ্যার পুরস্কারের পঞ্চাশ টাকা ছিল তাঁর ট্যাঁকে। তিনি সেই পঞ্চাশ টাকা জগ্‌গু পালোয়ানের সামনে দিয়ে বললেন, "ওস্তাদ, এ টাকা তোমার। তুমি আমাকে যে লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছ, সে উপকারের ভারে আমি চাপা পড়ে আছি। আর শালা মৈকুকে আজ সকালেই আমি আখড়া থেকে দূর করে দিয়েছি!"

জগ্‌গু পালোয়ান পঞ্চাশ টাকা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বিষণ-লালের দিকে তাকালেন, "শোন রে ছোঁড়া। বুদ্ধুসিংহ পালোয়ানের কাছে মাদুলি বাঁধিয়ে নে, গুরু হতে তোর এখন ঢের দেরি। তোর লজ্জা ইনিই ঢেকেছেন।"

সেদিন দুপুরে জগ্গু পালোয়ান ফতেপুরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

কুস্তি প্রদর্শনীতে যা হ'ল সেটা বেচু মিসিরের ভালো লাগল না। তসিলদার সাহেবের ভাই বিষণলাল মৈকুসিংহকে পরাস্ত করেও বুদ্ধুসিংহের শিষ্য বনে গেল। তার খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধুসিংহের খ্যাতিও বেড়ে চলল। এদিকে তাঁর ভাই ঘুমরু বাবা মহাবীর মন্দিরের পুজারীই রয়ে গেল।

উপরন্তু আর একটি ব্যাপার ঘটল, সেটা বেচুর খুবই খারাপ লাগল। যে আমবাগানে মহাবীর বাবার মন্দির আর আখড়া ছিল সেটি ঠাকুর বীরভান সিংহের জমিদারির এলাকায়। ঠাকুর বীরভান সিংহ সেই আমবাগানের মোকরীর দলিল বিষণলালের নামে লিখে দিলেন পুরস্কার স্বরূপ। দলিলে আমবাগানের চার বিঘে জমির সঙ্গে একটি পাকা কুয়ো আর মহাবীর বাবার মন্দিরও ছিল। সব কিছুই হয়ে গেল বিষণলালের সম্পত্তি। এখন ঘুমরু মন্দিরে অংশীদার না হয়ে রইল বিষণলালের কৃপার ওপর।

গরম বেশ বেড়ে গিয়েছিল। জ্বালাপ্রসাদের বাড়ির পরিবেশ শান্ত। দেওয়ানী আদালতে গ্রীষ্মের এক মাস ছুটি। ছুটি হওয়া মাত্র সাব জজ গিরিজাশঙ্কর মিশ্র নিজের বাড়ি সোরাঁওএ এলেন।

গিরিজাশঙ্কর আর বেচু একই বংশের। দুজনার বাড়িও ছিল গায়ে গায়ে। পঞ্চাশ বছর আগে এঁদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই দু' বাড়ির মধ্যে মন কষাকষি চলে আসছে। ইংরেজ আমলে যখন গিরিজাশঙ্কর আর বেচু দুজনেই সরকারী চাকরি পেলেন তখন থেকে দু' বাড়ির শত্রুতারও অবসান হ'ল। বেচু মিসির গিরিজাশঙ্করকে আপন অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করতেন আর তাঁর কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন অনুজের স্নেহ। বেচু মিসিরের মারফৎ সাব জজ গিরিজাশঙ্করের সঙ্গে জ্বালাপ্রসাদের আলাপ হয়েছিল। সে পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতার রূপ নিয়েছিল।

গিরিজাশঙ্কর এসেছেন খবর পেয়ে তৃতীয় দিন মুন্সী শিউলাল বেচু মিসিরের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন।

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। তারপর গিরিজা-শঙ্করের পাশে মুন্সী শিউলালকে বসিয়ে বেচু মিসির বললেন, "মুন্সীজি গরম তো ভীষণ পড়েছে, এখন পর্যন্ত লু চলছে। সেজন্যে কচি কচি আম দিয়ে সিদ্ধির সরবৎ ঘোঁটা হচ্ছে, খেলেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

মুন্সী শিউলাল বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন মশাই, আজ পর্যন্ত একটা জিনিসই সঙ্গ নিয়েছে।"

"মুখের স্বাদ বদলাবার জন্যে কখন কখন অন্য জিনিষও চলতে পারে।" হাসতে হাসতে বললেন গিরিজাশঙ্কর।

"সাব জজ সাহেব, মুখের স্বাদ বদলাবার বয়স আর নেই। এখন তো মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি, না জানি কবে এসে পড়ে। আপনি বিশ্বাস করবেন না, এখন আধাও খেতে পারি না। সময় গেছে তখন ঘড়াঘড়া খেতে পারতাম। এখন মদ খাই ওষুধের মতো।"

সিদ্ধি প্রস্তুত। সকলের আগ্রহ মুন্সী শিউলাল এড়াতে পারলেন না। তাঁকে কচি আমের সিদ্ধি খেতেই হ'ল আধ ভাঁড়।

সিদ্ধি ছাঁকার আধঘণ্টার মধ্যেই গিরিজাশঙ্কর আর বেচুর আত্মীয়েরা চলে গেলেন। সকলে যাবার পরে বেচু মিসির জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন তো আপনার শরীব ভালো? বলুন মুন্সীজি কেন এত কষ্ট করলেন?"

"সবই ঠাকুরের দয়া," মুন্সীজি উত্তর দিলেন, "সাব জজ সাহেব এসেছেন খবর পেয়ে ভাবলাম দেখা করে আসি। জ্বালার তো নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।"

"আরে, আপনি কেন কষ্ট করলেন, আমবাই তো দু'-একদিনের মধ্যে যেতাম ওদিকে", বললেন গিরিজাশঙ্কর।

"আমার আসাতেই বা কি আর হয়েছে। কথাই তো আছে তৃষ্ণার্তই যায় কুয়োর কাছে। আমাদের কিছু নিজস্ব কাজ ছিল,

ভাবলাম সাব জজ সাহেব তো নিজেরই লোক, তিনি যদি সাহায্য না করেন তো আর কে করবে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।" গিরিজাশঙ্কর বললেন বটে, কিন্তু তাঁর গলার স্বর কাঁপছিল।

মুন্সী শিউলাল গলা খাঁকরে বললেন, "ব্যাপারটা হ'ল, আমাদের ফতেপুরের জমিদারিতে কিছু ঝামেলা বেধেছে। আপনার আদালতে একটি মামলা চলছে। বাদী হলেন রহমত খাঁ। প্রতিবাদী হলেন শ্যামলাল আর শ্রীমতী সলীমা।"

"হ্যাঁ, শ্রীমতী সলীমা শ্যামলালের কাছে গ্রামটা বন্ধক রেখেছেন, না তাকে দান করেছেন, না তার নামে লিখে দিয়েছেন—কিছু স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না। তবে শ্রীমতী সলীমা বলছেন, তিনি নিজের সম্পত্তি বন্ধক রাখেননি অথবা দানও করেননি। তাঁকে নাকি আফিম খাইয়ে টিপ সই নিয়ে নেওয়া হয়েছে।"

"সে মিথ্যে বলছে......।" উত্তেজিত হয়ে শিউলাল বললেন, "আজ পর্যন্ত সে জ্বালার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছে। কখনো মৌলুদ[1] করেছে, আবার ভোজ দিয়েছে। মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গেও তার বনিবনা নেই।"

গিরিজাশঙ্করের বলার আগেই বেচু মিসির বললেন, "যদি তসিলদার সাহেব টাকা দিয়ে থাকেন তো তিনি মিথ্যে বলবেন না। তসিলদার সাহেব যদি শুধু এই বলে দেন যে তিনি টাকা দিয়েছেন তাহলে মামলায় আপনাদের জিত হয়ে যাবে সন্দেহ নাই। এতে আপনার আর চিন্তার কি আছে।"

মুন্সী শিউলাল বললেন, "আসলে সে টাকা জ্বালা দিয়েছিল শ্যামলালকে, সোজাসুজি সলীমার হাতে তো দেয়নি, সেজন্যে সলীমাকে টাকা দেবার কথা সে স্বীকার করবে না।"

---

[1] যে মজলিসে হজরত মোহম্মদের জন্মকথা বর্ণিত হয়।

বেচু মিসর কাঁচা লোক নন, "তাতে কি হয়েছে। তসিলদার সাহেব এ বলে দিন তাহলেই যথেষ্ট হবে।"

মুন্সী শিউলাল হকচকিয়ে গেলেন, "আমি জ্বালার পিতা। আমার বলাটাই কী যথেষ্ট নয়।"

এবার গিরিজাশঙ্কর উত্তর দিলেন, "আর শ্যামলাল জ্বালাপ্রসাদের খুড়তুতো ভাই, রাধেলাল জ্বালাপ্রসাদের খুড়ো। যখন আমি তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারছি না তখন আপনার কথা কি করে বিশ্বাস করি? হ্যাঁ, জ্বালা বড়ো সরকারী অফিসার, তার মান ও প্রতিষ্ঠা আছে, সে মিথ্যে বলে না। তার কথা আমি বিশ্বাস করবো।"

মুন্সী শিউলাল উঠতে উঠতে বললেন, "তা বেশ, আমি জ্বালাকে বলবো সে নিজেই আপনার সঙ্গে কথা বলবে। এ সম্পত্তি শ্যামলাল জ্বালার নামে লিখে দিচ্ছে। সেজন্যে যদি সঙ্কোচ করে এ মামলায় জ্বালা নিজে কিছু না বলতে চায়, তাহলে এ প্রমাণটা কি যথেষ্ট নয়?"

"না মোটেই না। যৌথপরিবারে সম্পত্তি যার নামেই থাক তাতে কিছু এসে যায় না। মুন্সীজি, আপনি এটুকু তো নিশ্চয়ই জানেন। কথাটা হল শুধু বিশ্বাস। জ্বালাবাবুকে আদালতে যেতে হবে না তিনি আমাকে বাড়িতে এসেই বলে দিন। দেওয়ানী খোলা মাত্রই জেরা হবে, জেরা শেষ হলেই আমি রায় দিয়ে দেবো।"

বাড়ি ফিরে মুন্সী শিউলাল জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "সাব জজ গিরিজাশঙ্কর সম্প্রতি এখানে এসেছেন। আমি আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বলছিলেন জ্বালাবাবুর সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি।"

"আজ্ঞে, এখন কাজের চাপ একটু বেশী, দু-এক দিনের মধ্যেই যাবো।"

মুন্সী শিউলাল জ্বালাপ্রসাদের দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, "আমি শ্যামুর মামলার কথা বলেছি। বললেন, যদি জ্বালা বলে

সে সলীমাকে টাকা দিয়েছে তাহলে তিনি রহমত খাঁর মোকদ্দমা খারিজ করে দেবেন।"

"কিন্তু......কিন্তু বাপ্পা, আমি সলীমা বিবিকে কখন টাকা দিলাম। আমি তো তাকে চিনিই না। এতো বড়ো মিথ্যে আমি তো বলতে পারবো না।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু তুমি তো বলতে পারো যে তুমি শ্যামলালকে সম্পত্তি কিনতে টাকা দিয়েছ। আর শ্যামলালকে জমি কেনার জন্যে তোমার টাকা দিয়েছি আমি, এটাতো আর মিথ্যে নয়। টাকা সলীমার জমিদারি কেনার জন্যে দেওয়া হয়েছে কি অন্য জমির জন্যে, তাতে কিছু এসে যায় না।"

জ্বালাপ্রসাদের মুখের ওপর বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল, "আজ্ঞে, এতো যুধিষ্ঠিরের উক্তি, অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ।"

মুন্সী শিউলাল তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দিলেন, "মহাভারতের কথা এখানে খাটে না।

"আজ্ঞে, এটা কলিযুগ। তার ওপর আবার আমার রথের চাকা মাটি থেকে উঁচুতে চলে না, ফলে মাটিতে ঠেকে যাবার ভয়ও নেই। সবই বুঝি, কিন্তু উঁচু সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি মিথ্যে বলতে পারবো না। আর যতখানি অর্ধ-সত্যের প্রশ্ন, সেখানে পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর দ্রোণাচার্য নয় যে অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে দিয়ে বসে পড়বেন। তিনি হলেন সাব জজ! জেরা করবেন আর তখন অর্ধসত্য সহজেই পূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব মিথ্যে আমি বলবো না।"

মুন্সী শিউলাল বেচু মিসিরের কাঁচা আমের সিদ্ধির সরবৎ খেয়েছিলেন মাত্র দু-চার ঢোঁক, কিন্তু সেটা ছিল বেশ কড়া। তাঁর মনে হ'ল, এই সত্যনিষ্ঠা আর সততার জেদে তাঁর ছেলে নিজের পায়ে নিজে শুধু কুড়ুলই মারছে না, বরং উপহাস করছে তাঁকেও আর আপন পরিবারের লোকেদেরও। জ্বালাপ্রসাদের প্রত্যেকটি কথা তাঁর অতি রূঢ় কটূক্তির মতো অপমানজনক বোধ হচ্ছিল। মুন্সী শিউলাল হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে উঠলেন, "বড়ো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাপ

হয়েছিল। খাসা জমিদারি ছেড়ে দিচ্ছিস। আমি জানতাম না আমার ছেলে এতো নিরেট অকর্মা হবে!"

মুন্সী শিউলালের গলা বেশ চড়া হয়ে উঠেছিল, ছিনকি, ভিখু, যমুনা, বিষণলাল সবাই উঠানে এসে জড়ো হয়েছিল।

ক্রোধ পাগলামিরই রূপান্তর। পাগলামির ঝোঁকের মতো রাগেরও ঝোঁক আসে, তখন মানুষ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মুন্সী শিউলাল খানিকক্ষণ জ্বালাপ্রসাদের উত্তরের অপেক্ষা করলেন। কিন্তু জ্বালাপ্রসাদের কোনো উত্তর পেলেন না। উপরন্তু, সেখানে একটি ভীড় জমা হয়ে গেল। মুন্সী শিউলাল গর্জে উঠলেন, "গাধা, কথা বলছিস না কেন। তোকে জন্ম দিলাম, লেখাপড়া শেখালাম। আর আমারই কথা শোনবার সময় তুই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাপ হয়ে বসবি, সেইজন্যেই কি আমি এসব করেছি?"

পিতার ক্রোধবহ্নিতে জ্বালাপ্রসাদের অন্তরের সত্যনিষ্ঠা আর সততা যেন আরো উদগ্র হয়ে উঠলো। এবার তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "আপনি তো কি, নিজের সত্যনিষ্ঠা আর সততা স্বয়ং ঈশ্বর এসে ছাড়তে বললেও আমি ছাড়বো না।"

সহসা মুন্সী শিউলাল উঠে দাঁড়ালেন। পাশে রাখা জল ভরা কুঁজোটা তুলে ধরে তিনি বললেন, "এইনে, তোর সত্যনিষ্ঠা আর সততার জন্যে আমি নিজেই বলি হচ্ছি।" এই বলে দেহের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ ক'রে তিনি দু'হাতে ভরা কুঁজোটা তুলে নিয়ে নিজের মাথার ওপর আছড়ে মারলেন।

মুন্সী শিউলাল আঘাতের চোটে টলমলিয়ে ধরাশায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই ছুটে এলো তাঁর কাছে। তিনি ধরাশায়ী হয়েই জ্ঞান হারালেন। তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ঝরছিল।

সেদিন রাতেই এলাহাবাদ থেকে ডাক্তার ডাকা হ'ল। অনেক চিকিৎসা হ'ল। কিন্তু মুন্সী শিউলালের জ্ঞান আর ফিরলো না। এক সপ্তাহ ধরে সংগ্রাম চলল জীবন-মৃত্যুর। সাত দিন পরে তিনি

চোখ মেলে চাইলেন। ছিনকিকে দিয়ে ডাকালেন জ্বালাপ্রসাদকে। পুত্রকে দেখেই তাঁর চোখ ভরে উঠল জলে, "বাবা, আমি চললাম। আমাকে ক্ষমা করো। ভুল হয়নি তোমার। যাক্, বার্ধক্য থেকে মুক্তি পেলাম!"

জ্বালাপ্রসাদ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বাপ্পা, আপনি সেরে উঠবেন, একথা আর বলবেন না!"

মুন্সী শিউলাল ইশারায় ছিনকিকে কাছে ডাকলেন, তারপরে ক্লান্ত ও ক্ষীণ স্বরে বললেন, "ছিনকিকে নিজের মায়ের মতো জানবে। একে তোর দয়ার ওপর ছেড়ে চললাম।" এই বলে মুন্সী শিউলাল চোখ বুজলেন চিরকালের মতো।

বারো

বাড়ির সামনের লনে বসে মুন্সী রাধেলাল জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে শ্রাদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন, "বাবা জ্বালা, দাদা ছিলেন বড়োই প্রতাপশালী। বংশটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন। পাঁচ'শ ব্রাহ্মণ ভোজন করানো উচিত; কিন্তু বোধহয় আশেপাশে পাঁচ শ' ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে না। তাহলে সওয়া'শ ব্রাহ্মণ ভোজন করানো যাক্। তারপরের প্রশ্ন হ'ল নিজেদের আত্মীয়স্বজন আর পরিচিতদের নিয়ে। সোরাঁও, এলাহাবাদ, ফতেপুর মিলিয়ে দু-তিন শ' মতো লোক তো হবেই।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "তার মানে হ'ল প্রায় পাঁচ-ছশ' লোককে ভোজ দিতে হবে।"

"হ্যাঁ বাবা, এ দাদার পরলোকের ব্যাপার, এ সবে তো আর মিতব্যয়িতা করা চলে না। আর অন্যরা যা করে করুক। তুমি হলে তসিলদার, সোরাঁওয়ের রাজা। সব জোগাড় হয়ে যাবে নিমেষে। শুধু তোমার হুকুমের অপেক্ষায়।"

জ্বালাপ্রসাদ চাপা গলায় বললেন, "আজ্ঞে, কিন্তু আমি এ সব কোনো দিন করিনি, কারণ এ সব করা অনুচিত। শ্রাদ্ধে এ সব কি জরুরী?"

"জরুরী না হলে কি আর আমি তোমাকে বলতাম।" রাধেলাল কথাগুলোর ওপর বেশ একটু জোর দিয়েই বললেন, "দাদা বড়ো পুণ্যাত্মা, প্রতাপশালী মানুষ ছিলেন। তাঁর সদ্‌গতি হওয়া তো উচিত। ব্রাহ্মণ ভোজন করালে আর আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ালে তাঁর আত্মা সন্তুষ্ট হবে, তাঁর সদ্‌গতি হবে। আমি এক্ষুনি আমজাদ আলি কানুনগোকে বলে দিচ্ছি। বাড়িতে বসে পনেরো দিনের মধ্যে সব জোগাড় হয়ে যাবে।"

ছিনকি পাশেই দাঁড়িয়ে এ সব কথাবার্তা শুনছিল আর তার চোখে জল ঝরছিল টপ টপ করে। সে আর থাকতে পারলে না, "জোর জুলুম করে যে সব জিনিষপত্র জোগাড়যন্ত্র হবে তাতে তাঁর পরলোকে গতি হবে না। বরং নষ্ট হবে! সেজন্যে চলবে না এ সব। একুশ জন ব্রাহ্মণ খাইয়ে দাও আর জন পঞ্চাশ-ষাট চেনাশোনা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে নিয়ম ভঙ্গের খাওয়ান করো। এর জন্যে যা জিনিষপত্তর লাগবে তার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেবো, তোমাকে তার ভাবনা ভাবতে হবে না।"

ছিনকির নাক গলানো রাধেলালের ভালো লাগল না, "তুই কথার মাঝে কথা বলিস কেন বল তো! কোথা থেকে এলি গিন্নীপনা করতে, আমাদের নাক কাটার জন্যে কোমর বেঁধেছিস না কী!"

ছিনকি এবারে ফেটে পড়ল। সে জ্বালাপ্রসাদকে বললে, "আমি আর এ বাড়িতে থাকবো না আর কথাও বলব না! এদেরই অধর্মের ফাঁদে পড়ে তিনি প্রাণ দিলেন। এবার জ্বালাকে সেই ফাঁদে ফেলতে চাইছে! আমি এ সব আর দেখতে পারবো না!" সে কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে গেল।

ছিনকি চলে গেলে জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "কাকাবাবু, আমি তো মনে করি ছিনকি ঠিক্‌ই বলেছে। প্রজাদের কাছ থেকে জোর-

জুলুম করে উস্‌্বুল করলে তাদের মনে কষ্ট হবে। আর আমার কাছেও টাকা নেই। সেজন্যে একটু স্থির হয়ে ভেবেচিন্তে দেখুন!"

এমন সময় শ্যামলাল গঙ্গাপ্রসাদকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে জ্বালাপ্রসাদের সামনে নিয়ে এলেন, "দাদা গঙ্গার গুণ দেখ। বিষণু আর তার বখাটে বন্ধুদের দলে মিশে সিদ্ধি খেয়ে এসেছে। আর এই ভিখু কোথায় ছেলেকে নিষেধ করবে, তা না নিজেও এক ঘটি সিদ্ধি টেনে এসেছে।"

জ্বালাপ্রসাদ বা রাধেলাল কিছু বলার আগেই ভিখু এগিয়ে মিষ্টির একটা ডালা সামনে রাখলে; "এই নাও, মহাবীর বাবার প্রসাদ! গঙ্গা পাস পেয়েছে কি না তাই মন্দিরে সিদ্ধি ঘোঁটা হয়েছিল। আমিও প্রসাদ একটু নিলেম, আর গঙ্গাও নিলে। এমন সময় শ্যামু সেখানে মোড়লি ফলাতে গিয়ে হাজির হ'ল। আর তখন থেকেই মিছিমিছি গঙ্গাকে কাঁদাচ্ছে, লজ্জাও নেই! ওখানে বিষণুকেও গালমন্দ করে এলো।"

ভিখুর কথায় বল পেয়ে গঙ্গাপ্রসাদ আরো জোরেজোরে কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে ছিনকি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আর খুব আদর করে তার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, "এই কচি তুলতুলে ফুলের মতো ছেলেকে কি এমন ভাবে ধমকানো উচিত! চলো বাবা, আজ এই আনন্দের দিনে ওকে আবার কাঁদালে!" ছিনকি গঙ্গাপ্রসাদকে চুপ করাতে করাতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। আর ছিনকির পিছনে পিছনে ভিখুও মিষ্টির ডালাটা নিয়ে চলে গেল।

ওরা যাওয়া মাত্রই শ্যামলাল বললে, "দাদা আপনি এই ছোট-লোকেদের বড়ো বেশী মাথায় তুলেছেন! আমাদের মুখের ওপর সমানে চোপা করে এরা!"

রাধেলাল ছেলেকে বোঝালেন, ও কিছু নয়, জ্বালা খুব সাদা-সিধে আর বেশী ভালো মানুষ কিনা। এখন আমি এসেছি বাড়ির বড়ো কর্তা। দেখো, এবার এদের দেমাক কেমন ঠিক করি!"

জ্বালাপ্রসাদ পিতা পুত্রের কথা যেন কিছু শোনেননি। শ্যামলালকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা শ্যামু, তুমি ফতেপুরের জমির কি ব্যবস্থা করলে? এবারে ফসল তো ভালো হয়েছিল?"

"আজ্ঞে, ফসলের তো কথাই নেই। কিন্তু দাদা, কি আর বলবো, দুনিয়া একেবারে বেইমান হয়ে গেছে। যে চাষীদের জমি দলিল করে দিয়েছিলাম, তারা বেইমানী ক'রে কোমর বেঁধেছে। খাজনা বন্ধ করেছে। মনে হচ্ছে তাদের নামে মামলা দায়ের করতে হবে।"

"আর সে সত্তর বিঘে জোত জমির কি হ'ল?"

"আজ্ঞে, সেটি ভাগচাষে দিয়েছিলাম, কিন্তু কেশোসিংহ যে এত বড়ো চোর তা আমি ভাবিনি। রাতারাতি ফসল কেটে কোথায় উধাও করে দিলে আর আমাকে বললে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। মাত্র দেড়শ' মণ গম আর একশ মণ ছোলা পাওয়া গেছে। তা থেকে প্রায় সত্তর মণ গম আর কুড়ি মণ ছোলা মহাজনকে বীজের ধারের চৌথো গুণে সুদ দিতে হ'ল। সব মিলিয়ে ত্রিশ মণ গম আর ত্রিশ মণ ছোলা ঘরে ঢুকেছে। সেটা বেচে খাজনা মিটিয়েছি। প্রায় পনেরো টাকা মতো নিজের পকেট থেকে গচ্ছা দিতে হয়েছে।"

জ্বালাপ্রসাদের মুখের ওপর মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, "চাষবাস অন্যকে দিয়ে হয় না শ্যামু, উদ্যোগী হয়ে পরিশ্রম করতে হয়!"

"আজ্ঞে, আপনি ঠিক্ বলছেন। কিন্তু দাদা, লাঙ্গল তো আমি ধরতে পারবো না। বংশের মানমর্যাদা আছে। তারপর ফতেপুরে থেকে এত অল্প জমি দেখাশোনা করায় লাভ কি? যদি রহীমপুরা মৌজা হাতে এসে যেত তবে না হয় কথা ছিল। এই জোত জমি আর ক্ষেতের ওপর নির্ভর করে তো আর জীবিকা চলবে না।"

"তা হলে জমিগুলো বিক্রি করে দিচ্ছনা কেন?" জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

এবারে রাধেলালের কথা বলার পালা, "বাবা জ্বালা, জমি বিক্রি করার কথা বলো না। জমি বরং আরো কেনার কথা হওয়া

উচিত। দাদার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে শ্যামুকে নিয়ে আমি ফতেপুরে যাবো। কিছু টাকা আছে আমার কাছে। মৌজা বীরপুরের তিন আনা অংশ বিক্রির আছে, সম্ভব হলে সেটা কিনে নেবো। আমাদেরও তো কিছু সম্পত্তিটম্পত্তি করতে হবে!"

এমন সময় একটি এক্কাগাড়ি বাড়ির মুখে আসতে দেখা গেল। "এসময় কে আসতে পারে?" বলে, রাধেলাল ওখান থেকেই হাঁক দিলেন, "কে?"

পর্দা ঝোলান এক্কা গাড়িখানা থামল বাড়ির সামনে এসে। রাধেলালের বড় ছেলে রামলাল পর্দার বাইরে বসেছিল। এক্কা থেকে নামতে নামতে সে বললে, "আমি বাপ্পা! স্কুলে গরমের ছুটি হ'ল তাই সবাইকে নিয়ে চলে এলাম।" জ্বালাপ্রসাদ দেখলেন এক্কা থেকে রামলালের স্ত্রী, শ্যামলালের স্ত্রী আর তিনটি শিশু নামল।

শ্যামলাল ছুটে গিয়ে এক্কা থেকে জিনিষপত্র সব নামাল। বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। দুই বৌ শাশুড়ীকে প্রণাম করলে আর যমুনার সঙ্গে কোলাকুলি করলে। ভেতরের উঠানে দুটো খাটিয়া পাতা হ'ল। মেয়েরা বসে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসাবাদ করে গল্পগুজব করতে লাগলেন। রামলাল সবার সঙ্গে বাইরে বসলেন।

"কি জ্বালা, ভালো আছ তো! আমি ভাবছিলাম জ্যেঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধের দিন তো এসে গেছে। সেইজন্যে স্কুলের ছুটি হওয়ামাত্রই সকলকে নিয়ে সোরাঁওয়ের দিকে রওনা হলাম।" তারপরে শ্যামুর দিকে ঘুরে, "কি শ্যামু, জমিজায়গা কি এমনি করে সামলানো যায়? তুমি এখানে এসে গাঁট হয়ে বসে আছ, আর ওখানে জোতজমির ঝামেলায় ফৌজদারী মামলা রুজু হতে চলেছে। বাপ্পা, শ্যামু একটু পরিশ্রম করলেই ওখানে বেশ ভালো আয়-টায় হতে পারে। কিন্তু এর তো ওখানে মনই টেঁকে না। ওর মন কখনো সোরাঁও, কখনো এলাহাবাদ আর কখনোবা ফতেপুর। সুযোগের সময়ে ওখানে না থাকলে সুযোগ ফসকাবে না?"

রামলাল এসেই পঞ্চায়েতী জুড়ে দিলেন। শ্যামলাল রেগে বললে, "আপনি তো রয়েছেন ওখানেই, জমি আপনি সামলান না কেন ?"

রামলাল সগর্বে মাথা তুললেন, তুমি জান কি, আমি চাষীদের কাছ থেকে পুরোপুরি খাজনা আদায় করেছি। শুধু তাই নয়, আমার জমির লাগোয়া আট বিঘে জমি ঠাকুর বাচ্চু সিংহের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি। অর্ধেক টাকা তো দিয়েই দিয়েছি, আর বাকি তিন শ' টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। জ্বালা, সে করবে তুমি।"

"সে কাকা করবেন। জমি কেনবার জন্যে কাকা কিছু টাকা জমিয়েছেন।"

জ্বালাপ্রসাদের এ সব কথাবার্তা বড়োই অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি ডাক দিলেন, "ভিখু !"

"হ্যাঁ দাদা," বলতে বলতে ভিখু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, "কি বলছিলে ?"

"কাকিমাকে জিজ্ঞাসা করো রান্না হয়েছে কি ? অনেক রাত হয়ে গেছে, আমার ক্ষিদে পেয়েছে। এঁরাও এসেছেন। আমি শীঘ্র খেয়ে ঘুমোবো, বড়ো ক্লান্ত বোধ করছি।"

"রান্না তো কখন হয়ে গেছে। ঠাকরুণ রেঁধেবেড়ে চলেও গেছে। কাকিমা লুচি ভাজছেন! ততক্ষণে রামলাল দাদাবাবু স্নানাদি সেরে নিন। তুমি খেয়ে নেবে চলো। তোমাকে আবার সকালে ট্যুরে বেরুতে হবে।"

"হ্যাঁ, ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ।" জ্বালাপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন।

মুন্সী শিউলালের শ্রাদ্ধের দিন পরিবারের সবাই ঝেঁটিয়ে একাগাড়ি করে ফরসা হবার আগেই সোরাঁও থেকে ফাফামউ রওনা হ'ল। সবাই গঙ্গাস্নান করে ফিরলেন তখন প্রায় দুপুর। বাড়ি ফিরে দেখেন কিষণলাল তসিলের অফিস ঘরে তাঁদের অপেক্ষায় বসে

আছে। কিষণলালকে দেখেই রাধেলাল চমকে উঠলেন। শঙ্কিত স্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আরে কিষণু তুমি! তুমি তো আসার খবরও দাওনি। ফাফামউ হয়েই তো এলে, সেখানেও দেখা করতে পারতে। হঠাৎ এলে যে? নিজের দশা এ কী করেছ? কোথাও পড়ে-টড়ে গিয়েছিলে না কি?"

"আজ্ঞে, জ্যেঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধ ছিল কি না! আর জমিদারগিন্নী এখানে আসতে দিচ্ছিলেন না। সেজন্যে আপনাদের কোনো খবর দিতে পারিনি। পাঁচ-ছ দিন আগে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, জ্যেঠামশাই খুব দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলছেন, 'বাবা কিষণু, সবাই থাকবে, আর তুমি যাবেনা, আমার কিন্তু ভারি কষ্ট হবে।' বাপ্পা, এই স্বপ্ন আমাকে অস্থির করে তুলল। জানি না কি রকম যেন একটা পাগলামি আমার মাথায় চাপল। আর আমি সোজা জমিদারগিন্নীর কাছে গেলাম। সেদিন কানপুর থেকে লক্ষ্মীচন্দও এসে গিয়েছিলেন। তাঁকে আমি যখন এই স্বপ্নের কথা বললাম তখন জমিদারগিন্নীতো চুপ করেই রইলেন, কিন্তু লক্ষ্মীচন্দ—জ্যেঠামশাই আর জ্বালা দাদার নামে গালমন্দ শুরু করলে। আমি আর থাকতে না পেরে তাকে বেশ কড়া উত্তর দিলাম। আমি উত্তর দেওয়ামাত্র চার চারজন লোক ডেকে সে আমাকে খুব উত্তম মধ্যম দেওয়ালে। তিন দিন আমি হাঁটতে-চলতে পারিনি। পরশু রাতে ঘাটমপুর থেকে রওনা হয়েছি।"

কিষণলালের সারা দেহে জায়গায় জায়গায় পটি বাঁধা আর ক্ষতের চিহ্ন ছিল। রাধেলাল জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "শুনলে, জ্বালা!"

জ্বালাপ্রসাদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, শুনলাম তো সবই কিন্তু বিশ্বাস হয় না। লক্ষ্মীচন্দ এরকম করতে পারে না, মনে হয় কিষণু সত্য গোপন করছে!"

বিষণলাল সেখানেই দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কথাবার্তাগুলো শুনছিল। সে আর থাকতে না পেরে জোরে হেসে উঠল, "কিষণু-

দাদা আর সত্যের মধ্যে যে চিরকেলে শত্রুতা! মার খেয়ে থাকবেন নিজের দোষে অন্য কোথাও আর দুর্ণাম রটাচ্ছেন লক্ষ্মীচন্দ্রের নামে।"

রাধেলাল বিষণলালকে এক চড় কষিয়ে দিলেন, "এটা একটা আস্ত জানোয়ার, চুপ কর্‌! তোর তো নিজের দাদাদের সঙ্গেই শত্রুতা, যখন তখন তাদের নামে বদনাম করিস্‌।"

রামলাল শ্যামলালও বিষণলালকে চড় চাপ্পড় কষাতে উদ্যত হচ্ছিলেন। জ্বালাপ্রসাদ বিষণলালকে বললেন, "বিষণ, তুমি যাও এখান থেকে। তোমাকে না কতবার বারণ করেছি যে অন্যদের কথায় ফোড়ান কাটবে না, এটা তোমার ভারি বদ্‌ অভ্যাস।" তারপর কিষণলালকে বললেন, "তা বেশ, তুমি এখন স্নানাদি সারো পরে ভেবে দেখবো কি করা যায়।"

জ্বালাপ্রসাদ সেদিন ছুটি নিয়েছিলেন। পরের দিন অফিস গিয়ে জয়দেইর একটা চিঠি পেলেন। তিনি শুধু এইটুকু জানিয়েছিলেন যে কিষণলালকে কয়েকটা কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, কারণটি চিঠীতে লেখার মতো নয়। কিষণলাল যা বলে তা যেন তিনি একটুও বিশ্বাস না করেন। শ্রাবণ মাসে যখন এলাহাবাদে যাবেন তখন সোরাঁওতে এসে তিনি দেখা করবেন।'

মুন্সী শিউলালের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর জ্বালাপ্রসাদ নিজের চারদিক্‌ তাকিয়ে দেখলেন। সে পরিবেশই যেন তিনি চিনতে পারলেন না। মুন্সী রাধেলালের গোটা পরিবার সেখানে মজুত ছিল। তসিলদারের অট্টালিকা যেন তাঁর কাছে ছোট গুমট মনে হ'ল। আপন আবাসে যেন তাঁর অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।

একদিন জ্বালাপ্রসাদ কাজ শেষ করে কাছারি থেকে উঠছিলেন, পণ্ডিত বেচু মিসির এসে বললেন, "মনে হচ্ছে এবারে বর্ষা আগেই নামবে। আষাঢ়ের প্রথম পক্ষই এখন শেষ হয়নি অথচ দুপুর থেকেই মেঘ ঘনাচ্ছে। লু বন্ধ হয়ে গেছে, পূবে বাতাস দিচ্ছে।"

জ্বালাপ্রসাদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আজ হঠাৎ দিনটি চমৎকার লাগছে। আষাঢ়ের অর্দ্ধেকের পর থেকেই তো বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এবারে তো অসম্ভব গরম পড়েছে।"

বেচু মিসিরের মুখের ওপর আলতো হাসির রেখা দেখা দিল, "মহাবীর বাবার মন্দিরের আমবাগানে মনে হয় আমের ফসল ভালই হয়েছে। কাল পাঁচ গাড়ি আম এখান থেকে এলাহাবাদে বিক্রীর জন্য গেছে। যাক্, আপনার ভাই শ্যামলাল কিছু রোজগার তো শুরু করেছে।"

জ্বালাপ্রসাদ আশ্চর্য হয়ে বেচু মিসিরের দিকে দেখলেন, "শ্যামুর পাঁচ গাড়ি আম এলাহাবাদে বিক্রী হতে গেছে! কই আমি তো এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। পুরানো উজাড় আমবাগানে এত আম কোথায় যে এক সঙ্গে পাঁচ গাড়ি ভরে যাবে?"

"তা তো আমি জানি না। আশ্চর্য লাগছে আমারও। কারণ ঘুমরু বলছিল আম এবারে খুব কম হয়েছে। আজ দিনটা তো ভাল, চলুন না কেন, একটু ঘুরে আসা যাক্। আজ শনিবার, হাট বাজার নেই। আজ আমরাও মহাবীর বাবাকে দর্শন করে আসি।"

বেচু মিসিরের মুখের ওপর বিদ্রূপের মুচ্‌কি হাসি দেখে বিরক্তির সুরে জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "কেন, ব্যাপারখানা কি? আপনি খোলাখুলি বলছেন না কেন?"

"কি করে বলি জ্বালাবাবু! ব্যাপার তো এমন কিছু নয়। তবে কথাটা হচ্ছে, আপনার দুর্ণাম রটা নিয়ে। সেজন্যে আপনাকে সব খুলে বলতেই হয়। আজকাল মহাবীর বাবার আমবাগানের আশেপাশের আমবাগানগুলো থেকে আম চুরির রিপোর্ট আসছে। তারা চোরকে সনাক্ত করে শ্যামলালের নাম বলছে। তারপর শ্যামলাল যখন পাঁচগাড়ি আম বিক্রী করতে পাঠাল তখন সন্দেহ আরো ঘোরালো হ'ল। দারোগা শহাবুদ্দীন রিপোর্টগুলো চেপে গেছেন। তবে শ্যামলালকে তিনি

জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্যই করেছেন। শ্যামলাল বলছে এলাহাবাদে পাঠানো আমগুলো মন্দিরের বাগানের আম।”

জ্বালাপ্রসাদ ভুরু কুঁচকে বললেন, “হুঁ! এই ব্যাপার। চলুন তো, একটু খোঁজ নেওয়া যাক্।”

মহাবীরের মন্দিরের পিছন দিকে কুয়োর কাছে আম গাছের নীচে ঘুণ্ডী স্বামী ধুনি জ্বেলেছিলেন। কিষণলাল ঘুণ্ডী স্বামীর আদেশে স্থানটি ছাইয়ে দিয়েছিল। স্বামীজীর পয়লা নম্বর চেলা হল কিষণলাল। সেখানে গ্রামের দু'চার জন ছোকরা জড়ো হয়েছিল। কিষণলাল কল্কেতে চরস ভরে স্বামীজীকে বাড়িয়ে দিল। স্বামীজী লম্বা এক টান মারলেন; আগুনের হল্কা ওপরে উঠল এক গজ। আর ঘুণ্ডী স্বামীর চোখও যেন জ্বলে উঠল আগুনের গোলার মতো, “নে ভক্ত, তুইও প্রসাদ পা!” বলে কল্কেটি কিষণলালকে বাড়িয়ে দিলেন।

কিষণলাল দম টানছিল। এমন সময় ঘুণ্ডী স্বামীর নজর পড়ল জ্বালাপ্রসাদ আর বেচু মিসিরের ওপর। তাঁরা যেন এদিকেই আসছিলেন। আশেপাশে যারা বসেছিল তারা তসিলদারের মুখের পানে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘুণ্ডী স্বামী ধুনিতে কাঠের মোটা কুঁদা দিতে দিতে চাপা স্বরে বললেন, “শালা, হুশ সামলা! তোর বড়দা আসছে।” এবার তাঁর স্বর উঁচু হল, “আচ্ছা প্রতাপশালী, ধার্মিক, মর্যাদাপ্রিয় মানুষ। কিন্তু টাকা-পয়সার অনটন। তবে অনেক ধন লাভ হবে—অনেক টাকা-কড়ি, সোনা-রূপা, হীরে-জহরত।” এরমধ্যে জ্বালাপ্রসাদ আর বেচু মিসির ঘুণ্ডী স্বামীর ধুনির কাছে এসে পৌঁছলেন। ঘুণ্ডী স্বামী জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “নাও বাছা, এই বিভূতি!” বলে স্বামীজী ধুনির মধ্যে থেকে এক চিমটি বিভূতি নিয়ে জ্বালাপ্রসাদের মুঠোর মধ্যে ভরে দিলেন, “মুঠো বন্ধ করে নে। হ্যাঁ, এবার খুলে দেখ!”

জ্বালাপ্রসাদ নিজের মুঠো খুলে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। তাঁর মুঠোর মধ্যে বিভূতির বদলে একটি লাল রংয়ের পাথর। বেচু

মিসির এগিয়ে এসে দেখলেন, "আরে এ যে গোমেধ মনে হচ্ছে।"

ঘুণ্ডী স্বামী মৃদু হাসলেন, "ভক্ত তোর কেতু মন্দ তাই বম্‌ভোলা বাবা তোকে গোমেধ দিলেন। এটি আংটিতে বসিয়ে পরবি। ছ'মাসের মধ্যে গুপ্তধন পাবি।"

বেচু মিসিরের মনে জ্বালাপ্রসাদের প্রতি কেমন যেন ঈর্ষা জাগল। তিনি ভুলেই গেলেন যে, তিনি জ্বালাপ্রসাদকে আম বাগানের আম দেখাতে এনেছেন। বরং ঘুণ্ডী স্বামী তাকেও কিছু বিভূতি-টিভূতি দিন, তিনি এই ফিকিরেই ছিলেন। এমন সময় আমবাগানের দক্ষিণ দিকের আম বাগানটা থেকে জুম্মন মিঞাঁ আর তাঁর দুজন লোক শ্যামলালকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে এলেন। জুম্মন মিঞাঁ চেঁচাচ্ছিলেন, "চোর কোথাকার! আজ ধরা পড়েছে। তসিলদারের ভাই সেজে বড়ো ঘুরে বেড়ানো হয়। আবার যদি কোনোদিন আমার আমবাগানে দেখি তো হাত পা গুড়িয়ে রেখে দেবো। হামদু, এবার থেকে সামলাবে, গাছে আর মাত্র অর্দ্ধেক আম আছে।" এমন সময় জুম্মন মিঞাঁর নজর পড়ল জ্বালাপ্রসাদ আর বেচু মিসিরের ওপর। তখন সে শ্যামলালকে টানতে টানতে এদিকে নিয়ে এলো, "তসিলদার সাহেব, সরকার কি আমার আম সংরক্ষণের জন্যে একে নিযুক্ত করেছেন? এ দিনের বেলায় আম দেখে আন্দাজ করে বেড়ায়, আর রাত্রি বেলায় পেড়ে নিয়ে যায়। আজ ধরেছি একে। এই চোরটা আমার কলমী আমের বাগানটাই উজাড় করে ফেললে।"

এই চেঁচামিচি শুনে মন্দিরের ভীড় ওখান থেকে এখানে এসে জড়ো হ'ল। জ্বালাপ্রসাদ আর বেচু মিসিরের মন ঘুণ্ডী স্বামীর দিক্ থেকে সরে এবার এই ফ্যাসাদের দিকে গেল। এটা যাচাই করে দেখার জন্যেই তাঁদের এখানে আসা। বেচু মিসির জুম্মন মিঞাঁকে বললেন, "রাগারাগির কাজ কি জুম্মন মিঞাঁ, তুমি শ্যামলালকে আম পাড়তে তো আর দেখনি। এখন যাও, ভবিষ্যতে আর তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। তসিলদার সাহেব এ ব্যাপারে নিজে

খোঁজখবর করতে এসেছেন।" আর জনতাকে লক্ষ্য করে ধমকালেন, "তোমরা সব এখানে ভীড় করছ কেন। চলে যাও এখান থেকে!"

জুম্মন মিঞা নিজের লোকজনদের নিয়ে আমবাগানে ফিরে গেলেন। তাঁর যাবার পরে একে একে ভীড়ও পাতলা হয়ে গেল। জ্বালাপ্রসাদ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় তিনি ঘুণ্ডী স্বামীর অট্টহাস্য শুনতে পেলেন, "ভাবছিস্ কি ভক্ত? এতে আর মন খারাপ করার কি আছে? এ সব তো হয়েই থাকে। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। শ্যামলালের ভাগ্যের জোর প্রবল। এর কাছে ধন দৌলত আসবে আপনা থেকেই।" তারপরে ঘুণ্ডী স্বামী বেচু মিসিরের দিকে ফিরলেন, "ভক্ত, তুইও কি বলবি, নে প্রসাদ নে। বোধহয় ভাবছিস্ স্বামী পক্ষপাতিত্ব করেন।" এই বলে ঘুণ্ডী স্বামী ধুনি থেকে এক চিমটি বিভূতি নিয়ে বেচু মিসিরের মুঠোর মধ্যে রাখলেন। মুঠো বন্ধ করিয়ে খোলবার পর তা থেকে বেরুল একটি মুগা।

ঘুণ্ডী স্বামী অট্টহাস্য করে উঠলেন, "তোর মঙ্গল রে! ছোট ভাইকে মহাবীরের সেবায় লাগিয়েছ এটা ভালোই করেছ। তা না হলে তোমাদের সব নষ্ট হয়ে যেত! এই মুগা ধারণ কর। মঙ্গলের ব্রত কর। আর রোজ সন্ধ্যাবেলা মহাবীর বাবাকে দর্শন কর!"

এমন সময় ওদের মধ্যে থেকে বিষণলাল বলে উঠল, "তুমি একটি বাছট ঠক্, ঘুণ্ডী স্বামী! গোমেধ, মুগা, আর পলা বিতরণ করছ। কারো মুঠোর মধ্যে থেকে হীরে, পান্না, মণি মাণিক বের করতে পারো তো বুঝি!" তারপর জ্বালাপ্রসাদকে বললে, "দাদা, আপনিও কোন্ জালিয়াতের ফাঁদে পড়েছেন! শ্যামুদাদা আর কিষণ্দাদাকে কব্জা করে আমাদের আমবাগানে জেঁকে বসেছে। রাত দিন গাঁজা টানছে আর আজকাল তো মেয়েমানুষেরও আসাযাওয়া শুরু হয়েছে। কি ঘুমরু পণ্ডিত আমি ঠিক্ বলছি কি না?"

মহাবীর বাবার সেবায় নিজের একটি চেলাকে নিযুক্ত করে ঘুমরু

তামাশা দেখতে এসেছিল। সে বললে, "দাদা, এ আমাদের প্রাণ-সঙ্কট করে তুলেছে। এখানে পর পর সর্দার গুণ্ডা জুটতে আরম্ভ করেছে। তারা আমাদের কাছ থেকে মহাবীর বাবার প্রসাদের আধা ভাগ চাইছে।"

জ্বালাপ্রসাদ হতবুদ্ধি আর মর্মাহত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছুই দেখছিলেন আর শুনছিলেন। তবে প্রসাদের ব্যাপারটি শুনে বেচু মিসিরের কান খাড়া হয়ে গেল। তিনি ঘুণ্ডী স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "স্বামীজী, এখানে আর কতদিন থাকবার ইচ্ছে?"

"ভক্ত, সব বম্ ভোলানাথের ইচ্ছে! ভূতনাথ বাবার আদেশ হওয়া মাত্র ঘুণ্ডী আস্তানা গুটবে। আর ভক্ত, এই ছোকরা যা বললে, সেটা পান করে নিলাম, আমরা তো বিষপান করে থাকি! তবে কবে যে ক্রোধের তৃতীয় নেত্র খুলবে আর এই ছেলেছোকরারা ভস্ম হয়ে যাবে তা শঙ্কর ভগবানই জানেন!"

এতক্ষণে জ্বালাপ্রসাদের চেতনা হ'ল। তিনি কড়া স্বরে বললেন, "ভগবান শঙ্করের আদেশ, তুমি কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাবে। কাল সন্ধ্যেবেলা আমি আবার আসবো, তখন যদি তোমাকে এখানে দেখি তো হাজতে আটক হবে! নায়েব সাহেব, দারোগা শহাবুদ্দীনকে বলে দেবেন যেন দু'জন জোয়ান পুলিশকে এক্ষুনি এখানে পাঠিয়ে দেন।"

তেরো

ছিনকি হাঁপাচ্ছিল, তার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। যমুনার পায়ের কাছে বসে বিড়বিড় করতে লাগল, "হে ভগবান্ কি হবে। এরা সব কী করতে চাচ্ছে? হে মা গঙ্গে, আমার জ্বালা আর গঙ্গাকে রক্ষা করো!"

যমুনা ভ্যাবাচাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কি হয়েছে গো? কি এমন বিপদ হ'ল? এত উতলা হয়েছ কেন?"

"ভালো করে চোখ মেলে দেখ তো, চারদিক্ থেকে বিপদ্‌ই ঘিরে রয়েছে। তুমি তো পাটরানীর মতো দিব্যি চোখ বুজে শুয়ে আছ আর ওদিকে তোমার রাজপাট যে লুট হচ্ছে। আমি আর এ সব দেখতে পারছি না। ঘোর অন্যায় হচ্ছে।"

ছিনকির এই ভূমিকা যমুনার ভালো ভাবেই জানা। তিনি মুখ বাঁকিয়ে বললেন, "ছিনকি কাকী, এতো তোমার নিত্যকার কথা। ওঁকে কিছু বললে, উনি উত্তর দেন সবাই নিজের নিজের ভাগ্যে খাচ্ছে। আর তুমি রোজই নতুন নতুন কেচ্ছা শোনাও, আমার হয়েছে সব দিক্ থেকে মুশকিল!"

ছিনকি রাগ করে উঠে দাঁড়াল, "হ্যাঁ, রাণীজি আমি তো গল্পই বানাই! এইমাত্র তোমার বড় জায়ের আধ সের ওজনের হাঁসুলি আর সওয়া সেরের মল স্যাকরার বাড়ি থেকে এলো—আর আমি কি না গল্প বানাচ্ছি! লুট হতে দাও! ভালো করে চোখ বন্ধ করে থাক, লুট হতে থাক্। আর গঙ্গাকে কাঙ্গাল করে ছাড়!"

যমুনা যেন চমকে উঠে খাট থেকে নীচে নামলেন, "ছিনকি কাকী, আমি জোড় হাত করছি। আমার কথায় কিছু মনে করো না। তুমি ঠিক্ বলছ তো বঠ্ ঠাকুর এই গয়না গড়িয়েছেন? কবে গয়না এ'ল? তুমি দেখেছ কি?

ছিনকি যমুনার কথার কোন উওর দিল না, সে দেখলে যে শ্যামলালের স্ত্রী এই ঘরের দিকেই আসছে। ছিনকি সে সময় ঘর থেকে সরে যাওয়াই উচিত মনে করলে। ছিনকি চলে গেলে শ্যামলালের স্ত্রী যমুনাকে বললে, "দিদি, এই মাত্র বড়দিদির পায়ের মল আর হাঁসুলি গড়িয়ে এলো। আমি পাশের ঘরে দরজার কাছে ছিলাম, তাই বঠ্ঠাকুরের গলা পেলাম। বঠ্ঠাকুর বলছিলেন, সওয়া সেরের পায়ের মল আর আধ সেরের হাঁসুলি, কিন্তু অন্য কেউ যেন গয়নার খবর জানতে না পারে।"

রাধেলালের পরিবারের মধ্যে শ্যামলালের স্ত্রীর সবচেয়ে বেশী অনাদর, কারণ, তার কোনো সন্তানাদি হয়নি। শ্যামলালের স্ত্রী বেশ মোটাসোটা, লম্বা, কালো আর কুৎসিত। তার ওপর একটু মুখরা। কিন্তু কাজকর্মে সে ছিল পটু আর খাটতে পারতো যথেষ্ট। বাড়ির রান্নাবান্না, বাসন মাজা সে একাই করতো। তবুও বাড়ির সকলের কাছ থেকে পেত অপমান আর অনাদর। যমুনার কাছ থেকে কখনো কখনো সে পেত সহানুভূতি। সেজন্যে যমুনাকে সে বললে, "দিদি আমার পায়ের গয়নার মধ্যে রয়েছে মাত্র বাঁকমল। তাও দু'টা ক্ষয়ে ভেঙ্গে গেছে, অন্যগুলোও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়েছে। না হয় তো বঠ্‌ঠাকুরকে বলে আমার জন্যেও আটটা বাঁকমল গড়িয়ে দাও। বড়দিদি তো গয়নায় ঢিবি হচ্ছে আর আমার যা-ও ছিল তা-ও ভেঙ্গে যাচ্ছে। দিদি, এ কিন্তু ভারি অন্যায়।"

যমুনা সে সময় কিন্তু এর চেয়ে বেশী অন্যায়ের কথা ভাবছিল। তাহলে ছিনকি যা কিছু বলেছে অথবা বলে সবই সত্যি। যমুনার চোখের সামনেই তার নিজের সর্বনাশ হচ্ছে। তখন জ্বালাপ্রসাদের অফিস থেকে ফেরার সময়—জোরে বৃষ্টি শুরু হ'ল। অফিস আর বাড়ি সামনা সামনি। তবে বৃষ্টি এত জোরে পড়ছিল যে জ্বালাপ্রসাদ অফিস থেকে সে সময় ফিরলে সম্পূর্ণ ভিজে যেতেন। যমুনা শ্যামলালের স্ত্রীকে বললে, "আমি ওঁকে বলবো। তবে উনি সব টাকা কাকাবাবুর হাতেই দিয়ে দেন। সেজন্যে কাকাবাবুকেই গিয়ে বলো, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে বলবো।"

শ্যামলালের স্ত্রী কাতর অনুনয়ের সুরে বলল, "কেন আর আমাকে গালমন্দ শোনাতে চাও। বাপ্পার মেজাজ তো জানই, আর মায়ের তো আমি দু'চক্ষের বিষ। কখন কখন তো এমন ইচ্ছে করে যে এই রাক্ষুসী বুড়িকে মাটিতে আছড়ে ফেলে এমন থেঁতলে দিই যে জন্মের মতো মুখের বুলি বন্ধ হয়ে যায়!"

যমুনার মুখের ওপর হাসির রেখা দেখা দিল, "ছিঃ! ছিঃ! মেজ বৌ, শাশুড়ীকে এমনি বলতে আছে কি?"

শ্যামলালের স্ত্রীর চোখ ছলছলিয়ে এলো, "কি করি দিদি, সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। বাড়ির লোকের ব্যবহারে মনটা বিষিয়ে গেছে। কোনোদিন হয়তো কেরাসিন তেল ঢেলে পুড়ে মরবো। কিন্তু মরার আগে এই বুড়িকে মারবো তবে মরবো, এটা ভালো করে জেনে রেখো।"

শ্যামলালের স্ত্রীর মনের জ্বালা শুনে যমুনা শঙ্কিতা হলেন, "এসব করার দরকার হবে না। দেখ, মাথায় বুদ্ধি খেলেছে। আমি ছিনকি কাকীকে কাকাবাবুর কাছে পাঠাবো। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী কাউকে যদি ভয় পান, সে ছিনকি কাকীকে।"

এমন সময় ছিনকি ঘরে এসে ঢুকলো। তাকে ভারি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। ঘরে ঢোকবার সময় সে যমুনার কথা শুনতে পেয়েছিল। সে বললে, "ছোট কর্তাকে নয় আমি জ্বালাকে বলবো, তার ফেরার সময় হয়েছে। তার আবার ছাতাটা পাওয়া যাচ্ছে না। ভিখু সারা বাড়ি খুঁজেছে। কি জানি ছাতাটা কোথায় যেন উধাও হ'ল।"

"দুপুরবেলা কাকাবাবু আমার কাছ থেকে ছাতা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন। তা ওঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো", যমুনা বললেন।

"কাকে জিজ্ঞেস করবো, ভূতকে। ছোট কর্তার তো কোনো পাত্তা নেই, তাঁর কোনো ছেলেকেও তো দেখছি না। এখন কি হবে? বৃষ্টি পড়ছে তো ঝমাঝম করে।"

এখানে ছাতার খোঁজ চলছিল। ওদিকে জ্বালাপ্রসাদ বেচু মিসিরের ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ভিখুর হাতে বেচু মিসিরের ছাতা ফেরত দিয়ে তিনি যমুনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম, তুমি ছাতা পাঠিয়ে দিলে না কেন?"

"ছাতা কাকাবাবু দুপুর বেলাতেই চেয়ে নিয়ে গেছেন। বলেছিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন। এখন পর্যন্ত ওঁর কোন পাত্তাই নেই। বঠ্ঠাকুরও ওঁর সঙ্গেই চলে গেছেন বোধহয়।"

জ্বালাপ্রসাদ কাপড় ছাড়লেন। বৃষ্টি এতক্ষণে থেমে গিয়েছিল। আর বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ গুমোট খুব বেড়ে গেল। জ্বালাপ্রসাদ অফিসের কাগজপত্র বের করলেন, কিন্তু এখন তাঁর পক্ষে বাড়িতে বসা অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি যমুনাকে বললেন, "ঠাকুর বীরভান সিংহের বাড়ি অনেক দিন যাওয়া হয়নি, অভিযোগ করছিলেন। চলো, ওখানেই যাওয়া যাক্। ঠাকুরানীও ক'বার তাগাদা করছেন তুমি যাওনি বলে। তাহলে আমি এক্কা জোড়াচ্ছি। ততক্ষণে তুমি তৈরী হয়ে নাও।"

"এক্ষুণি আমি দু মিনিটে তৈরী হয়ে নিচ্ছি। ততক্ষণে তুমি জল খাবার খেয়ে নাও।"

যমুনা রান্না ঘর থেকে লুচি আর আম জ্বালাপ্রসাদের জন্য পাঠালেন। জ্বালাপ্রসাদ জলযোগ আরম্ভ করলেন। আর ছিনকি শ্যামলালের স্ত্রীকে যে কথা দিয়েছিল সেই প্রসঙ্গ আরম্ভ করলে, "শ্যামুর বউয়ের পায়ের বাঁকমল ক্ষয়ে গেছে। বেচারি কাঁদছিল। রামুর বউয়ের জন্যে তো আজ সওয়া সের ওজনের পায়ের মল আর আধ সেরের হাঁসুলি গড়ে এসেছে। আর ওর জন্যে কেউ পায়ের চারটে বাঁকমলও গড়িয়ে দেয় না। তা তাকে আমি বলেছি যে তোমাকে বলবো।"

শ্যামলালের স্ত্রীর পরিবারের মধ্যে যে কী স্থান সে জ্বালাপ্রসাদ জানতেন ভালোভাবেই। তাই তার প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল, "তা বেশ, কাল তার বাঁকমল এনে দিও, আমি স্যাকরাকে দিয়ে নতুন বাঁকমল গড়িয়ে দেবো। কিন্তু এ কথা কি সত্যি যে বৌদির মল আর হাঁসুলি গড়ে এসেছে?"

"সত্যি নয় তো কি মিথ্যে? আজ সকালে রামু গয়নাগুলো এনে নিজের মা আর বউয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'কাউকে যেন বলো না, লুকিয়ে রেখে দাও।' আমি কাছে কাছে থাকি তাই দেখে ফেলেছি।"

জ্বালাপ্রসাদের টনক নড়ল, কিন্তু তিনি আর কথা বাড়ালেন না।

যমুনাকে নিয়ে জ্বালাপ্রসাদ ঠাকুর বীরভান সিংহের বাড়ি পৌঁছে দেখলেন রামলালের সঙ্গে মুন্সী রাধেলাল সেখানে রয়েছেন। যমুনা অন্দর মহলে চলে গেলেন আর জ্বালাপ্রসাদ ঠাকুর বীরভানের পাশে বাইরের উঠানে এসে বসলেন। জ্বালাপ্রসাদ আসা মাত্রই মুন্সী রাধেলাল বললেন, "খুব ভালো সময় এসে পড়েছ জ্বালা বাবা। ঠাকুর সাহেব চেষ্টা করছেন যাতে রামু এখানের স্কুলে একটা চাকরি পেয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকবে, তার চেয়ে সবাই এক সঙ্গে থাকাটাই ভালো।"

জ্বালাপ্রসাদ ফস্ ক'রে বললেন, "কিন্তু কাকাবাবু, ফতেপুরের বাড়ির কি হবে? আর এখানে যে বাড়িতে আমি থাকি সে তো সরকারী বাড়ি। এতো জনার থাকার তো ব্যবস্থা এখানে নেই।"

ঠাকুর বীরভান সিংহ জ্বালাপ্রসাদের কথার উত্তর দিলেন, "তসিলদার সাহেব, বাড়ির জন্যে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি নিজের জন্যে নতুন একটি প্রাসাদ তৈরি করাচ্ছি। ঠাকুরাণীর এ প্রাসাদে আর মন উঠছে না। তাহলে এটা আমি আপনাদের দিয়ে দেবো। প্রাসাদে তিন-তিনটে উঠান, গোটা পরিবারের পক্ষে এটা যথেষ্ট হবে। এতে বেশ স্বচ্ছন্দে আপনাদের সকলের চলে যাবে।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "ঠাকুর সাহেব, আপনার অশেষ কৃপা, কিন্তু আপনার প্রাসাদে আমি এসে উঠলে সরকারী আপত্তি উঠতে পারে। আপনি এ সব ব্যাপার বুঝবেন না ঠাকুর সাহেব।"

ঠাকুর বীরভান সিংহ মুচ্‌কে হাসলেন, "আমি সব বুঝি তসিলদার সাহেব, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এই প্রাসাদটি আমি আপনার কিংবা গঙ্গার নামে লিখে দেব। এটা তৈরি হয়েছে প্রায় সত্তর বছরের বেশী আর কিইবা দাম পাওয়া যাবে। যদি খালি ছেড়ে দিইতো দু-চার বছরের মধ্যে শুধু ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে। তাই মাত্র জমির দামে আপনি এটি পেয়ে যাবেন। যাক্, আপনাকে এ সব চিন্তা করতে হবে না, সব করে নেবেন মুন্সী রাধেলাল।"

জ্বালাপ্রসাদ প্রসঙ্গটি এড়াবার চেষ্টা করলেন, "এখন ছাড়ুন এ সব। আপনার নতুন প্রাসাদ শেষ হতে এখনও বছর দুই লেগে যাবে। এখন তো সবে ভিত কাটিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, সাত-আট মাস তো নিশ্চয়ই, পুরো বছরই ধরুন", ঠাকুর বীরভান সিংহ সায় দিলেন।

"ততদিন আমরা কোনরকমে চালিয়ে নেবো, এখন তো কাজ চলছেই," মুন্সী রাধেলাল উত্তর দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, "আচ্ছা, এখন তোমরা কথাবার্তা বলো, আমরা যাই। দুপুরবেলা ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে এলাহাবাদে গিয়েছিলাম। সেখানে রামুর চাকরি হয়ে গেছে। পনেরো দিনের মধ্যে আদেশপত্র পেয়ে যাবে। দু-এক দিনের মধ্যেই রামুকে নিয়ে ফতেপুরে যেতে হবে সেখানে ইস্তফা দিতে হবে তো। আবার ফতেপুরের বাড়ি আর জমিদারিরও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে", এই বলে রামলালকে নিয়ে মুন্সী রাধেলাল চলে গেলেন।

এদের যাবার পরে জ্বালাপ্রসাদ ও বীরভান সিংহ খানিক চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর বীরভান সিংহ জিজ্ঞেস করলেন, "তসিলদার সাহেব, আপনি কেন এতো অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন? এখানে এদের থাকা কি আপনি পছন্দ করছেন না?"

জ্বালাপ্রসাদ ইতস্ততঃ করে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে...আজ্ঞে সে রকম তো কিছু নয়।"

ঠাকুরানী সাহেবের আগ্রহে যমুনা আর জ্বালাপ্রসাদকে সেদিন ওখানেই খাওয়াদাওয়া করতে হ'ল। খাওয়াদাওয়ার পরে ঠাকুর বীরভান সিংহের সঙ্গে বসে জ্বালাপ্রসাদ একটু সুরা পান করেছিলেন তাই মনটা তাঁর একটু হাল্কা হ'ল। আর মনে কেমন যেন সাহস জেগে উঠল। তিনি এ সব কোনো মতেই হতে দেবেন না—হতে দেবেন না। যদি নরক সৃষ্টিতে মানুষের হাত থাকে, তাহলে তা বন্ধ করাতেও মানুষের অধিকার আছে।

জ্বালাপ্রসাদ যখন বাড়ি ফিরলেন তখন রাত দুপুর। শুধু ছিনকি

ঘুমন্ত গঙ্গাপ্রসাদের শিয়রে জেগে বসেছিল আর বাইরে দরজার কাছে বসে ঢুলছিল ভিখু। জ্বালাপ্রসাদ যমুনার ঘরে পা দেওয়ামাত্রই ছিনকি উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিল, জ্বালাপ্রসাদ ডাকলেন, "ছিনকি কাকী, একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে।"

ছিনকি যেন চমকে উঠল। আজ পর্যন্ত কেউ তার পরামর্শ চায়নি, সে নিজের দিক্ থেকেই পরামর্শ দিয়ে যেত। আজ প্রথমবার তার পরামর্শ চাওয়া হ'ল। সে ওখানেই মাটিতে বসে পড়ে বললে, "বলো।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "কাকাবাবু ঠাকুর বীরভান সিংহের কাছে তাঁর প্রাসাদটা আমাদের জন্যে চেয়েছেন, তাঁর আর একটা নতুন প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে। রামুদাদা ফতেপুরের চাকরি ছেড়ে সোরাঁওতে মাষ্টারি করবেন। কাকাবাবু সব ঠিক্‌ঠাক্ করে নিয়েছেন। তিনি বলছেন এবার সবাই এখানে এক সঙ্গেই থাকবে।"

"হা ভগবান! তোমার চোখের ওপরই এরা যত সব কুকর্ম করতে এসেছে। সব চোর, বেইমান, বখাটে কোথাকার। আর তুমি কিনা এসব হতে দেবে?"

"এ সব্ পরামর্শের জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছি। ছিনকি কাকী, বুঝতে পারছি না কি করা যায়।"

"করা কি যাবে। তুমি ছোটকর্তাকে খোলাখুলি বলে দাও নিজের ছেলেদের নিয়ে ফতেপুরে গিয়ে থাকুন।"

এতক্ষণে ভিখুর ঘুম ছেড়ে গিয়েছিল। ছিনকির শেষ কথাটার অভিপ্রায় সে বুঝতে পারলে না—দরজার কাছ থেকে সরে ঘরের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে, "কি ব্যাপার দাদা। মা কার ওপর রাগ ঝাড়ছে?"

ছিনকি উত্তর দিলে, "রাগ ঝাড়ছি না, বিপদ্ থেকে বের হবার পথ খুঁজছি। জ্বালার চোখের ওপর যত সব কুকর্ম করার জন্যে ফতেপুরের গোটা পরিবার এখানে এসে জুটেছে। এবার সব আবার সোরাঁওয়েই থাকবে।"

"এতো বড়ই বিপদ্ হ'ল। আমি তো এদের খুব ভয় পাই। এরা মানুষ নয়, শয়তান!"—ভিখু বললে।

জ্বালাপ্রসাদের সুরার নেশা যত কমছিল, তাঁর বুকও তত দমে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর সঞ্চিত সাহস এক করে বললেন, "ভিখু, ভোরে কাকাবাবুকে বলে দেবে, তাঁদের সোরাঁওতে কায়েম হয়ে বসা আমার ইচ্ছা নয়, তিনি সবাইকে নিয়ে যেন ফতেপুরে চলে যান।"

ভিখু চোখ মিটমিট করে বললে, "আর ওরা যদি সবাই মিলে আমাকে মারতে শুরু করে তখন তুমি আমাকে বাঁচাবে কি? না গো দাদা, আমাকে দিয়ে এমন কথা কইও না, তুমিই বরং ওদের বলে দিও।"

জ্বালাপ্রসাদ মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "এই তো হ'ল মুশকিল, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে! যাক্, ও কিছু নয়। কাল ভোরে আমি একটি কাগজে সব লিখে দেবো, তুমি শুধু কাকাবাবুকে দিয়ে দেবে।"

"হ্যাঁ, তা আমি অবশ্যই করতে পারবো", ভিখু হাই তুলতে তুলতে বললে। "আরে হ্যাঁ শোনো, এলাহাবাদ থেকে এক পত্রবাহক উটের-পিঠে করে তোমার একটা চিঠি এনেছিল, তোমার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছি।"

ছিনকি ও ভিখু চলে যাবার পরে জ্বালাপ্রসাদ বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা বের করলেন। চিঠি জয়দেইর। জয়দেই এলাহাবাদে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাই সোরাঁওতে আসতে পারবেন না। তিনি লিখেছেন, যদি জ্বালাপ্রসাদের অসুবিধে না হয় তাহলে যমুনাকে নিয়ে একদিন এলাহাবাদে আসতে। যদি দু-চার দিনের ছুটি নিয়ে যেতে পারেন তো খুবই ভালো হয়।

জ্বালাপ্রসাদ মৃদু হাসলেন। যমুনাকে বললেন, "জমিদার গিন্নীর চিঠি এসেছে। তিনি এলাহাবাদে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাদের ডেকেছেন। পরশু রবিবার, কাল সন্ধ্যেবেলা এলাহাবাদ

রওনা হবো। সোমবার অমাবস্যার ছুটি। সোমবার রাত্রে কিংবা মঙ্গলবার ভোরে আমরা ফিরে আসবো।"

"হ্যাঁ, আমিও এলাহাবাদে যাবার কথা বলব ভাবছিলাম, তবে সাহস হচ্ছিল না। এ বাড়ি যেন আমাকে গিলে ফেলছে। এক এক সময় মনে হয় কোথাও পালিয়ে যাই।"

জ্বালাপ্রসাদের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল, "এলাহাবাদে গিয়ে আমি রামুর এখানে চাকরি নিয়ে আসা বন্ধ করছি আর জমিদার গিন্নীর কাছে কিষণুর ব্যাপারটা সব জানতে পারা যাবে। কিন্তু বাড়ির লোকেরা যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে আমরা জমিদার গিন্নীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তুমি বলবে যে আমরা ডেপুটি সাহেবের বাড়ি 'কর্ণবধ' উৎসবে যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিত থাক," যমুনা বললেন।

এগারো-বারো বছর আগে পঁয়ত্রিশ বছরের জয়দেইকে পঁচিশ বছরের যুবতী দেখাত, আর এখন দেখাচ্ছে যেন ষাট বছরের বুড়ী। মাথার চুল প্রায় পেকে গেছে আর মুখের চামড়া কোঁচকাতে শুরু করেছে। শরীরের তেমন বদল হয়নি তবে শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে আর চোখের দীপ্তিও কমে এসেছে।

গত দু'বছর ধরে জয়দেইয়ের কম্পজ্বর আসছিল। কবিরাজী চিকিৎসা, হাকিমি চিকিৎসা, ঝাড়-ফুঁক, টোটকা-টুটকি সবই হ'ল, কিন্তু জ্বর আর ছাড়ল না কিছুতেই। মাস, পক্ষ যদিও বন্ধ, আবার সেই কাঁপ দিয়ে জ্বর আসতো। যখন জ্বালাপ্রসাদ আর যমুনা পৌঁছলেন তখন জয়দেই নিজের ঘরে জ্বরে বেহুঁস। লক্ষ্মীচন্দের স্ত্রী রাধা বসেছিল তাঁর শিয়রে।

ছ'মাস হ'ল লক্ষ্মীচন্দ সিভিল লাইন্সে একটি বাংলোবাড়ি কিনেছে, এলাহাবাদে এলে সেখানেই ওরা থাকতো। জ্বালা-প্রসাদের মালপত্তর নামালে চাকরেরা আর তিনি বসলেন বাইরের ঘরে গিয়ে। যমুনা চলে গেলেন ভেতরে সোজা জয়দেইর ঘরে।

যমুনাকে প্রণাম করে চেয়ারে বসাতে বসাতে রাধা বললে, "আজ

পনেরো দিন ধরে মার রোজই কাঁপ দিয়ে জ্বর আসছে। সন্ধ্যেবেলা জ্বর আসে আর মাঝ রাতে ঘাম দিয়ে ছাড়ে। ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত দিব্যি খান দান কাজকর্ম্ম করেন। কিন্তু মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সপ্তাহখানেক আগে উনি কানপুর থেকে ঘাটমপুরে এসেছিলেন। এ সব দেখে-শুনে জোর করে মাকে চিকিৎসার জন্য এলাহাবাদে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু মা ডাক্তারী চিকিৎসা করাতে একেবারেই নারাজ। শেষে হার মেনে উনি কাল কানপুরে ফিরে গেছেন, সেখানে দরকারি কাজ আছে।"

রাধা আর যমুনার কথাবার্তাতে জয়দেইর তন্দ্রা ভাঙ্গল। তিনি চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

রাধা উত্তর দিল, "মা, তসিলদার কাকিমা এসেছেন। কাকাবাবু বাইরের ঘরে বসে আছেন।"

জয়দেই কষ্টে চোখ মেললেন, "ঠাকুরপো এসেছেন! বোনটি তুমিও এসেছ বড় ভালো করেছ। বউমা, ঠাকুরপোকে এই ঘরেই ডেকে আনো।"

জ্বালাপ্রসাদ ঘরে ঢোকামাত্র রাধা ঘোমটা টানল।

অনেক রাত হয়েছিল। দূরে এগারোটার ঘণ্টা বাজল। জয়দেইর এবার জ্বর ছাড়বার সময়। তিনি রাধাকে বললেন, "বউমা, ঠাকুরপোদের জন্যে কিছু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর গিয়ে। তোমার কাকিমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, তোমার সাহায্য করবেন। ততক্ষণ আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে কথাবার্তা বলি।"

স্পষ্ট বোঝা গেল জয়দেই জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে চান। রাধা যমুনার হাত ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, "চলো কাকিমা, মা কাকাবাবুকে যে সব কথা বললেন, সে আমি তোমাকে সব বলব। তুমি পরে কাকাবাবুকে বলো।"

রান্না ঘরে গিয়ে রাধা যমুনাকে বলল, "কাকিমা, কাকাবাবুর যে খুড়তুতো ভাই ঘাটমপুরে কর্মচারী হয়ে এসেছিল আমরা কি করে জানবো বল, যে সে এত বড়ো বদমাইশ আর বখাটে।"

রাধার কথা শুনে যমুনা ভীষণ ক্ষেপে উঠলেন, "কিষণলাল এত নীচ !"

কাঁদতে কাঁদতে জয়দেই জ্বালাপ্রসাদকে সব কেচ্ছা শোনালেন। জ্বালাপ্রসাদ তো শুনেই রেগে আগুন। তিনি বললেন, "বৌদি, তুমি সপ্তাহখানেকের জন্যে সোরাঁও চল। তোমার সামনেই খুব শীঘ্রি আমি এর একটা মীমাংসা করে ফেলতে চাই। এরা আমাকে নাজেহাল করে ছাড়ছে।"

"ঠাকুরপো, আমার অবস্থা তো তুমি দেখছই। জ্বর ছাড়বার নাম নেই !"

"বৌদি, একটা কথা বলি যদি তুমি রাখ।"

"ছিঃ ! ছিঃ ! ঠাকুরপো, তোমার কথা আমি কোন্ দিন অমান্য করেছি ?"

"কাল ভোর থেকে তোমার ডাক্তারী চিকিৎসা শুরু হবে। আমি ডাক্তার ব্রাইটকে জানি। উনি এখানকার সব চেয়ে ভালো ডাক্তার। তিনি এ রোগ সারাতে পারবেন।"

"ঠাকুরপো, আমি হাত জোড় করছি, এই বিলিতী ওষুধ খেতে বলো না, ধর্ম নষ্ট হবে। এলাহাবাদের সব চেয়ে বড়ো কবিরেজ নিত্যানন্দ ; তাঁর চিকিৎসা শুরু করেছি।"

জ্বালাপ্রসাদ বিরক্তির সুরে বললেন, "দু'বছর তো কেটে গেল তোমার এই হাকিম কবিরেজের পাল্লায়। আর আমি এ সব চলতে দেবো না। কালকেই ডাক্তার ব্রাইটকে আনছি।"

ক্লান্তিতে চোখ বুজে জয়দেই বললেন, "ঠাকুরপো, তোমার যা ইচ্ছা। লক্ষ্মীর কথায় জেদ তো ধরে রইলাম, কিন্তু তোমার সামনে জেদ চলবে না। কিন্তু ঠাকুরপো, তুমি আমাকে তিন চার দিন পরে পরে এসে দেখে যাবে। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।"

পরের দিন ডাক্তার ব্রাইট জয়দেইকে দেখলেন, স্পষ্ট ধরা পড়ল পুরাতন ম্যালেরিয়া। তিনি ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, "অগ্রাহ্যের

ফলে গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে—পিলে বেড়ে গেছে। জ্বরতো তিন দিনেই ছেড়ে যাবে কিন্তু চিকিৎসা চলবে মাস খানেক।"

সোমবার সারা দিনটি জ্বালাপ্রসাদ কাটালেন বাড়িতেই। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল তার ওপর মনটা এত ভারি হয়ে উঠেছে যে তাঁর কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই। সোমবার সন্ধ্যেবেলা তিনি জয়দেইর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যমুনার সঙ্গে সোরাঁও রওনা হলেন।

জ্বালাপ্রসাদের মনে নিজের পরিবারের লোকদের ওপর এক রকম বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠেছিল। তিনি এলাহাবাদ থেকে ফিরে যমুনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে সোজা ঠাকুর বীরভান সিংহের বাড়ি গেলেন, সোরাঁওতে রামলালের চাকরি ক্যানসেল করবার জন্যে। তখন প্রায় ন'টা। তিনি দেখলেন মুন্সী রাধেলাল বীরভান সিংহের ওখানেই রয়েছেন আর দরবার জমিয়েছেন।

ঠাকুর বীরভান উঠে দাঁড়িয়ে জ্বালাপ্রসাদকে স্বাগত জানালেন। তাঁর দলবলও উঠে দাঁড়াল। মুন্সী রাধেলাল বললেন, আরে জ্বালা, তুমি ফিরে এসেছ! আমি তো জানতাম না যে তুমি আজই ফিরে আসবে, তা না হলে রাজা সাহেবকে আমি যেতে দিতাম না। তোমার সঙ্গে দেখা করবার তাঁর খুবই ইচ্ছা ছিল! শ্যামু তাঁর সঙ্গে গেছে। এখান থেকে কুড়ি ক্রোশ দূর প্রতাপগড়ে তাঁর জমিদারী এলাকা।"

জ্বালাপ্রসাদ কাকার কথার কোনো উত্তর দিলেন না যেন শুনতেই পাননি। ঠাকুর বীরভান সিংহ বললেন, "তসিলদার সাহেব, রাজা সাহেব সরোহন আমার মামা। তিনি প্রতাপগড় জেলার তালুকদার। এখন তাঁর খুব সঙ্কট চলছে। তিনি মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। দরাজ হাত, হিসেবপত্রে রুচি নেই, সম্পত্তি কিছু বন্ধক আছে আর কিছু বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু সদানন্দ প্রকৃতির লোক। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আপনি খুব খুশী হতেন।"

জ্বালাপ্রসাদ শুখনো গলায় উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না বলে আমি দুঃখিত। তাঁর প্রশংসা তো আমি আরো

কোথাও শুনেছি মনে হচ্ছে। যাক্, যখন আপনারই আত্মীয় তখন আবার দেখা হবেই। হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা বলতে এসেছিলাম। যদি কষ্ট না হয় আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে আসতে পারবেন কি?"

ঠাকুর বীরভান সিংহকে নিরালায় নিয়ে গিয়ে জ্বালাপ্রসাদ বললেন, সোরাঁওতে রামলালের চাকরিটা ঠিক্ করবেন না। আমি চাইনা সে ফতেপুর ছেড়ে এখানে আসে।"

ঠাকুর বীরভান সিংহ মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা তো প্রায় ঠিক্ই হয়ে এসেছে। আপনি আমাকে আগে কেন বলেন নি। আমি তো আপনার খাতিরেই চেষ্টা করছিলাম।"

"তাহলে আমার জন্যেই চেষ্টা করুন, যাতে সে কোনোমতেই এখানে আসতে না পারে!" জ্বালাপ্রসাদ একটু মুচ্কি হেসে বললেন, "আমার কাকাবাবুকেও বিশেষ প্রশ্রয় দেবেন না। আমার অনুরোধ শুধু এইটুকু।"

ঠাকুর বীরভান সিংহ একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "তসিলদার সাহেব, আমি আপনাদের পরিবারের ভেতরের ব্যাপার তো জানতাম না। আমি যা কিছু করেছি শুধু আপনার উপকার হবে মনে করে। এদের জন্যে আমার কিসের অভিরুচি! এখন আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন গিয়ে।"

জ্বালাপ্রসাদ বাইরে থেকেই ফিরে গেলেন।

সেদিন বিকেলে জ্বালাপ্রসাদের এলাহাবাদে জয়দেইকে দেখতে যাবার কথা। অফিসে তাঁর মন বসল না। বাড়ি ফিরে দেখলেন, কুরুক্ষেত্র বেধেছে। শ্যামলালের স্ত্রীর ওপর বেদম প্রহার চলছে। আর সে ততোই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, "আমি বলব, হাজার লোকের সামনে বলব! আমার পায়ে শুধু চারগাছা করে বাঁকমল, তাও আবার ক্ষয়ে গেছে। আমি কত বললাম কিন্তু কেউ গড়িয়ে দেয় না আর দিদির জন্যে গয়নার ওপর গয়না আসছে।"

জ্বালাপ্রসাদ কাকার ঘরের দরজার সামনে থেকেই বললেন,

"কাকাবাবু এ সব হচ্ছে কী? এতগুলো লোক মিলে একটি স্ত্রীলোককে প্রহার করছেন, এতো বড়োই বিশ্রী ব্যাপার। বেচারির সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যে। নির্দয় অত্যাচারের কোন সীমা কী নেই!"

মুন্সী রাধেলাল ঘরের ভেতর থেকেই গর্জে উঠলেন, বেচারি নয়, রাক্ষুসী। রাক্ষুসী। যখন তখনই গাল-মন্দ করছে। শাশুড়ী জায়ের সঙ্গে কোঁদল করছে। নীচ কোথাকার। দু-চার মাস পরে পরে একদিন করে মার না খেলে ও ঠিক হয় না। একা কারও সাধ্য নেই ওর সঙ্গে পেরে ওঠবে। যে লাগবে তারই অবস্থা কাহিল করে ছাড়বে।"

জ্বালাপ্রসাদ খুব দৃঢ় হয়ে বললেন, "কাকাবাবু, এ বাড়িতে এ সব চলবে না, আমি আপনাকে বলে রাখলাম।" বলে দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেলেন।

রাত্রে যখন জ্বালাপ্রসাদ এলাহাবাদ পৌঁছলেন, লক্ষ্মীচন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দুপুরে কানপুর থেকে ফিরেছেন। জয়দেইর জ্বর তিন দিন হ'ল ছেড়েছে। তাকে এখন বেশ সুস্থ দেখাচ্ছিল। আর তিনি যেন জ্বালাপ্রসাদেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। একার আওয়াজ শুনেই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, "এসো ঠাকুরপো, এবারে আমার জাকে সঙ্গে করে আনলে না?"

তৃতীয় দিন ভোরবেলা জয়দেই, লক্ষ্মীচন্দ, রাধাকে সঙ্গে করে জ্বালাপ্রসাদ সোরাঁও ফিরলেন। কিষণলাল তখন বাইরের কুঁয়োর পাড়ে বসে দাঁতন করছিল। লক্ষ্মীচন্দ, রাধা আর জয়দেইকে দেখেই দাঁতন ফেলে সরে পড়ার জন্যে উদ্যত হ'ল। তাকে যেতে দেখে জ্বালাপ্রসাদ ডাকলেন, "কিষণু, যাচ্ছ কোথায়? এদিকে শোনো।"

কিষণলাল যেন জ্বালাপ্রসাদের কথা শুনতেই পায়নি। এবার সেখান থেকে সে দৌড় দিল। জ্বালাপ্রসাদ চেঁচালেন, "কেউ আছ কি, ধর তো কিষণুকে।"

বিষণলাল সবে আখড়া থেকে ফিরেছিল। জ্বালাপ্রসাদের স্বর শুনেই কিষণলালের পিছু নিলে। আর তসিলের পুলিশদের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে জ্বালপ্রসাদের সামনে টেনে আনলে। চেঁচামিচি শুনে রাধেলাল আর রামলালও ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন, "কী ব্যাপার বিষণু, তুমি কিষণুকে ধরে টানাটানি করছ কেন?" রাধেলাল জিজ্ঞেস করলেন।

জ্বালাদাদা একে ডাকলেন, তা যাওয়া তো দূরের কথা, এ পালাতে শুরু করলে। তখন তিনি চেঁচিয়ে একে ধরতে বললেন। তাই তসিলের পুলিশরা একে জাপ্‌টে ধরে ফেললে। তাদের কবল থেকে ছাড়িয়ে একে এনেছি এখানে।"

জ্বালাপ্রসাদ কিষণলালকে বললেন, "এতে ভয় পাবার কিছু নেই। জমিদারগিন্নী তাঁর ছেলে-বৌকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সেখানে কিষণলাল যা করেছে জানা ছিল। তার শাস্তি সে অল্প-স্বল্প পেয়েছে। তবে জমিদারগিন্নী আর লক্ষ্মীচন্দের নামে যা মিথ্যে রটিয়েছে তা খুবই অন্যায়। এই কথা বলার জন্যেই আমি ওকে ডেকেছিলাম।"

"কি আর বলব, এ ছেলে তো কুলাঙ্গার", মুন্সী রাধেলাল কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন। "লক্ষ্মীচন্দ এই অপদার্থটাকে ক্ষমা কর, আমি হাত জোড় করে এর হয়ে ক্ষমা চাইছি।"

বিষণলাল বাবার কথায় জোরে হেসে উঠল, কত জনের কাছে ক্ষমা চাইবে বাপ্পা। কিষণুদাদা কি আর শোধরাবে। এ শুধু নিজের আর আমাদের নাক কাটবে।"

যমুনা বাইরে বেরিয়ে এসে জয়দেই আর রাধাকে স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

লক্ষ্মীচন্দ সেদিন সন্ধ্যেবেলাই রাধাকে নিয়ে এলাহাবাদে ফিরে গেলেন। যমুনার অনুরোধে জয়দেই কিছুদিনের জন্যে সোরাঁওতে রয়ে গেলেন। পরের দিন সকালে জ্বালাপ্রসাদও ট্যুরে চলে গেলেন।

তিন দিন পরে ট্যুর থেকে ফিরে এসে জ্বালাপ্রসাদ দেখলেন শ্যামলাল হাজির। সে বললে, "দাদা, আজ ভোরে রাজা সাহেব সরোহন ঠাকুর বীরভান সিংহের বাড়ি এসেছেন, তিনি বিশেষ করে দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।"

"হ্যাঁ, আমি জানি তিনি আমার সঙ্গেই বিশেষ সাক্ষাৎ করতে চান। বিজ্জু মৌজার বেনামা দলিল তোমার নামে করে দিয়েছেন কি না। সেই প্রসঙ্গেই আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।" জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন।

এর মধ্যে মুন্সী রাধেলালও সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু এ সব তুমি জানলে কী করে? শ্যামু ছাড়া তো এ সব আর কেউ জানে না, এমন কি ঠাকুর বীরভান সিংহও না।"

"চার-পাঁচ দিন হ'ল, এলাহাবাদ থেকে লালা ঘনশ্যামদাস আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর কাছেই রাজা সাহেবের তিনটি মৌজা বন্ধক আছে, বিজ্জু তারই একটা। তিনিই সব বলে গেছেন আর সেই সঙ্গে আমাকে সাবধানও করে গেছেন যেন মামলাটামলার ঝামেলা ঘাড়ে না নিই আর দুর্নাম না কিনি।"

রাধেলাল বললেন, "হ্যাঁ, মামলা তো চলছেই। আর মোকদ্দমা লড়ছেন রাজা সাহেব। সে মোকদ্দমায় কি এসে যায় আমাদের। যদি দলিলটা আসল বলে প্রমাণিত হয় তাহলে রাজা সাহেবের দুটি মৌজা আগে যেমন হাত ছাড়া হয়েছে, এটিও তেমনি চলে যাবে। নইলে বিনা ঝামেলাতেই জমিদারিটা আমাদের হাতে এসে যাবে।"

"তবে আর তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন?" জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"তুমি হাকিম মানুষ, প্রত্যেক ধনীমানী লোকই বড়ো অফিসারদের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে চায়। ঠাকুর বীরভান সিংহ আজ রাত্রে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। সেইখানেই রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে।"

জ্বালাপ্রসাদ আর কথা বাড়ালেন না। তিনি স্নানাহার সারলেন। স্নানাহারেই দুপুর গড়িয়ে গেল। যমুনাও ঠাকুর বীরভান সিংহের বাড়ি রাত্রে তাঁদের উভয়ের নিমন্ত্রণের কথা জানালেন। জ্বালাপ্রসাদ ভেবে পাচ্ছিলেন না কি করে এই নিমন্ত্রণ এড়ানো যায়। তিনি যমুনাকে বললেন, "তুমি এক্কাগাড়ি হাঁকিয়ে ঠাকুর বীরভান সিংহের বাড়ি যেও। আমাকে বেচু মিসিরের কাছে একটা পরামর্শের জন্যে যেতে হবে। আমি সেখান থেকেই সোজা চলে যাবো। তুমি ঠাকুরানী সাহেবাকে বলে দিও।"

যমুনা বললেন, "তা বেশ, তবে কিন্তু শ্যামুর বৌয়ের জন্য বাঁকমল গড়াতে দিতে হবে। বেচারিকে সবাই কষ্ট দেয়। পথে স্যাকরার দোকান পড়বে, এই আটটি বাঁকমল দিয়ে বলে দিও ষোলটি করে দিতে। বেশী যা রূপোর দরকার হবে যেন দোকান থেকে নিয়ে গড়ে দেয়।" বলে বাঁকমলগুলো যমুনা জ্বালাপ্রসাদকে দিলেন।

সেদিন জ্বালাপ্রসাদ হেঁটেই বেচু মিসিরের বাড়ি রওনা হলেন। দেবীদয়াল স্যাকরার দোকান বেচু মিসিরের বাড়ির পথেই। জ্বালাপ্রসাদ দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেবীদয়াল উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালে "আসুন সরকার, আপনি নিজে কেন কষ্ট করে এলেন? রামলাল ভাইকে তো বলে দিয়েছিলাম যে কালকে হয়ে যাবে, নিয়ে যাবেন।"

"কী তৈরি হয়ে যাবে?" আশ্চর্য হয়ে জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"তসিলদারনী সাহেবার গলার হার! দেখুন কি সুন্দর হয়েছে! এখনও তো পালিশ বাকি। পালিশের পরে দেখবেন।" এই সোনার একটি মটরমালা বের করে দেবীদয়াল জ্বালাপ্রসাদের সামনে রাখলে।

জ্বালাপ্রসাদ মটরমালাটি উল্টেপাল্টে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত ওজন হবে?"

"মোট সওয়া তোলা সরকার, তবে দেখতে পাঁচ তোলার কম

মনে হয় না। এলাহাবাদের ধনীমানী লোকেরাও আমার কাছ থেকে মটরমালা গড়িয়ে নিয়ে যান। আমার কারিগরটি জেলার সেরা কি না!" দেবীদয়াল বললেন গর্ব ভরে।

জ্বালাপ্রসাদ খানিক ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, "আরো কিছু গয়না-টয়না আমার বাড়ির জন্যে হালে গড়েছ কি?"

"আরে সরকার, এ আর জিজ্ঞাসার কি? গয়না তো রাজ-রাজড়ার আর হাকিম-হুক্কামদের ঘরে হামেশাই গড়ানো হয়ে থাকে। এতে আর ভাবনার কি আছে? রামলাল ভাইয়ের মারফতই তো সব জিনিষ গেছে। তিনি হিসেলে খুব দড়।" দেবীদয়াল হাসলে।

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "সে তো ঠিক্ই। তবে আমি নিজেও হিসেবটা দেখতে চাই। কারণ টাকা তো দিতে হবে আমাকেই। তাই নয় কি?"

"আরে সরকার, আপনি আবার টাকাকড়ির কথা কি বলছেন! বড় লোকদের বাড়ি বছরে একবার করে বিল যায়, আপনার কাছেও কালীপূজোর আগে যাবে। দু-চার শ' টাকা তো আপনাদের কাছে ফুৎকার।"

জ্বালাপ্রসাদ শ্যামুর বৌয়ের বাঁকমলগুলো দেবীদয়ালকে দিয়ে বললেন, "কাল দুপুরের মধ্যে ষোল গাছা নতুন বাঁকমল তৈরি করে আর পুরো হিসেব নিয়ে আমার কাছে আসবে। দেখো, এতে যেন কোনোরকম ভুল না হয়। তুমি তো জানই আমি ধারের হিসেব রাখি না।"

চৌদ্দ

পরের দিন জ্বালাপ্রসাদ ঘুম থেকে উঠলেন খুব দেরিতে। যখন তাঁর চোখ খুলল, মাথা ধরা ছিল সামান্য। ভোর চারটে থেকেই

ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছিল। এখন কমে এসেছে। চারধারের পরিবেশ বেশ খুশীতে ভরা। পুজো সেরে জয়দেই যমুনার কাছে বসে গত রাতের নিমন্ত্রণের গল্প শুনছিলেন।

সেদিন রবিবার, কাছারির ছুটি। তসিলের চাপরাসি জ্বালা-প্রসাদের বাড়িতেই ডাক দিয়ে গেল।

ভোরের কাজকর্ম সেরে স্নান করতে জ্বালাপ্রসাদের দশটা বেজে গেল। আকাশে মেঘের আনাগোনা নেই। থেকে থেকে সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে। জ্বালাপ্রসাদ সকালের জলখাবার নিষেধ করে নিজের অফিস ঘরে বসে সরকারী ডাক দেখছিলেন। তিনি ভিখুকে দিয়ে মুন্সী রাধেলালকে ডেকে পাঠালেন।

মুন্সী রাধেলাল শ্যামলালকে সঙ্গে করে রাজা সাহেব সরোহনের কাছে দেখা করতে যাবার জন্যে বের হচ্ছিলেন। এমন সময় ভিখু গিয়ে জ্বালাপ্রসাদের খবর দিলে। মুন্সী রাধেলাল শ্যামলালের সঙ্গে জ্বালাপ্রসাদের বৈঠকখানায় এলেন। শ্যামলালকে দেখে জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "ভালোই হ'ল তুমিও এসে গেছ। কাকা কাল আমি রাজা সাহেব সরোহনের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। তাঁর উকিলবাবু বটেশ্বরীপ্রসাদও তাঁর কাছেই ছিলেন।"

মুন্সী রাধেলাল বললেন, "হ্যাঁ, বটেশ্বরীবাবু আমাদের ফতেপুরেরই লোক। বিলেত থেকে ফিরেছেন বলে জাত গেছে তাঁর। কিন্তু খুব নাম করা উকিল। এলাহাবাদে তাঁর খুব বড়ো একটা বাড়ি আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এ সব তিনি আমাকে বলেছিলেন। খুব আন্তরিক ব্যবহার করলেন। বসুন না, কোনো তাড়া আছে কি?"

"না, এমন কোনো তাড়া নেই। শ্যামুকে নিয়ে রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। তিনি আজ সন্ধ্যেবেলা সরোহনে ফিরে যাবেন। তাই ভাবলাম তিনি যাবার আগে আমরা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করি।"

"এখন তো সন্ধ্যে হতে ঢের দেরি। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে।"

মুন্সী রাধেলাল বসলেন। শ্যামলাল বললে, "দাদা, আমি যদি একা যাই কোনো ক্ষতি আছে কি? আমাকে আপনার দরকার নেই তো?"

"না না, তুমি যেতে পার। কাকার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

শ্যামলাল যাবার পরে জ্বালাপ্রসাদ রাধেলালকে বললেন, "কাকা, আপনি তো জানেন বাপ্পার মৃত্যু হল কেন আর কি ভাবে।"

মুন্সী রাধেলাল ঘাবড়ে গেলেন, "হ্যাঁ,, তুমিই তো বলেছিলে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন আর ভরা কুঁজো তার মাথার ওপর উল্টে পড়েছিল।"

"আজ্ঞে না। তিনি কুঁজো নিজের মাথায় আছড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।" জ্বালাপ্রসাদ রুক্ষস্বরে বললেন, "আর আপনারা সবাই জানেন এটা। তিনি রাগে পাগল হয়ে মাথায় কুঁজো আছড়ে মেরেছিলেন। আর তাঁর রাগের কারণ হল আপনাদের জালিয়াতি সমর্থন করে মিথ্যে বলার জন্যে আমি রাজী হই নি।"

মুন্সী রাধেলাল বললেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে, সে মামলাটাতে আমরা হেরেও গেছি। এখন আবার সে কথা তোলা বৃথা। এ তাঁর ভুল, তিনি তোমার ওপর কেন যে চাপ দিচ্ছিলেন।"

"কাকা, তার জের এখনও মেটেনি। রাজা সাহেব সরোহন শ্যামলালের নামে বিজ্জু মৌজার যে বেনামী দলিল লিখেছেন তার বলি কে হবে? আমি আপনার উত্তর শুনতে চাই।"

"সে বেনামী দলিলে তোমার কি এসে যায়? সে রাজা সাহেব আর শ্যামলাল বুঝবে। তার জন্যে তোমাকে মিথ্যে বলতে বলছে কে? বিনা ঝঞ্ঝাটে জমিদারি হাতে আসছে। শাস্ত্রে বলে 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।"

জ্বালাপ্রসাদ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তবে বলতে বলতে থেমে গেলেন। দেবীদয়াল স্যাকরা ষোলটি বাঁকমল আর হিসেবের খাতা নিয়ে বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়াল। জ্বালাপ্রসাদ বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কে, দেবীদয়াল, ভেতরে এস।"

বাঁকমলগুলো হাতে নিয়ে জ্বালাপ্রসাদ ডাক দিলেন, "ভিখু।"

ভিখু সম্ভবত বৈঠকখানার দেওয়ালের গায়েই দাঁড়িয়েছিল সে তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানায় এসে বললে, "হ্যাঁ, দাদা"

জ্বালাপ্রসাদ বাঁকমলগুলো ভিখুর হাতে দিয়ে বললেন, "এ গুলো তোমার বৌদিকে দিয়ে এস, তারপরে রামুদাদাকে এখানে পাঠিয়ে দিও। বল, আমি ডেকেছি।"

"কেন, কি হয়েছে?" শঙ্কিত হয়ে মুন্সী রাধেলাল প্রশ্ন করলেন।

"রামুদাদা দেবীদয়ালের কাছ থেকে কিছু গয়না গড়িয়েছেন; এ তার হিসেব।" জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন শান্তভাবে।

এবার রাধেলাল দেবীদয়ালের দিকে ঘুরে বললেন, "কেনহে, এতো রামলালের নিজস্ব হিসেব, তসিলদার সাহেবের সঙ্গে এ হিসেবের কি সম্পর্ক?"

দেবীদয়াল উত্তর দেবার আগেই জ্বালাপ্রসাদ বলে উঠলেন, "কাকা, দেবীদয়াল রামুদাদাকে চেনেন কি? উনি জানেন আমাকে। যা কিছু লেনদেন সে তো তসিলদারের বাড়ি থেকেই হয়, তার দায়িত্ব আমার। ইনি এ হিসেব নিজে থেকে আমার কাছে আনেননি, আমিই এঁকে বলে এ হিসেব আনিয়েছি।" এই বলে জ্বালাপ্রসাদ হিসেবের খাতাটির ওপর চোখ বুলোলেন।

ততক্ষণে রামলাল ঘরের মধ্যে এসে পড়েছেন। দেবীদয়ালকে দেখামাত্র রামলাল বললে, "কি লালা, তসিলদার সাহেবের কাছে এ হিসেব কেন নিয়ে এসেছেন? আমার কথার ওপর ভরসা হল না নাকি?"

জ্বালাপ্রসাদ হিসেবের খাতা দেখলেন, "পায়ের মল এক জোড়া, ওজন একশো কুড়ি ভরি। হাঁসুলি একটি, ওজন পঁয়তাল্লিশ ভরি। রূপা পেলাম চল্লিশ ভরি। বাকি রূপা একশো পঁচিশ ভরি। দাম পঁচাত্তর টাকা। মল ও হাঁসুলির মজুরি দু আনা ভরির হিসেবে কুড়ি টাকা দশ আনা। মোট পঁচানব্বই টাকা দশ আনা।" জ্বালাপ্রসাদ

এবার দেবীদয়ালের দিকে তাকালেন, "কি মটরমালার হিসেব লেখনি কেন ?"

দেবীদয়াল বললে, "সরকার, মটরমালা সন্ধ্যের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। হিসেবের সঙ্গে কাল ওটা নিয়ে আসব। প্রায় ষাট টাকা হবে ওটারও।"

"আচ্ছা, এবার তুমি যাও। মটরমালা আর তার হিসেব কাল সকালে আমাকে দিয়ে যাবে।" জ্বালাপ্রসাদ বললেন।

দেবীদয়াল চলে যাবার পরে জ্বালাপ্রসাদ রামলালকে বললেন, "মোট একশো পঞ্চান্ন টাকা দশ আনা হয়। কাল সকালে দেবীদয়ালকে এই টাকা দিতে হবে। এই একশ' পঞ্চান্ন টাকা আমাকে দিয়ে দিন।"

রামলাল বাবার দিকে তাকালেন। রাধেলাল উত্তর দিলেন, রামুর কাছে টাকা কোথায় ? সে দেবীদয়ালকে নিজের পুরো মাইনে অর্থাৎ বারো টাকা মাসে মাসে দিয়ে যাবে। এক বছরে টাকা উসুল হবে।"

"কিন্তু এখানে ওঁর চাকরি কোথায় ?" জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"দু-এক দিনের মধ্যেই চাকরির পত্র আসবে," রামলাল উত্তর দিলেন।

"এ পত্র আপনার কাছে কোনোদিনই আসবে না। আপনি কাল সন্ধ্যেবেলা সপরিবারে ফতেপুর রওনা হয়ে যান, বুঝলেন। হাতের চাকরিটি সামলান গিয়ে।"

জ্বালাপ্রসাদের কথা শুনে মুন্সী রাধেলাল স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু জ্বালাপ্রসাদের ব্যবহার রামলালের বিশ্রী বোধ হল, "তাহলে এর অর্থ হল এই যে আপনি আমাকে আর আমার স্ত্রী পুত্রদের এখান থেকে বের করে দিচ্ছেন।"

জ্বালাপ্রসাদ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আপনি একে বের করে দেওয়া মনে করছেন ; আমি মনে করছি আপনাদের স্বস্থানে

পাঠানো। আপনি ফতেপুরে চাকরি করছেন। শ্যামলালের যথেষ্ট জমিজায়গা আছে। কাকাবাবু বাড়ির সব কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন। কিষণলালের বিয়ে দিয়ে আপনারা তাকে শাসনে রেখে ঠিক পথে নিয়ে আসুন।"

রাধেলাল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও দাদা শুনছ? তুমি তো স্বর্গে গিয়ে বসে আছ আর আমাকে এই নরকে ছুঁড়ে দিয়ে গেলে। এই জ্বালার সর্বনাশ হোক্ সর্বনাশ হোক্!" এই বলে মুন্সী রাধেলাল নিজের দু'হাত দিয়ে মাথা ঠুকতে লাগলেন।

বাড়ির মধ্যে হুলুস্থূল পড়ে গেল। চারদিক্ থেকে লোক জমা হতে লাগল। ভীড় যে হারে বাড়তে লাগল মুন্সী রাধেলালও সেই হারে গালাগালির সঙ্গে জ্বালাপ্রসাদকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। এমন সময় ভেতর থেকে এসে জয়দেই জ্বালাপ্রসাদের ঘরে ঢুকলেন। জ্বালাপ্রসাদের হাত ধরে তুলে বললেন, "ঠাকুর পো, এখান থেকে চল, এদের চেঁচাতে দাও!"

জ্বালাপ্রসাদ ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তবুও মুন্সী রাধেলালের অভিশাপ আর কটুবর্ষণ একটুও কমল না। বরং রামলাল আর রাধেলাল গলা মিশিয়ে অভিশাপ দিতে শুরু করলেন।

ভিখু চুপ করে দশ-পনের মিনিট পর্যন্ত এই সব তামাশা দেখছিল। তারপরে আর থাকতে না পেরে এগিয়ে এসে রামলালের হাত ধরল, "নিজের বাপকে নিয়ে ঘরের ভেতর যাও, এখানে তামাশা করে কিছু হবে না।"

ভিখুকে অশ্লীল ভাষায় গাল দিতে দিতে রামলালের স্বর সপ্তমে চড়ল। এবার ভিখুও ক্ষেপে উঠল, সে বলল, "চুপচাপ ভেতরে যাবে না চাপরাসি ডাকব? দাদার ভাতে থেকে আবার তাঁকেই গাল মন্দ করছ। যত সব নেমক্হারাম্!"

মুন্সী রাধেলাল দেখলেন ভিখুর পিছনে সত্যিই তসিলের দুজন চাপরাসি দাঁড়িয়ে। রাধেলাল রামলালের হাত ধরে বললেন,

"চল রামু, এখন হয়েছে কি। এবার এরা এই ছোটলোকদের দিয়ে আমাদের পেটাবে। চল, আজই এখান থেকে চলে যাই। এই পাপীদের অন্নজল আমরা গ্রহণ করবো না। তোমার মাকে আর বৌদের বল জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে। শ্যামু আর কিষণকে খুঁজে নিয়ে এস!" রাধেলাল রামলালের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

তাঁরা ভেতরে এলে বাইরের গণ্ডগোল যদিও থেমে গেল বাড়ির ভেতরে বাধলো হুলুস্থুল কাণ্ড। জিনিষপত্র তোলাপাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে চলল গালমন্দ। বিরক্ত হয়ে জয়দেই জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "ঠাকুর পো, তুমি না হয় বাইরে থেকে ঘুরে এস। এখানকার পরিস্থিতি তো ক্রমে আরো জটিল হতে চলেছে।"

"আজ খাওয়াদাওয়ার কি হবে বৌদি?" জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আজ একাদশী" জয়দেই মুচকে হাসলেন, "যদি চিরকালের জন্যে আপদ বিদায় করতে গিয়ে একদিন উপোস করতে হয় তো মন্দ কি। আজ তো বাড়িসুদ্ধ লোকের হাঁড়ী বারণ।"

জ্বালাপ্রসাদের মুখের ওপর মৃদু হাসি দেখা দিল, "না, বৌদি, এ আবার উপোস কি?" তারপর যমুনাকে বললেন, "তুমি আর ছিনকি উঠনে বেরিয়ে একটু দেখ কি হচ্ছে। বৌদি তুমিও না হয় এদের সঙ্গেই যাও। আমি ততক্ষণ বৈঠকখানায় গিয়ে আজকের ডাকটা দেখিগে।" এই বলে জ্বালাপ্রসাদ বৈঠকখানায় চলে গেলেন।

রান্নাঘরে শ্যামলালের বৌ নির্লিপ্তভাবে রান্না করছিল। রাধেলাল আর রামলালের স্ত্রী কান্নাকাটি করছিল। মুন্সী রাধেলাল চেঁচাচ্ছিলেন, "না, আমি খাবো না, জল পর্যন্ত স্পর্শ করবো না। ক্ষুধায় পিপাসায় এখানেই প্রাণ দেবো। এ আমার দাদার প্রাণ নিয়েছে, আমিও এরই হাতে যাব। ভোগ করুক নিজের তসিলদারি!

নিজের রাজ-পাট! নিজের অফিসারী! এর স্থান নরকেও হবে না।"

ছিনকি আর থাকতে পারলে না। সে এগিয়ে গিয়ে মুন্সী রাধেলালের সামনে দাড়াল, "প্রাণ দিতে হয় তো এক্ষুনি দাও, শুধু এই গালমন্দে প্রাণটা যাবে না। এই সব গুণের জন্যেই তো এমন দিন দেখতে হ'ল। যার লজ্জা আছে, যে পুরুষ মানুষ প্রাণ দেবে সেই। আমিও দেখতে চাই, তুমি কি করে প্রাণটা দাও।"

রাধেলালের স্ত্রীর মনে হ'ল ব্যাপারটা যেন বেশীদূর গড়াচ্ছে, শুধু গড়ায়নি, এখন তো সবকিছু শেষও হয়ে গেল। মুন্সী রাধেলাল চীৎকার করে ছিনকিকে গালমন্দ করছিলেন। রাধেলালের স্ত্রী চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, "কি রে ছিনকি, এখন তোর এতো বাড় বেড়েছে, ছোটকর্তার মুখের ওপর কথা বলছিস!"

"কেন ভয় কিসের? ওঁর খেয়েছি, না পরেছি। আমার ছেলেকে যে এত গালমন্দ করছেন তখন তো কই কেউ নিষেধ করছ না। বেহায়াপনা করে জ্বালাকে কষ্ট দেবে ভেবেছ। সেটি আর হচ্ছে না। যেখানে ঘরদোর আছে সেখানে গিয়ে থাকতে বলেছে, তা অন্যায় কি বলেছে জ্বালা? জমি কিনে দিয়েছে, সব রকম সাহায্য করছে। তাতেও খুশী নও। ওর প্রাণ নেবার জন্যে কি কোমর বেঁধে এসেছ তোমরা। তা সেসব আর হচ্ছে না!"

রাধেলালের স্ত্রী রাধেলালকে চুপ করালেন, "চেঁচিয়ে তো আর কাজ হবে না। ফতেপুরে যাবার তোড়জোড় করতে হবে। তা ধীরে সুস্থে তোড়জোড় করে নেওয়াই ভালো। এভাবে প্রাণ দিয়ে তো কোন লাভ নেই।"

রাধেলাল গর্জে উঠলেন, "আমি এত সহজে প্রাণটা দিচ্ছি না। তবে আমাদের আজ সন্ধ্যের মধ্যে এই পাপীর বাড়ি ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমি তো বলেছি আমি এ বাড়িতে আর অন্ন গ্রহণ করব না আর তোমাকেও অন্ন গ্রহণ করতে দেব না। শ্যামুর বৌকে বল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে।"

শ্যামলালের স্ত্রী তাড়াতাড়ি রুটি সেঁকছিল। রাধেলালের স্ত্রীর আদেশ পাবার আগেই সে যমুনার কানে কানে বলল, "দিদি, রান্না করে দিয়েছি, তুমি চিন্তা করো না। যাই, ফতেপুর যাবার জন্যে তৈরী হতে হবে।"

হঠাৎ যমুনার শ্যামলালের বৌয়ের বাঁকমলের কথা মনে পড়ল, তিনি শ্যামলালের বৌকে বললেন, "তোমার বাঁকমল হয়ে এসেছে, তুমি দাঁড়াও, আমি আনছি এক্ষুনি।"

এমন সময় রাধেলালের স্ত্রী রান্না ঘরের সামনে এলেন, "ওঠ্, মেজবৌ, ছেড়ে দে রান্না। যা নিজের জিনিষপত্র বাঁধ গে।" এই বলে তখনই ফিরে গেলেন।

শ্যামলালের স্ত্রী যমুনার জন্যে অপেক্ষা করছিল। যমুনা যখন তাকে ষোলটি বাঁকমল দিলেন সে ভারি খুশী হ'ল। তাড়াতাড়ি বাঁকমল পরতে পরতে বললে, "যাক দিদি, এদের হাত থেকে তোমার প্রাণটা বাঁচল।"

এর মধ্যে রাধেলালের স্ত্রীর আবার ডাক শোনা গেল, "কি রে মেজবৌ, ওখানে কি করছিস? বললাম না যে রান্না ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আয়। জিনিসপত্র সব বাঁধতে হবে।"

শ্যামলালের স্ত্রী ওখান থেকেই উত্তর দিল, "এক্ষুনি এলাম মা, একটু হাত-পা ধুয়ে নিই।" তারপরে যমুনাকে বললে, "দিদি, কি আর বলব, তোমাকে ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমরা চলে গেলেই তোমার কল্যাণ তা আমি ভালোভাবেই জানি।" বলতে বলতে তার চোখে জল ছলছলিয়ে এলো।

শ্যামলালের স্ত্রীর চোখে জল দেখে যমুনার মন করুণায় ভরে । তিনি তাকে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তারপরে নিজের পায়ের মল খুলে শ্যামলালের স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, "মেজবৌ, তোমার জন্যে আমি কোনো গয়না গড়িয়ে দিতে পারলাম না, এই আমার মলটি তুমি নিয়ে যাও, আমি আবার গড়িয়ে

নেবো পরে। এটা সামলে রাখবে। এরা যদি তোমাকে কষ্ট দেয় তাহলে কোনো রকমে খবর দেবে আমাকে।”

শ্যামলালের স্ত্রী মলটি তাড়াতাড়ি নিজের শাড়ির খুঁটে বেঁধে নিল আর ঝুঁকে যমুনাকে প্রণাম করল। তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

দুপুর হ'ল। জ্বালাপ্রসাদের উঠন নিস্তব্ধ। মুন্সী রাধেলাল আর তাঁর পরিবারের লোকেরা খেলেন না কিছুতেই। জ্বালাপ্রসাদ বৈঠকখানায় এসে শান্তি না পেয়ে এক্কা জুড়ে পাশের গ্রামে এক বন্ধুর বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে দুপুরে ফিরলেন। এরমধ্যেই শ্যামলাল আর বিষণলালও এসে পড়েছিল। সবাই মিলে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শুরু করেছিল।

যমুনা জ্বালাপ্রসাদকে খাবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। জ্বালা-প্রসাদ রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন সেখানে শুধু যমুনা একা আর উঠন নিস্তব্ধ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আর সবাই? ওরা কি খাবেন না?”

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল ছিনকি, যমুনার উত্তর দেবার আগেই সে বলল, “ছোটকর্তা এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করবেন না শপথ করেছেন। তা শুধু নিজেই শপথ করতেন তো হতো, নিজের ছেলে-বৌদেরও শপথ দিয়ে দিয়েছেন। সবাই জিনিসপত্তর বাঁধা-ছাঁদা করছে।”

জ্বালাপ্রসাদ বাড়া থালা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাত-মুখ ধুয়ে মুন্সী রাধেলালের ঘরের বাইরে গেলেন। রাধেলালকে কিছু না বলে রাধেলালের স্ত্রীকে বললেন, “কাকিমা শুনলাম না কি আপনারা এ বাড়িতে আর খাওয়া দাওয়া করবেন না বলে শপথ করেছেন। এ কি সত্যি?”

উত্তর দিলেন রাধেলাল, “হ্যাঁ, এতো অপমানের পরেও আবার আমরা এ বাড়িতে খাব মনে করেছ! আমাদের কাছে তুমি মরে গেছ।”

ছিনকি জ্বালাপ্রসাদের পিছন পিছন এসেছিল, সামনে এসে চেঁচিয়ে বললে, "মরেছ তুমি আর তোমার ছেলেরা! মুখপোড়া কোথাকার! ভবানী একে গ্রাস করুন, আমার ছেলেকে শাপ দিচ্ছে।"

জ্বালাপ্রসাদ ছিনকিকে বকলেন, "ছিনকি কাকী, তুমি এখান থেকে যাও! খবরদার যদি একটি কথাও মুখ থেকে বের করেছ।" তারপর তিনি রাধেলালের স্ত্রীকে বললেন, "কাকিমা শুনলাম, তোমাদের কাছে এখন আমি মৃত। এবার সামলাও নিজের পরিবার আর বংশ। ফতেপুরের বাড়ি আর জমিজায়গা আমি মরে তোমাদের নামে উইল করে দিয়েছি। আমার আর ঐ বাড়ি জমি-জায়গার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।"

হঠাৎ রাধেলালের স্ত্রী ছুটে এসে জ্বালাপ্রসাদের পায়ের ওপর পড়লেন, "হায় বাবা, আমাদের ভাগ্যে এদিনও দেখতে হ'ল! আমাদের ক্ষমা করো বাবা! ভগবান কোন বড়ো বিপদের মুখে আমাদের ফেলতে যাচ্ছেন সেইজন্যেই ওঁর এই মতিভ্রম হয়েছে। তোমাকে নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করেছি। আমার কথায় ওঁকে ক্ষমা কর বাবা!" এই বলে রাধেলালের স্ত্রী জ্বালাপ্রসাদের পা চেপে ধরলেন।

রাধেলালের স্ত্রী নিজের ছেলের মতোই জ্বালাপ্রসাদকে লালন-পালন করেছিলেন, এটা সত্য। জ্বালাপ্রসাদের চোখে জল ভরে এলো। নীচে ঝুঁকে কাকিমাকে পায়ের ওপর থেকে তুললেন, "ছিঃ ছিঃ কাকিমা, আমাকে কেন আর নরকে পাঠাচ্ছ? রাগের মাথায় আমি যা কিছু বলেছি তারজন্যে ক্ষমা চাইছি। আর কাকার রাগে তো আর কাজ হবে না। আমি আপনাদের যা কিছু বলেছি, সে আপনাদের মঙ্গলের জন্যেই আর নিজের কল্যাণের জন্যে। ছেলেদের সৎ আর পরিশ্রমী হতে শেখান। তাদের সততার আর পরিশ্রমে আমিও তাদের সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

আমার ছায়ায় থেকে তারা বখাটে, ফাঁকিবাজ, বেইমান আর চোর হয়ে যাচ্ছে। তাদের শোধরান আপনার কর্তব্য।"

রাধেলালের এখন মনে হচ্ছিল, সকাল থেকে তিনি যা করেছেন সব ক্রোধাবশে। তাঁর মনে এখন অনুশোচনা হচ্ছিল। তিনি জ্বালাপ্রসাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

জ্বালাপ্রসাদ তাকে জোর করে তুললেন, "কাকা, খেতে চলুন। আপনি না খেলে বাড়িতে কেউ খাবে না। যদি অজান্তে আমার মুখ থেকে কোনো কটু কথা বের হয়ে গিয়ে থাকে তো আমাকে ক্ষমা করুন।"

কান্নার বেগ চাপার ফলে রাধেলালের গলা হেঁচকিতে রুদ্ধ হল। তিনি জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গেই রান্না ঘরে এসে খেতে বসলেন। খেতে খেতে বললেন, "বাবা, তোমার ভাইদের তো তুমি জানই, এরা সবাই অপদার্থ আর বখাটে। মনে করেছিলাম তোমার কাছে থেকে বোধহয় ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলাম। এখন সমস্যা—আমাদের দিন কাটবে কি করে?"

জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "কেন, জমি তো যথেষ্ট কেনা হয়েছে। তার ওপর রামুও চাকরি করছে। কিষণলাল আর শ্যামলালের সঙ্গে আপনিও জমির দেখাশোনা করবেন। আমি মনে করি তাহলে আপনাদের কোনো অভাব আর থাকবে না। দরকার মনে করলে আমাকে লিখবেন। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।"

রাধেলালের চোখ জলে ভরে এলো, "বাবা, তুমি আমাদের বড়ো অবলম্বন, যেন আমাদের ছেড়ে দিও না!"

বিকেল পর্যন্ত রাধেলালের পরিবারের জিনিষপত্র সব বাঁধাছাদা হয়ে গেল আর সবাই খাওয়া দাওয়াও সেরে নিলে। শ্যামলাল আগেই তিনটি এক্কা গাড়ির ব্যবস্থা করে এসেছিলেন, তারা এসে পৌঁছল। বিষণলাল সেদিন প্রতাপগড়ের একটি কুস্তি প্রদর্শনীতে গিয়েছিল। জিনিষপত্র তোলা হলে রাধেলালের স্ত্রী জোড় হাত

করে জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "বিষণুর সঙ্গে দেখা হল না। বড়ো ভালো সরল ছেলে। ওর দেখাশোনা করো আর চোখ রেখ, বাবা!"

"কাকিমা, তুমি বিষণুর জন্যে কোনো চিন্তা কর না, তার ওপর সংসারের কারো কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না।"

এক্কাগুলো এলাহাবাদ রওনা হ'ল আর জ্বালাপ্রসাদ বৈঠকখানায় এসে বসে পড়লেন। তাঁর মন যদিও এখন হাল্কা তবুও এক বিচিত্র করুণ পরিবেশে তাঁর চারিদিক ঘিরে রেখেছিল। এক বছর ধরে যে দম আটকানো হট্টগোলে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ছিলেন সেটা সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন ছিল শুধু একটি মুক্ত পরিবেশ, কিন্তু কতই-না শুষ্ক আর কতই-না শ্রীহীন। তাঁর মন হাল্কা হল কিন্তু প্রাণটা ব্যথায় যেন টনটন করছিল। তিনি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে বসে ভাবছিলেন। কখন যে অন্ধকার হয়েছে টেরই পেলেন না। হঠাৎ জয়দেই কাঁধে নাড়া দেওয়াতে যেন চমকে উঠলেন, "ওঠো ঠাকুরপো, এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে বসে কি ভাবছ? বাইরে চল।"

জ্বালাপ্রসাদের হাত ধরে তিনি তাঁকে উঠনে বের করে আনলেন। যমুনা তখন রান্নাঘরে, ছিনকি তাঁকে সাহায্য করছিল। ভিখু আজ উঠনের লাগোয়া বারান্দায় গঙ্গাপ্রসাদের বিছানা পেতেছিল। জয়দেই যমুনাকে ডাকলেন, "রাণীজি, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে এঁকে সামলাও। এখানে এসে বস! লুচি তরকারিই হবে তো। ছিনকিকে তরকারিটা করতে বলো, পরে আমরা দুজনে মিলে লুচি ভেজে নেবো।"

যমুনা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আজ তিনি কতই যে শান্তি অনুভব করছিলেন! ভিখু জ্বালাপ্রসাদকে নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। ছিনকি রান্নাঘরে তরকারি রান্না করছিল, জ্বালাপ্রসাদ, জয়দেই আর যমুনা বসে গল্প করছিলেন।

জয়দেই বললেন, "ঠাকুরপো, লক্ষ্মীর বৌয়ের পাচ মাস চলছে।

আমরা ভাবছি প্রয়াগেই তার সন্তান হোক্। এলাহাবাদে বাংলো ভাড়া নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মী এলাহাবাদ আর কানপুরে যাতায়াত করে। ঘাটমপুরে যাবার সময় নেই তার।"

যমুনা বললেন, "দিদি, এলাহাবাদেই এসে থাক না কেন। ঘাটমপুরে কি আছে, যার জন্যে সেখানে পড়ে আছ? চাকর-বাকর দিয়ে কি আর ঘর-সংসার দেখাশোনা হয়? আমার কথা যদি শোন তাহলে ঘাটমপুরের সংসার তুলে এলাহাবাদে নিয়ে এস।"

"হ্যাঁ রাণী, লক্ষ্মীও ঘাটমপুর থেকে ঘর-সংসার গোটাতে বলছে। তার ইচ্ছে কানপুর না হলে এলাহাবাদে এসে থাকে। কানপুর শহরের মধ্যে একটা বড়ো বাড়ি কিনেছে। কিন্তু আমার তো আবার সে বাড়ি পছন্দ নয়। আমি মনে করি, প্রয়াগ সব চেয়ে বড়ো তীর্থস্থান, সেখানেই শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবো।"

"হ্যাঁ দিদি, একে তো তীর্থের রাজা, তার ওপর আবার রাজধানী। লক্ষ্মীর বৌয়ের কোন জায়গা পছন্দ?"

"তার পছন্দ তো কানপুরই। কারণ সেখানেই তার বাপের বাড়ি। কিন্তু বৌয়ের আবার পছন্দ অপছন্দ কী! কাঁচা বয়স আর ভালোমানুষ। রাণীজি, দু-তিন মাস পরে একমাসের জন্যে তোমাকে এলাহাবাদে আমার সঙ্গে গিয়ে থাকতে হবে, বৌমার ছেলে পুলে না হওয়া পর্যন্ত। ঠাকুরপো শুনছ কি আমার কথা! রাণীজিকে এক মাসের জন্যে আমার কাছে পাঠাতে হবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি চাও তো এখনই তোমার সঙ্গেও চলে যাবে!" জ্বালাপ্রসাদ হেসে বললেন, "বৌদি, তোমার তো আমাদের ওপর পুরো অধিকার।"

এমন সময় ভিখু আর গঙ্গাপ্রসাদের স্বর জ্বালাপ্রসাদ শুনতে পেলেন। ভিখু বলছিল, "এই তো সবে স্কুল খুলেছে, এখন দু-এক মাস লেখাপড়া কিছু হবে না, তাই বাড়িতেও লেখাপড়া করার দরকার নেই। খেয়েদেয়ে গিয়ে ঘুমোও। এই গরমে ঘরের মধ্যে কোথায় পড়বে বসে বসে।"

উত্তরে গঙ্গাপ্রসাদের স্বর শোনা গেল, "না, ভিখুকাকা, আমাকে এবার ক্লাসে প্রথম হতেই হবে। চার নম্বরের জন্য দ্বিতীয় হলাম। এবারে আমাকে আর কেউ হারাতে পারবে না।"

জয়দেই হাসলেন, "ঠাকুরপো, গঙ্গা তোমাকেও হার মানাবে। কিন্তু সোরাঁওতে লেখাপড়ার কীই বা ব্যবস্থা?"

জ্বালাপ্রসাদ হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। গঙ্গাপ্রসাদ এখন পঞ্চম শ্রেণী পাস করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছে। সোরাঁওতে ইংরিজি পড়ান হয় শুধু ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। এরপর জ্বালাপ্রসাদকে গঙ্গাপ্রসাদের পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে অন্যত্র। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এই সমস্যাটার কথা তাঁর কোনোদিন খেয়ালই হয়নি! গত দেড়-দু'বছর ধরে পারিবারিক সমস্যাগুলো নিয়ে তিনি বিশেষ জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই এসব ভাববার তাঁর সময়ই ছিল না। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, বৌদি, তুমি ভালো মনে করিয়ে দিলে। গঙ্গার পড়াশোনার সম্বন্ধে আমি তো কিছুই ভাবিনি। সোরাঁওতে থাকলে ওর লেখাপড়া কিছুই হবে না আর ফতেপুরে তো একে কোনো মতেই পাঠাবো না। এ বিষয় চিন্তা করতে হবে।"

জয়দেই মুচ্‌কে হাসলেন, "এতে চিন্তার কি আছে ঠাকুরপো! তোমার তো এলাহাবাদেও বাড়ি। গঙ্গাকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও। বড় ছেলে লক্ষ্মী তো এখন আত্মনির্ভর হয়েছে, এই ছোট ছেলেটিকে নিয়েই আমি থাকব।"

জ্বালাপ্রসাদ আর যমুনা একে অপরের দিকে তাকালেন আর পরস্পরেব চোখের ভাষা বুঝে নিলেন। যমুনা জয়দেইয়ের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, "দিদি, গঙ্গা যেমন আমার তেমনি তোমার। সে অনেক পড়বে। তার বাবার চেয়েও বড়ো হবে। তাহলে গঙ্গা আজ থেকেই তোমার। আর এঁর তো চাকরির ব্যাপার। গত বছর থেকেই উন্নতি আর বদলীর খবর শুনছি। তা চাকরির ছোটাছুটিতে কি আর গঙ্গার লেখাপড়া হবে?"

জয়দেই যমুনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, "রাণীজি, তুমি কী ভালো! আমার কত আপন! আমার কাছে গঙ্গা লক্ষ্মীর চেয়ে কিছু কম নয়। এবার আমি প্রয়াগ ছেড়ে আর কোথাও যাব না। লক্ষ্মীর কানপুর বেশী পছন্দ। কিন্তু আমি তো প্রয়াগেই থাকব।" জয়দেইয়ের মুখের বলিরেখা যেন সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল! তাঁর মনে হ'ল যেন বয়স তাঁর কমে গেছে দশ বছর!

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক

পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্ত আকাশের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়েই রইলেন। তাঁর মুখে একটা করুন চিন্তার আবেশ আর চোখ দুটো সজল। গম্ভীর স্বরে তিনি যেন নিজেকেই বললেন, "আমরা এবার সত্যিকার গোলাম হলাম। ইংল্যাণ্ডের বাদশাহ দরবার করতে আসছেন দিল্লীতে। ভারতের রাজা মহারাজারা তাঁর হুজুরে মাথা নত করে থাকবেন, তাঁকে ডালি দেবেন, স্বীকার করবেন তাঁর আধিপত্য!"

শ্রীকিশোরী রমণ পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্তের সামনে পানের বাটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "পণ্ডিতজি, তবে আপনি কি এর জন্য দুঃখিত?"

শ্রীকিশোরী রমণ বেরেলি শহরের সহকারী সিভিল সার্জেন। গৌরবর্ণ, লম্বা, দোহারা-চেহারা। যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়াবস্থায় প্রবেশ করেছিলেন। শ্রীরমণজি বেরেলির জনপ্রিয় ডাক্তার। সরকারী মাইনের ওপর প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে মাসে দু-তিনশ' ক'রে কামাতেন।

পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্তের মুখের ওপর মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল কিন্তু গাম্ভীর্য কমলো না, কারণ তাঁর মৃদু হাসি এত সুস্পষ্ট ছিল না। তাঁর ঠোঁট দুটোকে ঢেকে রাখা আধপাকা গোঁফ জোড়ার মধ্যে থেকে তা দেখা গেল না। "না, ডাক্তার, যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে। কোন রকমে এই ম্লেচ্ছ যবনদের শাসন আমাদের ওপর থেকে সরলো, দেশের অরাজকতা দূর হ'ল, অত্যাচার থেকে মুক্ত হলাম, চারদিকে সুখ-শান্তি বাড়ল। এ সব কে খারাপ বলবে। কিন্তু এরই সঙ্গে একটি কথা অতি অবশ্যই বলার আছে, বিদেশী সব সময়েই বিদেশী।"

পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্ত বেরেলির ডেপুটি কালেক্টার। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। লম্বা-চওড়া আকৃতি, জঁাদরেল চেহারা, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। সংস্কৃত ভালো জানতেন তিনি। পণ্ডিতজি ছিলেন আচারনিষ্ঠ, স্পষ্ট-ভাষী, খাঁটি মানুষ, কিছুটা ঝগড়াটে বলা যেতে পারে। অনায়াসেই তিনি খিলখিল করে হেসে উঠলেন, "ডাক্তার সাহেব, এই বিদেশীরা কত কিছুই না বদলে দিলে। এই যে মীর সাহেব আসছেন, এঁর বাবার ছিল লম্বা দাড়ি। তিনি সব সময় গাউনের মত ঢিলে জামা পরে থাকতেন। তাঁর হাতে থাকত জপের মালা। আর এঁকে দেখুন, কোট-হাফপ্যান্ট, দাড়ি কামান গোঁফটা এমন পাকান যে দেখে ভয়ে পালাতে হয়! মুখে চুরুট।"

মীর জাফর আলির কানে পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্তের কথাগুলো গিয়ে পৌঁছল। তিনি মুচ্‌কি হেসে এগিয়ে এলেন, "কি পণ্ডিত, বিদ্রূপ করছেন নাকি! আপনি নিজের কথা বলছেন না কেন? ডাক্তার সাহেব, একটা নতুন খবর শুনেছি—আমাদের পণ্ডিতজি আর্যসমাজী হয়ে গেছেন। কি পণ্ডিত, আমি কি ভুল বলছি?"

"তা এর জন্যে আপনার দুঃখ কেন? হিন্দু ধর্মের আড়ম্বরের ঠেলায় আমাদের ধর্মটা শূন্যগর্ভ হয়ে গেছে। আমাদের ধর্মের এই দুর্বলতার সুযোগে নাফা করেছেন মুসলমানেরা, খ্রীষ্টানেরা। লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা বিধর্মী হয়ে গেছে। আর্যসমাজ হিন্দুধর্মকে সুসংগঠিত করছে। ঋষিদের পরম্পরাকে পুনরুজ্জীবিত করছে। হিন্দুধর্মকে বিশ্ব-বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করছে।"

মীর জাফর আলি বেরেলি পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। তাঁকে যুবক বলা চলতে পারে। লম্বা সুগঠিত দেহ, রং উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণের চেয়ে পরিষ্কার দেখতে। মীর সাহেব নিজেকে পাঠান বলতেন। মীর সাহেবের ধর্মে-কর্মে কোন রুচি ছিল না, না রোজা করতেন আর না নামাজ পড়তেন। তবে ধর্ম নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা ইদানীং তাঁর যেন নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মীর সাহেব মুখ বেঁকিয়ে বললেন "পণ্ডিতজি, একটু হুঁসবাহালের

চিকিৎসা করুন। এই ধুতি-পরা মানুষরা কি দুনিয়া জিততে পারবে? মরার আগে যেমন পিঁপড়েদের পালক গজায়, ঠিক তেমনি হিন্দুধর্মের মধ্যে এই আর্যসমাজ জন্ম নিয়েছে। কি বলেন, জোনাথন সাহেব।" মীর সাহেব মিস্টার জোনাথন ডেভিডকে ডাক দিলেন, তিনি তখন তাস পেটার জুটি জোগাড়ে ব্যস্ত।

মিস্টার জোনাথন ডেভিড কাল, বেঁটে, কিছুটা পিংখারু ধরণের। বয়স প্রায় তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁকে দেখতে পঞ্চাশের মতো। জোনাথন ডেভিড বেরেলির সাব জজ। কোটপ্যান্ট পরা, দাড়ি গোঁফ কামান। মীর সাহেবের ডাকে এগিয়ে এসে বললেন, "ও মীর, টুমি এসেছ, আমি টোমার খোঁজ করছিলাম। হ্যালো ডক্টর, আজ ব্রিজ জমবে?" তারপর মীর সাহেবের কাছে এসে বললেন, "টুমি হামাকে ডাকছিলে ম্যান?"

মীর সাহেব জোরে হেসে উঠলেন, "ডেভিড সাহেব, উচ্চারণ এখনও একটু আধটু দেশীদেশী ঠেকছে যে। আরো বেশী অভ্যাস করতে হবে, তবে যদি বা এংলোইণ্ডিয়ানদের মতো বলতে পারো।"

"কি উল্টোপাল্টা বকছ টুমি মীর? হামি পিওর য়ুরোপীয়ান আছি। সেভেন জেনারেশনস্ হাগে হামার ফোর ফাদার্স হিন্দুস্থানে এসেছিলেন—সাউটেই রয়ে গেলেন। ডক্টর, সেভেন জেনারেশনস্ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইন সাউট!" জোনাথন ডেভিড নাটকীয় ভঙ্গিমায় নিজের দু'টো হাত ছড়িয়ে দিলেন, "এ্যাণ্ড দি রেজাল্ট?"

"আজ্ঞে আপনি!" ডাক্তার কিশোরী রমণ খুব গম্ভীরস্বরে বললেন, "একের ওপর এক হিন্দুস্থানের কালো পরদা জমে উঠল। সেভেন জেনারেশন্সে সাতটি পরদা। আবলুস আপনার কাছে হার মানবে ডেভিড সাহেব! কিন্তু আমি হলাম সার্জন, যতই কালো হোক্ না কেন, আপনার চামড়ার আসল রং সাদা, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি! ওই মেকগিল নিজেকে বড় সিভিল সার্জেন বলত, ও অন্ধ হয়েছে, অন্ধ! সেইজন্যে আপনার সাদা চামড়া দেখতে পায়নি বলে আপনাকে য়ুরোপীয়ন ক্লাবে ঢুকতেই দিল না একদম!"

পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্ত এতক্ষণ চুপচাপ এই কথাবার্তায় মজা দেখছিলেন। তিনি আর থাকতে পারলেন না, "এই পাজি য়ুরোপীয়নরা আপনাকে কোনোমতেই নিজেদের ক্লাবে ঢুকতে দেবে না, জোনাথন সাহেব। যদি আপনি আমার কথা শোনেন তাহলে শুদ্ধ হয়ে যাবেন। যে হিন্দুরা মারের ভয়ে মুসলমান হয়েছিল আর দুর্ভিক্ষের জন্যে যে হিন্দুরা খ্রীষ্টান হয়েছিল, তাদের সবাইকে শুদ্ধ করার কঠিন কাজ আমরা নিজের ঘাড়ে নিয়েছি। সে দিক্ থেকে ডেভিড সাহেব, এই সুযোগে আপনি লাভবান্ হতে পারবেন।"

জোনাথন ডেভিড বা মীর জাফরআলি পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্তকে মুখের ওপর জবাব দেবার আগেই ডাক্তার কিশোরী রমণ বলে উঠলেন, "পণ্ডিতজি, ডেভিড সাহেব যদিও বা শুদ্ধ হয়ে যান, কিন্তু এঁর মেমসাহেবকে আপনি কি করে শুদ্ধ করবেন? তিনি'ত পিওর য়ুরোপীয়ান। আমাদের জোনাথন ডেভিড সাহেবের য়ুরোপীয়ান ক্লাবে ঢোকা নিষেধ আর এঁর মেমসাহেব সেখানে প্রত্যহ টেনিস খেলেন, ডান্স ক'রে থাকেন।"

মীর জাফরআলি বললেন, "আপনারা জোনাথন সাহেবকে ভেবেছেন কি? ইনি ছোট লাট সাহেবের কাছে মেমোরেণ্ডম পাঠিয়েছেন—যেন এঁকে য়ুরোপীয়ান ক্লাবে ভরতি করে নেওয়া হয়। এঁর মেমসাহেব নিজে মেমোরেণ্ডম নিয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছেন। এক ঘণ্টা পর্যন্ত কথাবার্তা বলেছেন!"

পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্ত জোনাথন ডেভিডের দিকে দেখলেন, "কি ডেভিড সাহেব; মীর সাহেব কি ঠিক্ বলছেন?"

অত্যন্ত দীন আর করুণ মুখে জোনাথন ডেভিড পণ্ডিত সোমেশ্বরের দকে তাকালেন, "হাঁ পণ্ডিট, কিন্তু লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর হামার মেমকে বলল, যে, এন্‌কোয়ারী করবে। কমিশনর, কালেক্টার, ডিস্ট্রিক্ট জজ, সবাই রাজী আছে, কিণ্টু এই শূয়োর সিভিল সার্জেন বলছে যে যদি হামি ক্লাবে ঢুকি তো হামাকে টুলে নাকি ফটকের

বাইরে ফেলে ডেবে। মীরটার সঙ্গেই আছে টোমার ওই হারামজাডা ক্লীমেণ্টস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিশ,'' এই বলে জোনাথন ডেভিড বয়কে ডাক দিলেন, ''একটি ছোট পেগ্। ওয়েল ম্যান, টুমিও খাবে মীর, ছটি ছোট।''

পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্তের মুচ্‌কি হাসি তাঁর গোফের ফাঁক দিয়ে দেখা দিল, ''মিস্টার ডেভিড, শুনেছি নাকি এই পুলিশ কাপ্তান ক্লীমেণ্টস্ প্রতিদিন য়ুয়োপীয়ান ক্লাবে গঙ্গাপ্রসাদকে ডেকে তার সঙ্গে টেনিস খেলে। এটা কি ঠিক্ খবর?''

কিশোরী রমণ জোরে হেসে উঠলেন, ''পণ্ডিতজি, আমাদের সিভিল সার্জেন মিস্টার মেকগিল পাঁচবার আমাকেও য়ুরোপীয়ান ক্লাবে নিয়ে গেছেন। তবে জানিনা কেন তাঁর জোনাথন ডেভিডের সঙ্গে ধর্মের বিদ্বেষ আছে। এঁর মুখ দেখলে যেন তিনি ভড়কে ওঠেন!''

বেয়ারা জোনাথন ডিভিড আর মীর সাহেবকে হুইস্‌কির গেলাস ভরে দিয়ে গিয়েছিল। জোনাথন ডেভিড এক ঢোঁকে আধ গেলাস খালি ক'রে দিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, ''ওয়েল পণ্ডিট, হামার ভাগ্য মণ্ড। হামি বিলায়েট গেলাম, আসল য়ুরোপীয়ান মেমের সঙ্গে বিয়ে করলাম। হামার ড্যাডি হামাকে এংলোইণ্ডিয়ন লেখালেন। কিণ্টু শূয়োরের বাচ্চা এই মেকগিল আর ক্লীমেণ্ট হামাকে নেটিভ ক্রিশ্চিয়ানই বলে। পণ্ডিট, ভাগ্য খারাপ ছাড়া আর কি বলি? ওই ডেখ, গঙ্গাপ্রসাড এলো। ওকে খুব খুশী খুশী ডেখাচ্ছে যে। হ্যালো, মিস্টার গঙ্গাপ্রসাড, টুমি আজ য়ুরোপীয়ান ক্লাবে টেনিস খেলতে যাওনি? বল ম্যান, কি ব্যাপার?''

গঙ্গাপ্রসাদ এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, ''ডেভিড সাহেব, ব্যাপারটা হ'ল আমাকে আজ রাত্রের গাড়িতে কিম্বা কাল সকালে এলাহাবাদে যেতে হবে। দিল্লী-দরবারের ব্যবস্থাপক কমিটিতে আমার নাম উঠেছে। দু-তিন মাস সেখানে থাকতে হবে, সেজন্যে তার ব্যবস্থা করতে হবে।''

জোনাথন ডেভিড অবাক্ হয়ে গঙ্গাপ্রসাদকে দেখলেন, "টুমি বড়ো ভাগ্যবান্ গঙ্গাপ্রসাড ! এটো জুনিয়র ! সার্ভিস মাত্র ডু বছর হয়েছে আর ডিল্লি ডরবারের ব্যবস্থা করটে টোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে ! মীর, আমিটো মনে করেছিলাম যে টুমি যাবে, কিন্তু যাচ্ছে গঙ্গাপ্রসাড।"

গঙ্গাপ্রসাদের দিল্লী-দরবারে যাবার খবরে মীর জাফরআলি যেন একটা ধাক্কা খেলেন. "জোনাথন সাহেব, এসব ক্লীমেণ্ট্‌সের বদমাইশি। এ হজরত রোজ ওর সঙ্গে টেনিস খেলে, ওর খোসামোদ করে। তাই একে না পাঠিয়ে কি আমাকে পাঠাবে !"

কিশোরী রমণ জোর গলায় বললেন, "গঙ্গাপ্রসাদ, তুমি বাদশাহ সেলামতের সঙ্গে তো নিশ্চয়ই দেখা করবে। আমাদের জোনাথন ডেভিডের রিপ্রেজেণ্টেশনের উল্লেখ ক'রে দিও। তিনি যেন অর্ডার দিয়ে জোনাথন ডেভিডকে য়ুরোপীয়ান অথবা এংলোইণ্ডিয়ান বানিয়ে দেন।"

জোনাথন ডেভিড খুব গম্ভীরভাবে বললেন, "এম্পারারকে এ আর কি বলবে ? কোনো নেটিভ সেখানে ঢুকতে পায় না। আমি নিজের মিসেসকে সেখানে পাঠাবো।"

গঙ্গাপ্রসাদ ছিপছিপে গড়নের ঢেঙ্গা যুবা। এলাহাবাদ থেকে বি.এ. পাস করার পরেই ডেপুটি কালেক্টারের পদে নির্বাচিত হয়েছে। জ্বালাপ্রসাদের তোষামোদ, লক্ষ্মীচন্দের প্রভাব, সেইসঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের যোগ্যতা তার ডেপুটি হওয়ার পথ সুগম করেছিল। বি. এ. পরীক্ষাতে সে পেয়েছিল সেকেণ্ড ডিভিশন। কিন্তু খেলা ধূলোয় আর ছাত্রজীবনের সামাজিক কর্মে সে এগিয়ে ছিল বেশ। জয়দেইয়ের সঙ্গে সিভিল লাইন্সের বাংলোতে থাকায় তার সবরকম সুবিধা সুলভ হয়েছিল। এই সব সুবিধের জন্যেই গঙ্গাপ্রসাদ এলাহাবাদের মিওর সেণ্ট্রাল কলেজের সবচেয়ে সেরা খেলোয়াড় হতে পেরেছিল। ক্রিকেট আর টেনিসে তার ছিল অখিল ভারতীয় খ্যাতি।

গঙ্গাপ্রসাদ তখন নিজের মধ্যেই তন্ময়। জোনাথন ডেভিডের

কথায় তিনি মুচ্‌কে হাসলেন মাত্র আর এঁদের ছেড়ে ব্রিজ টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। গঙ্গাপ্রসাদ যাওয়া মাত্রই মীর জাফরআলি বললেন, "দেখলেন তো মিস্টার সোমেশ্বর দত্ত সাহেব, এই ছেলেটিকে! কি জাঁক! কি দেমাক! ভাহা তালুকদারীর ডাঁট যেন!"

পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্ত একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন, পিতাপুত্রে বহুত ফারাক, ছেলে কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের। গঙ্গাপ্রসাদ সাহসী আর উচ্চাভিলাষী ছেলে মীর সাহেব, এ আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। এ নবীন যুগের মানুষ, নতুন দুনিয়ায় উন্নতি করবে যথেষ্ট।"

"উন্নতি করবে না ছাই! এর সম্বন্ধে এখন থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। ভগবান্‌ই জানেন এতো আজে বাজে খরচার টাকা এর কোথা থেকে আসে, কারণ ঘুষ নেবার অভিযোগ ত কোনদিন শোনা যায়নি। আমি আপনাকে বলে রাখছি পণ্ডিতজি, একদিন এ ছেলে বিপদে পড়বেই। আপনি প্রবীণ ব্যক্তি, এর বাবার বন্ধু, আপনি একটু একে বোঝাবেন." বললেন মীর জাফরআলি।

কিশোরী রমণ জোরে হেসে উঠলেন, "আপনার হিংসে হচ্ছে মীর সাহেব? আপনি যত সব কুকর্ম করেও নিরাপদে থাকবেন, আর গঙ্গাপ্রসাদ কিনা পড়বে বিপদে! কি পণ্ডিতজি, আপনার মত কি?"

পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্ত গম্ভীর ভাবে বললেন, "ডাক্তার মীর সাহেব ঠিক্ বলেছেন। মীর সাহেব আর গঙ্গাপ্রসাদের মধ্যে তফাৎটা শুধু এই যে গঙ্গাপ্রসাদ সাহসী। ইংরেজদের সমাজে তার স্বচ্ছন্দ যাতায়াত, তার কারণ হ'ল তাদের সঙ্গে ও অবাধে মেলামেশা করে আর সমান ব্যবহার করে। কিন্তু ডাক্তার, এটাই হ'ল তার বদগুণ! সে তোষামোদ করতে পারেনা, কারণ সে বীর। আর বীরত্বই হ'ল অপরাধের কারণ, এটাও ঠিক। আমাদের মীর সাহেব নেহাৎ

ভীরু প্রকৃতির। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ গালমন্দ করলে ভুলেও এর চেহারায় বিকৃতি ঘটে না। মীর সাহেব হলেন সবার প্রিয়। আর গঙ্গাপ্রসাদের অহঙ্কারটাই তার সবচেয়ে বড়ো শত্রু। তার মুশকিল এই যে, সে ভেতর-বাইরে এক, আর মীর সাহেবের ভেতর-বাইরে ডুবুরী নেমেও পাত্তা পাবে না। ডাক্তার সাহেব, এ দুনিয়াটা নেহাতই দোরঙ্গা! মানুষ দোরঙ্গা হয়েই উন্নতি করে।"

মীর জাফরআলি পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্তের কথায় রাগ করলেন না, "ইয়ার পণ্ডিত, তুমি খুব ঘোড়েল আদমী। চলুন, জোনাথন সাহেব, একহাত হয়েই যাক্।"

জোনাথন ডেভিডের হাত ধরে মীর জাফরআলি ব্রিজ রুমে যখন ঢুকলেন সেই সময় খেলা শেষ করে গঙ্গাপ্রসাদ উঠছিলেন, তিনি মীর সাহেবের কাছে এসে বললেন, "মীর সাহেব, আমার সঙ্গে একটু আসবেন কি, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। মিস্টার ডেভিড, ক্ষমা করবেন আপনার সঙ্গীটিকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

ক্লাব ঘর থেকে বেরিয়ে মীর সাহেব গঙ্গাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন "কিন্তু বাবা, আমাকে নিয়ে চললে কোথায়?"

"মিস্টার ক্লীমেণ্ট্সের বাংলোতে।" গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনাকেও যেন দিল্লী-দরবারের ব্যবস্থাপক কমিটিতে ডাকেন্। তিনি নিমরাজী হয়েছেন বলে মনে হ'ল। এখন আপনি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলে নিন্। আমার মনে হয় আপনাকেও নিয়ে যেতে তিনি অরাজী হবেন না।"

"সত্যি বাবা।" কৃতজ্ঞতাভরে গঙ্গাপ্রসাদের হাত চেপে ধরে মীর সাহেব বললেন, "যদি তুমি আমাকে দিল্লী-দরবারে পাঠাতে পার তাহলে আজীবন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো!"

দুজনে যখন মিস্টার ক্লীমেণ্ট্সের বাংলোয় গিয়ে পৌঁছলেন, সাহেব তখন বারান্দায় বসে দিল্লী-দরবারের প্ল্যান দেখছিলেন। দিল্লী-দরবারের ব্যবস্থাপনার ভার ছিল উত্তরপ্রদেশের লেফ্টেন্যাণ্ট

গভর্নরের ওপর আর মিষ্টার ক্লীমেণ্ট্স তারই কৃপাপাত্র। গঙ্গাপ্রসাদ আর মীর জাফরআলিকে দেখেই তিনি বললেন, "হ্যালো গঙ্গাপ্রসাদ, তুমি দিল্লী যাচ্ছ কবে? আমিত পরশু পৌছব।"

"স্যার, আমি কাল ভোরে যাচ্ছি এলাহাবাদ। সেখান থেকে সপ্তাহ খানেক পরে দিল্লীতে পৌছব। স্ত্রী-পুত্রকে এলাহাবাদ পৌছে দিতে যেতে হবে কি না।"

"তা বেশ, তবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে পৌছে যেও কিন্তু। আর মীর, তুমি এসেছ কেন? বিশেষ কোন কাজ আছে কি?"

উত্তর দিলে গঙ্গাপ্রসাদ "আমি এঁকে সঙ্গে করে এনেছি স্যার। মীর সাহেবও দিল্লী-দরবারে ব্যবস্থাপনার জন্যে যেতে ইচ্ছুক। আমি বললাম আপনি নিজেই গিয়ে কাপ্তান সাহেবকে বলুন না কেন। মীর সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পান, তাই জোর করে আমি এনেছি এঁকে।"

গঙ্গাপ্রসাদের কথা শুনে মিষ্টার ক্লীমেণ্ট্স মৃদু হাসলেন, "গঙ্গাপ্রসাদ, এই মীর ভয় পায় আমাকে? বল কি? এটা একটা আস্ত শূয়োর। এর মতন দ্বিতীয় নচ্ছার আর খুঁজে পাবে না। কি মীর, আমি কিছু ভুল বলছি কি? তুমি একটা বাছট বদমাইশ আর নম্বরী লোক!"

মীর জাফরআলি নম্রতার সঙ্গে বললেন, "হুজুরের কথার ওপর কথা বলার দুঃসাহস আমার নেই। হুজুরের মুখের ওপর জবাব দেব এর চেয়ে বেশী বেআদবী আর কি হতে পারে।"

মিষ্টার ক্লীমেণ্ট্স গঙ্গাপ্রসাদের দিকে তাকালেন, "দেখছ, গঙ্গাপ্রসাদ! এ কতো বড়ো শয়তান। আর তুমি কিনা একে দিল্লী-দরবারের ব্যবস্থাপনার জন্যে পাঠাতে বলছ।"

মীর সাহেব আরো ডিগ্রীখানেক মোলায়েম স্বরে বললেন, "হুজুর, ধৃষ্টতা মাফ করবেন, নম্বরী লোকেদের নিয়েই তো এই পুলিশ বিভাগ। হুজুর অধমের মতো মানুষ যদি সাহেবের খেদমতে

না থাকত তবে একদিনের জন্যেও রাজপাট টিকত না! ব্যবস্থা করি তো আমরাই।"

মিষ্টার ক্লীমেণ্ট্‌স জোরে হেসে উঠলেন, "ভালো বলেছ মীর, ভালো! আচ্ছা গঙ্গাপ্রসাদ, আমি মীর জাফরআলীর নাম ব্যবস্থাপকদের লিস্টে তুলে দিচ্ছি। এই অসভ্যটাকে বল যেন যাবার ব্যবস্থা করে।"

মীর সাহেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ঝুঁকে ক্লীমেণ্ট্‌সকে লম্বা এক সেলাম ঠুকলেন।

মীর জাফরআলিকে ক্লাবে পৌঁছে দিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ বাড়ি ফিরলেন। গঙ্গাপ্রসাদকে এত শীঘ্র ফিরতে দেখে তাঁর স্ত্রী রুক্মিণী অবাক্ হয়ে গেল। সে প্রতিবেশী শ্রীকৃষ্ণ উকিলের বাড়ি যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। গঙ্গাপ্রসাদের দু'বছরের ছেলে নবলকিশোরকে ভিখু বারান্দায় বসে খেলা করাচ্ছিল আর রাঁধুনি রান্না করছিল। গঙ্গাপ্রসাদকে দেখামাত্র ভিখু বললে, "আজ এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলে বাবা। বউমা তো উকিল সাহেবের বাড়ি যাচ্ছিলেন।"

রুক্মিণী গঙ্গাপ্রসাদের হাসিমুখ দেখে ভাবলো, নিশ্চয়ই কোনো সুসংবাদ আছে। জিজ্ঞেস করলে "মুখখানা আজ যে খুশী খুশী দেখাচ্ছে, পদোন্নতি হয়েছে না কি?"

"পদোন্নতিই মনে কর। দিল্লী-দরবারের ব্যবস্থাপনা করবার জন্যে দিল্লী যাবার হুকুম পেয়েছি। চল, তুমিও দিল্লী-দরবার দেখে আসবে। দিল্লী খুব পুরানো শহর—লাল কেল্লা, কুতুবমীনার আর সেই সঙ্গে দিল্লী-দরবার।"

রুক্মিণী জিভ কেটে বললো, "ছিঃ! ছিঃ! তোমার সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে গেলে লোকে বলবে কী? দু'হাত ঘোমটা টেনে তোমার সঙ্গে বের হলে লোকে যে হাসবে।"

"আরে ঘোমটা টানার দরকার কি? এ সব সেকেলে বাজে প্রথা ছেড়ে দাও। ভিখু, সব জিনিসপত্র গোছাতে হবে, কাল ভোরে কিংবা দুপুরের গাড়িতে আমাদের রওনা হতে হবে। তিন

মাসের মতো সেখানে থাকতে হবে, সেই বুঝে শীতের জামা কাপড়ও সঙ্গে নিতে হবে।"

রুক্মিণী ভিখুকে বলল "না না ভিখু কাকা, ইনি তো সবসময় এরকম আজে বাজে বলেই থাকেন। তুমিই বল না কেন দিল্লী-দরবারে আবার মেয়ে মানুষের কাজ কি?"

ভিখু হাসলে, "কাজ আবার নেই বউমা, শায়া পরে তুমিও মেমসাব বনে যাবে। ইংরেজিটাও শিখে নেবে। বাছার আমার সাধ মিটবে। নতুন-যুগ, নতুন নতুন আচার-ব্যভার শিখতে হবে বৈ কী।"

"মা গো! তুমিও কী সব বলতে শুরু করলে ভিখু কাকা?" তারপরে গঙ্গাপ্রসাদের দিকে ঘুরে বললে, "তিন মাসের জন্যে যেতে হবে? তোমাকে পৌঁছতে হবে কবে?"

"এক সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছন উচিত। তবে দু-চার দিন দেরিও চলতে পারে। এখন আমার সমস্যা যে তুমি একা এখানে তিন মাস কাটাবে কি করে?" গঙ্গাপ্রসাদ বললেন।

"আমাকে বাবার কাছে বাঁদায় কিংবা জেঠিমার কাছে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দাও। এক বছরের বেশী হয়ে গেছে মা-জেঠিমার সঙ্গে দেখাও হয়নি। জেঠিমার চিঠি এসেছে, তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, ভাবছিলাম তোমাকে এলাহাবাদেই পৌঁছে দিই। ভিখু ছাড়া দিল্লীতে আমার চলবে না। সেজন্যে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তাহলে তোমরা দুজনে মিলে গোছগাছ করে নাও, কাল ভোরের গাড়িতে এলাহাবাদ যেতে হবে। আমি বাবাকে বাঁদায় চিঠি লিখে দিচ্ছি। তিনি এলাহাবাদে এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন।"

গঙ্গাপ্রসাদ তক্ষুনি জয়দেইকে তার করে দিলেন এলাহাবাদে যাবেন বলে।

তিন দিন পরে ভোরের দিকে গঙ্গাপ্রসাদ যখন সপরিবারে

এলাহাবাদে পৌঁছলেন, জয়দেইয়ের টাঙ্গা মোতায়েন ছিল ষ্টেশনে। মালপত্তর বোঝাই করে জয়দেইয়ের বাংলোতে গেলেন সবাই।

গঙ্গাপ্রসাদ দেখলেন বাড়িতে জয়দেই একা নন, তাঁর বাবা জ্বালাপ্রসাদও রয়েছেন সেখানেই। তিনি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এলাহাবাদে এসেছিলেন জয়দেইকে দেখতে।

জয়দেই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ম্যালেরিয়াতে তাঁকে একেবারে কাবু করে ফেলেছিল আর চলছিল সেই কবরেজী চিকিৎসা। জ্বালাপ্রসাদ এসে কবরেজী চিকিৎসা বাতিল করে দিলেন, এ্যালোপাথির ফলে দিন দুইয়ের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে গেল। জয়দেই রুক্মিণীকে দেখে আনন্দিত হলেন, "বাবা গঙ্গা, তুমি বৌমাকে নিয়ে এসেছে, ভালোই করেছ। আমি তো একেবারেই একা ছিলাম। লক্ষ্মীর বউ তো ছেলে-মেয়ে, ঘর সংসারের কাজ-কর্ম নিয়ে এখানে আসবার ফুরসতই পায় না। আবার লক্ষ্মীরও দেখাশোনা তাকেই তো করতে হয়।"

গঙ্গাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন, "জেঠিমা, তুমি কানপুর যাওনা কেন?"

"এখন এই নিদেন কালে প্রয়াগ ছেড়ে কানপুরে যাবো?" জয়দেইয়ের মুখের ওপর ম্লান হাসির রেখা দেখা দিল, "না বাবা, এখন আমার দেহ এই ত্রিবেণী তীরেই ভস্ম হোক্। ষাট পেরিয়েছে, এই ধরো আরও দু-চার বছর," বলতে বলতে জয়দেইয়ের চোখ সজল হয়ে উঠল। তিনি আবার বললেন, "লক্ষ্মী খুব রাগ করেছে। আমাকে বলে, 'কানপুরে চল, কানপুরে চল!' আমি তাকে বললাম, বাবা, এলাহাবাদেও তো আমাদের কাঠের গোলা রয়েছে। এখানেই রাধা আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এস না কেন। কিন্তু রাধার বাপের বাড়ি আবার কানপুরে কিনা! বাপের বাড়ীর মায়া সে কাটাতে পারছে না।" জয়দেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন, "যাক্, কানপুরেই থাক্ আর যেখানেই থাক্, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তারা সুখে-শান্তিতে থাকে।"

সবাই বুঝতে পারলেন জয়দেইয়ের স্বরে রয়েছে বিচিত্র বেদনা, অসহায়তা আর চাপা দুঃখ। গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "এতে দুঃখ করার আর কী আছে? বল তো আমি বদলী হয়ে চলে আসি এলাহাবাদে। তবে আমার হ'ল সরকারী চাকরি, এতে তো সব সময় বদলী হতেই থাকে, এখান থেকে আবার অন্য জায়গায় বদলী হয়ে যাবার সম্ভাবনা।"

জয়দেইয়ের সকল বেদনা গঙ্গাপ্রসাদের কথায় উবে গেল। তিনি জ্বালাপ্রসাদের দিকে চেয়ে উত্তর দিলেন, "না বাবা, তোমাকে এত সব আর করতে হবে না। ঠাকুরপো তো রয়েছেন, আমাকে ইনি দেখে যান মাসে মাসে। ছ-সাত বছর পরে এঁরও তো পেন্সন হবে। আমি এঁকে বলেছি এখানে বদলী করিয়ে নিতে। চাকরির শেষ ছ-সাত বছর এলাহাবাদে কাটান। বাড়ি করবার জন্য এখানে জমিও কিনে রেখেছেন। এই নতুন পাড়া লুকরগঞ্জে বসতি হচ্ছে কিনা। এখানে থেকে নিজের বাড়িও করিয়ে নেবেন।"

এবার গঙ্গাপ্রসাদ বাবার দিকে ঘুরে বললেন, "আমি পরশু বেরেলি থেকে আপনাকে চিঠি দিয়েছি। কথা হ'ল আমাকে দিল্লী-দরবারে ব্যবস্থাপক কমিটিতে সদস্য করা হয়েছে। আমাকে তিন মাস দিল্লী গিয়ে থাকতে হবে। ভিখুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, কারণ ভিখু ছাড়া আমার অসুবিধে হবে।"

জ্বালাপ্রসাদের মুখ খুশীতে ভরে উঠল, "ও এই কথা! তুমি তো খুব জবর কথা শোনালে! তাই বুঝি তুমি বউমাকে নিয়ে এখানে এসেছ। শুনছ বৌদি, তোমার ছেলে দিল্লী-দরবারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে।"

এই সংবাদে জয়দেই জ্বালাপ্রসাদের চেয়ে কম পুলকিত হলেন না, "ঠাকুরপো, তুমি দেখো এই গঙ্গা একদিন কালেক্টার সাহেব হবে, আমি বলে রাখলাম। কিন্তু ঠাকুরপো, এখন অন্ততঃ একমাস বউমা থাক্ আমার কাছে। কিছুদিনের জন্যে আমার জা-কেও এখানে পাঠিয়ে দিও, জানলে।"

"আচ্ছা বৌদি, আমি কি বলেছি যে আমার সঙ্গে বউমা বাঁদায় যাবে। গঙ্গাকে তুমি লেখাপড়া শেখালে, এত উৎসাহ করে ওর বিয়ে দিলে। গঙ্গার স্ত্রীর ওপর আমার চেয়ে অধিকার বেশী তোমার," জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন হাসতে হাসতে।

ছুটি ফুরিয়ে এল জ্বালাপ্রসাদের। তিন দিন পরে তিনি বাঁদা চলে গেলেন। তাঁর যাবার দুদিন পরে গঙ্গাপ্রসাদের দিল্লী রওনা হবার কথা। যাবার সময় গঙ্গাপ্রসাদ জয়দেইকে প্রণাম করে বললেন, "জেঠিমা তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, কি কথা বলবি। দিল্লী যাবি তাই টাকা চাই। কত দরকার তোর ?"

"জেঠিমা, আমাকে সেখানে তিন মাস থাকতে হবে, বোধ হয় একমাস লাগবে আরও। মাইনে তো আমি পাচ্ছিই......।"

গঙ্গাপ্রসাদের কথার মাঝখানেই জয়দেই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর মাইনে কত তা আমি জানি আর তোর বদ অভ্যাসগুলোর খবরও আমি পেয়েছি লক্ষ্মীর কাছ থেকে। দায়িত্বপূর্ণ অফিসার হয়েছিস, এখন তোর একটু বুঝেসুঝে চলা উচিত।"

"হ্যাঁ, জেঠিমা, সে আমি বুঝি। আমি খরচা করলে লক্ষ্মীদাদার চোখ টাটায়, যেন হুল ফোটে। কিন্তু দিল্লীতে যত সব বড়ো বড়ো রাজা মহারাজারা আসবেন। তাঁদের সঙ্গে চলতে গেলে তো তাঁদের সামনে......," গঙ্গাপ্রসাদ বলতে বলতে থেমে গেলেন।

"হ্যাঁ, বুঝিরে, তুই বা কোন্ রাজা-মহারাজার চেয়ে কম বল্ তো!" বড় স্নেহভরে গঙ্গাপ্রসাদের মাথায় হাত বুলতে বুলতে জয়দেই বললেন, "আমি বলছি, তোর সামনে সেই বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজদের দেখাবে ঠিক গোলামের মতন। তোর কত লাগবে, বল্ তো ? দিল্লী গিয়ে থাকবি খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে মনটাকে খাটো করিসনি কখনও।"

গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "পাঁচ শ' টাকায় হয়ে যাবে।"

"পাঁচ শ' টাকায় তোর কি আর হবে, আমি যেন তোকে চিনি না," এই বলে জয়দেই ক্যাশবাক্স থেকে একশ' টাকার দশখানি নোট বের করে গঙ্গাপ্রসাদকে দিলেন, "যদি তোর কম পড়ে তো আরও আনিয়ে নিস্। কিন্তু কদাপি মন খাটো করিসনি, বুঝলি!"

গঙ্গাপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, "জেঠিমা, তুমি কতো ভালো। কিন্তু তুমিই আমার এ অভ্যাসটা খারাপ করে দিয়েছ। আমার ঠাটবাট দেখে মানুষের হিংসে হয়।"

জয়দেইও হাসলেন, "তোর শত্রুর মুখে ছাই, ভালোই তো। তুই রাজা-মহারাজদের চেয়ে কম কিসের। হ্যাঁ কি বললি তুই? দিল্লীতে বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজরা আসবেন, হীরেজহরতের আলোয় ঝক্ ঝক্ করবে দিল্লী। কিন্তু তোর হাত যে খালি রয়েছে রে। দাঁড়া একটু।" এই বলে জয়দেই ক্যাশবাক্স থেকে একটি হীরের আংটি বের করলেন, "কোন রাজা নাকি এই আংটীটা তাঁর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। এগারো রতি ওজনের হীরে। উনি তাঁকে দিয়েছিলেন পাচ হাজার টাকা। তারপর কেউ আর সে অংটিটা ছাড়াতে এলো না। নে, এই আংটিটা পর। কোনো বড়ো রাজা-মহারাজার কাছে এত বড়ো জমকাল হীরে নেই।"

আংটির হীরের ঝল্‌মলানিতে গঙ্গাপ্রসাদের চোখ যেন ঝলসে গেল। এত বড়ো হীরে তিনি সত্যিই জীবনে কখনো দেখেন নি। হাল্‌কা নীল রং, তীব্র জ্যোতি আর বেলজিয়মের ছাঁটাই। গঙ্গাপ্রসাদের আঙ্গুলে আংটিটি এমন লেগে গেল যেন তিনি নিজে মাপ দিয়ে গড়িয়েছেন।

গঙ্গাপ্রসাদ আনন্দে জয়দেইকে জড়িয়ে ধরলেন, "জ্যেঠিমা, তুমি যে আমার মার বাড়া! তুমি আমাকে কত স্নেহ কর। কত স্নেহ যে পেয়েছি তোমার কাছ থেকে!" গঙ্গাপ্রসাদের চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠল।

দুই

লক্ষ্মীচন্দ যে 'স্যার' উপাধি পাবেন, একথা কোনদিন কেউ কল্পনা পর্যন্ত করেনি। কর্তারা চাপ দেওয়ার ফলে লক্ষ্মীচন্দ দিল্লী-দরবারের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। বিদেশী কাপড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে উত্তর ভারতে লক্ষীচন্দ ছিলেন অগ্রগণ্য। কিন্তু এতেই তিনি সন্তুষ্ট হন নি। বি. এ. পর্যন্ত ইংরেজি বিদ্যার জোরে তাঁর গতিবিধি ছিল সরকারের বরাবর। কানপুরে তিনি একটা কাপড়ের মিল, একটা চিনির কল আর দুটো তেলের মিল খুলেছিলেন। এলাহাবাদেও ছিল একটা বড়োরকমের কাঠের কারখানা। এ সবের জন্যে স্বভাবতঃ তাঁকে মামলা লড়তে হত। টাকা কড়ি নিয়েই তাঁর খেলা। সেজন্যে যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার খেল, সেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকার মর্দানিতে হুজুরের নজরে খাড়া হওয়া লক্ষীচন্দ বাঞ্ছিত মনে করেছিলেন। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে হাইকোর্টে তাঁর দুটো বড়ো মামলার আপীল ছিল। সেইসূত্রে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি এলাহাবাদে গেলেন। পয়লা জানুয়ারী ১৯১২র 'পায়োনীয়রে' নব বর্ষে খেতাব প্রাপ্ত ভাগ্যবানদের তালিকায় নিজের নাম দেখে লক্ষীচন্দ আনন্দে লাফ দিয়ে উঠলেন।

লক্ষ্মীচন্দকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সকাল থেকে তাঁর বাড়িতে অসংখ্য লোকের ভীড় লেগে গেল। বহু স্থান থেকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম আসছিল। জয়দেই লক্ষীচন্দের আরতি করলেন আর তাঁকে নিয়ে গেলেন গঙ্গাস্নানে। তারপরে দে-দেবতার প্রসাদ চড়ালেন। এই সবে সারা দুপুর কেটে গেল। বাড়ি ফিরে লক্ষ্মীচন্দ মাকে বললেন, "আমাকে আজ প্রথম গাড়ি ধরে কানপুরে যেতে হবে। সেখানে সবাই আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। এক্ষুনি আমি কানপুরে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।" তারপর একটু থেমে বললেন, "এত বড়ো খেতাব পেয়েছি। হাজার হাজার মিল কর্মী, চাকরবাকর আর কানপুর শহরের লোকেরা সবাই আমার বাড়ি

আসবে। সপ্তাহ খানেকের জন্যে তুমিও আমার সঙ্গে কানপুরে চলনা কেন, আবার এখানে ফিরে আসবে।"

লক্ষ্মীচন্দ জয়দেইকে নিয়ে সন্ধ্যের গাড়িতে কানপুর রওনা হলেন।

গাড়ি রাত দু'টায় কানপুরে পৌঁছল। স্টেশনে লক্ষ্মীচন্দকে স্বাগত জানাতে জমাট ভীড় হয়েছিল। শহরের প্রখ্যাত ব্যবসায়ীরা আর তাঁর কর্মকর্তারা সকলেই সেখানে উপস্থিত। চাকর-বাকরেরা শশব্যস্ত হয়ে এদিক্ ওদিক্ ছোটাছুটি করছিল। রাধা বদলু কাহারকে বললেন "বদলু শোন, মাকে ওঁর ঘরে পৌঁছে দাও আর ভরোসীকে ওঁর দেখাশোনার জন্যে ওখানে থাকতে বল।" তারপরে শাশুড়ীর দিকে ফিরে বললেন, "মা কি বলব, এঁর মিলের আর দোকানের কর্মীরা প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে, বললে ওঁর শোভাযাত্রা বের করা উচিত। আমি আর কি করতাম। তাই এসব করতে হ'ল। তারা সবাই খাবে এখানে। ধর, তিন চারশ' মতো লোক হবে। এখন আমাকেই এসব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। কি জানি কতক্ষণে শোভা-যাত্রা এসে পৌঁছবে। অর্ধেক রাতও হয়ে যেতে পারে। সেজন্যে তুমি একটু কিছু খেয়ে নাও, তারপরে বিশ্রাম কর, কতক্ষণ আর জেগে বসে থাকবে।"

জয়দেই উদাস দৃষ্টিতে রাধার দিকে তাকালেন—তাঁর ছেলেকে এ-ই ছিনিয়ে নিয়েছিল। যে এবাড়ির খোদ কর্ত্রী। একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, "ঠিক বলেছ বৌমা, ভালো করে সবাইকে খাওয়াবে দাওয়াবে। আমার ধনকে সবাই যেন আশীর্বাদ করে যান। আমার তো এখন তেমন ক্ষিদে নেই। বড় ক্লান্ত লাগছে, শুধু একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়বো।"

রাধা মৃদু হেসে বললেন, "না মা, একটু মিষ্টিমুখ তো করতেই হবে। আর নিমন্ত্রিতদের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকো। এখানে তো খাওয়া-দাওয়া, আদর অভ্যর্থনা, শোভাযাত্রা—নিত্যি লেগেই আছে।

এত বড়ো রাজপাট, উদ্যম আর বুদ্ধি ছাড়া তো সামলান যায় না।" তারপরে চাকরকে আদেশ দিলেন, "যা, অল্প একটু মিষ্টি আর এক গেলাস গঙ্গাজল নিয়ে আয়। আর শোন্, মার ঘরে তামার কলসীতে করে গঙ্গাজল রেখে দিবি।"

জয়দেই অল্প একটু জলখাবার খেয়ে চুপচাপ নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁকে তেতলার নিরিবিলিতে ঘর দেওয়া হয়েছিল। ঘরটি বেশ বড়ো আর সাজান গোছান। ভরোসী সেখানে আগে থেকেই হাজির হয়ে জয়দেইয়ের বিছানা পেতে রেখেছিল। জয়দেই শুয়ে পড়লেন আর ভরোসী তাঁর পা টিপতে লাগল। জয়দেই বারণ করলেন, "থাক রে, আমি তত বেশী ক্লান্ত হইনি। তুই বরঞ্চ যা, বৌমার কাজকর্মে সাহায্য করগে।"

পরের দিন স্নান পূজো সেরে জয়দেই তেতলা থেকে নীচে নামলেন। বাড়ির কাজকর্ম হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। লক্ষীচন্দের ছেলেরা জয়দেইকে ঘিরে ধরল। তিনি তাদের নিয়েই মন ভোলানোর চেষ্টা করছিলেন।

রাধার বাপের বাড়ির মেয়েরা আর আত্মীয় স্বজনেরাও এসেছিলেন। কিন্তু জয়দেই সেখানে নিজের বাপের বাড়ির কাউকেই দেখতে পেলেন না। সুযোগ বুঝে তিনি রাধাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বৌমা, বুদ্ধু আর মুন্নুকে ডাকনি বুঝি? তাদের ত কাউকেই দেখছি না?"

রাধা কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না, "মা, কোন মুখে তাদের ডাকব! তাছাড়া আমরা কাউকেই তো ডাকিনি। সবাই নিজের থেকেই এসেছেন অভিনন্দন জানাতে। আর তাঁরা যদি শত্রু মনে করে অভিনন্দন জানাতে না আসেন তো এতে আমাদের আর কি অপরাধ?" বলে রাধা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বুদ্ধুলাল আর মুন্নুলাল জয়দেইর ভাইপো। তাঁদের চামড়ার আড়ত ছিল। এককালে তাঁরা কানপুরের নামকরা ব্যবসাদার ছিলেন। কিন্তু এখন কয়েক বছর ধরে তাদের অবস্থা পড়ে গেছে

জয়দেইয়ের দাদা সুকখুলালের কাছে থেকে লক্ষ্মীচন্দ লেখাপড়া শিখেছিলেন। আর লক্ষ্মীচন্দকে তাঁর মামা স্নেহ করতেন পুত্রাধিক। সুক্‌খুলাল যখন মারা যান তখন বুদ্ধুলালের বয়স আঠার আর মুন্নুলালের বয়স পনের। সুক্‌খুলাল নিজের দুই ছেলেকে লক্ষ্মী-চন্দের হাতে সঁপে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন।

লোকেরা অনুমান করত লালা সুক্‌খুলালের কাছে অন্ততঃ নগদ পনের-কুড়ি লক্ষ টাকা রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীচন্দের হিসেবনিকেশ মিলিয়ে দেখার পর জানা গেল যে লালার সব ধারদেনা মিটিয়ে সবে সত্তর হাজার নগদ বাঁচছে ছেলেদের জন্যে। সুক্‌খুলাল মারা যাবার পরে বছরও ঘুরল না, লক্ষ্মীচন্দ একটা চিনির কল আর একটা তেলের মিল কানপুরে খুলে বসলেন। আত্মীয়-স্বজনদের ভেতর তখনই কানাঘুষো হতে লাগল। সুক্‌খুলালের শ্যালক গিরিধারীলাল দু'জনের হয়ে লক্ষ্মীচন্দের নামে মামলা দায়ের করলেন। দু'বছর পর্যন্ত মামলা চলেছিল। এই দু'বছরের মধ্যে বুদ্ধুলাল আর মুন্নুলালের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। গিরিধারীলাল যখন দেখলেন মামলায় হার নিশ্চিত তখন সুলেনামা দাখিল করলেন। এই মামলার ফলে লালা গিরিধারীলালের কাছে প্রায় একলাখ টাকা নগদ নাফা এসে গেল। আর সুক্‌খু-বুদ্ধুর ফার্মের ঋণ দাঁড়ান এক লক্ষ টাকা।

জয়দেই জানতেন লক্ষ্মীচন্দ বেইমানী করেছে আর এও জানতেন গিরিধারীলালকে নগদ পঞ্চাশ হাজার গুঁজে এই বোঝাপড়া হ'ল। তিনি দু-চারবার ভাইপোদের হয়ে লক্ষ্মীচন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীচন্দ আর রাধা সে কথাটাকে একেবারে সুযোগই দেয়নি। জয়দেইয়ের কানপুরে না থাকতে চাওয়ার এও একটা প্রধান কারণ।

সন্ধ্যের দিকে জয়দেই বাপের বাড়ি গেলেন। পৈত্রিক ভিটের অবস্থা দেখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর বাবার বিশাল প্রাসাদ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। মাঝখানে গাঁথা হয়েছে দেওয়াল। জয়দেইয়ের

অভ্যর্থনা করলেন বৌদি। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে সৌহার্দ বা মমতা মাখা ছিল না।

বাড়িতে দেখলেন প্রচণ্ড কলহের পরিবেশ। বুদ্ধুলাল আর মুন্নুলালের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। তিনি জানতে পারলেন মুন্নুলাল লক্ষ্মীচন্দের কাপড়ের কলে কাজ পেয়েছে দালালির, আর এর জন্যে বুদ্ধলাল আর তাঁর মা আপত্তি করেছিলেন। মামলার পর মামলা লড়ে সুক্‌খুলাল বুদ্ধুলাল-ফার্মের অবস্থা বড়ো শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুন্নুলালের মন এই সব সংঘর্ষের ফলে সংসার থেকে উদাস হয়ে গিয়েছিল। দালালির কাজে মাসিক আয় হ'ত তার হাজার টাকার মতো। সেই জন্যে দাদার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়ে সে সুক্‌খুলাল বুদ্ধুলাল ফার্ম থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

জয়দেই প্রায় ঘণ্টা দু-তিন বাপের বাড়িতে ছিলেন, এর মধ্যে লক্ষ্য করলেন তিক্ততা। সে পরিবেশে তাঁর দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল; তিনি তাড়াতাড়ি ছেলের বাড়ি ফিরে এলেন। তিনি ফিরে দেখলেন লক্ষ্মীচন্দ খেতে বসেছে। মাকে দেখে তিনি মুচ্‌কি হাসলেন, "দেখে এলে ভাইপোদের? তারা আপসেই মামলা লড়ছে। তাদের কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিলুম; তাতে বুদ্ধু রেগে উঠল আর মামীমা তো শত্রুই বনে গেলেন। হ্যাঁ, সাহায্য নিলে মুন্নুলাল। সেই জন্যে ওরা তার সঙ্গেও শত্রুতা করেছে।"

জয়দেই এ কথার খুব কড়া উত্তর দিতে পারতেন, কিন্তু মাত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "সবই ঈশ্বরের লীলা। এর ওপর জোর নেই কারো।"

লক্ষ্মীচন্দ ভেবেছিলেন প্রতিবারের মতোই জয়দেই নিজের ভাইপোদের পক্ষ নিয়ে কিছু কড়া কথা শোনাবেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ হতে হ'ল। তিনি আবার বললেন, "মা, আমি এলাহাবাদের কাঠের কারখানাটা বিক্রি করে দিচ্ছি। তাতে লক্ষ টাকা নগদ নাফা হচ্ছে।"

জয়দেই চমলে উঠলেন, "কেন, কাঠের কারখানাটা তো ভালোই চলছে সেখানে !"

"হ্যাঁ, চলছে তো ভালোই ; তা না হলে কে আর এক লক্ষ টাকা উজিয়ে সেটা কিনতে রাজী হতো ? কিন্তু কানপুর থেকে ভালো-ভাবে কারখানার তদারক করা সম্ভবপর নয়। মিছিমিছি এতগুলো টাকা আটকে আছে ওতে। আমি এখানেই আর একটা কাপড়ের মিল খুলছি। কাঠের কারখানা বিক্রির টাকাতে আরো কিছু জুড়ে এই মিলটি খোলা হবে। কানপুরে থেকে ভালোভাবে দেখাশোনাও করা যাবে।"

জয়দেই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আর এলাহাবাদের বাড়িটা ? সেটাও কি বিক্রি করবে ?"

লক্ষ্মীচন্দ হেসে উঠলেন, "না মা, না, এলাহাবাদের বাড়ি তো তোমার। তার ওপর আবার এলাহাবাদ হ'ল আমাদের দেশের রাজধানী, সেখানে হাইকোর্ট রয়েছে। হামেশা মামলা মোকদ্দমা তো লেগেই আছে, সে জন্যে যাওয়া আসাতো করতেই হবে।"

জয়দেইয়ের ধড়ে যেন প্রাণ এল। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "লক্ষ্মী তাতো বটেই। তবে এবার তোমারও যাওয়া আসা কমে যাবে। সেখানে আমি একেবারে একা, বুঝতে পারছি না কি হবে।"

লক্ষ্মীচন্দ বললে, "আমি তো তোমাকে কত বললাম, কানপুরে এসে থাক। কিন্তু তুমি যে কিছুতেই বুঝতে চাইছ না। গঙ্গা তো কানপুরেও রয়েছে, তবে সেখানে থাকার দরকার কি ? তবে প্রয়াগ যে খুব বড়ো তীর্থ, সেটা ঠিক্। না হয় সেখানে তোমার নামে একটা ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করে দেবো।"

জয়দেই হাসলেন, "ধর্মশালা করাস্ আমি মরবার পরে......।"

রাধা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "মা ওখানে আবার একা কোথায় ! চাকরবাকর, এত বড়ো বাড়ি, গাড়ি সবই তো রয়েছে, নেই কি ? তার ওপর তীর্থ, ত্রিবেণী, আর আমরা ত যাওয়া-আসা

করেই থাকি। মা যদি কানপুরে এসে না থাকতেই চান ক্ষতি কি তাতে ?"

এবার জয়দেই রাধার দিকে তাকালেন। তাঁর উদাস দৃষ্টিতে ছিল কৃতজ্ঞতার ছাপ। কানপুরের বাড়ির গিন্নী রাধা, জয়দেই নন, সেটা স্পষ্ট। আর জয়দেইয়ের কানপুরে এসে থাকার মানে হ'ল রাধার অধীনে থাকা, কিংবা বাড়িতে রাত দিন মন কষাকষি। তিনি লক্ষ্মীচন্দকে বললেন, "বৌমা ত ঠিক্ই বলছেন। সেখানেই ভালো আছি। চাকরবাকর তো সবই রয়েছে। আর এখন মায়া মমতা কাটিয়ে ভগবানের চরণে মন দিতে হবে। কে জানে ডাক পড়বে কবে। তাই এলাহাবাদ থেকেই পূজোপাঠ করতে চাই। তোর উন্নতি হোক্, তুই সমৃদ্ধিশালী হ', ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।"

এক সপ্তাহ কানপুরে থেকে জয়দেই এলাহাবাদে ফিরে গেলেন। মাঘমেলা এসে পড়ল।

তিন

দিল্লী-দরবার থেকে ফিরে গঙ্গাপ্রসাদ সপরিবারে যখন বেরেলি পৌঁছলেন, সেখানে তখন উত্তেজনা খুব বেশী। আর্য সমাজের প্রথম অধিবেশন বেরেলি শহরে খুব ধুমধাম করে হচ্ছে। প্যারেড ময়দানে খুব বড়ো শামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছে। প্রতিদিন সেখানে জোরদার বক্তৃতা চলছে। দেশের সেরা গায়কমণ্ডলী সেখানে এসে জমে বসেছেন। এই অধিবেশনে প্রাণসঞ্চার করছিলেন আর্যসমাজের মহান্ উপদেষ্টা স্বামী জটিলানন্দজি, তাঁর বক্তৃতা যেন অগ্নিগর্ভ। স্বামী জটিলানন্দ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্র আলোচনার জন্যে চ্যালেঞ্জ করেন। সেই আহ্বান গ্রহণ করলেন আল্লামা উহ্শী।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা আল্লামা উহ্শী আর স্বামী জটিলানন্দের আলোচনার দিন।

মণ্ডপ ভীড়ে ঠাসা। অনেক পুলিশ সেপাই উপস্থিত। শাস্ত্র আলোচনার নির্ণায়ক মিস্টর প্রেটর। বাড়িতে অতিথি এসে পড়াতে যথাস্থানে পৌছতে তাঁর একটু দেরী হ'ল। মিস্টার প্রেটর এসেই সোজা মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে মীর জাফরআলি, পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্ত আর মিস্টার জোনাথন ডেভিড বসেছিলেন। তাছাড়া ছ-সাতটি চেয়ার মঞ্চের ওপর খালি পড়ে ছিল। বড় মঞ্চের সামনে তিনটি ছোট ছোট মঞ্চ একজনের বসার মতো। মাঝখানের মঞ্চটিতে স্বামী জটিলানন্দ, ডান দিকের মঞ্চটিতে আল্লামা উহশী আর বাঁ দিকের মঞ্চে ফাদর মসীহ ছিলেন।

মিস্টার প্রেটর উঠে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রার্থ আলোচনার নিয়ম কানুন বলে দিলেন। প্রথমে আল্লামা উহশী স্বামী জটিলানন্দকে প্রশ্ন করবেন। যদি নির্ণায়ক প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট না হন তাহলে প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তরের আবার সুযোগ দেওয়া হবে। ক্রমানুসারে ফাদর মসীহ স্বামী জটিলানন্দকে প্রশ্ন করবেন। স্বামী জটিলানন্দের পরে উত্তর দিবেন আল্লামা উহশী, এইভাবে পুর্যা চলবে। শেষ উত্তর দাতা হবেন ফাদর মসীহ।

মিস্টার প্রেটরের ঘোষণার পরে মণ্ডপ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। স্বামী জটিলানন্দ পদ্মাসনে বসে 'ওঁ' ধ্বনি করলেন, শুনে চেলারা হর্ষধ্বনি করলেন। আল্লামা উহশী মসনদে ঠেস দিয়ে হাতে জপের মালা নিয়ে বসেছিলেন। তাঁর চোখ বোজা ছিল আর জপমালা ঘুরছিল দ্রুতবেগে। হঠাৎ তিনি চমকে উঠে চোখ মেললেন। চোখ দুটি জ্বলন্ত আগুনের গোলার মতো লাল। হাঁটু গেড়ে বসে ভারি গলায় বললেন, "আল্লার হুকুম, দেবদূতের মরজি! ওহে নাড়া মুণ্ডী স্বামী, আমি বলতে চাই, তুই শুধু মাথাই মুড়াস্‌নি, গোঁফ দাড়ি পর্যন্ত সাফ করে ফেলেছিস্‌। তোর ঈশ্বর তোর মাথায় চুল দিলেন, গোঁফ দাড়ি দিলেন। তার ফলে তুই নিজের ঈশ্বরকে মূর্খ, গোঁয়ার ঠাওরালি। তুই গোঁফ দাড়ি কামিয়ে, মাথা মুড়িয়ে প্রমাণ করলি যে, তুই ঈশ্বরের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান্‌। তোর চুল গজিয়ে তিনি

বোকামি করেছিলেন। আপন ব্যবহারে তুই আপন ঈশ্বরের মূর্খতা ঘোষণা করলি। হে ওল-প্রভ মূর্খানন্দ স্বামী, আপন আচরণে ঈশ্বরের মূর্খতাই ঘোষণা শুধু অকৃতজ্ঞতাই নয়, এটা খুব বড়ো রকমের নচ্ছারী।"

পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্ত এই প্রশ্ন শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি কালেক্টার সাহেবকে বললেন, "হুজুর, এ কি প্রশ্ন, এ যে গালাগাল্লি।"

মিস্টার প্রেটর মুচ্‌কে হেসে মীর জাফরআলির দিকে তাকালেন, "মীর, তুমি কি বল?"

"হুজুর মুন্সেফ, নির্ণয় হুজুরের অধিকারে। হতে পারে প্রশ্ন করার ধরণ ঠিক্ নয় কিন্তু এ প্রশ্নে তো কিছু অন্যায় দেখছি না। অবশ্য আপনাকে, আমাকে অর্থাৎ আমাদের সকলকেই জোর করে এই প্রশ্নে টানা হয়েছে।"

মিস্টার প্রেটর এবার জোনাথন ডেভিডের দিকে তাকালেন, "কি মিষ্টার ডেভিড, আপনার কি অভিমত?"

জোনাথন ডেভিড সুযোগ পাওয়া মাত্র উত্তর দিলেন, "এই ধরণের প্রশ্ন ডিস্‌এলাউ করে দেওয়া উচিত, বড়ো অশিষ্ট প্রশ্ন।"

এবার মিস্টার প্রেটর গঙ্গাপ্রসাদের দিকে ঘুরলেন। গঙ্গাপ্রসাদ মুচ্‌কে হেসে বললেন, "প্রশ্নটা ঠিক্‌ই আছে আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ধরণও বিশেষ অস্বাভাবিক নয়।"

কিছুক্ষণ ভেবে মিস্টার প্রেটর বললেন, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ধরণটা আমার ভালো লাগছে না, কিন্তু প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লামা উহশী তিরস্কারের ভঙ্গীতে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছেন, সে জন্যে স্বামী জটিলানন্দেরও পাল্টা তিরস্কারে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"

দর্শকেরা করতালি দিলেন। যথাযোগ্য নির্ণয়।

স্বামী জটিলানন্দ জোরে হাঁক দিলেন, "মহর্ষি দয়ানন্দের জয় হোক। আমাদের ধর্মানুসারে জগতে তিনটি তত্ত্ব কাজ করছে—

পরমাত্মা, আত্মা আর প্রকৃতি। ওরে আল্লামা উহশী নামে খ্যাত, আমার শরীর প্রকৃতির অংশ, আমার প্রাণ আত্মার অংশ। এই আত্মা আর প্রকৃতির স্বামী পরমাত্মা। কারণ পরমাত্মা এই তত্ত্বের নির্মাতা। কিন্তু এরা ইচ্ছাধীন কর্ম করার স্বাধীনতা পেয়েছে। ওরে আল্লামা উহশী, তোমার প্রশ্ন একটা নাটক মাত্র। কারণ যদি প্রকৃতি অপূর্ণ না হত তাহলে তোমার জামা পাজামাও হত না। প্রকৃতি জঙ্গল তৈরি করে, মানুষ সেটা বাগানে রূপান্তরিত করে। প্রকৃতি বরফ বর্ষণ করে, ঠাণ্ডা বাতাস বহায়, মানুষ তখন তৈরি করে বাড়ি, গায়ে দেয় কম্বল আর লেপ। আমাদের আত্মা প্রকৃতিকে বর্ধিত আর সজ্জিত করে। এবার আমার উত্তর শোন। আমি যে মাথা মুড়িয়েছি, গোঁফ দাড়ি কামিয়েছি তার কারণ হ'ল প্রকৃতির বাজে কাজে আটকে না থেকে—যেমন মাথায় তেল মালিশ করা, চুল আঁচড়ান, নাপিতকে দিয়ে রোজ গোঁফ দাড়ি কাটছাঁট করান—এই সব বাজে কাজ থেকে ওপরে উঠে আমার আত্মা পরমাত্মার ধ্যান, মনন করতে পারে। কিন্তু ওরে আল্লামা, তোর খোদা পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ, শেয়াল, শুয়োর, সাপ সৃষ্টি করেছেন...... অর্থাৎ একেবারেই সব বাজে জিনিষ তৈরি করেছেন আর তার ওপর তোকে পাঠিয়ে যে উপহাস করেছেন সেটা প্রশংসার যোগ্য নয়। খোদার জন্যে 'মুর্খ' শব্দের প্রয়োগ উচিত হবে না। ওরে আল্লামা মূর্খতা তোরই সৃষ্টি।"

স্বামী জটিলানন্দের উত্তরে একদিক থেকে করতালির ধ্বনি হতে লাগল, কিন্তু অন্যদিক্ থেকে রোল উঠল, "মারো এই কাফিরকে, খোদাকে 'জোকর' বলছে।" মিষ্টার প্রেটর উঠে দাঁড়িয়ে হট্টগোল শান্ত করলেন, "যেমন প্রশ্ন তার তেমনিই উত্তর। যে মারধর করবে তাকে গ্রেফ্তার করা হবে। পুলিশ এখানে মোতায়েন রয়েছে। এই প্রশ্নে নম্বর পেলেন স্বামীজিই। এবারে ফাদার মসীহ স্বামী জটিলানন্দকে প্রশ্ন করবেন।"

ফাদার রামইলাহী নিশ্চিন্ততার সঙ্গে নিজের চেয়ারে বসে বসে

সব কিছু দেখছিলেন, শুনছিলেন। মিষ্টার প্রেটরের আদেশ পেয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে প্রার্থনা করলেন, "হে পিতা। আমাকে শক্তি দাও যাতে তোমার প্রকাশিত জগৎকে দেখাতে পারি।" তারপর তিনি স্বামী জটিলানন্দের দিকে তাকালেন।

বিজয়গর্বে গর্বিত স্বামী জটিলানন্দ ফাদার মসীহকে এমন ভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন, বাঘ যেমন ছাগলকে দেখে। ফাদার মসীহ প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজি, একথা কি ঠিক্ যে আর্য-সমাজে মূর্তি পূজোর নিষেধ আছে, মন্দিরে যাওয়া ভুল মনে করা হয়। আর্য-সমাজের পূজোর বিধি সন্ধ্যো-আহ্নিকের সঙ্গে হোম আর যজ্ঞ?"

স্বামী জটিলানন্দ উত্তর দিলেন, "পাদরী সাহেব, তোমার খ্রীষ্টান ধর্মও তো ঈশ্বরকে নিরাকার বলে। তিনি সর্বত্র বিরাজ করছেন সেজন্যে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা সব অর্থহীন। আমাদের মুনি ঋষিরা যজ্ঞ করতেন, ইশ্বরের পূজোর বিধি সব চেয়ে ঠিক্ এটাই।"

ফাদার মসীহ এবার চরম আঘাত করলেন, "স্বামীজি, হিন্দুদের মড়া পোড়ান হয়। তবে এটা কি ঠিক্ নয় যে, তোমাদের যজ্ঞকুণ্ড একটি চিতা আর তুমি স্বাহা স্বাহা করে রোজই নিজের পরমাত্মাকে দাহ কর? এর অর্থ হ'ল যে তুমি নিজের পরমাত্মাকে মৃত মনে কর, তাকে পোড়াবার জন্যে তুমি রোজ যজ্ঞ কর।"

ফাদার মসীহের এই প্রশ্নে স্বামী জটিলানন্দ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "ওহে পাদরী, তুমি একটি গণ্ডমূর্খ! আমরা হোম করি, যজ্ঞ করি আপন আত্মাকে শুদ্ধ করবার জন্যে অর্থাৎ আমরা পোড়াই আপন পাপকে। এইভাবে নিজের পাপকে পুড়িয়ে আমরা পূজো করি পরমাত্মার।"

ফাদার মসীহ মুচ্‌কে হাসলেন, "হে স্বামী, পাপের দেহ নেই, পরমাত্মাও বিদেহী। তাহলে কুণ্ডের চিতায় তোমার পাপ পোড়ে, না পরমাত্মা পোড়ে, তা তুমি জানলে কি করে?"

স্বামী জটিলানন্দ ভড়কে গেলেন, "কি আবোলতাবোল বকছ

পাদরী সাহেব! পরমাত্মা কখনও কি পুড়তে পারে? সে তো অজর-অমর। এই বুদ্ধিতে তুমি বি. এ. পাস করেছ?"

ফাদার মসীহ উত্তর দিলেন, "অসঙ্গত কথা তো তুমিই বলছ স্বামী! পাপ যদি অশরীরী হয়, তাহলে সে পোড়ে কি করে? উপরন্তু পাপ পুড়ে যাওয়ার নয়, অর্থাৎ পাপ স্বয়ং এক প্রকারের অগ্নি, যার শিখায় পুড়ছে সবাই। সেই জন্যে তোমার মুনি ঋষিরা যাঁরা হোম করছেন, যজ্ঞ করছেন, সবাই গোঁয়ার, জঙ্গলী আর মূর্খ। হে স্বামী, কেউ কোথাও আগুনের শিখা প্রজ্বলিত ক'রে কি নিজের পিতা মাতার পূজা করে? সেই জন্যে হে স্বামী, সন্ধ্যে-আহ্নিক, হোম সব অজ্ঞানতাপ্রসূত আড়ম্বর মাত্র।"

স্বামী জটিলানন্দ মনে মনে এর কড়া উত্তর ভাবছিলেন। সেজন্য কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুজেছিলেন। কিন্তু মিষ্টার প্রেটর মনে করলেন, 'উত্তর যোগাচ্ছে না'। তাই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই প্রশ্নে নম্বর পেলেন ফাদার মসীহ। এবার আল্লামা উহশীর পালা, তিনি প্রশ্নের উত্তর দেবেন।"

মিস্টার প্রেটরের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই করতালি বেজে উঠল। স্বামী জটিলানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি শাস্ত্র আলোচনায় আর যোগ দেব না। এখানে অন্যায় হয়, খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব করা হয়।" এই বলে স্বামীজি চেলাদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

স্বামীজি যাবার পরে কালেক্টার সাহেব ঘোষণা করলেন, "স্বামী শাস্ত্র আলোচনা ছেড়ে পালিয়ে গেল। শাস্ত্র আলোচনা শেষ হল।" এইভাবে আলোচনা সভা ভঙ্গ হ'ল।

গঙ্গাপ্রসাদ বাড়ি ফিরলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল যেন তিনি নাট্য-জগৎ থেকে ফিরছেন। জটিলানন্দ, উহশী, মসীহ, প্রেটর সবাই মিলে যেন এক অদ্ভুত নাটক করলেন।

চার

ট্রেন যখন এলাহাবাদ স্টেশনে পৌছল, গঙ্গাপ্রসাদের মন বড়ো ভার। তিনি জয়দেইয়ের বাংলোতে গিয়ে পৌছলেন। সেখানকার সমগ্র পরিবেশ যেন দম আটকানোর মতো। ভিখু ছিল বারান্দায়। গঙ্গাপ্রসাদের টাঙ্গা দেখেই সে জিনিষপত্র নামাতে ছুটল। মাল নামাতে নামাতে সে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় ছিলে বাছা? তোমার ঠিকানাটাও তো জানা ছিল না, তা না হলে খবর পাঠান হতো। জমিদার গিন্নী সমানে তোমার নাম জপছেন।"

"কেন, কি হয়েছে, জেঠিমা ভালো তো?"

"ব্যস্, তোমাকে দেখবার জন্যেই যেন তাঁর প্রাণ আট্‌কে রয়েছে। ডাক্তারেরা তো জবাবই দিয়ে গেছেন। সোজা ওঁর ঘরে চলে যাও। দাদাবাবু আজ ছ'দিন থেকে এখানেই আছেন। তিনি তো ওঁরই ঘরে বসে রয়েছেন। পরশু লক্ষ্মীচন্দ এসেছেন।"

গঙ্গাপ্রসাদ সোজা জয়দেইয়ের ঘরে গেলেন।

জয়দেই চুপচাপ চোখ বুজে শুয়েছিলেন। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভেতরের কষ্ট চেপে চেপে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছে। জ্বালাপ্রসাদ চোখ বন্ধ করে তাঁর শিয়রে বসেছিলেন, যেন ঘুমোচ্ছেন। গঙ্গাপ্রসাদের পায়ের আওয়াজে চোখ চাইলেন, "আরে, তুমি এসেছ। বৌদি মিথ্যে বলেননি। গতকাল রাত্রে তিনি আমাকে বললেন যে আজ তুমি ঠিক্ আসবে। তুমি বেরেলীতে ছিলে না? আমি তোমাকে ছ'টো তার করলাম, কিন্তু তোমার কোনো উত্তর পেলাম না।"

"আজ্ঞে, আমি কলকাতা গিয়েছিলাম। সেখানে সাত দিনের জায়গায় সতের-আঠার দিন লেগে গেল।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "গত রাত থেকে বৌদি অজ্ঞান হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে চোখ খুলে তুমি এসেছ কি না খোঁজ নিচ্ছেন। আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন," বলে জ্বালাপ্রসাদ একটু জোরে বললেন, "বৌদি, তোমার কথা ঠিক্ হ'ল, গঙ্গা এসেছে।"

জয়দেই চোখ মেলে চাইলেন। আর কিছুক্ষণ তিনি একদৃষ্টে গঙ্গাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "একটু আমার কাছে আয়, তোর মাথায় হাত রাখব। হ্যাঁ, ঠিক্! তুই এখানে সেখানে ঘুরছিলি আর তোকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণটা ছটফট করছিল। কিন্তু আমি ঠাকুরপোকে বলেই দিয়েছিলাম গঙ্গাকে না দেখে আমার প্রাণ বের হবে না। যাক্ তুই এসে গেলি। ভগবান্ আমার কথা শুনেছেন।" তারপর তিনি জ্বালাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঠাকুরপো, লক্ষ্মী কোথায়?"

"এখান থেকে আধ ঘণ্টা হ'ল চলে গেছে। আমাকে বলে গেছে কমিশনার সাহেবের বাংলোয় যাচ্ছে। যদি দরকার পড়ে লোক দিয়ে ডেকে পাঠাতে বলেছে। বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে কি?"

"হ্যাঁ, প্রয়োজন তো আছেই। কিন্তু সে এলেই হবে।" আবার গঙ্গাপ্রসাদকে বললেন, "হ্যাঁরে, ঠিক্ সময়েই এসেছিস্। যদি আর একদিনও দেরী করতিস্ তাহলে আমি তোকে দেখতে পেতাম না আর তুইও আমাকে দেখতে পেতিস্ না।"

জয়দেই চোখ বুজলেন। গঙ্গাপ্রসাদের মাথায় হাত রেখে যেন পরম শান্তি পেলেন। তাঁর মুখের বিকৃতি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, স্বাভাবিকতা ফিরে এল। অনেকক্ষণ ধরে তিনি গঙ্গাপ্রসাদের মাথার ওপর থেকে হাত সরালেন না আর কোন কথাও বললেন না। তখন গঙ্গাপ্রসাদ আস্তে আস্তে তাঁর হাতটি নামিয়ে পাশে রেখে দিল। "একি হ'ল বাপ্পা, মনে হচ্ছে যেন আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।"

"অজ্ঞান হয়ে তো দু'দিন থেকেই পড়ে আছেন। ডাক্তারেরা আশ্চর্য হচ্ছেন, এখনও বেঁচে আছেন কী করে। যাও, তুমি কাপড় ছাড়ো, স্নান করো। জ্ঞান হলে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে, তোমাকে ডেকে পাঠাব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গঙ্গাপ্রসাদের মা আর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন।

বিশেষ কোনো কথা হ'ল না। সেখানের পরিবেশটা কেমন যেন ভয়বিহ্বল। স্নান সেরে খেয়েদেয়ে গঙ্গাপ্রসাদ ড্রইংরুমে এসে বসলেন।

দুপুরে ফিরলেন লক্ষ্মীচন্দ। গঙ্গাপ্রসাদকে দেখে বললেন, "তাহলে তুমি এসেই গেলে। কিন্তু ছিলে কোথায়? তোমার এত খোঁজ খবর হচ্ছিল, চিঠি-তার সব পাঠান হ'ল। কিন্তু তুমি এমন অদৃশ্য হলে যে তোমার পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছিল না। মা তো তোমারই নাম জপ করছিলেন। দেখা হ'ল ওঁর সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, দু-এক মিনিটের জন্যে জ্ঞান হয়েছিল, আবার অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনি একাই কানপুর থেকে এলেন যে, বৌদি ছেলেমেয়েরা এলো না কেন? এখানকার তো এখন তখন অবস্থা।"

লক্ষ্মীচন্দ মুচ্‌কে হাসলেন, "হ্যাঁ, এখন একাই এসেছি, তারাও এসে পড়বে দু-একদিনের মধ্যেই। আমি তো এসে মহা বিপদে পড়েছি। এখানে আমার তিন দিন হয়ে গেল। মনে করেছিলাম দু-একদিন লাগবে। কানপুরে কাজকর্মের ক্ষতি হচ্ছে। এক্ষুনি সিভিল সার্জেনের সঙ্গে দেখা ক'রে আসছি। তিনি বললেন, বলা মুশকিল। যে কোন সময়ই এঁর মৃত্যু সম্ভব। এমনিভাবে দু-চার দিন আরো টানতেও পারেন। বুঝতে পারছি না কি করি।"

"দাদা, এতে আবার বোঝার কি আছে, থাকতে তো আপনাকে হবেই।"

"হ্যাঁ, থাকতে তো হবেই।" অন্যমনস্ক হয়ে লক্ষ্মীচন্দ বললেন, "কারো মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা—কেমন যেন বিচিত্র ঠেকে, কিন্তু এখন তাই করতে হচ্ছে। শুধু আমিই বা কেন, এ বাড়ির সকলকেই। কিন্তু তুমি তো বললে না এতদিন কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে।"

"কলকাতা গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এক বন্ধুর নিমন্ত্রণ এসেছিল……লালা রাধাকিষণ, বোধ হয় আপনি নাম শুনে থাকবেন, হয়তো চেনেনও। তাঁর বাবা গোপীকিষণ, এখন কানপুরেই থাকেন।"

"আরে, ওই গোপীকিষণের ছেলে রাধাকিষণ! রাজা সাহেব হয়ে গেছে। কলকাতার জহুরী। বুঝেছি। তার কাছে গিয়েছিলে। কলকাতার খবর কি? এখন তো সেখান থেকে রাজধানীও সরে গেল।"

"রাজধানী সরলো তো কী হয়েছে? সেখানে তো সেই সমান ধূম-ধাম, আনন্দ-উৎসব লেগেই রয়েছে। কলকাতার চেহারা দেখে আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি।"

লক্ষ্মীচন্দ হাসলেন, "গঙ্গাপ্রসাদ, তুমি ভ্যাবাচ্যাকা খেলে! আশ্চর্য! কিন্তু তুমি তো কিছুতেই ভ্যাবাচ্যাকা খাবার পাত্র নও।" তারপর তার হীরের আংটির দিকে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "ভারি সুন্দর আংটি, হীরেটা কত বড়ো। মনে হচ্ছে যেন কোথাও দেখেছি। কলকাতা থেকে কিনেছ বুঝি?"

"আজ্ঞে না, এ আংটি জেঠিমা দিয়েছিলেন আমাকে।" একটু, ইতস্ততঃ করে বললেন গঙ্গাপ্রসাদ।

লক্ষ্মীচন্দ ভুরু কোঁচকালেন, "তাই আমি ভাবছিলাম এ আংটি যেন আমি কোথাও দেখেছি।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে রইলেন। এমন সময় জ্বালা-প্রসাদ জয়দেইর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি ড্রইং রুমে এসে বললেন, "লক্ষ্মী, বৌদির জ্ঞান হয়েছে। উনি তোমাকে আর গঙ্গাকে ডাকছেন।"

হীরের আংটির বিষয় জেনে লক্ষ্মীচন্দের মুখের ওপর যে উত্তেজনার ভাব দেখা দিয়েছিল তা যেমনকে তেমনই রয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন।"

জয়দেই তাদের প্রতীক্ষায় দরজার দিকে চেয়েছিলেন। জ্বালাপ্রসাদ এসে জয়দেইয়ের মাথার কাছে চেয়ারে বসে পড়লেন। জয়দেইয়ের পালঙ্কের পাশের দুটি চেয়ারে একটিতে লক্ষ্মীচন্দ আর অপরটিতে গঙ্গাপ্রসাদ বসলেন। জয়দেই খানিক চুপ করে দু'জনকে দেখলেন। তাঁর চোখ জলে ভরা। তারপর তিনি ক্ষীণ

স্বরে বললেন, "আমার সময় শেষ। বাবা লক্ষ্মী, তোকে কিছু বলতে চাই। এই আমার শেষ ইচ্ছা।"

"হ্যাঁ মা, বল। তোমার শেষ ইচ্ছে পূরণ করা হবে," লক্ষ্মীচন্দ বললেন।

একটু থেমে জয়দেই বললেন, "তোর মতো এই গঙ্গাকেও আমি মানুষ করেছি। সেইজন্যে আমি একেও কিছু দিয়ে যেতে চাই। তোর তো এত বড়ো রাজপাট রয়েছে, এ বেচারি তো চাকরি করে খায়—আমার ক্যাশবাক্সে যে নগদ টাকা আর গয়না আছে সে সব আমি গঙ্গাপ্রসাদকে দিয়ে যেতে চাই। গঙ্গা ছিল না। আমি ঠাকুরপোকে এ বিষয় বলেছিলাম, উনি আগে তোর সঙ্গে কথা বলে নিতে বললেন।"

লক্ষ্মীচন্দ কাষ্ঠ কর্কশ হাসি হাসলেন, "বোধ হয় এই জন্যেই গঙ্গাপ্রসাদের নাম জপ করছিলে। যদি গঙ্গাপ্রসাদ আগে এসে যেত তাহলে আমাকে জানানরও দরকার বোধ করতে না। আমাকে জিজ্ঞেস করে কি গঙ্গাপ্রসাদকে হীরের আংটি দেওয়া হয়েছিল? বড়ো হাসির কথা বললে মা!"

জয়দেই চোখ বুজলেন। একটি নিদারুণ দুঃখের ছাপ তাঁর মুখের ওপর ছায়া ফেলে মিলিয়ে গেল। খানিক পরে চোখ বুজেই তিনি বললেন, "যা আমার ছিল তা দিয়েছি। প্রত্যেকটি কথা তোকে আর কি জিজ্ঞেস করবো। এখন তুই এখানে আছিস সেইজন্যে জিজ্ঞেস করলাম।"

লক্ষ্মীচন্দ বললেন, "মা, জিজ্ঞেস করে ভালো করেছ। না হলে তুমি তো চলে যেতে। আর এদের অবস্থা কাহিল হ'ত। গঙ্গাপ্রসাদকে চুরির অভিযোগে আমি গ্রেফতার করিয়ে দিতাম। কাকাবাবু জানেন, সেইজন্যেই তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। জেনে রাখ এই টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটির ওপর কারো কোন অধিকার নেই। এ সব আমার। এ থেকে তুমি গঙ্গাকে কিছুই দিতে পার না, মনে রেখ। তুমি একে পড়িয়েছ-লিখিয়েছ, এর পিছনে অগুণতি

টাকা ঢেলেছ। তার ওপর আবার হীরের আংটিও দিয়েছ। আর কি কি দিয়েছ, জানতে পারি কি?"

এবারে জয়দেই চোখ মেললেন, "লক্ষ্মী বাবা, এতো ছোট হস্ না। কাউকে দেবার মত আমার কাছে কিই বা ছিল? সব কিছুই তো তোকে আর তোর বউকে দিয়ে দিয়েছি। আমার নিজস্ব বলতে কিছু গয়না আর দশ-পনেরো হাজার মতো নগদ ওই ক্যাশ-বাক্সে আছে। সব সমেত বড়ো জোর পঁচিশ-তিরিশ হাজারের মতো হবে। ভগবান্ তোকে অজস্র দিয়েছেন। এত অল্পে মন এত ছোট করছিস্ কেন?"

লক্ষীচন্দ একটু আবেশের সঙ্গেই উত্তর দিলেন, "এই যে অজস্রের কথা বলছ, তা তো শ'হাজার জমেই হয়েছে মা! প্রতি গজে এক পয়সা করে লাভে তবে গিয়ে লক্ষ-ছু'লক্ষের লাভ হয়। যা কিছু আমার প্রাপ্য তা আমি ছেড়ে দিই কি করে? যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আর আমি একটি পয়সাও কাউক দিতে দেব না, ভাল করে জেনে রাখ।"

লক্ষীচন্দের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া জয়দেইয়ের ওপর সুস্পষ্ট ভাবেই হল, তুই একেবারে বাপের গুণগুলো পেয়েছিস লক্ষ্মী! কিন্তু, তুই আমাকে বাধা দিতে পারবি না।" নিজের জীর্ণ হাতে গলার হার থেকে ক্যাশবাক্সের চাবিকাটি খুলে গঙ্গাপ্রসাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "যা আমার, তা দেবার আমার পূর্ণ অধিকার আছে। এতে তুই বাধা দিতে পারবি না। গঙ্গাপ্রসাদ নে এই চাবি-কাটি......।" কিন্তু লক্ষীচন্দ যেন এ সবের জন্য সতর্ক ছিলেন। চাবিকাটি মায়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন, "গঙ্গাপ্রসাদকে চাবি দিতে এসেছিস্ হারামজাদী!"

এই গালাগালি শুনে যেন গঙ্গাপ্রসাদের চেতনা ফিরল। তিনি লক্ষ্মীচন্দের হাত ধরে বললেন, "জেঠিমাকে গালাগালি করতে তোমার লজ্জাও করল না।"

লক্ষ্মীচন্দ নিজের ওপর অধিকার একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন,

"গাল দেবো। আরও দেবো এই ডাইনীকে। এর গুণ আমরা সবাই জানি।"

জয়দেইয়ের মুখ থেকে একটি আর্তস্বর বেরিয়ে এলো, "হে ভগবান্।" আবার তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এবার জ্বালাপ্রসাদ পাগলের মত উঠে দাঁড়ালেন, "লক্ষীচন্দ, এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। একেবারে বেরিয়ে যাও। তোমার সঞ্চিত ধন সব তোমারই কাছে। সে কেউ স্পর্শও করবে না। তবে এ বেচারিকে শান্তিতে মরতে দাও।" "গঙ্গা এ ঘর থেকে যাও, লক্ষ্মীচন্দ চলে যাও, এই অভাগীকে শান্তিতে মরতে দাও" —জ্বালাপ্রসাদ প্রলাপ বকছিলেন।

মাথা নীচু করে গঙ্গাপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু লক্ষীচন্দের হিংসে আরও যেন জ্বলে উঠল। "যাচ্ছি, তবে মনে রাখবেন, যদি এ ঘরের কোন জিনিষ কিছুমাত্র এদিক্-ওদিক্ হয়, তাহলে বাপ-বেটা দু'জনকেই শ্রীঘর দেখিয়ে দেব," এই বলে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই ধরণের কথাবার্তা শুনে বাড়ির চাকরবাকরেরা ঘরের বাইরে জমা হয়ে গিয়েছিল। ওই মৃত্যুর ঘরটিকে হিংসার ভীষণতা চারিদিক্ থেকে যেন ঘিরে রেখেছিল। জ্বালাপ্রসাদ মর্মাহত হয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন। তিনি ডাকলেন, "বৌদি, চোখ খোল। ওরা চলে গেছে।"

জয়দেই চুপচাপ নির্জীবের মতো পড়েছিলেন আর একটি নিদারুণ মনোবেদনায় তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। জয়দেইয়ের এই অবস্থা দেখে জ্বালাপ্রসাদের চোখ ছলছলিয়ে এল। তিনি কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে জোড় হাতে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে ভগবান্! বৌদি যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তো তার দণ্ড আমাকে দিও। ওঁর যন্ত্রণা দূর কর। হে ভগবান্! এঁকে শীঘ্র নিজের কাছে তুলে নাও।"

ধীরে ধীরে জয়দেইয়ের মুখের বিকৃতি দূর হতে লাগল, তবে তাঁর অবস্থা রইল অপরিবর্তিত।

সন্ধ্যে ছ'টায় ডাক্তার এলেন। জয়দেইকে পরীক্ষা করে বললেন, "অবস্থা খুবই শোচনীয়। বোধ হয় এই অচেতন অবস্থাতেই এঁর শেষ। এখন ওষুধপত্র বন্ধ করে শুধু গঙ্গাজল দিন।"

জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "ডাক্তারবাবু, আজ তিন দিন থেকে তো শুধু গঙ্গাজল খেয়েই রয়েছেন। ওষুধ তো আপনি তখনই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।"

"আরে হ্যাঁ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার তো আশ্চর্য লাগছে; ইনি এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছেন কী করে?"

এবার লক্ষ্মীচন্দ বললেন, "ডাক্তারবাবু, আমি তিন দিন থেকে এখানে এসে পড়ে আছি। আমার কাজকর্মের খুব ক্ষতি হচ্ছে। এঁর অবস্থা আর কতদিন এরকম চলবে?"

ডাক্তার একটু রুক্ষভাবেই উত্তর দিলেন "আমার মনে হচ্ছে, আপনি এঁর অন্ত্যেষ্টি সেরে কাল কানপুর ফিরে যেতে পারবেন।"

ডাক্তারের রুক্ষ উত্তরে লক্ষীচন্দ তিক্ত হাসি হাসলেন, "আমার কানপুর যাওয়া নিয়ে কথা নয়, ডাক্তারবাবু। আমাকে তো এখানে থেকেই সব ক্রিয়াকর্ম সারতে হবে। পনের-কুড়ি দিন তো লেগেই যাবে। কথা হ'ল অন্যদের যাওয়া নিয়ে। আমি ওদের জন্য চিন্তা করছিলাম। আচ্ছা বেশ।"

ডাক্তারকে বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে লক্ষীচন্দ আর জ্বালাপ্রসাদ এগিয়ে এলেন। ডাক্তার যাবার পর লক্ষীচন্দ বললেন, "কাকাবাবু, যদি রাগের মাথায় কিছু কুকথা বলে থাকি তো কিছু মনে করবেন না যেন। আপনিই ভেবে দেখুন না কেন, সামনে থেকে বাড়া ভাত কে তুলে নিতে দেয়? হ্যাঁ, আর একটি কথা। আমার মুহুরি আর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে তার করেছি। আমার পরিবার, আর ছেলেপুলেদের নিয়ে তারা দু'একদিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তার জন্যে আপনাদের কিছু অসুবিধে তো হবেই, কিন্তু কি

করব। আমাদের এখানে অন্ততঃ একমাস-পনের দিন তো থাকতেই হবে।"

জ্বালাপ্রসাদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভালো করেছ, সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছ। আমার মনে হচ্ছে, বৌদি আজ রাতেই চলে যাবেন। কাল ভোরেই সব শেষ।" জ্বালাপ্রসাদ জয়দেইয়ের ঘরে ফিরে গেলেন।

দুপুরে মর্মান্তিক ঘটনার পরে গঙ্গাপ্রসাদ শহরের দিকে চলে গিয়েছিলেন। ফিরলেন প্রায় রাত ন'টায়। ফিরে এসেই জয়দেইয়ের ঘরে গেলেন। জয়দেই তেমনি অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন। আর জ্বালাপ্রসাদ মাথার কাছে চেয়ারে চোখ বুজে মূর্তির মতন তেমনই বসেছিলেন। জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "গঙ্গা, বসো! আজকের রাতটা কত বড়ো, কত ভয়ানক!"

"বাপ্পা, আপনি তিন রাত সমানে জেগে আছেন। একটু ঘুমিয়ে নিন্ না কেন। আমি ততক্ষণ এখানে বসি," বললেন গঙ্গাপ্রসাদ।

জ্বালাপ্রসাদ মৃদু হাসলেন, "আর এক রাত্তির। ব্যস্, এই শেষ রাত্তির, তা জাগতে পারব। কটা বেজেছে?"

"ন'টা বেজে দশ মিনিট," গঙ্গাপ্রসাদ ঘড়ি দেখে বললেন।

"যাও, তুমি খেয়ে নাও। হ্যাঁ, শোন লক্ষ্মীচন্দের কথায় কিছু মনে কর না যেন। প্রত্যেক মানুষ কাজ করে যাবে তার সহজাত সংস্কার বশে। লক্ষ্মীচন্দ আর তার বাবা প্রভুদয়ালের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, একটুও না।" জয়দেই যেন সব কথা শুনছিলেন। তখনই তিনি চোখ মেলে চাইলেন, "ঠিক্ বলছ ঠাকুরপো, বাপ বেটাতে কোন তফাৎ নেই। ভেবেছিলাম বুঝি আমার পেটে জন্মেছে! কিন্তু কিছুমাত্র তফাৎ হ'ল না!"

জয়দেইয়ের কণ্ঠের দুর্ব্বলতা যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। কোথায় উবে গেল যেন তাঁর মুখের বিকৃতি! জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "বৌদি, এখন শরীর কেমন?"

"খুব ভালো ঠাকুরপো। আমার রোগ যেন সব দূর হয়ে গেল। গঙ্গা, তুই আসতে বড়োই দেরি করে ফেললি, সবই ললাটের লিখন। এখন গিয়ে খেয়েদেয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ঠাকুরপোর সঙ্গে একটু কথা বলি।"

"আচ্ছা জেঠিমা, আমি খেয়ে আসছি এক্ষুনি," এই বলে গঙ্গাপ্রসাদ চলে গেলেন।

জয়দেই হাসলেন, "খেয়ে আসছে, যেন ততক্ষণ আমি বসে থাকব।"

একটু থেমে আবার বললেন, "ঠাকুরপো, বড়ো পিপাসা, একটু গঙ্গাজল খাইয়ে দাওনা। হ্যাঁ শোন, ক'টা তুলসীপাতা গঙ্গাজলে দিয়ে দাও। কে জানে এই আমার শেষ পিপাসা কিনা!"

জ্বালাপ্রসাদ রূপোর ঘটিতে করে তুলসীপাতা ভেজান গঙ্গাজল নিয়ে এলেন।

"ঠাকুরপো আমাকে ভর দিয়ে বসিয়ে দাও। শেষবার শুয়ে-শুয়ে গঙ্গাজল খাব না।"

জ্বালাপ্রসাদ ভর দিয়ে জয়দেইকে বসিয়ে দিলেন। জয়দেই গঙ্গাজল খেলেন এক ঢোঁক। একটি আল্‌তো হিক্কা উঠল, "ঠাকুরপো, মাটিতে শুইয়ে দাও, চল্‌লাম।"

জ্বালাপ্রসাদ জয়দেইকে কোলে করে খাট থেকে তোলা মাত্র একটি দীর্ঘ হিক্কার সঙ্গে তাঁর প্রাণ-পাখী বের হয়ে গেল।

পাঁচ

"তুমি!" জ্ঞানপ্রকাশকে দেখে অবাক্ হয়ে বললেন জ্বালাপ্রসাদ।

"হ্যাঁ, দাদা আমি। রবিরারে জাহাজ থেকে বম্বেতে নেমেছি। সোমবারে সেখান থেকে ট্রেনে রওনা হয়ে এইমাত্র এখানে পৌছলুম। ষ্টেশন থেকে আসছি সোজাই।"

"তোমার আসার খবর তারে পাঠালে আমি ষ্টেশনে যেতাম আনতে।" জ্বালাপ্রসাদ চাকরকে ডাক দিলেন, "গিরিধারী, জ্ঞানদার মালপত্র টাঙ্গা থেকে নামাও আর ভেতরে জানিয়ে দাও জ্ঞানপ্রকাশ এসেছেন।"

মুন্সী রামসহায়ের ছোট ছেলে হলেন জ্ঞানপ্রকাশ। ১৯১২ সালে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন ব্যরিষ্টারী পড়তে। তাঁর ইংল্যাণ্ডে প্রবাস-কালেই রামসহায়ের মৃত্যু হয়। ইংল্যাণ্ড যাবার আগেই তাঁর মা মারা গিয়েছিলেন। রাজপুরায় তাঁর বড়দাদা সত্যপ্রকাশ জমিদারি দেখা শোনা করছিলেন। দুই ভাইয়ের স্বভাবে অমিল ছিল প্রচণ্ড। আর সেই জন্যেই জ্ঞানপ্রকাশের কোন সংশ্রব ছিল না বাড়ির সঙ্গে। তিনি বম্বে থেকে সোজা এলাহাবাদে চলে এলেন। এখানেই বসবাস করে তাঁর ওকালতি করার ইচ্ছে।

মালপত্র নামাবার পরে জ্বালাপ্রসাদ আর জ্ঞানপ্রকাশ ড্রইংরুমে এসে বসলেন। জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি রাজপুরা যাবেনা? তোমার ফেরবার খবর সত্যপ্রকাশকে দিয়েছ তো?"

জ্ঞানপ্রকাশ মৃদু হাসলেন, "হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ড থেকে রওনা হবার আগে দাদাকে টাকা পাঠাতে নিষেধ করে লিখেছিলাম। কিন্তু এখন রাজপুরা যাবার কোন ঠিক্ নেই। এলাহাবাদে স্থায়ীভাবে থাকবো ভাবছি। ১লা জানুয়ারি থেকে ওকালতি শুরু করব। হাইকোর্টে নাম এন্‌রোল করাতে হবে। তার ওপর আবার এখন বাড়ি গেলে নানা ঝামেলা হতে পারে। 'বিলেত থেকে ফিরেছ, প্রায়শ্চিত্ত কর, এ কর, সে কর।' ওখানে গিয়ে কে এসব ঝঞ্ঝাট করে?"

জ্বালাপ্রসাদ হেসে উঠলেন, "হ্যাঁ, বলছ তো ঠিক্ই। গাঁয়ে অবশ্য এখনও গোঁড়ামি রয়েছে প্রচুর। আমি তো সত্যপ্রকাশের গোঁড়ামি দেখে সত্যিই খুব অবাক হয়েছি, বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দের কান কাটা গেছে।" তারপরে একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন "ইংল্যাণ্ডে তুমি অনেক দিন কাটালে। মামাবাবু তোমাকে দেখবার জন্যে ভারি অস্থির হয়েছিলেন।"

কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, "আপনিই বলুন আমি কি করতে পারতাম ? সেখানে পৌঁছনো মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। যুদ্ধের সময় ফিরতাম কী করে ? যুদ্ধ যখন শেষ হ'ল, আমি তখন আমেরিকাতে। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ড ফিরলাম ; লণ্ডনে তখন ভারতের রাজনৈতিক জীবনের চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে। ভারত থেকে একের পর এক প্রতিনিধি দল যেতে শুরু করল, আর তখন ফিরতে ইচ্ছে করল না।"

"রাজনৈতিক চাঞ্চল্য তো এখন আরও বাড়বে। যাক্, তুমি যে ফিরে এসেছ, এটাই যথেষ্ট। সত্যপ্রকাশ মনে করেছিল তুমি খ্রীষ্টান হয়ে গেছ আর মেম বিয়ে করেছ। এখানে তোমার সম্বন্ধে এই ধরনের উড়ো খবর রটেছিল।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি-মিথ্যে সব রকমারি খবর উড়ে বেড়ায়। আমি সত্যিই খ্রীষ্টান হইনি। সেখানে পাদরীদের খ্রীষ্টান করার তেমন অভিরুচি নেই। এ সব ঝামেলা ভারতেই রয়েছে। আর বিয়ের ব্যাপার, অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েও ভেঙ্গে গেল। যে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ের কথা চলছিল, তার বাগ্‌দত্ত জার্মান যুদ্ধে মারা গেছে বলে জানা গেল। কিন্তু আসলে সে মারা যায়নি, গ্রেফতার হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি আমাদের বিয়ের ঠিক্ এক সপ্তাহ আগে সে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলো। আর আমাদের বিয়েরও হ'ল ইতি।"

জ্বালাপ্রসাদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ভালোই হ'ল ! ভগবান্ যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই ! এখানে যখন এসে গেছ ওকালতি কর। তোমার বিয়ের কথা অনেক জায়গা থেকেই আসছে। তুমি বিলেত ফেরত, নিজেই মেয়ে পছন্দ ক'রে নেবে। আজই তো সকালে বেনারসের রায়বাহাদুর কন্হৈয়ালাল তোমার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে গেছেন। মেয়ে সুন্দরী, ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছে। আমি তাকে দেখেছি। ওদের বাড়িতে পরদা চালু নেই। তাঁকে খবর দেব, তাঁর মেয়ের ভাগ্যেই তুমি ফিরে এসেছ।"

"কিন্তু, আমি কালকে তো অমৃতসরের দিকে রওনা হয়ে যাব। আজ বাইশে ডিসেম্বর, ছাব্বিশে ডিসেম্বর থেকে সেখানে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হবে।"

"তোমার সেখানে যাওয়া কি বিশেষ জরুরী?" জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"এ দুনিয়ায় জরুরী বলে তো কিছুই নেই। কিন্তু আমাদের যে নতুন চেতনা আসছে, আমি আগেভাগেই তা দেখতে চাই। জলিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অমৃতসরেই হয়েছিল, আর সেখানেই কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। আমি তো আপনাকেও আমার সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করছি।"

জ্বালাপ্রসাদ জিভ কেটে বললেন, "না ভাই, আমার পেন্‌শন্‌টা বহাল থাকুক। এই রাজনৈতিক হুজুকের শেষ হবে—কিন্তু এই ব্রিটিশ সরকার যেমনটি ছিল তেমনই থাকবে। মাঝখানে আমার পেন্‌শন্‌টা ফেঁসে যায় কেন।"

তখন দেওয়াল ঘড়িতে দশটার ঘণ্টা বাজল। "আরে দশটা যে বেজে গেল। আমরা খেয়ে নিই চল। তোমার বিছানা পাতা হয়ে গিয়ে থাকবে। রাত্রে আরাম করে শোবে। আজ বাইশ তারিখ, কাল তেইশ। তুমি যদি চব্বিশ তারিখে রওনা হও তো পঁচিশে সকালে অমৃতসরে পৌছবে। কংগ্রেস অধিবেশন তো ছাব্বিশ থেকে শুরু—কালকে যাবার তাড়া কিসের? কাল দিন ভোর জিরোও।"

জ্বালাপ্রসাদের পেন্‌শন্‌ হয়েছে দু'বছর হ'ল। তিনি জর্জটাউনে বাড়ি করিয়েছেন।

পরের দিন জ্ঞানপ্রকাশ যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন ন'টা বেজে গেছে। বাইরে কুয়াশা আর ধোঁয়াশা। জ্বালাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে তৈরী হয়ে নিলেন। জোরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। জ্ঞানপ্রকাশের মনে উৎসাহ আর স্ফুর্তি। জ্বালাপ্রসাদ বারান্দায় তৈরী হয়ে বসেছিলেন, তাঁর টাঙ্গা পোর্টিকোর তলায় প্রস্তুত ছিল। জ্ঞানপ্রকাশকে দেখেই বললেন,

"অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে। জলখাবার খেয়ে নাও। আমাকে ষ্টেশনে যেতে হবে। এইমাত্র গঙ্গার তার পেলাম সে আজ এলাহাবাদে আসছে, তাকে স্টেশনে আনতে যেতে হবে। বড়োদিনের ছুটি কি না। ওর গাড়ি পৌঁছবে এগারোটায়।"

জ্ঞানপ্রকাশ বসতে বসতে বললেন, "যাক্, খুব ভালোই হ'ল। অমৃতসর যাবার আগে ওর সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। সে আজকাল থাকে কোথায়? তার খবর কি?"

"জৌনপুরে আছে। সেখান থেকেই আসছে। দেখা হলে তাকেই তার খবর জিজ্ঞেস কোরো।"

"সে একলা, না পরিবারও সঙ্গে আসছে?"

"আরে, কাল তোমাকে বলাই হয়নি, তার ছেলেমেয়েরা এখন এখানেই আছে। তার ছেলে এখানে পড়ছে। বৌমাও একমাস হ'ল এখানে এসেছেন। বৌমাটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!"

জ্ঞানপ্রকাশ মৃদু হাসলেন, "যাক্, আপনার একা খালি খালি বোধ হবে না। ভাল কথা, আমিও আপনার সঙ্গে স্টেশনে যাব, সেখান থেকেই শহরে যাব।"

জ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গাপ্রসাদের চেয়ে প্রায় তিন বছরের বড়ো। কিন্তু দু'জনের মধ্যে গভীর হৃদতা ছিল। জ্ঞানপ্রকাশ এলাহাবাদের মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ থেকে বি. এ., এল.এল.বি. পাস করেছিলেন। তিনি গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে এদিক্-ওদিক্ খুব ঘুরেও বেড়িয়েছেন। জ্ঞানপ্রকাশকে দেখে গঙ্গাপ্রসাদের মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাবাকে প্রণাম করেই জ্ঞানপ্রকাশকে জড়িয়ে ধরলেন, "কি কাকা, খবর কি, খুব দেখা হয়ে গেল! বিলেতে খুব মজা মেরেছ মনে হচ্ছে! আমাদের তো ভুলেই গেছ! কি হে, মেম কাকী এনেছ না কি?"

জ্ঞানপ্রকাশ ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখতে রাখতে বললেন, "সব প্রশ্নগুলো একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করে ফেলবে না কি? আগে বাড়ি চল সেখানে নিরালায় বসে কথাবার্তা হবে। সবই বলব।

সবে কাল রাত্রে এসেছি। তোমরা বাড়ি যাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি। খেয়েদেয়ে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে বের হব। তখন মনের কথা বলা যাবে।”

নানা লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ক'রে প্রায় একটার সময় জ্ঞানপ্রকাশ ফিরলেন। জ্বালাপ্রসাদ আর গঙ্গাপ্রসাদ তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলেন। খাবার পরে দু'জনে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বের হলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউস পার হয়ে আল্‌ফ্রেড পার্কে ঢুকতে ঢুকতে জ্ঞানপ্রকাশ বললেন “হ্যাঁ গঙ্গা, এবার বল কোন্‌ দিকে যাওয়া যায়? এখানে এসেছ কতদিনের জন্যে?”

“দু'তারিখে কাছারি খুলবে, দুপুরের মধ্যে জৌনপুর পৌঁছলেই হবে। ততদিন পর্যন্ত আমি ফ্রী। এমনিতে তো ছুটিতেও জেলার বাইরে বের হতে পারিনা। কিন্তু কালেক্টার সাহেব আমার ওপর বড়ো সদয়, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। এখন তোমার প্রোগ্রাম কী?”

“আমার প্রোগ্রাম অতি সোজা। আজ সন্ধ্যের মধ্যে আমাকে একটা ভাড়াটে বাংলো ঠিক্‌ করে ফেলতেই হবে। কয়েকটি বাংলো দেখে সবে ফিরছি। কাল ভোরের মেলে অমৃতসর রওনা হচ্ছি। সেখানে কংগ্রেস-অধিবেশন হবে, তা দেখতে চাই।”

গঙ্গাপ্রসাদ একটু গম্ভীর স্বরে বললেন, “কাকুমণি, আমার কথা শোন, কংগ্রেস-টংগ্রেস থেকে দূরে থাক। এর মধ্যে কিচ্ছু নেই।”

শুনে জ্ঞানপ্রকাশ জোরে হেসে উঠলেন, “ঠিক্‌ এই কথাই তোমার কাছ থেকে শুনব আশা করেছিলাম। বাছাধন, ডেপুটি কালেক্টার কি না—মজা মার আর আরামসে সময় কাটাও! জিজ্ঞেস কর এই আমাকে, সবে যে ইউরোপ থেকে ফিরেছে। আমরা গোলাম, আমরা অসভ্য, আমরা অস্পৃশ্য! তুমি এসব অনুভব করনি কারণ ভারত থেকে বাইরে গিয়ে এসব বোঝার তোমার অবসর হয়নি! লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যবিধাতা হবার অধিকার তোমাকে স্থাণু করে রেখেছে!”

“কাকু, তুমি বলছ ঠিক্‌ই কিন্তু...কিন্তু...বল তো আমি যে

পরিবেশে রয়েছি তার জন্যে আমার অভিযোগ করা উচিত কি না। আর শুধু আমারই বা কেন, কারুরই নয়। এখানকার অবস্থা শান্ত। ধনপ্রাণ সুরক্ষিত। কাজকর্ম্ম সব ঠিক ঠিক চলছে। আর এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য! কত শক্তিশালী! দুনিয়ার পাঁচ ভাগ রয়েছে এই সাম্রাজ্যে। জার্মানীকে দলে দিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।"

"বল কি, জার্ম্মানীকে দাবিয়ে রেখেছে এই সাম্রাজ্য! কখন ভেবে দেখেছ কি জার্মানীকে হারিয়েছে কারা? মহাযুদ্ধে কত ভারতবাসী যে মারা গেছে, তার হিসেব রাখ কি? ইংরেজের হয়ে লড়েছে ভারতবাসীরা—গোরখা, শিখ, পাঠান, বেলুচী, রাজপুত, গাড়োয়ালী, তেলেঙ্গী, মারাঠা—সারা ভারতবর্ষ থেকে সৈন্য গিয়েছিল। পঞ্চাশ লক্ষ ছিল শুধু ভারতীয় ফৌজ, তবে হেরেছে জার্মানী। গঙ্গা, এখন আর এ সব বললে চলবে না। আমাদের ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মর্যাদা পেতেই হবে।"

আল্‌ফ্রেড পার্ক পেরিয়ে দু'জনে কাটরা থেকে শহরে যাবার বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছিলেন। এবার তাঁরা শহরের দিকে না গিয়ে সিভিল লাইন্সের দিকে ঘুরলেন। গঙ্গাপ্রসাদ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ কাকা, বল্‌ছ ঠিকই। আমাকেই দেখনা কেন, মনে হয় যেন এই ডেপুটি কালেক্টারিতেই জীবনটা কেটে যাবে। খুব বেশী হলে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারি। আর এখানে যে কোন ইংরেজ ছোকরা আসামাত্র আমার বস্‌ সেজে ওপর থেকে চোখ রাঙ্গায়। তা কাকা, যদি ডোমিনিয়ন স্টেটাস্‌টা হয়ে যায়, তাহলে অন্ততঃ উন্নতির কল্পনা তো করা যেতে পারবে।"

"এতক্ষণে বাছাধন এলে তুমি সোজা পথে।" জ্ঞানপ্রকাশ মুচকি হাসলেন, "তাহলে আমার সঙ্গে অমৃতসর চল না কেন?"

গঙ্গাপ্রসাদ চমকে উঠলেন, "মাথা ঠিক আছে তো চাচাজান? আমাকে অমৃতসর কংগ্রেসে যেতে বলছ? সরকারের কানে যদি পৌঁছয় কথাটা, উন্নতির যা কিছু আশা আছে, সব একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে। আজকাল সি. আই. ডি.র আতঙ্ক কি রকম, জানই তো!"

"আরে মিঞা, রাখ তোমার সি. আই. ডি-র কেচ্ছা! মনে কর আমার নাম জ্ঞানপ্রকাশ আর তোমার নাম রামপ্রকাশ, অর্থাৎ তুমি যেন আমার ছোট ভাই। তারপর অচেনা মুখের মধ্যে কে কাকে চিনছে, খোঁজ করছে? সি-আই-ডি-রা নেতাদের পিছনে লাগবে। আর ভারতের গোয়েন্দারা যে কিরকম আস্ত গাধা, তা তো তুমি ভালো ভাবেই জান। তাছাড়া পাঞ্জাবের পুলিশ আমাদের চিনবে কি করে, জানবেই বা কি করে? কাজেই চল আমার সঙ্গে, দেখবে সেখানে কি হয়। দেশের নেতাদের মুখ দেখতে পাবে, বিশেষ করে গান্ধীজিকে। কখন ও কোনো কংগ্রেস অধিবেশনে গেছ কি?"

"আজ পর্যন্ত তো যাইনি, তবে কাকা, এবারে তুমি টোপ ধরাচ্ছ জোর। ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে সত্যই চলে যাই। কিন্তু বাপ্পার কাছে গোপন করতে হবে, প্রোগ্রাম, মানে কোনো বাহানা করতে হবে, মিথ্যে বলতে হবে। তিনি কিন্তু কোনো মতেই আমাকে কংগ্রেস অধিবেশনে যেতে দেবেন না, তা জেনে রাখ।"

"এটা আর এমন কি মুশকিল। তুমি আজ পর্যন্ত প্রোগ্রামের কথা দাদাকে কিছু বলোনি তো? চট্ করে আগ্রা, মথুরা, আলিগড় কিম্বা মীরাটের যে কোন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে ফেল। ধরো আলিগড়ে তোমার কোন পুরানো বন্ধু আছেন।"

"হ্যাঁ, আলিগড়ে পণ্ডিত সোমেশ্বর দত্ত আছেন। বাবা চেনেন তাঁকে," গঙ্গাপ্রসাদ বললেন।

"না, পণ্ডিতে ফয়দা হবে না, কারণ দাদা চেনেন তাঁকে। মিথ্যে সব ফাঁস হয়ে যাবে। একটাকে ধরো দাদা যাকে চেনেন না।"

গঙ্গাপ্রসাদ খানিক ভেবে বললেন, "মীরাটে আছেন কৃষ্ণচন্দ্র মিশ্র, এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন।"

"ঠিক্। তাহলে তুমি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ছেলের 'মুড়ন' বা কানফোঁড়া উৎসবে যাচ্ছ।"

"উহুঁ, পৌষমাসে এসব শুভকাজ হয় না যে," গঙ্গাপ্রসাদ বললেন।

"বড়ো মুশকিলে ফেল্‌লে কিন্তু। আচ্ছা, তাহলে পোষ মাসে মরতে পারে তো। ধর তাঁর বাবার শ্রাদ্ধে যাচ্ছ, এতে কোন খুঁত ধরতে পারবে না নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, তিন বছর আগে তাঁর পিতাঠাকুর টেঁসেও গেছেন।"

"ব্যস্‌, ব্যস্‌! তাহলে বলে দিও তাঁর বাবার বজরিকে যাচ্ছি। ছাব্বিশে বার্ষিক, সাতাশে তিনি বের হতে দেবেন না, কারণ যাচ্ছ অনেকদিন পরে। সেজন্যে আটাশে রওনা হয়ে উনত্রিশে এখানে পৌছতে পারবে। তা এক আধ দিন দেরি পথেও তো হয়ে যেতে পারে।"

পঁচিশে ডিসেম্বর ভোরে দুজনে পৌছলেন স্টেশনে। জ্ঞানপ্রকাশ অমৃতসরের দুটো থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনলেন। গঙ্গাপ্রসাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে চাচা, থার্ড ক্লাসে যাবে না কি? কি ভীড়! তার ওপর আবার দূরের পথ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাপধন, আরাম করে শুয়ে যেতে পারার জন্যেই তো থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনেছি। ইণ্টার একেবারে ঠাসা থাকবে। সেকেণ্ডে জায়গা পাওয়া দুরূহ, কারণ নেতাদের ঠাসা ভীড় অমৃতসরের দিকেই চলছে। আর ফার্ষ্ট ক্লাসে আমার সাধ থাকলেও সাধ্যের বাইরে। যদি বা ফার্ষ্টে চলি, মাঝপথে কোথাও কোনো বদ্‌মেজাজী সাহেব বাচ্ছা উঠে আমাদের মালপত্তর টেনে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে কিংবা আমাদের মারধর করবে, তখন! ও সব আরামের সময় এখন নয়। তার চেয়ে থার্ড ক্লাসে দিব্যি মৌজসে ঘুমিয়ে যাওয়া যাবে।"

ছয়

ছিনকির অন্ত্যেষ্টির পরে ভিখু যখন বাড়ি ফিরল, তখন রাত অনেক। ছিনকির চিতা জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালাপ্রসাদ ফিরে

এসেছিলেন। কিন্তু ভিখুকে তার জ্ঞাতিগোত্রের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকতে হ'ল সেখানে। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল, মাঝে মাঝে বেশ জোরে। জ্বালাপ্রসাদ অন্যমনস্কভাবে যমুনাকে আর নাতি নাতনিদের নিয়ে ভেতরের বারান্দায় বসেছিলেন। বাড়ির পরিবেশ শোকাচ্ছন্ন। ভিখু এসেই জ্বালাপ্রসাদকে বললে, "দাদা, এখন তো সব শেষ হ'ল। তোমারা এবার রান্নাবান্না কর, ছেলেপুলেদের দিকে তো তাকাতে হবে।"

"আর তুমি?" জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি আজ উপোস করব। শোব বাইরের ঘরে।"

"বাইরের ঘরে কোথায় শোবে ভিখু, তোমাকে যে ছিনকি কাকীর ঘরে শুতে হবে। রাত্রে ঐ ঘরে প্রদীপও জ্বালতে হবে। আর ছিনকী কাকী কী কী রেখে গেছে, সে সবও দেখেশুনে নাও। তুমি যখন এলে সে তখন অজ্ঞান। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল তোমরই নাম করছিল। সে তোমাকে জিনিষপত্তর হাতে তুলে দিয়ে যেতে চেয়েছিল।"

"দাদা, কি আর জমাটমা। যা আছে সবই তো তোমারই। তুমিই রাখ নিজের কাছে। আমার তো আর আগুপিছু কেউ নেই, একমাত্র আছে গঙ্গা। গঙ্গা তোমারই ছেলে", ভিখু উত্তর দিলে।

"না ভিখু, যতদিন তুমি আছ, তোমারই তো ওসব; মনে হয় হাজার টাকার মতন নগদ আর চার-পাঁচ শ' টাকার মতন গয়না ছিল ছিনকি কাকীর কাছে। সে প্রায় বলত, ভিখুর বিয়ে হলে বউমাকে সব দিয়েথুয়ে যেতাম। মারা যাবার আগে পর্যন্ত বলছিল, 'ভিখুকে বুঝিয়ো সে যেন বে-থা করে'।"

ভিখু হাসল, "দাদা, বিয়ে এখন যমের ঘরেই হবে! বয়স পঞ্চাশ পার হ'ল, আগে করিনি—এখন করব! আর আমি বিয়ে না করেই তো বাড়িঘর পেয়ে গেছি, ছেলে পেয়ে গেছি। আমার জীবনটা তো গঙ্গার কাছেই কেটে যাবে।" তারপরে খানিক

থেমে জ্বালাপ্রসাদকে বললে, "দাদা, কিছু যদি না মনে কর তো একটা কথা বলি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ভিখু, বল বল! মনে করার আর কি আছে?"

"আমি বলি তুমি আর বৌদি গঙ্গার কাছে গিয়ে থাক না কেন? গঙ্গার বউ তো বছরে ছ'মাস তোমাদের কাছে এসে থাকে। গঙ্গাকে একা ছাড়া উচিত নয়। তোমরা গিয়ে সেখানে থাকলে গঙ্গার একটু চক্ষুলজ্জা হবে।"

গঙ্গার সম্পর্কে জ্বালাপ্রসাদ নানারকম খবর পাচ্ছিলেন। তার চরিত্রহীনতার খবর এখন স্থানীয় অফিসার মহল ছেড়ে দেশের অফিসার মহলে গিয়ে পৌঁছেছিল। জ্বালাপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফল হয়নি। যমুনা জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "ভিখু ঠিক্ই তো বলছে। এলাহাবাদে এমন কী রয়েছে যার জন্যে ছেলেকে আমাদের ছেড়ে থাকতে হবে। এখানকার বাংলোটা ভাড়া দিলেই হবে, মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা আসবে। তাছাড়া আলাদা দু'টা সংসারের বাড়তি খরচটাও কমে যাবে। বউমা আমাদের অনেকবার জৌনপুরে গিয়ে থাকবার জন্যে তো বলেছে......বড়ো বাংলো, সেখানে তার একা থাকতে ভালো লাগে না। কিন্তু আমি নিজেই সব সময় এড়িয়ে যাই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে ঠিক্ই বলছে।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখব।"

"দাদা, এতে আর ভাবনাচিন্তার কি আছে, তোমাদের জৌনপুরে গিয়েই থাকতে হবে। এতে গঙ্গার কল্যাণ আর বংশেরও কল্যাণ গঙ্গা দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। শুনছি, তার ওপর দু-তিন হাজার ধারও না কি জমেছে।"

জ্বালাপ্রসাদ চমকে উঠলেন, "কি বললে, ধার করেছে কেন ধার হ'ল?"

"গঙ্গাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিও না আমি তোমাকে সব বলেছি তাহলে আমাকে আর সে আস্ত রাখবে না। কি আর বলব

দাদা, গঙ্গাকে আমি ভারি ভয় পাই। গঙ্গা বেশ্যা পুষেছে। তার খরচখরচা সব গঙ্গার, তার ওপর নিত্যি মদ চালাচ্ছে, তার খরচা! জানই তো, এ সব এলাহীর কত খরচ! ঋণ তো হবেই।”

জ্বালাপ্রসাদ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, “জল এতদূর গড়িয়েছে!” তারপর যমুনার দিকে তাকিয়ে বললেন, “বউমা তোমাকে এসব কিছুই জানান নি?”

যমুনার চোখ সজল হ'ল, “বউমার মুখের হাসি তো মিলিয়ে গেছে কিন্তু মুখ ফুটে সে কোনোদিন কিছুই বলেনি। এখন আমি বুঝছি জৌনপুরে তার মন টিকছেনা কেন।”

জ্বালাপ্রসাদ সচকিত হয়ে বললেন, “না না, আমাদের সেখানে গিয়েই থাকতে হবে। জৌনপুরে থেকে আমি সব ঠিক্ করে দিতে পারব। কাল জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ ক'রে নেব।”

তিন-চার দিন ধরে জ্ঞানপ্রকাশ বিশেষ ব্যস্ত। কলকাত্তা কংগ্রেসের জোরদার প্রস্তুতি চলছিল। এই প্রথম সুযোগ। দেশের চেতনা একটা সক্রিয় আন্দোলনের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। সেই চেতনার একটি অংশ হলো জ্ঞানপ্রকাশ। কিছু-দিনের মধ্যেই জ্ঞানপ্রকাশ গান্ধীজির অনুগামীদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন। জ্বালাপ্রসাদ যখন জ্ঞানপ্রকাশের বাড়ি পৌছলেন, তিনি তখন শহরের কিছু গণ্যমান্য কংগ্রেসীদের সঙ্গে পরামর্শে ব্যস্ত। জ্ঞানপ্রকাশ বলছিলেন, “শিক্ষিত আর মধ্যবিত্ত মানুষদের নিয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। যতদূর জানি জমি-দাররা রাজাদের অধীনে থেকে, রাজন্যবর্গের নিরংকুশতার সহায় হয়ে অশিক্ষিত আর নিরীহ জনতার ওপর শাসন আর অত্যাচার চালিয়ে এসেছেন। এই জমিদাররা যে ব্রিটিশ শাসকদের সাহায্য করবেন তা তো সুস্পষ্ট।”

জ্ঞানপ্রকাশের কথা রাজবিহারীর ভালো লাগল না। তিনি নিজে একজন বড়ো জমিদার। তিনি গর্জে উঠলেন, “আপনি

বলছেন কি ? ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহটা হ'ল দেশী রাজ-রাজড়া আর জমিদারদের। আপনি ইতিহাসকেও যে ভুল প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন !"

জ্ঞানপ্রকাশ শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "রাজবিহারীজি, ইতিহাস তো সত্য বটেই তবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণে ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ অথবা বিপ্লব—যা ইচ্ছে বলতে পারেন—তার যে কি হাল হ'ল সে তো আপনি ভালো করেই জানেন। তাতে জনতার কোন যোগ ছিল না, তাই সে বিফল হ'ল। তারপরে ১৮৫৭ সালের সঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতির তুলনাও চলতে পারে না। যাঁরা মনে করেন ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় তাঁদের ধারণা ভুল। ইতিহাস তো মৃত। পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, জীবন-মান পাল্টাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে; সব চেয়ে বড়ো কথা হ'ল মানব-চেতনার ক্রমবিবর্তন হচ্ছে।"

জ্ঞানপ্রকাশের এই তত্ত্ব ব্যাখ্যায় জয়নাথ পাণ্ডের মন লাগছিল না। তিনি বললেন, "থাক্‌গে, এসব সিদ্ধান্ত-টিদ্ধান্তের ঝামেলা ছেড়ে দিয়ে আসল কথাটা বলুন। আপনি কি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ওকালতি, স্কুল, কলেজ ছাড়লে, কাউন্সিল ত্যাগ করলে, খেতাব ছাড়লে, স্বরাজ পাওয়া যাবে ?"

জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, "আমরা ঠিক্ মতো কাজ করে গেলে পাওয়া যেতে পারে। ভেবে দেখুন, তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ওপর মাত্র দু'লক্ষের মতন ইংরেজ শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে সওয়া দেড় লাখ ইংরেজ সৈনিক আর বাকি মাত্র পঞ্চাশ হাজার ইংরেজ ভারত সম্রাজ্যের খবরদারী করছে। এ কাজ সম্ভবপর হচ্ছে কি করে, এখন এই প্রশ্নটাই আমাদের সামনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দশ-বিশ লাখ ভারতবাসী ইংরিজি শিক্ষা পেয়ে ইংরেজ সরকারের গোলামি করছে বলে এটা সম্ভব হচ্ছে ; তারাই সারা দেশটাকে ইংরেজের গোলামখানা তৈরী করাতে ইংরেজদের দক্ষিণ হস্ত হয়েছে। এরা যদি ইংরেজদের সহযোগিতা না করে তাইলে ইংরেজদের পক্ষে

শাসন সম্ভব হতে পারে না ; শুধু তাই নয়, তাদের পক্ষে ভারতবর্ষে তিষ্ঠনই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।"

রাজবিহারী বিরক্তির সুরে বললেন, "আজ্ঞে একথার পরিষ্কার অর্থ হ'ল এই ভারতবাসী সরকারী চাকরি ছেড়ে দিলে স্বরাজ মিলে যাবে। সাড়ে সাত মণ তেলও পুড়বে না আর রাধাও নাচবে না। সরকারী চাকুরেরা মজা মারেন, মোটা মাইনে খান। তাঁরা কিছুতেই স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দেবেন না। বাকি রইল আইনজীবি, শিক্ষক আর শিক্ষার্থী। উকিল ওকালতি ছেড়ে দিক্, শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আকাট মূর্খ হোক্। জ্ঞানপ্রকাশজি, আপনি স্বয়ং ওকালতি ছাড়বার জন্যে প্রস্তুত আছেন কি না বলুন তো ?"

লালা শীতলপ্রসাদ হাসলেন, "ইনি ওকালতি শুরুই তো করেন নি, সুতরাং ছাড়বার প্রশ্নই ওঠে না। আমার ধারণা আমাদের গান্ধীজির সহযোগিতা করা উচিত। এই অসহযোগ আন্দোলনটা একবার শুরু হয়ে যাক্। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্রিটিশ সরকার একটা না একটা বোঝাপড়ায় আসবেই। জ্ঞানপ্রকাশের কথাটাই আমার ঠিক্ মনে হচ্ছে, অসহযোগ আন্দোলন সফল হ'লে দু'লক্ষ ইংরেজ পরের দিনই পাড়ি দিতে বাধ্য হবে।"

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, "অসহযোগ আন্দোলন একরকম আরম্ভ হয়েই গেছে। আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই অসহযোগিতা জোরদার হয়ে উঠছে। দেশের মুসলমানদের ভেতরও ইংরেজ-বিরোধীতার প্রবল ভাব জেগেছে। মাদ্রাজে যে বিরোধী পরিষদ্ বসেছিল, তাতে দেশের মুসলমানেরা অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিয়েছিলেন। মুসলমানেরা মূলতঃ ভারতবাসী। হালেই খবর পাওয়া গেল, হাজার হাজার মুসলমান ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করার জন্যে ভারত ছেড়ে আফগানিস্থানে থাকতে গিয়েছিলেন, আফগান সরকার তাদের না কি দেশের সীমানায় ঢুকতে দেননি। তা হলে আপনারা বুঝতেই পারছেন অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে এর চেয়ে মোক্ষম সুযোগ

আর কি আসতে পারে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য আনা সম্ভব হয়েছে। আমাদের এই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত আরও মজবুত করে তোলা উচিত।"

"আজ্ঞে, আজকের এই ঐক্য তো কেবল ইংরেজ বিরোধিতার জন্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর বেশী ঐক্য তো আর কিছুতে দেখছি না।" রাজবিহারী বললেন, "মুসলমানরা এখন আপনার সঙ্গে রয়েছে এর কারণ হ'ল তুর্কীদের ব্যাপারে ইংরেজরা কথার খেলাপ করেছে।"

রাজবিহারীর বিদ্রূপে জ্ঞানপ্রকাশ মৃদু হাসলেন, "রাজবিহারীজি, কারণগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেবেন না, কারণ ওগুলো বিগত। এখন হক্ কথাটা হ'ল এই, ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান একমত, এদের বিরোধিতার কারণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু এই বিরোধ, অসন্তোষজনিত বিদ্রোহ। আন্দোলনই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ একেবারেই মুছে ফেলবে। এখন আমাদের এক হয়ে গান্ধীজির সঙ্গে হাত মেলান উচিত।"

রাজবিহারী হাসলেন, "আমরা তো এখন চক্ষু বুজে গান্ধীজির সঙ্গেই রয়েছি। আপনি বিশ্বাস করুন, কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজির প্রস্তাবে আমার পূর্ণ আস্থা। আমার আশা, সকলেই গান্ধীজির অনুগমন করবেন।"

সবাই একবাক্যে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

ঘর খালি হ'লে জ্ঞানপ্রকাশ জ্বালাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে দাদা, আপনাকে যে বড়ো চিন্তিত দেখাচ্ছে।"

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে জ্বালাপ্রসাদ বল্‌লেন, "জ্ঞানু, গঙ্গা যে হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। ওকে কিভাবে ফেরান যায়, তার জন্যে তোমার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছি।" অতঃপর জ্বালাপ্রসাদ সমুদয় ঘটনা বলে গেলেন।

সব শুনে জ্ঞানপ্রকাশের মুখের ওপর চিন্তার বিষন্ন রেখা ফুটে

উঠলো, "দাদা, আমারও এই আশঙ্কাই ছিল। শক্তি আর সামর্থের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপও ঘোরে। এর নেশায় লোকে বিবেক আর সংযম হারিয়ে ফেলে চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। আচ্ছা, আপনি এই বিষয়ে কিছু ভেবেছেন কি ?"

"জ্ঞানু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ভিখু জৌনপুরে গিয়ে আমাদের থাকতে বলছে। ভিখুর পরামর্শ তোমার বউদিরও মনে লেগেছে। কিন্তু জানিনা কেন, জৌনপুর যেতে আমার ভালো লাগছে না। গঙ্গা সৌজন্যতাবশতঃ আমাকে কোনোদিন সেখানে গিয়ে থাকতেও বলেনি। এখন আমি বুঝতে পারছি কেন সে আমাদের থেকে দূরে দূরে থাকতে চায়।"

জ্ঞানপ্রকাশ একটু ভেবে বললেন, "দাদা, বাড়ির মালিক তো আপনিই। আপনি গঙ্গাপ্রসাদের বাবা। এ ব্যাপারে আপনার নিজেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি গঙ্গাপ্রসাদের বলা না-বলার অপেক্ষায় কেন থাকছেন।"

"আমার ওপর তার যে শ্রদ্ধার ভাব আছে সেটুকু যাতে বজায় থাকে শুধু তার জন্যে। সেখানে গিয়ে যদি তার সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়, শ্রদ্ধা-সম্মানটুকুও আমার হারাতে হবে। আর ওগুলো হারানোর অর্থ ছেলেকেই হারানো।" বড়োই করুণ সুরে বললেন জ্বালাপ্রসাদ।

"কিন্তু দাদা, আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন করে কি ভাবে তাকে বাঁচাবেন ? গঙ্গাপ্রসাদকে বাঁচাবার প্রশ্ন যে তার জীবন-মরণের প্রশ্ন। আপনারা সেখানে গেলে তার অবস্থাটা পাল্টে যাবে, খারাপ যতদূর হওয়া সম্ভব তা তো সে হয়েছেই। আমি দু-এক দিনের মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছি। আজ উণত্রিশে আগষ্ট, চৌঠা সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হবে। এখন সেই বিষয়েই আমরা পরামর্শ করছিলাম। দশই বা এগারোই সেপ্টেম্বর আমি কলকাতা থেকে সোজা জৌনপুরে যাব। আপনি এখন সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সবাইকে নিয়ে জৌনপুর রওনা হয়ে যান।"

"এলাহাবাদের এই বাংলোটার......কি হবে?"

"এই বাংলোতে কোন ভাড়াটে বসিয়ে দিন। আমার বন্ধু মনোমোহন ব্যানার্জী একটি বাংলো খুঁজছেন, সত্তর আশি টাকার মতো ভাড়া দেবেন। যদি বলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি?"

হতাশ স্বরে জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "না, ভাড়া দেবার জন্যে তো আমি বাড়ি তৈরি করিনি। তুমিই বরং এই বংলোটাতে চলে এস না কেন? তোমার বাড়ি শেষ হতে তো এখনও বছর খানেক লেগে যাবে, ততদিন তুমি আমার বাংলোতে এসে থাক। আর তোমার বাংলোটা মনোমোহন ব্যানার্জীকে দিয়ে দাও।"

জ্বালাপ্রসাদ যখন বাড়ি ফিরলেন তাঁর মনে হচ্ছিল যেন তিনি জোর করে পা টেনে টেনে চলছেন। এ সব কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কি করে হচ্ছে, কিছুই যেন তিনি বুঝতে পারছেন না। সারা বাড়ি থমথমে। তিনি এসেই গঙ্গাপ্রসাদকে একখানা পত্র লিখলেন, সপরিবারে জৌনপুরে গিয়ে থাকবার ইচ্ছে জানিয়ে।

পত্র লেখার চার দিন পরেই গঙ্গাপ্রসাদের উত্তর পেলেন। গঙ্গাপ্রসাদ পিতার প্রস্তাব সমর্থন করেছেন, অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে তাঁর বদলীর সম্ভাবনার সঙ্কেতও দিয়েছেন। গঙ্গাপ্রসাদের চিঠিখানাতে জ্বালাপ্রসাদ কোনো আগ্রহের স্বর খুঁজে পেলেন না। তবুও ঠিক এক সপ্তাহ পরে তিনি যমুনা, রুক্মিণী আর তার দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে জৌনপুর রওনা হয়ে গেলেন। ভিখু তিন দিন আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিল।

জ্বালাপ্রসাদ সপরিবারে ওখানে যাবার পর থেকে গঙ্গাপ্রসাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। এখন তাঁর অধিকাংশ সময় বাড়িতেই কাটে। বন্ধুবান্ধব এলে কখনো কখনও সুরা পান চলত। গঙ্গাপ্রসাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে জ্বালাপ্রসাদ সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর মনে হ'ল জৌনপুরে এসে তিনি ভালই করেছেন। রুক্মিণীর মুখে ফিরে এলো প্রসন্নতা। বাড়িখানা হাসিখুশীর উচ্ছাসে ভরে উঠল।

কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের মুখের ওপর অদ্ভুত একটা অস্থিরতার ছাপ ফুটে উঠল। তাঁর মাথায় বা মনে কোথাও যেন একখানা জগদ্দল পাথর চাপান রয়েছে। জ্বালাপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদের গম্ভীর ভাব দেখে অবাক হলেন কিন্তু এই বিষয়ে উচ্চবাচ্য না করাই তাঁর উচিত বলে মনে হ'ল। কারণ তিনি জানতেন এ ভাবটা অস্থায়ী, ক্রমশঃ কেটে যাবে।

সেদিন রবিবার। শনিবার সন্ধ্যেবেলাই গঙ্গাপ্রসাদ কাশীতে কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জ্বালাপ্রসাদ নাতি নবলকে পড়াচ্ছিলেন বারান্দায় বসে। নবলের বয়স প্রায় তেরো। সে পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে। পাশেই বসে নবলের ছোট বোন বিন্ধ্যা শ্লেটে অঙ্ক কষছিল।

দুপুর হ'ল, জ্বালাপ্রসাদ নাতি নাতনীকে দপ্তর গুটাতে বললেন। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, কিন্তু গুমোট ভাবটা তখনও যাই যাই করেও যাচ্ছে না। জ্বালাপ্রসাদ স্নান করবার জন্যে পাতকুয়োর দিকে এগোচ্ছিলেন। এমন সময় একটি টাঙ্গা বাংলোর দিকে আসতে দেখলেন। টাঙ্গায় বসেছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ। জ্বালাপ্রসাদ পথেই দাঁড়িয়ে পড়লেন, পরে জ্ঞানপ্রকাশের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "আরে জ্ঞানু, তুমি!"

জ্বালাপ্রসাদ জ্ঞানপ্রকাশের মালপত্তর নামাতে বলে তাঁকে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন, "তুমি তো বলছিলে সেপ্টেম্বরের দশ-এগারোর মধ্যে এসে যাবে, কিন্তু এলে পূজো কাটিয়ে।"

"আজ্ঞে, কলকাতার দুর্গাপূজো খুব প্রসিদ্ধ কিনা তাই কংগ্রেস অধিবেশনের পরে ওখানেই রয়ে গেলাম। আর এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে একটা ওলটপালট চলছে। বাংলা দেশের কংগ্রেসী নেতারা এবারকার পরাজয়ের পরে আবার কংগ্রেসীদের সঙ্গে আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। এ সব দেখবার জন্যও থেকে গেলাম। এখন সোজা আসছি কলকাতা থেকেই। পথে এক রাত্রির জন্য নেমেছিলাম কাশীতে। আজ ভোরেই সেখান

থেকে জৌনপুর রওনা হয়েছি। গত রাত্রে কাশীতে যুক্তপ্রদেশের কর্মকর্তাদের বৈঠক ছিল, তাই ওখানেও নামতে হ'ল।"

"গঙ্গাও গতকাল সন্ধ্যেবেলা কাশীতে তার যেন কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। ফিরবে কাল সকালে।"

"গঙ্গা কাশী গেছে!. তা হলে আমার চোখের ভুল হয়নি তো।" জ্ঞানপ্রকাশ ধীরে ধীরে বললেন যেন আপন মনেই।

জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন, "তুমি গঙ্গাকে দেখেছিলে বুঝি?"

"আজ্ঞে দেখেছিলাম, তবে অনেক দূর থেকে। ধুতিপাঞ্জাবি পরেছিল বলে ভালো করে চিনতে পারিনি। তায় আবার রাত্রি বেলা, আলোও কম ছিল, সেজন্যে ভাবলাম বোধ হয় আমার চোখের ভুল। যাক্ ওসব কথা। হ্যাঁ, বলুন এখন তার খবর কি?"

"আমি তো বিশেষ কিছু দেখছি না। ঠিক্ সময় বাড়ি থেকে যায় আর ঠিক্ সময়েই বাড়ি ফেরে। উচিত আদব কায়দা মতই চলছে। শুধু তাই নয়, এখন প্রত্যেকের প্রতিই তার টান রয়েছে," বলতে বলতে জ্বালাপ্রসাদের মুখের ওপর তৃপ্তির আলো ফুটে উঠল।

জ্ঞানপ্রকাশ মৃদু হাসলেন, "আমি আপনাকে বলেছিলাম না আপনার এখানে আসাতে সুফলই ফলেছে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে যে বড়ো চিন্তিত দেখছি, ব্যাপার কি।"

"রুক্মিনীর আজ সকাল থেকে পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে, গঙ্গা এখানে নেই, তার দিন মাস পুরো হয়েছে। ভিখুকে ধাই ডাকতে পাঠিয়েছি, যে কোন মূহূর্তে প্রসব হতে পারে। ব্যস, এই কথা।"

"ধাইকে ডাকতে পাঠিয়েছেন! লেডী ডাক্তার আর মিড্ওয়াইফকে ডাকতে পাঠালেন না কেন? আপনারা এখনও সেই মান্ধাতার আমলেই রয়ে গেলেন। একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুণি সিভিল হাসপাতাল থেকে লেডী ডাক্তার বা নার্সকে ডেকে আনছি," বলে জ্ঞানপ্রকাশ উঠে দাঁড়ালেন।

সামনে দেখা গেল ভিখু আর ধাই আসছে।

"ভালো কথা, একটু দাঁড়াও, ধাই এসেছে, দেখি কি বলে? আমিও ততক্ষণে স্নানটা সেরে নিই আর তুমিও জামাকাপড় ছেড়ে স্নানটান করে নাও।"

জ্বালাপ্রসাদ স্নান সেরে জ্ঞানপ্রকাশের কাছে এলেন। তক্ষুনি ভিখু ভেতর থেকে এসে বললে, "দাদা, বৌমার খোকা হয়েছে, যথাসময়ে ধাইকে নিয়ে এসেছিলাম।"

জ্বালাপ্রসাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দুটি টাকা বের করে ভিখুর হাতে দিয়ে বল্লেন, "দুটাকার খুচরো পয়সা আধলা নিসে এস। ছেলের আর মায়ের নিছনির জন্যে লুট করাও। আর শোন, রোশনচৌকি ওয়ালাদের ডেকে আনো, সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতজিকেও ডেকে নিয়ে আসবে।"

ভিখু মৃদু হাসলেন, "মুনিয়াকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিয়েছি, বাধাই সাধতে মেয়েদের ডেকে আনবার জন্যে, পথে সে পণ্ডিতজিকেও ডেকে আনবে। আমি রোশনচৌকি ওয়ালাদের ডাকতে চললাম; সেইসঙ্গে বাজার থেকে ভাঙ্গানিও নিয়ে আসব।"

গঙ্গাপ্রসাদ মাঝ রাতে ফিরলেন কাশী থেকে। তখনও বাড়িতে হৈ চৈ চলছে। জ্বালাপ্রসাদ আর জ্ঞানপ্রকাশ শোবার ব্যবস্থা করছিলেন। জ্ঞানপ্রকাশকে দেখেই গঙ্গাপ্রসাদ বলে উঠলেন, "বাঃ কাকা, আমরা কবে থেকে তোমার অপেক্ষা করছিলাম। কলকাতায় এত দিন রইলে. এলে কবে?"

"আমি তো আজই দুপুরে এসে পৌছেছি। কাল কাশীতে আটকে পড়েছিলাম। আমি তোমাকে ওখানে দেখেছিলাম তবে ভালো করে চিনতে পারিনি। বোধ হয় তুমিও খুব ব্যস্ত ছিলে সেইজন্যে আর ডাকিনি। পরে আমার মনে হ'ল আমার বোধ হয় চোখের ভুল। কিন্তু......।" জ্ঞানপ্রকাশ অর্থপূর্ণ হাসির সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালেন, "আমার চোখের ভুল কমই হয়, তুমিই ছিলে।"

গঙ্গাপ্রসাদ ঘাবড়ে গেলেন। এই ফাঁকে জ্ঞানপ্রকাশ আবার না জেরা তর্ক ফেঁদে বসেন। জ্বালাপ্রসাদ উঠতে উঠতে বললেন, "একটা বাজে, এবার আমি শুয়ে পড়ি। সারাদিন লোকের আনাগোনা লেগেছিল। বড়ো ক্লান্ত বোধ করছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, আপনি শুয়ে পড়ুন।" বলে জ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গাপ্রসাদকে বললেন, "খোকা হয়েছে বাবা, অভিনন্দন জানাই। জন্মের লগ্নক্ষণ খুব ভালো। এখন ভেতরে যাও, এই একটু আগেই গানবাজনা শেষ হ'ল। জামাকাপড় ছেড়ে শোও গিয়ে। কাশীতে যা দেখলাম তা মোটেই আমার ভালো লাগেনি, সে বিষয়ে কাল কথাবার্তা বলা যাবে।"

"না, আমার তো মনে হয় কাকা এই সময় কথাটা বলে নিলেই ভালো হয়, আমরা দুজনে এখন একা আছি। কাশীতে আমার সঙ্গে মল্লিকা ছিল। বাপ্পা আর বাড়ির সবাই যেদিন থেকে এখানে এসেছেন, আমি সেদিনই ওকে জৌনপুর থেকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে কার ঝুট-ঝামেলা কে আর ঘাড়ে নেয়। আপনিই বলুন, কিছু অন্যায় করেছি কি?"

"ভালোই করেছ, তবে এতে তোমার খরচা যে আরো বেড়ে গেল। কাশীতে মল্লিকার খরচা, তোমার যাওয়াআসার খরচা। আমার অনুমান তোমার আর্থিক অবস্থা তেমন সুবিধার নয়।"

"হ্যাঁ, আমার আর্থিক অবস্থা সত্যিই ভালো নয়। তবে এখন এলাহাবাদের সংসারের খরচাটা কমে গেছে। তবে জান কাকা, জৌনপুরে লোকেরা কানাঘুষো শুরু করেছিল, সেটা বন্ধ করার দরকার ছিল।"

জ্ঞানপ্রকাশ খানিক চুপ করে ভাবলেন। পরে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করলেন, "গঙ্গা, তুমি এপথ ছেড়ে দিতে পার না কী? আমি বলছি এ পথ সর্বনাশের পথ।"

গঙ্গাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন, "হ্যাঁ কাকা, আমিও তা জানি এপথ সর্বনাশেরই পথ। কখন-সখন মনে মনে ভাবিও, কিন্তু আবার

পরমুহূর্তেই মনে হয় জীবনের পথটাই তো সর্বনাশের সোজা সড়ক। সব শেষে আসে মৃত্যু! এ অবস্থার পরে কি হবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করাই বৃথা। আজ যা আছে, সেই সত্য, কাল কি হবে, তা কেউ জানে না, তাই এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তায় কোনো লাভ নেই।"

একটু ক্লান্ত স্বরে জ্ঞানপ্রকাশ উত্তর দিলেন, "বাইরে থেকে একভাবে বিচার করে দেখলে অন্যায় মনে হয় না ঠিক্ই বাপধন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ আমরা চিন্তা ও মননশক্তি লাভ করেছি। গঙ্গাপ্রসাদ, তুমি কী নিজের এই বুদ্ধিবৃত্তিকে খোয়াতে পারবে? তোমার পরিবার বাড়ছে, অন্ততঃ তাদের জন্যে তো তোমার ভাবা দরকার। তোমার খরচা অনেক আমি জানি; আর তুমি যে বেইমানী করতে পার না, ঘুষ নিতে পার না—এও জানি। যদি তোমার ধারদেনা হয়ে থাকে তাতেও আমি অবাক্ হব না।"

"আলিরজা আসার পর থেকে কমেছে। তা না হ'লে এদ্দিনে হয়েই যেত।"

"কিন্তু আলিরজা আর এখানে ক'দিন। তোমরা দুজনেই ক'দিন বা একত্রে থাকবে? না গঙ্গা, তোমাকে বদঅভ্যাসগুলো শোধরাতেই হবে, এ সব ছাড়তেই হবে। তোমার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তুমি সম্ভ্রান্তবংশীয়, সমাজে তোমার মান-মর্যাদাও রয়েছে।"

গঙ্গাপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "স্ত্রী, সন্তান, বংশ, সমাজ, মান-মর্যাদার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে আমরা জীবনকে কতই-না কুৎসিত আর নীরস করে ফেলেছি। কাকা, এই বন্ধন ছিন্ন না করলে মানুষ কিছুই করতে পারে না। তোমার এসব জেনে রাখা দরকার, কারণ তোমার কর্মক্ষেত্র হ'ল রাজনীতি। জেল খাটা, অস্পৃশ্যতা দূর করা, স্ত্রী-পুত্রের মোহে ভীরু না হওয়া, এসব স্বীকার করেই তবে আজকের সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পার। তুমি যে খুব মান-সম্মান, বংশ ও সমাজের দোহাই দিচ্ছ।

তুমিই তো কলকাতায় বিরোধী প্রস্তাব পাস করিয়ে এসেছ। যখন তোমার মুখে এ সব কথা শুনি তখন আমার খুব অদ্ভুত ঠেকে।”

জ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গাপ্রসাদের তর্ক শুনে মৃদু হাসলেন, “বাবা, খুব যে বোঝদার হয়েছ দেখছি। যা বলছ তা বেঠিক নয় তবে তুমি শুধু অর্ধ সত্যের আশ্রয় নিচ্ছ। যদি বল বাস্তব জীবন আর তার প্রগতি প্রচলিত মানের বিরোধী, সেটা আমি স্বীকার করি। তবে এই বিরোধের রূপ হ’ল দুটো—একটা বিশ্বাসের, অপরটা অবিশ্বাসের। তোমার পথ অবিশ্বাসের পথ আর আমার পথ হ’ল বিশ্বাসের পথ।”

“তুমি এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের অদ্ভুত গোলঘণ্ট করে বসেছ। মেহেরবানী করে জটটা ছাড়িয়ে ফেল।”

“হ্যাঁ বাপধন, একটু মন দিয়ে শুনবে। এই যে পরিবার, মান-মর্যাদা ইত্যাদি তার ওপরও একটা বস্তু আছে—তা হ’ল ত্যাগ আর আত্মোৎস্বর্গের মনোভাব। যাঁরা এই ভাবে চিন্তা করেন, তাঁদের বিশ্বাসের পথ। তাঁদের যেমন ত্যাগ, উৎসর্গ আর সত্যের ওপর অটুট আস্থা তেমনি জীবনের প্রচলিত মানের প্রতিও অবিচল আস্থা। আবার এমন লোকও আছেন যাঁদের এগুলির ওপর আস্থা তো দূরের কথা, জীবনের মান-মর্যাদার ওপরেও তাঁদের কোনো বিশ্বাস নেই; আমি বলব তাঁদের পথ অবিশ্বাসের। তাহলে বাবা, তুমি যে পথ ধরেছ সে হ’ল অবিশ্বাসের পথ আর আমাদের পথ হ’ল বিশ্বাসের। আচ্ছা, অনেক রাত হয়েছে, তুমিও ক্লান্ত হয়ে এসেছ। তোমাকে তো বাড়ির ভেতরেও একবার যেতে হবে। তারপর জামাকাপর ছেড়ে শুয়ে পড়। আমিও শুতে চললাম। তুমি আমার কথাগুলো ভালো করে ভেবে দেখো। কাল আবার আলোচনা হবে।” নিজের জটিল সমস্যায় চিন্তিত ও হতাশ গঙ্গাপ্রসাদকে বসিয়ে রেখে জ্ঞানপ্রকাশ শুতে চলে গেলেন।

সাত

আলিরজা হাঁফাচ্ছিলেন। তার মুখ দিয়ে স্পষ্ট কথা বের হচ্ছিল না। তিনি এসেই চেয়ারে বসে পড়ে জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে লাগলেন আর আপন মনেই বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, "হে খোদা, মনে হচ্ছে যেন তোমার মহাক্রোধ স্থায়ী হতে চলেছে। জৌনপুরে যে এত বড়ো আন্দোলন হতে পারে তা তো কোনোদিনও ভাবিনি। দুনিয়া কোথায় চলেছে!"

"বলুন নরকের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি তো কুশলেই আছেন। আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? কিছু বলবেন নাকি?" গঙ্গাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন মৃদু হেসে।

"ওহে বাপু, উদ্বিগ্ন আর কি, কিন্তু নিজের চোখকেই যে বিশ্বাস হচ্ছে না। অটালা মসজিদ থেকে যখন মিছিল বের হ'ল, তখন শুধু পঞ্চাশ ষাট জনের মতো জনতা ছিল। মশাই, খোদা জানে এত ভীড় কোথা থেকে এসে জমা হলো!"

গঙ্গাপ্রসাদ হাসলেন, "পঞ্চাশ-ষাট জনের জটলা নয়, জমেছিল দশ-বার হাজার; খবর পেয়েছি। গ্রাম থেকে লোক এসেছিল গোমতি স্নানে। আজ আবার মাঘী-পূর্ণিমার স্নান। সেই মিছিলে এই মেলার ভীড় জমলো, এতে অবাক হবার আমি তো এমন কিছু দেখছি না।"

"ও মশাই, আরো শুনুন, কেচ্ছা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। ফরহতুল্লা ঘোষণা করলেন, মহাত্মা গান্ধী আর কংগ্রেসের আদেশে তিনি আজ থেকে ওকালতি ছাড়লেন। শুধু তাই নয়, দারোগা বিক্রমসিংহও চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন। মিছিল শেষ হবার পরে খুব জাঁকিয়ে মিটিং বসেছে, সেখানেই এইমাত্র ঘোষণাগুলি প্রচার করা হ'ল। আমি তো সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ছুট দিলুম, কারণ আমারও মনে হ'ল চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দিই। সেখানে দারুণ উৎসাহ, প্রচণ্ড ভাবাবেগ!"

"ফরহতুল্লা ওকালতি ছেড়ে দিয়েছেন—কি বলছেন আপনি? ওকালতিতে তাঁর তো খুবই পসার ছিল। দারোগা বিক্রম সিংহের কথা না হয় বোঝা সহজ, অত্যন্ত উদ্ধত আর কঠোরভাষী; তারপক্ষে সরকারী চাকরিতে বহাল থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ফরহতুল্লার ওকালতি ছাড়ার কী খেয়াল চাপল। আমার মনে হয় তাঁর আর্থিক অবস্থাও এমন কিছু সচ্ছল নয়।"

"আরে ভালো তো নয়ই, অবস্থা দারুণ খারাপ। এর বাপ ছিল তাঁতি কিন্তু খরচে ছিল খুব। সে যা রোজগার করেছিল সব এর লেখাপড়ার পিছনে ঢাললে। মনে হয় সে দেনা রেখে মরেছে। আর ফরহতুল্লা......এর ওকালতি ভালোই তো চলে, কিন্তু বেশীর ভাগ মামলা লড়তে সে পয়সাকড়ি নেয় না। যে যা দেয় পকেটে পোরে, টাকা চাইতেই জানে না। তার ওপর আবার নেতাগিরির ঝোঁকে খরচাও অনেক বেড়ে গেছে। সমিউল্লার চাকরি যেদিন থেকে গেছে সেদিন থেকেই সে বখাটে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি এলাহাবাদে মিওর সেণ্ট্রাল কলেজে পড়ছে। হজরতের সন্তান তিনটি আর নিকে দুটি। আর এই সময়েই তিনি ওকালতি ছেড়ে উপোস থাকতে কোমর বাঁধলেন। বোকামির একটা সীমা আছে তো!"

"মিটিং-এ আর কী কী হ'ল?" গঙ্গাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন।

"আরে মিটিং কি, দস্তুরমতো একটা হাঙ্গামা। ব্যাপারটা হ'ল এই, আমি পুত্তুলালের তাড়িখানা দেখে বাড়ির পথে রওনা হলাম। খানিক দূর গিয়ে টাঙ্গা থামল। সামনে থেকে একটা বিরাট মিছিল আসছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার মতো রাস্তায় অপেক্ষা করার পর মিছিল শেষ হ'ল। সেখান থেকে বাড়ি গেলাম। বিশ্রাম করে, কাপড়জামা ছেড়ে আপনার বাসার দিকে পা বাড়ালাম। অটালা মসজিদের কাছে পৌঁছে দেখি একটা মিটিং চলছে। ভাবলাম দেখে যাই কী হচ্ছে। টাঙ্গা থেকে নেমে আমিও ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দেখি কি না ফরহতুল্লা মিটিং এ সভাপতির

করছে। তার আশেপাশে দশ-বারো জন খদ্দরধারী, কিছু জমায়েতে উল্লার লোক আর কিছু কংগ্রেসী। ফরহতুল্লাও খদ্দর পরেছিল আর বক্তৃতা দিচ্ছিল। প্রথমতঃ কলকাতা কংগ্রেসের বিবরণ শুনিয়ে সে বললে, 'গান্ধীজি প্রতিজ্ঞা করেছেন বছর ঘোরার আগেই তিনি দেশে স্বরাজ আনবেন।' আরো বললেন, 'বিরোধী লীগ যোগ দিয়েছ কংগ্রেসে, মৌলানা মোহম্মদ আলি আর মৌলানা সৌকত আলি কংগ্রেসে নেতা হয়েছেন।' আবার বললেন, মহাত্মা গান্ধীর হুকুমে জনসাধারণের খিদ্‌মতের জন্যে আমি ওকালতি ছাড়ছি।' জনতা তাঁর খুব বাহবা দিলে, খুব হাততালি পড়ল, আবার কেউ কেউ তাঁর গলায় ফুলের মালাও পরিয়ে দিলে। তারপরে বিক্রম সিংহ খাদির পোষাক পরে অসহযোগ সম্পর্কে লম্বা বক্তৃতা দিতে দিতে বললেন, 'সরকারী চাকরি থেকে ইস্তাফা দিচ্ছি।' এ কথা শুনে কিন্তু মশাই আমি ঘাবড়ে গেলাম, মনে বইছিল ভাবের ঝড়, ভয় হ'ল আমিও না একটা বক্তৃতা দিয়ে বসি! ভয়ে আমি সেখান থেকে সোজা কেটে পড়লুম।"

গঙ্গাপ্রসাদ হাসলেন, "আপনি খুব হুঁসিয়ারীর কাজ করেছেন, আলিরজা সাহেব, একেবারে রণক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন!"

বাড়িতে সেদিন গঙ্গাপ্রসাদ একা। জ্বালাপ্রসাদ সপরিবারে এলাহাবাদে পনের দিনের জন্যে মাঘ মেলা স্নানে গিয়েছিলেন।

আন্দোলন চলছিল প্রচণ্ড বেগে—এক বিচিত্র গতিতে। ধর্মঘট হচ্ছিল, চরখা ঘুরছিল, খাদি আর স্বদেশী মালের প্রচার চলছিল, বিদেশী জিনিষকে বয়কট করা হচ্ছিল। মিছিল বের হচ্ছিল, প্রকাশ্যে সরকারের নিন্দে বাদ চলছিল, ইংরেজদের গাল দেওয়া হচ্ছিল। জৌনপুরের এই আন্দোলন দমনের ভার কালেক্টার গঙ্গাপ্রসাদের ওপর ন্যস্ত করলেন! গঙ্গাপ্রসাদ বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে নির্মমভাবে আপন দায়িত্ব পালন করছিলেন। জৌনপুরের জেল ভরতি হয়ে গেল। জনসাধারণের কাছ থেকে মোটা জরিমানা আদায় করা হচ্ছিল। জৌনপুরের অধিকাংশ কর্মকর্তাকে জেলে পোরা হ'ল।

আট

নবল গাইছিল 'বলছে করাচির বন্দী, আমরা চলেছি বছর দুই এর মোয়াদী।'

তার ওপর বিদ্যা কেটে কেটে বললে, "বললেম মোহাম্মদ আলির মা-ও", এর পরের কলিটি সে ভুলে গিয়েছিল। নবল কলিটি পুরো করল, "জান বেটা খেলাফতে দিয়ে দাও।"

জ্ঞানপ্রকাশ কংগ্রেস কমিটিতে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে নবলকে আল্‌তো চড় কষালেন, "বাপ জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, বেটা গাইছেন বিপ্লবের গান!" বিদ্যা কোথা থেকে ছুটে এসে জ্ঞানপ্রকাশের পা জড়িয়ে ধরলে, "দাদু, সেই পুতুলটা আনতে ভুলেবেন না যেন। পাড়ার পরশু মালতীর বিয়ে, আমিও পুতুলের বিয়ে দেব।"

এখন সময় জ্বালাপ্রসাদ পূজোপাঠ সেরে উঠলেন। জ্ঞানপ্রকাশকে দেখে বললেন, "আজ যে এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ, এখন তো সবে দশটা। ব্যাপার কী?"

"দাদা, ব্যাপার আর কি। শুনছি সরকার নাকি সংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবক দলকে আইন বিরোধী বলে ঘোষণা করবে। এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। তাছাড়া কংগ্রেস মুভমেন্টকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, সে বিষয়েও ভাবতে হবে।"

জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন চলবে তোমাদের এই আন্দোলন?"

"এই তো সবে শুরু। এই ধরুন দাদা, এটা হ'ল আন্দোলনের প্রথম পর্যায়। সরকারী জেলগুলো ভরতি। সরকার যতই দমনের চেষ্টা করছে, আন্দোলন ততই বেড়ে চলেছে।"

জ্বালাপ্রসাদ স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ, আন্দোলন তো তোমাদের চলছে, তবে এই আন্দোলনটা মুসলমানদের কাছ থেকে খুব জোর

গেল। গান্ধীজির দূরদর্শিতা মানতেই হ'ল। আলি ভাইদের গ্রেফ্‌তারের ফলে দেশে যেন আগুন ধরে গেল।”

“হ্যাঁ, জনগণ দ্রুত জেগে উঠছে,” জ্ঞানপ্রকাশ উত্তর দিলেন।

এর মধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ চুপচাপ একদিকে বসেছিলেন। তিনি আর থাকতে পারলেন না, “কাকা, জনতা জাগছেও না আর ঘুমোচ্ছেও না। এই আন্দোলনের মধ্যে রয়েছেন মুষ্টিমেয় মাত্র অসন্তুষ্ট লোক। আমি তো দেখছি এই আন্দোলন খতম হয়ে এলো। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলের শেষ দশা। জেলে খাটা ভলেন্টিয়ার নিয়োগও বন্ধ ধরুন। আর এই যে দেখছেন জ্বলন্ত আগুন এ যাবে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষেই। এই আগুন জনতাকে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপে প্রবৃত্ত করবে। আর জনতা হিংসাত্মক কাজ শুরু করলেই আন্দোলনকে পুরোপুরি থেঁতলে দেওয়া হবে।”

গঙ্গাপ্রসাদ বেড়িয়ে ফিরেছিলেন। তাঁর বদলী হয়েছিল জৌনপুর থেকে কানপুরে। অস্থায়ী জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কোন ভারতীয়কে কানপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া অস্থায়ী হ'লেও খুব বড়ো কথা। এর মুখ্য কারণ জৌনপুরের আন্দোলন দমন করায় গঙ্গাপ্রসাদের চরম সাফল্য। কানপুরে কংগ্রেস যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাচ্ছিল, সেজন্যে কানপুরে আন্দোলনের মূল উৎপাদন করা গঙ্গাপ্রসাদকে দিয়েই সম্ভবপর মনে করা হয়েছিল। গঙ্গাপ্রসাদ কানপুরে চার্জ নিতে যাচ্ছিলেন। যতদিন কানপুরে যথাযথ ব্যবস্থা না হয় ততদিনের জন্যে গঙ্গাপ্রসাদের পরিবার এলাহাবাদে ছিল।

জ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন, “কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এলে কি? কি কথা হ'ল?”

গঙ্গাপ্রসাদ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, “কমিশনারের সঙ্গে কথা! দমন, দমন, দমন! ব্রিটিশ সরকার এখানে যে কোন উপায়ে কায়েম থাকবেই, সেজন্যে আন্দোলন দমন করতেই হবে! আজ সন্ধ্যের গাড়িতে আমাকে যেতে হবে, কাল চার্য নেব কানপুরে।

আন্দোলনটা কানপুরে লক্ষ লক্ষ টাকার সাহায্য পাচ্ছে, সেটা বন্ধ করার জন্যে আমাকে সাহায্য করতে হবে।"

জ্ঞানপ্রকাশ চিন্তিত স্বরে বললেন, "গঙ্গা, আমার একটি কথা রাখবে?"

"কাকা, রাজনীতির মামলা যতটা আমার সরকারী আমল হ'ল ততটা, সে ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে জোর করে কিছু করাবার চেষ্টা করবেন না।"

জ্ঞানপ্রকাশ আর একটি কথাও বললেন না। তিনি চুপচাপ বসে বসে চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট হ'ল যে তিনি গঙ্গাপ্রসাদের কাছে এরকম উত্তর প্রত্যাশা করেননি, তাঁর চোখে নেমে এলো একটা গভীর উদাস চাহনি।

গঙ্গাপ্রসাদ রওনা হবার জন্যে তৈরী হতে ভেতরে চলে গেলেন। জ্বালাপ্রসাদও ছেলের পিছু পিছু চলে গেলেন। ঘরের কোনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে নবল সব কিছু দেখছিল, সে জ্ঞানপ্রকাশের কাছে এলো, "দাদু বড়ো হয়ে আমিও জেলে যাবো। আপনি বিষণ্ণ হবেন না। 'জয় ভারত মাতার জয়'।"

জ্ঞানপ্রকাশ মৃদু হাসলেন, "না বাবা, আমি বিষণ্ণ হইনি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার আর জেলে যাবার দরকারই হবে না। তোমরাই তো ভাবী ভারতের স্বাধীনতার সুখ ভোগ করবে। আচ্ছা যাও, এখন তোমার স্কুলে যাবার সময় হ'ল।"

নবল আর বিদ্যা খুনসুড়ি করতে করতে ভেতরে চলে গেল। জ্ঞানপ্রকাশ চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলেন, তিনি যেন কারো প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। এমন সময় গাড়িবারান্দায় একটি টাঙ্গা এসে দাঁড়াল। পণ্ডিত জয়নাথ পাণ্ডের সঙ্গে একটি যুবকও নামল টাঙ্গা থেকে। জ্ঞানপ্রকাশ বারান্দায় বেরিয়ে এসে স্বাগত জানালেন, "আসুন পাণ্ডেজি, বড্ড দেরি করে ফেললেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এঁকে খুঁজে পেতে দেরি হয়ে গেল। ইনিই

হলেন শ্রীগেঁদালালজি, এঁর কথাই আমি আপনাকে বলেছিলাম। এবছর এম. এ. পাশ করেছেন। চামড়ার কারখানা খুলতে চান।”

গেঁদালাল জ্ঞানপ্রকাশকে ঝুঁকে নমস্কার করলেন। প্রতি নমস্কার করে জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, “আপনারা ঘরের ভেতর আসুন।”

গেঁদালাল ধুতি কামিজ আর বুক খোলা কোট পরেছিলেন। মানানসই লম্বা, সুদেহী যুবক, গোল মুখ ব্রনতে ভরা আর ময়লা রং। মাথায় পাগড়ি। বয়স প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ। একটু ইতস্তত করে তিনি ড্রইংরুমে ঢুকলেন। জয়নাথ আর জ্ঞানপ্রকাশ বসলেন, কিন্তু গেঁদালাল দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন বসতে সাহস হচ্ছিল না। জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, “বসুন গেঁদালালজি, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?”

“আজ্ঞে, ঠিক আছে। দাঁড়াতে আমার কোনই কষ্ট হচ্ছেনা। পণ্ডিতজি আমাকে টাঙ্গাতে বসিয়ে আনলেন, নইলে আমি হেঁটেই যাওয়া, আসা করে থাকি।”

জ্ঞানপ্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে গেঁদালালের হাত ধরে বললেন, “আরে বসুন-বসুন। আপনাকে আর বাছবিচার করতে হবে না। আমরা অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ মিটিয়ে ফেলেছি। মহাত্মা গান্ধী এই কাজেরই সংকল্প নিয়েছেন।”

জয়নাথ পাণ্ডে বললেন, “স্বামী দয়ানন্দ এটা শুরু করেছিলেন, জ্ঞানপ্রকাশ, তাই না? তবে এখন একাজটা এগোচ্ছে ঠিক্। গেঁদালাল, বসো-বসো: আমরা সবাই সমান।”

গেঁদালাল কুণ্ঠিত হয়ে চেয়ারে বসলেন। তারপর একটু ভেবে বললেন, “বলুন, কি বলবেন আমাকে।”

জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলেন, “শুনলাম আপনি নাকি বিলিতি ধরণে চামড়ার কারখানা খুলছেন?”

“আজ্ঞে, খুলছি না, তবে হ্যাঁ, খোলবার চেষ্টা করছি। তবে কি জানেন টাকাকড়ির অভাব। বছরখানেক আগে সরকারকেও

লিখেছি। এধার ওধার থেকে ধার চাইলাম। মহাজনরা মোটা সুদ চাইছে, তার ওপর নাফার আধা।”

জয়নাথ পাণ্ডে বললেন, “আর শর্ত এই, কারখানা ভালোভাবে চলতে শুরু করা মাত্র মহাজন মালিক সেজে বসবে আর গেঁদালালজিকে গলা ধাক্কা দিয়ে কারখানা থেকে বের করে দেবে কিংবা চাকর খাটাবে। কি গেঁদালাল ঠিক্ কি না? তাই আমি এঁকে বলছি কারখানা খোলার খেয়াল ছেড়ে দিন।”

“হ্যাঁ পণ্ডিতজি, খেয়াল না হয় ছাড়লাম। তবে কি জানেন কখন-সখন মনে বড়ো কষ্ট হয়। বিলিতি চামড়ার চেয়ে ভালো চামড়া আমরা তৈরি করতে পারি, কিন্তু সুযোগ পাই না। চারদিকে ঘোরতর অন্যায় চলছে।”

এবার জ্ঞানপ্রকাশ প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা গেঁদালালজি, এই আন্দোলনের ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?”

“আজ্ঞে, এই আন্দোলনের কথা বলছেন! এ বিষয়ে আমার আর কী মতামত থাকতে পারে? এসব তো আপনাদের ব্যাপার। আমাদের মতো অস্পৃশ্যরা এ আলোচনার অযোগ্য। আমরা তো জন্ম-জন্ম গোলামি করব আপনাদেরই।”

গেঁদালালের স্বরে জ্ঞানপ্রকাশ স্পষ্টতই তিক্ততা অনুভব ক'রে বললেন, “না গেঁদালালজি, আপনি নিজেকে অস্পৃশ্য বলছেন কেন। উঁচু বর্ণের আমরা মানুষের গলা টিপে ধরেছি, আপনাদের ওপর অজস্র অত্যাচার চালিয়েছি। হাজার বছরের গোলামী তার ফলেই আমরা ভোগ করলাম। আজ তো আমাদের শিশুরা পর্যন্ত অপমানিত আর অস্পৃশ্য।”

গেঁদালাল জ্ঞানপ্রকাশের কথাটা যেন বুঝতে পারলেন না; বুঝতেও চাইলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, “আজ্ঞে, আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন?”

“গেঁদালালজি, দেশে এত বড়ো একটা আন্দোলন চলছে, সে

আপনি অবশ্যই জানেন বোধহয়। এ আন্দোলনে আপনি যোগ দিচ্ছেন না কেন?"

"আন্দোলনটা কিসের আর যোগাযোগটাই বা কি রকম?" গেঁদালাল প্রশ্ন করলেন, "কিছু যে একটা হচ্ছে তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এ 'কিছু'টা যে কী বস্তু তা আমাদের কোনোদিন বোঝান হয়নি, আর আমরাও বুঝিনি কোনোদিন। বোধহয় আমরা বুঝতেই পারব না, বুঝবই বা কী করে? আমরা যে অশিক্ষিত। আমার ধারণা আমাদের লেখাপড়া শিখে হবেই বা কি? আমি যতটা লেখাপড়া শিখেছি তার মতন কিন্তু চাকরি তো পাচ্ছি না কোথাও। আমাকে স্পর্শ করতেই সমাজ যখন রাজী নয়, তখন অফিসে এক সঙ্গে বসতেই বা দেবে কি করে। ভাগ্যিস স্কুলটা ছিল মিশনারীদের, তাই কারও কোনো ট্যাঁ-ফূ চলল না, নইলে আমাকে তো পড়তেই দিত না।"

এমন সময় গঙ্গাপ্রসাদ ঘরে ঢুকলেন। তিনি কোট প্যান্ট পরেছিলেন আর টাইও ছিল গলায়। গেঁদালাল থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন আর ঝুঁকে গঙ্গাপ্রসাদকে সেলাম করলেন। গঙ্গাপ্রসাদ মাথা নেড়ে অভিবাদনের উত্তর দিয়ে বললেন, "বসো, দাঁড়াবার দরকার নেই।"

গেঁদালাল আবার চুপচাপ জড়সড় হয়ে বসে পড়লেন। এবার জ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গাপ্রসাদকে বললেন, "ইনি হচ্ছেন শ্রীগেঁদালাল, এম. এ. পাস করেছেন। চামড়ার কারখানা খুলতে চান—কারণ জাতিতে ইনি চর্মকার।"

সহসা গঙ্গাপ্রসাদ চমকে উঠলেন, "চামার! তুমি ঘরে ঢুকলে কী বলে? বের হও এখান থেকে, বের হও।"

জ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গাপ্রসাদের এরকম আচরণ কল্পনাও করেন নি। তিনি গঙ্গাপ্রসাদের হাত ধরে বললেন, "গঙ্গা, একী বকছ? আমি এঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য এঁকে ডেকে এনেছি। আমাদের দেশের অস্পৃশ্যদের এই আন্দোলনে কোন যোগ নেই আর ভারতবর্ষে

এঁদের সংখ্যাই হল ছ'কোটি। আমরা এঁদের সহযোগিতা অবশ্যই চাই।"

জ্ঞানপ্রকাশের কথার মাঝখানেই গেঁদালাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ্ঞে, এখন সহযোগিতা চাইছেন। পরে আমাদের খতম করে দেবেন। যেখানে আমাদের বসবারই অধিকার নেই, সেখানে কথাবার্তা কি আর হবে? আন্দোলন করুন, স্বরাজ আনুন, কিন্তু আমাদের বাঁচতে দিন। আপনাদের গোলামি করবার জন্যেই তো আমাদের জন্ম!" উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই গেঁদালাল ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

গেঁদালাল চলে যাবার পরে জ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গাপ্রসাদকে বললেন, "বাপধন, আমি ভেবেছিলুম তুমি নবীনযুগের শিক্ষিত, উদার হৃদয়— তুমি এসব মান না। কিন্তু এখন দেখছি আমি ভুল বুঝেছি। তবে এই ছ'কোটি অস্পৃশ্যদের আমরা হারাতে চাই না।"

গেঁদালাল চলে যাবার পরমুহূর্তেই গঙ্গাপ্রসাদ অনুভব করলেন, কাজটা তাঁর ঠিক হয়নি। কিন্তু এখন স্বকর্মের ঔচিত্য স্থাপনই যেন তাঁর প্রধান কর্তব্য। একটু ভেবে বললেন, "আজ্ঞে, এই পাঁচ ছ'কোটি অস্পৃশ্য আর প্রায় সাত-আট কোটি মুসলমান, মোট তেরো-চোদ্দ কোটি মানুষ। তাহলে কাকা, এই তেরো-চোদ্দ কোটি লোকের সমস্যার সমাধান করার পরে আপনারা স্বরাজের কথাটা ভাববেন। আমি স্বরাজও চাই না আর এদের সমস্যার সমাধানও আমাকে করতে হবে না। সন্ধ্যের গাড়িতে আমি আজ কানপুর যাচ্ছি।"

জয়নাথ পাণ্ডেও উঠে দাঁড়ালেন। তিনি জ্ঞানপ্রকাশকে বললেন, "আপনি গেঁদালালের জন্যে চিন্তা করবেন না, সে আমার লোক।" গঙ্গাপ্রসাদকে বললেন, "গঙ্গাপ্রসাদবাবু, মুসলমানদের সমস্যার সমাধান তো আমরা ক'রেই ফেলেছি, অস্পৃশ্যতার সমস্যাটা এখন আমাদের সামনে যে ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে, তার সমাধানের কঠিন সংকল্প মহাত্মা গান্ধী নিজের কাঁধে নিয়েছেন। এইমাত্র

গেঁদালাল এখান থেকে চলে গেল বলে আপনি ভাববেন না অস্পৃশ্যরা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। সে যেতেই পারে না, কারণ সে আমাদেরই লোক, আমাদেরই সাহায্য করবে।”

গঙ্গাপ্রসাদের ওপর জয়নাথের কথার কোনো প্রতিক্রিয়া হ'ল কিনা বলা কঠিন। জয়নাথ যাবার পরে গঙ্গাপ্রসাদ জ্ঞানপ্রকাশকে বললেন, “কাকা, আপনাদের এই আন্দোলন সফল হতে পারে না সে আমি জোর করে বলতে পারি। স্বরাজ পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে আমাদের দেশের হাজার বছর লেগে যাবে। তবে আপনাকে স্বীকার করিতেই হবে ইংরেজ ও ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের নবীন চেতনা লাভ করেছি। তাই প্রথমে এই শিক্ষাটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে, তারপরে আমরা স্বাধীনতা সম্পর্কে চিন্তা করতে সক্ষম হব। আর এই আন্দোলনের গতি দেখে বোঝা যাচ্ছে সুচিন্তিত পরিকল্পনা আর সুসংবদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়াই এটা আরম্ভ ক'রে দেওয়া হয়েছে, ফলে বিফল হতে বাধ্য।”

জ্ঞানপ্রকাশ গঙ্গাপ্রসাদের কথার কোনো উত্তর দিলেন না। বোধহয় বিবাদ করার মুডে ছিলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, “তাহলে আজ সন্ধ্যেয় তোমার যাওয়া স্থির। কিন্তু গঙ্গা, একটু চেষ্টা করো যাতে এই আন্দোলনের ওপর তোমার মনেও সহানুভূতি জাগে।”

গঙ্গাপ্রসাদ কানপুরে পৌছে পরের দিনই চার্জ নিলেন। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল। গঙ্গাপ্রসাদ নতুন এক সেট্ গরম সুটের প্রয়োজন বোধ করলেন। কানপুরে আসবার পর তার থেকে তাঁর সামাজিক সম্পর্কগুলিও বেড়ে গিয়েছিল। কানপুরে অনেকগুলি মিল খোলার দরুন অনেক ইংরেজ সেখানে বসবাস করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে হ'ত। তাঁর বাংলোটি ছিল সিভিল লাইন্সে। নবলকে তিনি কনভেন্টে ভরতি করে দিয়েছিলেন। সেদিন কাছারির কাজ শেষ করে তিনি সোজা শহরের দিকে গেলেন কাপড় কিনতে।

বাজার সেরে গঙ্গাপ্রসাদ বাড়ির পথে যখন রওনা হলেন, বাজারের ভীড় যেন পাতলা হয়ে এসেছিল। বাড়ি পৌঁছেই খবর পেলেন সকাল সাতটার সময় কালেক্টার সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাংলোতে গিয়ে দেখা করতে হবে—কিছু জরুরী পরামর্শ আছে।

গঙ্গাপ্রসাদ কালেক্টারের কাছে যখন পৌঁছলেন, বারান্দায় বসে সাহেব তখন চা পান করছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের জন্যে পেয়ালা ঘুঁটতে ঘুঁটতে সাহেব বললেন, "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, খবর বড়ো গুরুতর। কাল বোম্বাইয়ে যুবরাজ আগমন করলে ভীড় হটাতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল।"

গঙ্গাপ্রসাদ চমকে উঠলেন, "ভীড়ের ওপর গুলি চালাতে হ'ল। এটা তো খুবই খারাপ হ'ল। যুবরাজ কি মনে করলেন?"

কালেক্টার সাহেব বললেন, "যুবরাজ কিছু মনে করার চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হচ্ছে এই আন্দোলন এতদূর এগোল কী করে। যুবরাজের আগমনে বয়কট যে হবে সেটা আমাদের জানা ছিল। কিন্তু এই বয়কট যে এত উগ্র আর হিংসাত্মক রূপ নেবে তা তো আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আমাদের এই শহরের অবস্থা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি?"

"কানপুর শহরের অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়। কাল সন্ধ্যাবেলা কাপড় কিনতে আমি শহরের দিকে গিয়েছিলাম। মূলগঞ্জের চৌমাথায় বিদেশী কাপড়ের চাঁচর জ্বালানো হল, খুব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাও হ'ল। বাজারের পরিবেশ থমথমে, দোকানদাররা দোকান থেকে সব বিলিতি কাপড় সরিয়ে ফেলছে। কে জানে কখন কি হয়! বিলিতি কাপড় বাজারে দেখা যাচ্ছে না। স্বদেশী আন্দোলন জোর ধরেছে। মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রি বিলিতি কাপড়ের দোকানে ধর্ণা দেওয়া হবে।"

"এই ব্যাপার! কালেক্টার সাহেব চিন্তিত স্বরে বললেন। "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, সরকারের আদেশ—আমরা যেন সতর্ক থাকি। যুবরাজ মাদ্রাজ হয়ে কলকাতায় যাবেন, আর কলকাতায় পৌঁছে পঁচিশে

ডিসেম্বর বড়োদিনের উৎসব পালন করবেন। গভর্ণর জেনারেল সে সময় সেখানেই থাকবেন। যুবরাজ জানুয়ারি মাসে উত্তর ভারত ট্যুর করবেন। এখানে যাতে আর বোম্বাইয়ের মতন ঘটনা না ঘটে, তার জন্যে আমাদের এখন থেকে সাবধান হতে হবে আর পুরো ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।"

"আজ্ঞে, সে তো ঠিক্ই। কিন্তু এই ব্যবস্থা কি রকম হবে? গঙ্গাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"আমি ভাবছি কংগ্রেস নেতা আর প্রমুখ কর্মকর্তাদের একটা তালিকা আমাদের করে ফেলা উচিত। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এঁদের গ্রেফ্‌তার করা হোক্। আর এই যে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দল কাজ করছে এরা টাকাকড়ি পাচ্ছে কোথা থেকে, এ খবরও আমাদের যোগাড় করা দরকার।" খানিক থেমে আবার কালেক্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, তুমি অনুমান করতে পার কি, কংগ্রেস কোথা থেকে এত টাকা পাচ্ছে? এই কানপুরে তো তেমন বড়ো জমিদার বা তালুকদার নেই।"

গঙ্গাপ্রসাদের মস্তিষ্কে মূলগঞ্জের কাপড় ব্যবসায়ীর কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশী মিলের ভাগ্য খুলছে। একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন, "আমার মনে হয় টাকাকড়ি যারা যোগাচ্ছে, তারাই এই আন্দোলনের দ্বারা সোজা-সুজি লাভবান হচ্ছে, অর্থাৎ মিলমালিক আর ব্যবসায়ীরা।"

কালেক্টার সাহেব গঙ্গাপ্রসাদকে খুঁটিয়ে দেখলেন, "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, তুমি সত্যই বুদ্ধিমান। আমার অবাক লাগছে এই সোজা সরল কথাটা প্রথমে আমার মাথায় এ'ল না কেন? এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি এ আন্দোলন বোম্বাই, কলকাতাতে কি করে ক্রমশঃ জোর চলছে আর অন্যত্র ঢিমে পড়েছে। কানপুর হ'ল ব্যবসায়ের নগর, কিন্তু এখানের মিলমালিক বেশীর ভাগ ইংরেজ আর রাজভক্ত। মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, একটু সতর্ক হয়ে খোঁজ নিন

তো কোন্ কোন্ মিলমালিক আর ব্যবসায়ীর যোগাযোগ আছে কংগ্রেসের সঙ্গে।”

সেদিন সন্ধ্যেবেলা গঙ্গাপ্রসাদ লক্ষ্মীচন্দের বাড়ি গেলেন। লক্ষ্মীচন্দ খাস শহরের বাড়িতে অফিস খুলেছিলেন আর বসবাসের জন্যে সিভিল লাইন্সে একটি বাংলো তৈরি করেছিলেন। গঙ্গা-প্রসাদের বাংলো থেকে লক্ষ্মীচন্দের বাংলো প্রায় মাইলখানেক দূরে। গঙ্গাপ্রসাদ লক্ষ্মীচন্দের বাংলোয় যখন পৌঁছলেন তখন রাত হয়ে গেছে। লক্ষ্মীচন্দ বাইরের ঘরে বসে দফ্‌তরের কাগজপত্র দেখছিলেন, দুজন ক্লার্ক তাঁকে সাহায্য করছিল। গঙ্গাপ্রসাদের কার্ড পাওয়ামাত্র কাগজপত্র বন্ধ করে ক্লার্কদের বললেন, “তোমরা সকালে এস, এসব গুছিয়ে রেখে দিয়ে যাও।” এই বলে তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, “আরে গঙ্গাপ্রসাদ, তুমি! কার্ড পাঠাবার কী দরকার ছিল। বাড়ির মধ্যে আবার এরকম আচরণ চলে নাকি! এস।”

লক্ষ্মীচন্দ গঙ্গাপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে এসে ড্রইংরুমে বসলেন, “আজকাল আছ কোথায়? কানপুরে কবে এলে? কেন এলে?”

গঙ্গাপ্রসাদ মনে মনে সেই লক্ষ্মীচন্দের সঙ্গে এই লক্ষ্মীচন্দের তুলনা করছিলেন যিনি গর্ভধারিণী মা জয়দেইকে মৃত্যুশয্যায় কটু কথা বলেছিলেন, গঙ্গাপ্রসাদ আর তাঁর বাবা জ্বালাপ্রসাদকে অপমান করেছিলেন; এখন কতই না আত্মীয়তার সঙ্গে তার সঙ্গে কথা বলছেন, হাসছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আপন মনে এক বিচিত্র পরিবর্তন অনুভব করলেন। মন কষাকষির ভাবটা বিলুপ্ত হয়ে গেল, মুখের ওপর দেখা দিল মৃদু হাসি, কণ্ঠস্বরও মোলায়েম হয়ে গেল। “সাত দিন হ'ল কানপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছি। আসামাত্র কাজকর্মে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। নতুন শহর, নতুন দায়িত্ব আর নতুন সমস্যা। আজ ভাবলাম, লক্ষ্মীদাদার সঙ্গে দেখা করে আসি। অনেক চেষ্টায় সময় করে এখানে আসতে পেরেছি।”

"খুব ভালো কথা! খুব ভালো কথা! আমার ছোট ভাই গঙ্গা কানপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে। আজ পর্যন্ত কোনো ভারতবাসী এই চেয়ারে বসেনি। আমি কতখানি গর্ব বোধ করেছি!" লক্ষ্মীচন্দ আবেশের সঙ্গে বললেন, "তোমার বৌদিকেও খবরটা দিই। তোমার কথা তিনি কতবার যে বলেন। কিন্তু আমি তোমার কোনো খবরই জানতাম না, আর তুমিও তো আমাকে কোনোদিন চিঠি দাওনি," এই বলে তিনি ভেতরে গেলেন আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রাধাকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন।

রাধা বেশ মোটা হয়েছিলেন, তাঁকে বিশ্রী দেখাচ্ছিল। গয়নায় মোড়া প্রৌঢ়া একটি মহিলাকে সামনে দেখে গঙ্গাপ্রসাদ চিনতেই পারলেন না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নমস্কার বৌদি।"

"বেঁচে থাক ঠাকুরপো। তোমার কাছে আমাদের অনেক অভিযোগ আছে। যদি আগে থেকে জানাতে তো স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যেত। কোথায় উঠেছ? অসুবিধে হয়নি তো?"

লক্ষ্মীচন্দ হাসতে হাসতে বললেন, "কানপুরে জয়েণ্ট সাহেব হয়ে এসেছেন। এখন আরামের আর অভাব কী! সুন্দর বাংলো, অনেক চাকরবাকর। আমাদের সঙ্গে যে দেখা করতে এসেছেন এটাই কি কম। আচ্ছা গঙ্গা, বউমাকে সঙ্গে এনেছ তো? আর কাকাবাবু কাকিমা, তাঁরা ভালো আছেন তো? শুনলাম এলাহাবাদে একটি বাংলো তৈরি করেছেন, পেন্সনের পর থেকে ওখানেই বাস করছেন।"

"হ্যাঁ লক্ষ্মীদাদা, বাপ্পা এলাহাবাদে জর্জ টাউনে একটি বাংলো তৈরী করেছেন। কিন্তু ওখানে বাপ্পা ও মা একা, অসুবিধা হত, তাই অনেক বলেকয়ে তাঁদের আমার কাছে নিয়ে এসেছি। আমার পরিবারও এখানেই আছে। বাপ্পা আপনাদের এখানে আসছিলেন, কিন্তু এখন বাড়ি সাজাতে গোছাতে ভারি ব্যস্ত, সেজন্যে ফুরসৎ হল না। আমার একটা টাঙ্গা আছে, সেটা আমার কাছেই থাকে। বাপ্পা রবিবারে এখানে আসবেন বলছেন।"

লক্ষ্মীচন্দ বললেন, "আরে, এখনও টাঙ্গা দিয়েই কাজ চালাচ্ছ! তোমার তো এতদিনে মোটর কিনে নেওয়া উচিত ছিল। টাঙ্গা-ফাঙ্গা তো সাধারণ ডেপুটি কালেক্টারদের জন্যে, তুমি তো জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট!" তারপর একটু ভেবে বললেন, "আমি কাল সন্ধ্যেবেলা কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে তোমার ওখানে যাব। তাঁকে আর বাড়ির সকলকে নিয়ে আসব। বউমা আর ছেলেপুলেরা আমার এখানেই খাবে, যদি তোমার সময় হয় তুমিও এখানেই খাবে।" লক্ষ্মীচন্দ মৃদু হাসলেন, "কিন্তু এ বাড়িতে তো বোষ্টম আচার-বিচার।"

গঙ্গাপ্রসাদও মুচকে হাসলেন, "কাল আমার এস. পি.র বাড়িতে রাত্রে নিমন্ত্রন, অন্য কোনোদিন আসব।"

গঙ্গাপ্রসাদ বাড়ি ফিরে লক্ষ্মীচন্দের বাড়ি যাওয়ার বিবরণ বাবাকে বললেন। "কাল সন্ধ্যেবেলা সে আপনাকে আর বাড়ির সবাইকে নিতে আসবে। খুব আন্তরিক ব্যবহার করলে।"

জ্বালাপ্রসাদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, "গঙ্গা, তোমার ওখানে যাওয়া উচিত হয়নি।"

"আমি কি যেতাম বাপ্পা! কানপুরে সব চেয়ে বড়ো ভারতীয় মিলমালিক আর নাগরিক, 'স্যার' খেতাব পেয়েছে, সরকারের কাছে উঁচু মান পেয়েছে। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বজায় রাখতেই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সব কাজ ঠিক্‌ই হবে। বাপ্পা, পুরানো ব্যাপার ভুলে যাওয়াই উচিত। জ্যাঠামশাইয়েরই ছেলে তো। একদিন আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।"

জ্বালাপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদের মধ্যে ভাব আর সঙ্কোচের অভাব হামেশাই অনুভব করতেন। আজ ছেলের মুখে এসব কথা শুনে তার মধ্যে নতুন পরিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি খুশীই হলেন, "হ্যাঁ গঙ্গা, সে তো ঠিক্‌ই। কিন্তু লক্ষ্মীচন্দ.........জানি না কেন তাকে আমার কোনোদিনই ভাল লাগেনি। যাক্‌গে, সে এলে আমরা তার সঙ্গে যাব।"

পরের দিন সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ লক্ষ্মীচন্দ একটা নতুন ওভরল্যাণ্ড মোটর হাঁকিয়ে গঙ্গাপ্রসাদের বাংলোতে এলেন। গঙ্গাপ্রসাদ যেন লক্ষ্মীচন্দেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। লক্ষ্মীচন্দ ড্রাইংরুমে এসেই বললেন, "গঙ্গা আমার সঙ্গে এক মিনিটের জন্যে বাইরে এস তো! আমি আজই একটা নতুন মোটর কিনেছি, দেখ তো কেমন।"

"আপনার তো দুখানা মোটর কাল দেখলাম। কিন্তু এই গাড়িটা খুবই সুন্দর। ভাবছি দু-চার মাসের মধ্যেই আমিও একটা গাড়ি কিনব।"

মোটর দেখে দুজনে ঘরে ফিরে এলেন। গঙ্গাপ্রসাদ লক্ষ্মীচন্দের আসার খবর বাবাকে পাঠালেন।

জ্বালাপ্রসাদ বাইরে এলেন। লক্ষ্মীচন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "প্রণাম কাকাবাবু। আমি কালই গঙ্গাপ্রসাদের কাছে শুনলুম আপনারা সবাই এখানে এসেছেন। এক সময় আমরা কতই না আপনজন ছিলাম, তখনকার কথা মনে পড়ে। গঙ্গাকে দেখেই মন আবেগে ভরে উঠল—আমার ছোট ভাই কি না। ভালো ছিলেন তো? শরীর কেমন?"

লক্ষ্মীচন্দের আন্তরিক ব্যবহারে জ্বালাপ্রসাদ বিশেষ খুশী হলেন। তিনি লক্ষ্মীচন্দের কুশল জিজ্ঞেস করে যমুনা, রুক্মিণী আর ছেলে-মেয়েদের যাবার জন্যে তৈরী হতে আদেশ দিলেন।

জ্বালাপ্রসাদ সবাইকে প্রস্তুত রেখে ভেতর থেকে যখন ফিরলেন, গঙ্গাপ্রসাদ আর লক্ষ্মীচন্দের মধ্যে সে সময় রাজনীতির চর্চা হচ্ছিল। বোম্বাইয়ে যা কিছু ঘটেছিল, তার খবর খবরের কাগজগুলোতে ছাপা হয়েছিল আর সারা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। গঙ্গাপ্রসাদ বলছিলেন, "এই স্বদেশী আন্দোলন করে কি ধরণের স্বরাজ পাওয়া যাবে? আর স্বদেশীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকাও তো চলে না। আমাদের এখানে শিল্প-বাণিজ্য তেমন কোথায়, যার ফলে স্বদেশী আন্দোলন সফল হতে পারে। জোর জবরদস্তি করে আমাদের বিদেশী মাল কিনতেই হবে লক্ষ্মীদাদা।"

লক্ষীচন্দ বললেন, "হ্যাঁ গঙ্গা, তুমি বলছ ঠিক্ই। এই রকম আন্দোলন করে স্বরাজ পাওয়া যাবে না। এদিকে দেশের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি করতেই হবে। স্বদেশীভাব জনগণের মধ্যে না জাগলে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার অসম্ভব। আমাদের দেশে শিল্প-বাণিজ্যের সবে তো শৈশব, শুরুতে বিদেশের সঙ্গে মোকাবিলা সম্ভবপর নয়। স্বদেশী চেতনা ও সহযোগিতা পেলে আমরা অর্থাৎ শিল্পপতিরা দেশকে ধীরে ধীরে আত্মনির্ভর করতে পারব। লোকে যদি মোটা কাপড় পরে আর দিশী কাপড় কেনে, তাহলে ক্রমশঃ দেশে বেশী সংখ্যায় মিল খোলা শুরু হবে আর আমরা খুব ভাল মিহি কাপড় তৈরি করতে পারব। গঙ্গা, অসহযোগের এই স্বদেশী আন্দোলন তো আমাদের স্বপক্ষে। তবে স্বরাজ আর খেলাফত এসব আড়ম্বর মাত্র।" বলতে বলতে লক্ষ্মীচন্দ হেসে উঠলেন।

জ্বালাপ্রসাদ প্রস্তুত হয়ে এসে গিয়েছিলেন, ফলে লক্ষ্মীচন্দকে রাজনীতির আলোচনা বন্ধ করতে হ'ল, "গঙ্গা, এখন তো তুমি এখানেই এসে পড়েছ, পরে তোমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হবে। যখন যা দরকার হয় আমাকে জানিয়ো। সব রকম সাহায্যের জন্যে আমি প্রস্তুত রইলুম। গঙ্গা শোন, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতন! আমার যে ছোট ভাই, সে এখানকার সব চেয়ে বড়ো ভারতীয় অফিসার। তার একটা মোটর গাড়ি দরকার। আমি আজ যে মোটরটা কিনেছি সেটা তোমারই জন্যে। আমি সেই গাড়ি হাঁকিয়েই তোমার বাড়ি এসেছি এবং তোমার পরিবারকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। কোম্পানির কাছ থেকে এক মাসের জন্যে ড্রাইভারও একটা চেয়ে নিয়েছি, তার বেতন এই মোটরের দামের সঙ্গেই দেওয়া আছে। এই কাগজপত্রগুলো সামলে রাখ। এই ড্রাইভার তোমাকে ড্রাইভিং শিখিয়ে দেবে। আর যদি তুমি চাও তো এ তোমাকে একটা ড্রাইভারও এনে দেবে। আমি বাড়ি পৌঁছে মোটরটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। এই মোটর হাঁকিয়ে তুমি 'ডিনারে' যেও।"

গঙ্গাপ্রসাদ ক'মাস ধরে মোটর কেনার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু টাকার অভাবে কিনতে পারেন নি। তিনি বললেন, "লক্ষ্মীদাদা, এ সবের কি দরকার ছিল, আমি তো নিজেই কিনব ঠিক্ করেছিলাম।"

"তুমি কিনতে, আমিই না হয় কিনে দিলাম, তাতে আর তফাতটা কি হ'ল।" পরে জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "যাক্ কাকাবাবু, যানবাহন না থাকাতে আপনি এতদিন আমার বাড়ি যেতে পারেননি, গঙ্গা বলছিল। তাই আমি ভাবলাম, এই যানবাহনের বাহানটাই বা কেন থেকে যায়। একটা মোটর আর একটা টাঙ্গা। একটা গঙ্গার জন্যে আর একটা আপনার বাড়ির লোকেদের জন্যে। আজ কাল দু'টা যানবাহনের কমে তো আর কাজ চলে না।"

গঙ্গাপ্রসাদ আর লক্ষ্মীচন্দের পরিবারের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল।

বাংলাদেশে এবং সারা উত্তর ভারতে ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ক্রিমিন্যাল ল'এ্যামেণ্ডমেণ্ড এ্যাক্ট জারি করা হ'ল। বাংলা দেশের আর উত্তর প্রদেশের প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ্তার করা হ'ল। যুবরাজ পঁচিশে ডিসেম্বর কলকাতা পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানে যে রকম বড়ো ধর্মঘট শুরু হ'ল আর সারা উত্তর ভারত জুড়ে যে সব ধর্মঘট ও 'প্রদর্শন' করা হ'ল তাতে পরিস্থিতি আরো আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়াল। কলকাতায় পঁচিশে ডিসেম্বরের ধর্মঘটের খবর পেয়ে কালেক্টার সাহেব গঙ্গাপ্রসাদকে ডেকে পাঠিয়ে পরামর্শ করলেন, জেলার অপর অফিসারগণও এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর সমাধান কারও মাথায় এ'ল না। এঁদের কাছে মাত্র একটি পথ ছিল—দমন।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে আন্দোলনকে আরো এগোবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। সেই কংগ্রেসে জ্ঞানপ্রকাশও গিয়েছিলেন। ফেরার পথে সোজা এলাহাবাদ না গিয়ে তিনি দিল্লী হয়ে কানপুরে এলেন। সেদিন নববর্ষ, ১৯২২ সালের পয়লা তারিখ। গঙ্গাপ্রসাদের বাড়িতে

নববর্ষের অভিনন্দন যাঁরা জানাতে এলেন তাঁদের লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছিল। সেদিন রাত্রে লক্ষ্মীচন্দের বাড়িতে নববর্ষ উপলক্ষে ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল।

জ্ঞানপ্রকাশ যখন গঙ্গাপ্রসাদের বাংলোতে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যে। গঙ্গাপ্রসাদের পরিবারবর্গ দুপুর থেকেই লক্ষ্মীচন্দের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ ড্রইংরুমে বসে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করছিলেন। হুইস্কির একটা বোতল শেষ হয়ে গিয়েছিল আর একটার অর্ধেকটা খালি হয়ে এসেছিল। জ্ঞানপ্রকাশের আসার খবর পাওয়ামাত্র গঙ্গাপ্রসাদ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। জ্ঞানপ্রকাশের হাত ধরে বললেন, "এস চাচাজান, মনে হচ্ছে দিল্লী হয়ে আসছ!" এই বলে আর্দালিকে হুকুম দিয়ে আর একটি গেলাস আনালেন। "নববর্ষের অভিনন্দন জানাই, বড়ো ক্লান্ত হয়ে এসেছ!" এই বলে হুইস্কির বড়ো পেগ গেলাসে ভরে জ্ঞানপ্রকাশের দিকে এগিয়ে দিলেন।

যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা উঠে চলে গেলেন। জ্ঞানপ্রকাশ এক ঢোঁকেই গেলাসের সিকি ভাগ খালি করে ফেললেন। সত্যিই তিনি বড়ো ক্লান্ত আর পিপাসার্ত ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "দাদা কোথায়? বাড়িটা বড়ো খালি খালি লাগছে, ছেলেপুলেদেরও তো দেখছি না।"

"সবাই লক্ষ্মীচন্দের ওখানে গেছে। আজ ওঁর বাড়িতে নববর্ষ উপলক্ষে বিরাট ভোজ। বড়ো বড়ো অফিসাররা নিমন্ত্রিত হয়েছেন। আমাকেও যেতে হবে রাত আটটায়। কাকা, হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নাও। ডিনারস্যুট তোমার আছে নিশ্চয়ই?" এই বলে তিনি ঘন্টি বাজালেন। ঘন্টির শব্দে ভিখু ঘরে ঢুকল। ভিখুকে বললেন, "জ্ঞানু কাকার জন্যে স্নান ঘরে গরম জল দাও।"

জ্ঞানপ্রকাশের দিকে ঘুরে বললেন, "কাকা, বোঝাপড়ার কথা তো খতম হ'ল। এখন আপনারা আমেদাবাদ কংগ্রেসে কী ঠিক্ করলেন?"

"সারা দেশে আন্দোলনকে জোরদার করা আর সত্যাগ্রহ শুরু করে দেওয়া," জ্ঞানপ্রকাশ বললেন মৃদু হেসে। "এবার লড়াইএ উৎসাহ দেখা দিয়েছে। যুবরাজের অভ্যর্থনায় যা দুর্গতি হচ্ছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ।"

গঙ্গাপ্রসাদের মুখের ওপর একটা অস্পষ্ট ছায়া নেমে এল, "ওহে বন্ধু বড়ো বিপদে ফেললে! এই অসহযোগ আর ধর্ণার জন্যে হ'ল প্রাণের সঙ্কট! তার ওপর সত্যাগ্রহ আর কর-বন্ধ করা।" তারপর একটু ভেবে বললেন, "কিন্তু একদিক থেকে এই সত্যাগ্রহটা হয়েছে ভালোই। আমরা পত্রপাঠ এই আন্দোলনটাকে খতম করে দিতে পারব।"

এবার জ্ঞানপ্রকাশকে বলতে হ'ল, "সত্যাগ্রহ করে আন্দোলন খতম হবে! কী বলছ তুমি?

আজ্ঞে, কারণটা হ'ল এই, এই ভীড়ে জনসাধারণের হাতে পড়ে সত্যাগ্রহ দুরাগ্রহ হয়ে দাঁড়াবে। নেতারা থাকবেন জেলে আটক, কেউ থাকবে না বোঝাবার জন্যে। জনতা হিংসাত্মক কাজ শুরু করে দেবে। আর তারপর জালিয়ানওয়ালা বাগের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ব্যস্, মাত্র এইটুকু ব্যাপার আর আন্দোলন হবে লুপ্ত।"

জ্ঞানপ্রকাশ দূর পথের ক্লান্তিতে আর তর্কের মুডে ছিলেন না। তিনি হুইস্কির গেলাস শেষ করতে করতে বললেন, "এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব কিন্তু বেটা, তুমি যে আমাকে জোর করে লক্ষ্মীচন্দের বাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছ, সেটা কি ঠিক্ হবে?"

"কাকা, এতে বেঠিক্‌টা কী? আমার পুরো পরিবার যখন নিমন্ত্রিত তোমাকে কোথায় ছেড়ে যাব? আর লক্ষ্মীচন্দকে তো তুমি ভালোভাবেই জান। 'স্যার' খেতাব পেয়েছে। শ্যাম্পেন চলবে, জাঁকজমকের সঙ্গে ডিনার হবে, অনেক ইংরেজকে সেখানে দেখবে, তোমার বিলেত মনে পড়ে যাবে।"

জ্ঞানপ্রকাশ মনে মনে হাসলেন, "তা বেশ, আচ্ছা এই নেমন্তন্নেই ওর সঙ্গে দেখা করা যাবে।"

হাতমুখ ধুয়ে আর বিলেতে সেলাই করা ড্রেস স্যুট পরে জ্ঞান-প্রকাশ যখন বাইরে বের হলেন, তখন বাংলোর সামনে গঙ্গাপ্রসাদের মোটর দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, লক্ষ্মীচন্দ তোমাকে নিয়ে যেতে মোটর পাঠিয়েছে বুঝি ?

গঙ্গাপ্রসাদ হাসলেন, "না কাকা, এ মোটর আমার। এখানকার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট কিনা তাই আমার মোটর থাকা দরকার। তবে তোমার ধারণাটা ভুল নয়, এ মোটর গাড়িখানা লক্ষ্মীচন্দই আমাকে ভেট দিয়েছেন। সে আমার বড়দাদা কি না। আমার কাছে এত টাকা কোথায়, মোটর কিনব। এখন পর্যন্ত তো জৌনপুরের ধারই শোধ করছি।"

লক্ষ্মীচন্দ জ্ঞানপ্রকাশকে দেখে চমকে উঠলেন। এলাহাবাদে কয়েকবার তাঁকে দেখেছিলেন, কথাবার্তাও হয়েছিল। তবে এবারে তাঁকে দেখে বা তাঁর নাম শুনে তার চমকে ওঠাটা গঙ্গাপ্রসাদের অদ্ভুত ঠেকল, কিন্তু জ্ঞানপ্রকাশ অবাক্ হলেন না। লক্ষ্মীচন্দ নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমেদাবাদ কংগ্রেস থেকে আসছেন ?

জ্ঞানপ্রকাশ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আর বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই কানপুর এলুম, পরে এলাহাবাদে ফিরব।"

"কাল দুপুরে আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করবেন," লক্ষ্মীচন্দ বললেন। তারপর তিনি অন্য অতিথিদের অভ্যর্থনা আর আদর-আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জ্ঞানপ্রকাশ জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

জ্ঞানপ্রকাশ আর লক্ষ্মীচন্দের কথাবার্তা গঙ্গাপ্রসাদের বড়ো রহস্যজনক বোধ হ'ল। বাড়ি ফিরে গঙ্গাপ্রসাদ জ্ঞানপ্রকাশকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকা, লক্ষ্মীচন্দ কি করে জানতে পারলে যে তুমি আমেদাবাদ কংগ্রেস থেকে ফিরেছ আর তুমি কংগ্রেসী। পোষাকে তুমি তো ইউরোপীয়ানদেরও হার মানিয়েছিলে !"

"এসব আর জেনে কী করবে?" জ্ঞানপ্রকাশ মৃদু হেসে এড়াবার চেষ্টা করলেন।

"না কাকা, এ বলতেই হবে, তা না হলে আমার পেটের ভাত হজম হবে না," গঙ্গাপ্রসাদ জেদ ধরলেন।

"তাহলে শোন বাবা। কিন্তু এটা মনে রাখবে আমি এসব কানপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলছি না, আমার ভাইপো আর বন্ধু গঙ্গপ্রসাদকে বলছি। এই স্যার লক্ষ্মীচন্দ পুঁজিপতি, নয় কি? আর ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরাই হলেন এই আন্দোলনের মেরুদণ্ড। আমাদের আন্দোলনকে চালানোর জন্যে টাকা চাই আর এ টাকা আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের কাছ থেকেই আমরা পেতে পারি। কারণ ইংরেজের শাসন ব্রিটিশ পুঁজিবাদেরই শাসন। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতে নিজেদের মাল বিক্রি করে ব্রিটেন ভারতবর্ষকে শোষণ করছে। এই ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড়ো আর সক্রিয় শত্রু যদি কেউ থাকে তো এই ভারতীয় পুঁজিপতিরাই।"

গঙ্গাপ্রসাদের আবার সেই কাপড় ব্যবসায়ীর কথাটা মনে পড়ল—'এই স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা দেশী মিলের ভাগ্য খুলে যাচ্ছে।' তিনি বললেন, "বুঝেছি কাকা, আপনি আন্দোলনের জন্য লক্ষ্মীচন্দের কাছ থেকে টাকা নিতে এসেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, লক্ষ্মীচন্দ সরকারকেও টাকা দেয়, আবার কংগ্রেসকেও টাকা দেয়।"

"আর তোমাকে টাকা দেয়—মোটরের স্বরূপে" জ্ঞানপ্রকাশ বললেন। "কিন্তু গঙ্গা, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই পুঁজিপতিরা মোটা লাভ করে। সেই লাভের অতি ছোট্ট ভাগ দেয় সরকারকে, যাতে সরকারের কাছ থেকে তারা সব রকমের সুবিধা পায়। এই লাভের একটি ছোট ভাগ দেয় কংগ্রেসকে, যাতে স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হয় আর তাদের মালপত্র খুব জোর বিক্রি হয়। আবার এই লাভের আর-একটি ভগ্নাংশ দেয় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গঙ্গাপ্রসাদকে যার আড়ালে লক্ষ্মীচন্দ যা লুটপাট,

বেইমানী করে, সেদিক থেকে সরকারী কর্মচারীদের চোখ বন্ধ থাকে। টাকা এযুগের সবচেয়ে বড়ো হীলিং বাম।" বলতে বলতে জ্ঞানপ্রকাশ জোরে হেসে উঠলেন।

নয়

সারা কানপুর শহরে ধর্মঘট চলছিল আর জনগণ ভয়ানক উত্তেজিত। আগের রাতে জেলের মধ্যে একজন কংগ্রেস কর্মকর্তার মৃত্যু ঘটেছিল। জনগণের বক্তব্য তাঁর মৃত্যু ঘটেছে জেলকর্তৃপক্ষের অত্যাচারের দরুন আর কর্তৃপক্ষ বলছিল তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক—অসুখে মরেছেন। সেই মৃত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের শবযাত্রার শোক মিছিল বের হ'ল। ষ্টেশন রোড পৌঁছতে পৌঁছতে পঁচিশ-তিরিশ হাজার লোকের ভীড় শোক মিছিলে যোগ দিল। জনতার মধ্যে ক্রোধের আক্রোশ আর হিংসা জেগে উঠল।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ মিছিলের এই মনোভাব দেখে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা গঙ্গাপ্রসাদকে এর সূত্র জানালেন। কর্তৃপক্ষর পরামর্শ মতো স্থির করা হ'ল মিছিলকে সিভিল লাইন্সে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কারণ সেখানে ইংরেজদের আর উচ্চ রাজকর্মচারী-দেরই বাংলো আর ভীড় এতো উত্তেজিত যে কোনো সময় হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সশস্ত্র পুলিশদলকে মোতায়েন করা হয়েছিল, এই মিছিলের মোকাবিলা করার জন্যে।

প্রায় দুশ' সশস্ত্র আর সাধারণ পুলিশ সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ ষ্টেশন রোড থেকে সিভিল লাইন্সে যাবার রাস্তার চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়ালেন মিছিল আটকাবার জন্যে। কংগ্রেস কর্মকর্তার শব জেল থেকে সোজা ভৈরব শ্মশানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে। মিছিল চৌমাথায় গিয়ে পৌঁছানোমাত্র সেখানেই আটকে দেওয়া হ'ল।

মিছিলের অগ্রভাগে কংগ্রেস পতাকা হাতে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবিকারা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অন্য মহিলারাও যোগ দিলেন। তাঁদের পেছনে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক আর অন্য কর্মকর্তারাও ছিলেন। পেছনে ছিল কানপুর শহরের জনগণের জমাট ভীড়। গঙ্গাপ্রসাদ এগিয়ে গিয়ে আদেশ জারি করলেন, মিছিল ফিরে যেতে হবে, সিভিল-লাইন্সে মিছিলের প্রবেশ নিষেধ। নিষেধাজ্ঞা লটকানো হয়েছে। এই আদেশ শুনে নগর কংগ্রেস কমিটির পাঁচজন নেতা এগিয়ে এসে বললেন, মিছিল ফিরে যেতে পারে না, মিছিল সিভিল লাইন্স হয়ে শ্মশানঘাটে গিয়ে তাঁদের অমর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবে। সরকারী আদেশ পালনের জন্য জনতা রাজী নয়। তবে গঙ্গাপ্রসাদকে আশ্বাস দিলেন হিংসাত্মক হবে না।

মিছিলের মধ্যে হল্লা হচ্ছিল। জনতা সরকার ও সরকারী কর্মকর্তাদের অভব্য গালাগালি করছিল। কংগ্রেস, মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীনতা আর ভারত-মাতার জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। গঙ্গাপ্রসাদের পাশেই কানপুরের ইংরেজ অ্যাসিস্ট্যান্ট্ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দাঁড়িয়েছিলেন আর আশে পাশে ইউরোপীয় আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টরা কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার গঙ্গাপ্রসাদ কানপুর শহরে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি ঘোষণা করলেন আর মিছিলকে পনেরো মিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে আদেশ দিলেন।

এমন সময় মিছিলের পিছন দিক থেকে একটা ঢেলা পড়লো সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট্ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাঁ হাতে এসে লাগল। তৎক্ষণাৎ তিনি পিস্তল উঁচিয়ে ভীড়ের দিকে তাক করলেন। গঙ্গাপ্রসাদ তাঁর হাতখানা নীচের দিকে মুড়ে দিলেন কিন্তু ভীড় থেকে ঢেলা বর্ষণ শুরু হ'ল, একটা ঢেলা এসে গঙ্গাপ্রসাদের মাথায় লাগল। গঙ্গাপ্রসাদ এবার পুলিশকে লাঠিচার্জের আদেশ দিলেন আর ঘোড়সওয়ারদের হুকুম দিলেন ভীড় ছত্রভঙ্গ করে দিতে। জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট গঙ্গাপ্রসাদের আদেশ পাওয়া মাত্রই পুলিশ আর ঘোড়সওয়ার মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মিছিলের মধ্যে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবিকারা আর কংগ্রেস কর্মকর্তারা মাঠে স্থির দাঁড়িয়ে লাঠির প্রহার সইতে লাগলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভীড় অদৃশ্য হয়ে গেল, রয়ে গেল শুধু আহতেরা। লাঠি চার্জের দরুন আহতদের সংখ্যা হ'ল দুশ'র ওপর, এর মধ্যে প্রায় পঁচিশ জন মহিলা। পঞ্চাশ জনের মতো গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হ'ল। বাকিদের গ্রেফ্‌তার করে হাজতে আটক করা হ'ল।

পরের দিন গঙ্গাপ্রসাদ যখন কাছারি থেকে ফিরলেন, জ্ঞানপ্রকাশ আর সত্যব্রত তাঁর অপেক্ষায় ঘরে বসেছিলেন। প্রায় তিরিশ জনকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শেষ কুড়ি জনের চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু সকলের অবস্থা ভালোর দিকেই যাচ্ছিল। আগের সন্ধ্যায় যে পাঁচজন নেতাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছিল গঙ্গাপ্রসাদ তাঁদের একমাস করে কারাদণ্ড দিলেন। ফলে তাঁর মনটা ছিল হাল্‌কা। তিনি জামাকাপড় ছেড়ে এঁদের কাছে এসে বসলেন। ভিখু তিন জনার চা-জলখাবার দিয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হয়ে জ্ঞানপ্রকাশের দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, এবার তোমাদের উদ্দেশ্য বল।"

"উদ্দেশ্য! তা ধরো তোমার চিন্তা তো দূর করছি বাবা। অন্ততঃ তুমি শান্তি পাবেই। শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে আন্দোলনকে এবার গ্রাম থেকে শুরু করতে হবে। আমরা কর-বন্ধের জন্যে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সত্যাগ্রহের প্রোগ্রাম করেছি আর গ্রামের সঙ্গে শহরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের অনুমান তিন চার মাসের মধ্যেই সরকার মাথা হেঁট করবে আর তখনই সব মীমাংসা হয়ে যাবে।"

"কাকা, তাহলে আপনারা কি সত্যিই গ্রামে ব্যাপক সত্যাগ্রহ করতে যাচ্ছেন? এই ব্যাপক সত্যাগ্রহ যে ভয়ানক অস্ত্র। একটু ভেবে দেখুন। এযাবৎ যেটুকু সফল আপনারা হয়েছেন, এ থেকে সেটুকুও উল্টে যাবে।"

একটু ভেবে জ্ঞানপ্রকাশ উত্তর দিলেন, "গঙ্গা, তা আমি জানি, কিন্তু এই সফলতা আমাদের নিষ্ক্রিয়তা থেকেও তো নষ্ট হতে পারে। এই ব্যাপক সত্যাগ্রহই একমাত্র অস্ত্র যার সামনে ব্রিটিশ সরকার মাথা নত করবে। এখন আমাদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাষীদের ঘরে ঘরে এই আন্দোলনকে পৌঁছে দিতে হবে। এক সপ্তাহ পরে এলাহাবাদে গোটা যুক্তপ্রদেশের সক্রিয় কর্ম-কর্তাদের একটি বৈঠক বসবে, সেই বৈঠকে গ্রামে আন্দোলনকে পৌঁছে দেবার খসড়া তৈরি করা হবে।"

সেই সময় কালেক্টর সাহেবের চাপরাসী এসে একখানি চিঠি দিল। চিঠি পড়ে গঙ্গাপ্রসাদ চমকে উঠলেন। চাপরাসীকে বললেন, "আমি এক্ষুণি এক ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।" চাপরাসী যাবার পরে কালেক্টারের টাইপ করা নোট জ্ঞানপ্রকাশের দিকে এগিয়ে দিলেন, "এটাও একটু পড়ে দেখ কাকা, তোমাকে খুব গরম গরম খবর দিচ্ছি।

"এ্যাঁ, একী ?" কালেক্টারের নোট পড়ে জ্ঞানপ্রকাশ চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই চৌরিচৌরার খবর মিথ্যে, অতিরঞ্জন করা হয়েছে। একুশ জন পুলিশের সেপাই আর একজন সাবইন্সপেক্টরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে আর থানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ? আমি একথা বিশ্বাস করতে পারি না। গঙ্গা, একি সত্য খবর ?"

গঙ্গাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "কাকা, সরকারী ব্যাপারে খবর ভুল হয় না, আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন। আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে গ্রামে ব্যাপক সত্যাগ্রহ, ধ্বংসাত্মক আন্দোলন করাটা হবে ভুল পদক্ষেপ। যদি এরকম আরো দু-চারটি ঘটনা ঘটে তাহলে সারা প্রদেশে ফৌজী শাসন জারি করা হবে, সে বোধ হয় পাঞ্জাবের মার্শাল ল'য়ের চেয়েও বেশী ভয়ানক হবে। এই ফৌজী শাসনের প্রয়োজনের যুক্তিও দেখানো যেতে পারে।"

জ্ঞানপ্রকাশ একথার কোনই উত্তর দিলেন না, কিন্তু সত্যব্রত দৃঢ়স্বরে বললেন, "জয়েন্ট সাহেব, শুধু যুক্তপ্রদেশই নয় সারা

ভারতবর্ষে মার্শল ল' জারি করে দেওয়া হলে আমি খুশী হব। ইংরেজরা দেশময় যে বুরোক্র্যাসীর জাল বুনেছেন সেটা তো আগে খতম্ হোক আর প্রত্যেকটি ভারতবাসী অনুভব করুক যে তারা গোলাম। যে সব ভারতীয় নিজেদের সিভিলিয়ন বলেন আর সরকারী চাকরি করছেন, এই সরকার সেই ভারতীয়দের অবলম্বন করেই কায়েম হয়েছে।"

সত্যব্রতের কথা গঙ্গাপ্রসাদের ভালো লাগল না, বিশেষ করে তাঁকেও এর মধ্যে টানা হয়েছে ব'লে। কিন্তু সত্যব্রত যা বললেন সেটা অস্বীকার তো করা যায় না। তিনি সত্যব্রতের দিকে তাকালেন—এই অনুভবহীন যুবক, এত বড়ো সত্য কথাটা বললে কী করে! কিন্তু সত্যব্রত যা বলেছে তার উল্টো দিকটা তো আছে। তিনি সত্যব্রতকে প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু সত্যব্রত, এই তো ভারতীয় সেনা? এদেরই সহায়তায় আঠ্যারশ সাতান্ন সালের সেপাই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, তাদের কী করবে? সৈন্যবাহিনীর জোরেই মুষ্টিমেয় ইংরেজ এত বড়ো দেশটাকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। সত্যব্রত, এই মার্শাল ল' বড়ো ভয়ানক, এটার কামনা করো না।"

সত্যব্রত উঠে দাঁড়ালেন, "জয়েন্ট সাহেব, আমি জানি গোলামির প্রতি বিদ্রোহ করা, গোলামির বিরুদ্ধে লড়াই করাই আমাদের ধর্ম। এই বিদ্রোহ আর লড়াইয়ের ফলাফল কি হবে, সে নিয়ে চিন্তা আর বাদবিবাদটা হ'ল ভীরুতা। এই ভীরুতার জন্যেই ভারতীয়দের অস্তিত্ব ভেড়া ছাগলের মতো হয়ে গেল। আচ্ছা, আপনার যদি কালেক্টার সাহেবের কাছে যাবার থাকে তাহলে আমিও কংগ্রেস অফিসে চলি, সম্ভবতঃ সেখানেও কোনো খবর এসে থাকবে। এই থমথমে পরিস্থিতে আমাদেরও কিছু করার রয়েছে। জ্ঞানপ্রকাশজি চলুন, আপনিই বা এখানে একা বসে থেকে কি করবেন।"

গঙ্গাপ্রসাদ জ্ঞানপ্রকাশকে বললেন, "হ্যাঁ কাকা, তুমিও তাহলে এস।"

"কিন্তু এখন এই চৌরিচৌরার খবরটা কারো কাছে যেন প্রকাশ করো না। তাহলে আমি আবার সরকারী খবর ফাঁস করার অভিযোগে পড়ে যাব। মনে হয় সরকার ঘুরিয়ে খবরটি সাধারণে প্রকাশ করবেন। কিন্তু কাকা, জেলের বাইরে তোমরা দুজন হচ্ছ দায়িত্বশীল কংগ্রেস নেতা। আমি তোমাদের বলছি এই আন্দোলনকে এখানেই থামিয়ে দাও। নইলে সাংঘাতিক অনর্থ ঘটে যাবে। ভারতীয়রা ভারতীয়দের হত্যা করবে, পুড়িয়ে মারবে, এইভাবে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। গাঁয়ে, শহরে লুটতরাজ, মারধর আর অরাজকতা এসে যাবে।"

পরের দিন চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ডের খবরটা দেশময় রটে গেল। যা কিছু ঘটেছিল সে বড়ো ভয়ানক। জনতা উত্তেজিত হয়ে কী দারুণ উগ্ররূপ ধারণ করতে পারে! সরকারী অফিসার আর কর্মকর্তাদের মনে আতঙ্কের ছায়া নেমেছিল। সেই আতঙ্কের প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে তাঁদের মনে জিঘাংসা জেগে উঠল। যুদ্ধের শ্রীদুর্গা ফাঁদা হয়েছিল আর সারা দেশের কংগ্রেস সংগঠনে ভরে উঠেছিল এক রকম উত্তেজনা।

সেদিন অল্প এক পশলা বৃষ্টি হ'ল। আগের রাত থেকে ঠাণ্ডা পড়েছিল। গঙ্গাপ্রসাদ কাছারি যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন এমন সময় জ্ঞানপ্রকাশ ঘরে ঢুকে বললেন, "গঙ্গা, আমি এই ট্রেনেই এলাহাবাদ যাচ্ছি কাল রাত্রে কংগ্রেস কমিটিতে আমার নামে তার এসেছিল, সেখানে আমার উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মন্ত্রীর চিঠিও এইমাত্র পেলাম, সেখানকার পরিস্থিতি বিচিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

গঙ্গাপ্রসাদ কৌতূহলী দৃষ্টিতে জ্ঞানপ্রকাশের দিকে তাকালেন, "কাকা, পরিস্থিতি কি হয়েছে, আপত্তি না থাকে তো বল আমাকে।"

"খবরের কাগজে পড়ে থাকবে মহাত্মা গান্ধী এই ব্যাপক সত্যাগ্রহ গুটিয়ে নিতে চাইছেন। বারই ফেব্রুয়ারি বারদৌলিতে কংগ্রেস

কর্ম সমিতির বৈঠক হবে, এ খবরও পড়ে থাকবে। মনে হচ্ছে এই অধিবেশনে গান্ধীজির প্রস্তাব পাস হয়ে যাবে।"

গঙ্গাপ্রসাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন, "আমি কি বলিনি কাকা, মহাত্মা গান্ধী সত্যিই দেশের পরিস্থিতি ভালোভাবেই বোঝেন। উনি যা করেছেন ঠিক্ই করছেন। এর জন্যে তোমাদের মাথাব্যথার দরকার নাই।"

"এগিয়ে গিয়ে পিছু হটলে সে হবে আমাদের পরাজয়। জয় যখন সুনিশ্চিত আমরা তখনই পিছু হঠছি।"

গঙ্গাপ্রসাদ মৃদু হাসলেন, "বিজয় না বিনাশ, সামনে যে কি—সেটা তোমার চেয়ে ভালো বোঝেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু তুমি এলাহাবাদে গিয়ে করবেটা কি? শোন কাকা, বাপ্পা এখনও পর্যন্ত ফেরেননি, আজ এগার তারিখ হ'ল। তুমি এখানে রয়েছে, আমারও মন লাগছে। আমার কথা যদি শোন তাহলে আরও এক-আধ সপ্তাহ এখানে থেকে যাও। কংগ্রেসের কোনো কাজ তোমা-বিনে আটকে থাকবে না।"

জ্ঞানপ্রকাশ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে একটু তিক্ত স্বরেই বললেন "কাজ আটকাচ্ছে আবার না আটকাচ্ছেও বটে। এই আন্দোলনটাকে চালিয়ে যাবার ব্যবস্থাপনা করার দায় ছিল আমার ওপর; তবে এখন আর টাকা পাব বলেও তো মনে হয় না। কানপুরের ব্যবসায়ী আর মিলমালিকরা এখানে আবার বাহানা আরম্ভ করেছে। কাল তো পরিষ্কার জবাবই দিয়েছিল। লক্ষ্মীচন্দ পঞ্চাশ হাজার দেবো বলে কথা দিয়েছিল, কিন্তু কাল স্পষ্ট অস্বীকার করলে।"

গঙ্গাপ্রসাদ হাসলেন, "শাবাস স্যার লক্ষ্মীচন্দ! বুদ্ধিমান লোক বটে! আন্দোলন চললে সে সাহায্য দিতে পারে বটে কিন্তু যুদ্ধ আর অরাজকতার প্রশ্নে সে কি আর সাহায্য দেবে! বেশ, আপনি আসুন, কংগ্রেসীদের অর্থযোগের মিথ্যে প্রত্যাশাকেও নিঃশেষ করে দিন। কিন্তু গিয়েই বাপ্পা এবং আর সবাইকে পাঠিয়ে দেবেন—কালকের মধ্যেই যেন এসে যান।"

জ্ঞানপ্রকাশ সহজে চটবার লোক নন—এখন তাঁর মুখ যেন রাগে থমথম করছিল, "সবাইকেই পাঠিয়ে দেব। না এলে জোর করে তাদের গাড়িতে চাপিয়ে দেব। কিন্তু গঙ্গা, এই লক্ষ্মীচন্দ লোকটা বড়ো নীচ প্রকৃতির। এই স্বদেশী আন্দোলনে সে প্রায় পাঁচ ছ'লাখ টাকা লাভ করেছে। এর মধ্যেই আর একটি কাপড়ের মিল খুলতে যাচ্ছে। আর এখনই সে একদম অস্বীকার করছে। এলাহাবাদে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে আমি কি করে মুখ দেখাব? আমরা এলাহাবাদে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক আর কর্ম-কর্তাদের যে র‍্যালী ডেকেছি তাতেই প্রায় দু-তিন হাজার টাকার মতন খরচা হবে। সেখানে আমাদের তহবিল ফাঁকা। লক্ষ্মীচন্দের কাছ থেকে আজ সকালে আমি পাঁচ হাজার চাইলাম, কিন্তু সে বললে তার কাছে একটি পয়সাও নেই। একশ টাকার মাত্র পাঁচ খানা নোট বের করে বললে যে তার কাছে মাত্র এই নগদ রয়েছে—অথচ কালকেই সে তিন লাখ টাকার হুণ্ডী ভাঙ্গিয়েছে।

গঙ্গাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কাকা, তাহলে সে আপনাকে শূন্য হাতে বিদেয় দিয়েছে বলুন। এলাহাবাদ যাবার জন্যে ভাড়ার খরচা আছে, না আমি দেব?"

জ্ঞানপ্রকাশ রাগ করে বললেন, "বাছাধন, তোমার কাছ থেকে রাহা খরচ চাইব, এত কাঁচা লোক আমি নই। লক্ষ্মীচন্দ 'না' 'না' করছিল, কিন্তু পাঁচশ' টাকা তো আমি কেড়েই নিয়ে এসেছি। জানো তো—'ভাগল-বা চোরের কপনিই লাভ।' আরো পাঁচশ' টাকা এধার ওধার থেকে জোগাড় করলাম। হাজার টাকা তো এখন আমার পকেটে, আরও হাজার খানেক মতো চাই। বুঝতে পারছি না কি করা যায়।"

গঙ্গাপ্রসাদ তখন খোসমেজাজে ছিলেন। বললেন, "কাকা, অল্পক্ষণের জন্যে যদি তুমি শান্তি সভার সদস্য হয়ে যাও তাহলে আজই আমি তোমার ঐ হাজার টাকার সুরাহা করে দিতে পারি।"

জ্ঞানপ্রকাশ চমকে উঠলেন, "শান্তি সভা! বাপধন, মাথা ঠিক্ আছে তো, শান্তি সভায় যেতে বলছ আমাকে!"

গঙ্গাপ্রসাদ মৃদু হাসলেন, "কাকা, তুমি নও তোমার দাদা রায় সাহেব সত্যপ্রকাশ শান্তি সভার প্রেসিডেন্ট। যাক্‌গে, এই সামান্য কথায় কিছু মনে করো না। আমার উদ্দেশ্য মহৎ। বিপদ থেকে তোমাকে উদ্ধার করা, অর্থাৎ তোমার ঐ এক হাজার নগদ ব্যবস্থা করা। না হলে আমার মনে হচ্ছে এ টাকাটা তোমাকে পকেট থেকেই খসাতে হবে। কাকা, বল, ঠিক কি না?"

"হ্যাঁ, এ টাকাটা আমার পকেট থেকেই যাবে।" জ্ঞানপ্রকাশ হতাশ হয়ে বললেন, "কিন্তু শান্তি সভার সদস্য হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আর এভাবে টাকাই বা পাব কি করে?"

"তা সম্ভব হতে পারে, এখানে 'নুর অহমদ মঞ্জুর অহমদ' নামে ফার্মের দুটো টেনারী আছে। খান বাহাদুর নুর অহমদ সরকারের বড়ো অনুগত। আমি কাল তাঁকে শান্তি সভার জন্যে চাঁদার কথা বলেছিলাম, তিনি এক হাজার টাকা দেবেন বলেছেন। আমি তাঁকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। এক হাজার টাকা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নাও। কিন্তু সেখানে সুট পরে যেতে হবে।"

"আর চাঁদার রসিদ?" জ্ঞানপ্রকাশ প্রশ্ন করলেন।

"আমি তাঁদের রসিদ পাঠিয়ে দেব। ব্যাপারটা এই, লক্ষ্মীচন্দ শান্তি সভাকে দু'হাজার টাকা দিয়েছে, কিন্তু তাকে আমি এখনও রসিদ পাঠাইনি। টাকা যা আসে সেটা ব্যাঙ্কে জমা করে শান্তি সভার হিসেবের খাতাতে তুলে নিই, কিন্তু রসিদটা পরে কাটি। না হয় লক্ষ্মীচন্দকে এক হাজার টাকারই রসিদ দিয়ে দেব। আমার কাছে টাকা থাকলে এই পাজি খান বাহাদুরটার কাছে তোমাকে পাঠাতাম না।"

জ্ঞানপ্রকাশের মুখে ম্লান হাসির রেখা দেখা দিল, "বাপধন, তাহলে জাল করতে খুব ওস্তাদ হয়েছ দেখছি।"

"চাচাজান, তোমার জন্যেই তো এসব করছি, নইলে কংগ্রেস তো আমার প্রাণের শত্রু।"

জ্ঞানপ্রকাশ দিনের গাড়িটা ছেড়ে দিলেন, টাকা নিয়ে সন্ধ্যের গাড়িতে এলাহাবাদ রওনা হলেন।

অনুমান মতো বারদৌলির কংগ্রেস কর্মসমিতি মহাত্মা গান্ধীর ব্যাপক সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার প্রস্তাবটি পাস করলেন। দেশময় নিরাশা আর গ্লানির ঢেউ খেলে গেল। কিন্তু তবু কর্ম-কর্তাদের একটা দল আন্দোলনকে চালাবার চেষ্টা করছিলেন। দিল্লীতে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি অখিল ভারতীয় কংগ্রেস মহাসমিতির অধিবেশন। জ্ঞানপ্রকাশ আর সত্যব্রত উভয়েই মহাসমিতির সদস্য। সত্যাগ্রহকে স্থগিত রাখা অধিকাংশ সদস্যেরই ভালো লাগছিল না। কিন্তু প্রভাবশালী সদস্যরা জেলে আটক ছিলেন। যাঁরা অধিবেশনে যোগ দিলেন তাঁদের মধ্যে আবেগের উত্তেজনা ছিল কিন্তু কাজের কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সত্যগ্রহের পরিকল্পনাটা হ'ল মহাত্মা গান্ধীর; তিনিই এর পরিচালনা করতে পারতেন। অবশ্য অনেকেই তাই চেয়েছিলেন, মহাত্মা গান্ধীরও সম্মতি ছিল এতে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চলতেই থাকবে, তবে এই ব্যাপারে এগুতে হবে সতর্ক হয়ে। ইত্যবসরে গঠনমূলক কর্মক্রম পরিবর্তন করে জনসাধারণকে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত করা হোক্। এই গঠনমূলক কর্মক্রমের খসড়া ছিল মহাত্মা গান্ধীর কাছে।

সত্যব্রত দিল্লী থেকে কানপুরে ফিরলেন। কিন্তু জ্ঞানপ্রকাশ চলে গেলেন সোজা এলাহাবাদে। কংগ্রেসকে নতুন করে সংগঠিত করবার জন্যে। এলাহাবাদে কংগ্রেস কর্মকর্তাদের একটা বিশেষ ক্যাম্প বসবার কথা ছিল। আন্দোলন চালানোর উদ্দেশে আর্থিক বুনিয়াদ পাকা করবার জন্য স্থায়ী তহবিল গঠন করবার জোর চেষ্টা চালানো হ'ল। এলাহাবাদের এই ক্যাম্পে কানপুর থেকেও কংগ্রেস কর্মকর্তাদের বড়ো একটা দল যাচ্ছিল।

গঙ্গাপ্রসাদ সেদিন আফিস থেকে ফিরলেন দেরীতে। কালেক্টার

সাহেবের ওখানে শহরের সরকারী আফিসারদের একটা মিটিং ছিল। তাতে কংগ্রেসের আগামী কর্মধারার মোকাবিলা করবার জন্যে কি উপায় অবলম্বন করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল। মিটিংয়ে কালেক্টার সাহেবের কতকগুলি প্রস্তাব গঙ্গাপ্রসাদের মনঃপূত হ'ল না। অবশ্য কালেক্টার সাহেবের মনেও সে বিষয় সন্দেহ ছিল, কিন্তু প্রস্তাবগুলি এসেছিল উপরওয়ালাদের কাছ থেকে। সেদিন গঙ্গাপ্রসাদ শরীরে ও মনে বিশেষ ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তাঁর অজ্ঞাতসারেই ভিতরে ভিতরে এই আন্দোলনের প্রতি যেন তাঁর একটা সহানুভূতি জেগে উঠেছিল। আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার সময় সেই মিটিংয়েই কালেক্টার সাহেব বলেছিলেন, 'হোলিতে মুসলমানদের গায়ে রং দিলে অশান্তি হতে পারে'। এই ইঙ্গিতটি গঙ্গাপ্রসাদের কিন্তু অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তবে তিনি সত্যিই অবাক্ হয়ে গেলেন, মুসলমান আফিসাররা কালেক্টার সাহেবের ইঙ্গিত সমর্থন করলেন দেখে। তাঁরা বললেন, 'মুসলমানদের ক্রোধ আর অন্ধ সংস্কারে এতে ইন্ধন যোগান হবে'। গঙ্গাপ্রসাদ ভাবছিলেন, হাজার হাজার বছর ধরে তো হোলি চলে আসছে, কিন্তু কই কোনদিন তো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধেনি। হিন্দু-মুসলমানেরা বরং একজোটেই হোলি খেলে এসেছে। এবারকার হোলির সময় সাম্প্রদায়িক অশান্তি হতে পারে—একথা বলার সার্থকতা কি?

দশ

মিষ্টার হ্যারিসনের ডিনার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন মাত্র বারজন। তার মধ্যে ছ'জন ভারতীয়, চার জন হিন্দু আর দু'জন মুসলমান— স্যার লক্ষ্মীচন্দ, রাজা শিবকুমার, রায় বাহাদুর গোপীনাথ আর গঙ্গাপ্রসাদ, খান বাহাদুর নুর অহমদ আর নবাব অশফাক হুসেন। সবাই একত্র হয়ে মদের আর কথাবার্তার জোয়ার চালিয়ে দিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের মনে হ'ল এটা যেন একটা রাজনৈতিক ডিনার। ইংরেজদের মধ্যে কালেক্টার আর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাড়া চারজন ছিলেন মিলমালিক।

মিষ্টার হ্যারিসন একটু অধিক মাত্রায় পান করেছিলেন, বোধহয় সামান্য উত্তেজিতও হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, "এই গান্ধীটাকে মাত্র ছ'বছরের জন্যে আটকানো হল। এই পাঁড় বিদ্রোহীটা সারা ভারতে যেভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়েছে, তাতে গুলি ক'রে তার খুলিটা উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কি বলেন স্যার লক্ষ্মীচন্দ ?"

লক্ষ্মীচন্দ তাঁর কথার কোনো উত্তর দিলেন না। উত্তর দিলেন রায় বাহাদুর গোপীনাথ, "যাক্, আপদটা বিদায় হ'ল। বদমাশটা তো আমার ব্যবসাটাই ডকে তুলতে বসেছিল। ম্যানচেষ্টার থেকে আমার কাপড় আসে পাঁচ লক্ষ টাকার মতো, খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।"

খান বাহাদুর নুর অহমদ বললেন, "গোপীনাথ সাহেব, বেড়ে বলেছেন আপনি! লোকটা খাঁটি বিদ্রোহী, কী ভয়ানক আগুনটাই না লাগিয়ে দিয়েছে।"

মিষ্টার হ্যারিসন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "তবে সে আগুন নিভে গেছে। আমি আপনাদের জানাতে চাই, আজ আমি এই যে খোশ মেজাজে ডিনার দিয়েছি সেটা সেই জঙ্গলী জানোয়ার দেশদ্রোহীকে আটক করার ঘটনাকে উপলক্ষ করেই।

গঙ্গাপ্রসাদ ভারতীয় বন্ধুদের দিকে তাকালেন। এই লোকটার অশিষ্ট আচরণে কারো মুখে কোনো বিকৃতি দেখা গেল না। তিনি আর থাকতে পারলেন না, "মিষ্টার হ্যারিসন, আপনি যদি আগে এই ডিনানের কু-অভিসন্ধিটা ফাঁস করতেন তাহলে অন্ততঃ আমি এই ডিনার বয়কট করতাম। মনে হয় পাঁচ ছ'জনও আসতেন না।"

আমন্ত্রিত সকলে গঙ্গাপ্রসাদের কথায় যেন চমকে উঠলেন। মিষ্টার হ্যারিসন কানপুরের খুব বড়ো একজন পুঁজিপতি আর মিলমালিক। ইংল্যাণ্ডের কোন্ এক অভিজাত লর্ড বংশীয় বলে

আত্মপরিচয় দিতেন। উগ্র স্বভাবের জন্যে তিনি ছিলেন কুখ্যাত। গঙ্গাপ্রসাদের কথায় তাঁর মুখটা রাগে থমথম ক'রে উঠল, "তাহলে বদমাশ, লম্পট, মিথ্যাবাদী, প্রতারক গান্ধীটাকে আপনি কি মহাত্মা বলে মনে করেন ?"

হ্যারিসনের এই অনাবশ্যক গালি বর্ষণে গঙ্গাপ্রসাদ তিরিক্ষি হয়ে উঠলেন, "মিষ্টার হ্যারিসন তুমি নীচ, তুমি লম্পট সেইজন্যেই তুমি সেই মহাপুরুষকে গালাগালি দিতে সাহস পাচ্ছ। তাঁর রাজনীতি আমরা মানতে না পারি, কিন্তু তাঁর মহত্ব, সততা আর ভদ্রতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।"

হ্যারিসন উঠে দাঁড়ালেন, "তুমি আমাকে নীচ, লম্পট বললে, তুমি কালা আদমী! আমরা তোমাকে মাথায় তুলেছি আর এই তার ফল! আর একবার বল, তোমার মুখ ভেঙ্গে দেব।"

গঙ্গাপ্রসাদ আস্তিন গোটাতে গোটাতে উঠে দাঁড়ালেন, "তুমি লম্পট, নীচ, হারামজাদা।"

একটা হাঙ্গামা বেধে গেল। উপস্থিত অতিথিরা উভয়কে ছাড়িয়ে দিলেন। হ্যারিসনের ভুল হয়েছিল ঠিক্ই। সবাই বিশেষ করে ইংরেজ মিলমালিকগণ চেপে ধরায় মিষ্টার হ্যারিসন মহাত্মা গান্ধীর প্রতি নিক্ষিপ্ত অশ্রাব্য শব্দগুলো ফিরিয়ে নিলেন। পরিবেশ আবার শান্ত হ'ল, অতিথিরা খানাপিনা শুরু করলেন।

পরদিন গঙ্গাপ্রসাদ কাছারিতে গেলে কালেক্টার সাহেবের চাপরাসী এসে বললে, "হুজুর সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।"

গঙ্গাপ্রসাদ সোজা কালেক্টারের কাছে গেলেন। কালেক্টার সাহেব বললেন, "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, এই হ্যারিসনটা নম্বরী পাজি আর বদমেজাজী।"

"স্যার, সে বেহুস ছিল আর আমিও একটু বেশী মাত্রায় পান ক'রে ফেলেছিলাম," গঙ্গাপ্রসাদ ইতস্তত ক'রে বললেন।

"না, তোমার কোনো অন্যায় হয়নি। কিন্তু এই হ্যারিসন

তোমার পেছনে লেগেছে। আমার মাধ্যমে কমিশ্‌নারের কাছে সে সরকারীভাবে তোমার নামে নালিশ ঠুকেছে। এই দেখ তার চিঠি।" এই বলে কালেক্টার সাহেব গঙ্গাপ্রসাদের হাতে হ্যারিসনের চিঠিটা দিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ চিঠি পড়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। হ্যারিসন, তাঁর ওপর কংগ্রেসী মনোভাবের অভিযোগ এনেছে। আগের রাতের ঘটনাটা অতিরঞ্জিত ক'রে বর্ণনা করেছে। চিঠি পড়ে গঙ্গাপ্রসাদ কালেক্টার সাহেবকে বললেন, "স্যার, আপনি তো জানেন এসব মিথ্যে।"

"হ্যাঁ, বিদ্বেষপ্রসূত মিথ্যে। আমি এই চিঠিতে নোট তো লিখছি, কিন্তু কমিশ্‌নারের সঙ্গে এই ফাঁকে তুমি একটু দেখা ক'রে নিলে ভালো হয়। মনে হয় হ্যারিসনের কথায় কমিশ্‌নার গুরুত্ব দেবেন। তোমার ওপর তিনি একবার বিরূপ হলে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কমিশ্‌নারের কাছে তোমার নালিশ পৌঁছবার আগেই তুমি তাঁর কানে খুশী মতো এই কেচ্ছাটা তুলে দিয়ে এস। আমার নোট যাবে তোমার অনুকূলে।"

কালেক্টারের কাছ থেকে ফিরে এসে গঙ্গাপ্রসাদ চার দিনের ছুটির আবেদন করলেন। কালেক্টার তক্ষুনি মঞ্জুর ক'রে দিলেন।

এলাহাবাদে পৌঁছেই গঙ্গাপ্রসাদ কমিশ্‌নারের সহিত দেখা করলেন। গঙ্গাপ্রসাদের কথা শুনে তিনি বললেন, "তাহলে তুমি গান্ধীকে কি সত্যিই মহাত্মা মনে কর? সে অর্ধসভ্য বিদ্রোহী মহাত্মা, এই কি তোমার অভিমত?" কমিশ্‌নারের স্বরে ব্যঙ্গ।

গঙ্গাপ্রসাদ সবিনয়ে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "হুজুর, আমি তাঁর প্রজ্ঞা আর রাজনীতির সঙ্গে একমত না হতে পারি, কিন্তু তাঁর চরিত্র ও সততার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দোষ কি। মানুষের গুণের সমাদর করলে ব্রিটিশ জাতি বাধা দেবে, তাঁরা এতখানি অনুদার নয় বলেই আমার ধারণা।"

কমিশ্‌নার জিভ কেটে বললেন, "ব্রিটিশ জাতি এতটা অনুদার

নয় বটে, তবে ব্যক্তিগত ভাবে কেউ অনুদার হতে পারে তো। তুমি যা বলছ তা ঠিক্ হলে হ্যারিসনের নালিশের গুরুত্ব দেব না।"

গঙ্গাপ্রসাদ খুশী হয়ে বললেন, "স্যার" বলেই ওঠবার জন্যে উদ্যত হলেন। কমিশ্‌নার বললেন, "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, কিন্তু একটা কথা ভবিষ্যতের জন্যে মনে রাখবে—ইংরেজ ইংরেজ, ভারতীয় ভারতীয়। ইংরেজ হ'ল শাসক আর বাকিরা শাসিত। একথাটা তোমার মনোমত না হতে পারে কিন্তু এটাই হ'ল বাস্তব সত্য। সেইজন্যে ভবিষ্যতে এরকম ঘটনায় তোমার চুপ থাকাই মঙ্গল।"

কমিশ্‌নারের পরামর্শ তিনি তক্ষুণি স্বীকার করে বললেন, "যে আজ্ঞে স্যার।" আন্দোলন প্রায় নিভে আসছিল এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল নিরাশার ঢেউ। কংগ্রেসের নীতিকে আবার নতুন করে আলোচনা করার প্রয়োজন হ'ল। সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা প্রকাশ্যেই চাইছিল অসহযোগ আন্দোলনের পরিবর্তে শুরু হোক সহযোগিতার সঙ্গে বিরোধ জানাবার নীতি।

গঙ্গাপ্রসাদ মনের মধ্যে একটা বিচিত্র পরিবর্তন অনুভব করছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের এই শৈথিল্যে তিনি প্রসন্ন হতে পারলেন না ; অশান্তিতে তাঁর মন ভরে উঠল। কিন্তু এই অশান্তির কারণটা তাঁর জানা ছিল না। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর অশান্তির কারণটা ঠাহর করতে পারলেন। 'এটা' শহরে ডেপুটি কালেক্টারের পদে তাঁকে অনাবশ্যক বদলী করা হয়েছিল। একদিন সকালে চা-পর্বের সময় সরকারী অর্ডারটা তাঁর হাতে এল। ভোজন অসমাপ্ত রেখেই উঠে দাঁড়ালেন। "আচ্ছা পুরষ্কার মিললো বটে !"

অসহযোগ আন্দোলন দমনে তিনি যা যা করেছিলেন, সেসব ঘটনা উপর মহলে অবিদিত ছিল না। ফলে তাঁর ধারণা ছিল শীঘ্রই তাঁর পদোন্নতি হবে আর জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেই তিনি

পাকা হবেন। কানপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর ছুটি ১৯২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ ভাবছিলেন তাঁর আর বদলী হবে না। পোষাক বদলে তিনি তৎক্ষণাৎ কালেক্টারের কাছে গেলেন। কালেক্টার সাহেব তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন, "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, তোমার বদলীর জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার মনে হয় এটা দায়ে পড়েই করা হয়েছে। কাণপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদটা হল আই.সি.এস.এর। সম্ভবতঃ কিছু নতুন আই.সি.এস. এসে গেছে, তাদের তো কোথাও নিয়োগ করতেই হবে।"

"তাহলে তো স্যার, কোনো আই.সি.এস.কেই অস্থায়ী জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে ডাকা উচিত ছিল। আই.সি.এস. দের জন্যে সংরক্ষিত পদ আমাকে কেন দেওয়া হয়েছিল?"

"কারণটা মনে হয়, সে সময় অসহযোগ আন্দোলন জোর চলছিল আর তার মোকাবিলার জন্যে একজন যোগ্য আর অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন ছিল, তাই তোমাকে এখানে আনা হয়েছিল।"

তিক্ত স্বরে গঙ্গাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "আর এখন আন্দোলন খতম হয়ে গেছে। এই তো কথা! আন্দোলন শেষ হয়ে যেতেই ভারতীয় বলে দুধের মাছির মতো আমাকে তুলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে—তাই না!"

কালেক্টার গঙ্গাপ্রসাদকে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, আই.সি.এস. সংস্থায় যোগ্য ইংরেজ যুবকদেরই নেওয়া হয়…ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজ্যের ভরসা হলেন এই আই.সি.এস.গণ। দায়িত্বপূর্ণ যত সরকারী চাকরি সব পদেই আই.সি.এস. দেরই নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কানপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ।"

কমিশ্‌নারের কথাটা গঙ্গাপ্রসাদের এই সময় মনে পড়ে গেল। কয়েক মাস আগেই একথা তিনি তাঁকে বলেছিলেন। তিনি কমিশ্‌-নারের কথার পুনরুক্তি ক'রে বললেন, "আজ্ঞে আমি মানি,

'ইংরেজ ইংরেজ আর ভারতীয় ভারতীয়। একে শাসক, অপরে শাসিত।' আর আই.সি. এস.রা হ'ল শাসককুল।" গঙ্গাপ্রসাদের মুখের ওপর তিক্ত হাসি দেখা দিল, ধন্যবাদ স্যার, এরপরে আমার আর কিছু বলার নেই, আমার প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গেল।"

গঙ্গাপ্রসাদের উক্তিতে কালেক্টার বিরক্ত হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে কতখানি যে চাপা বেদনা মিশ্রিত রয়েছে, কালেক্টার তা অনুভব করলেন। গঙ্গাপ্রসাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল, "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ, আমার মনে হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকারকে শীঘ্রই তার নিজস্ব পথ বদল করতে হবে। তোমার প্রতি অবিচার হচ্ছে, তা আমি স্বীকার করি। আমি তোমাকে বলি, তুমি একবার চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা কর। তোমার রেকর্ড তো খুব ভালো। বুঝতে পারছি না তোমাকে এ পদে পাঠান হচ্ছে কেন!"

গঙ্গাপ্রসাদ চীফ সেক্রেটারির কাছে গেলে তিনি বললেন, 'মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ আমি দুঃখিত কারণ এখন তোমাকে 'এটা' শহরের ব্যবস্থাপনার জন্যেই পাঠাতে হচ্ছে। আমি তো তোমাকে কানপুরেই রাখতাম, কিন্তু···কিন্তু, থাক্‌গে সেসব কথা, এখন থাক্‌। প্রত্যেকের নিজস্ব দায়-দায়িত্ব থাকে তো। তবে হ্যাঁ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছুটি নিয়ে নাও, জানুয়ারী মাসে আমি তোমাকে কোনো ভালো জায়গায় পাঠিয়ে দেব। ততদিনে যা হয় একটা কিছু ঠিক্‌ হয়ে যাবে।"

গঙ্গাপ্রসাদের অবাক্‌ লাগল, চীফ সেক্রেটারি আই. সি. এস.দের নিয়ে কোনো অসুবিধার কথা তুললেন না কেন। তাঁর সামনে কিসের যে দায়দফা ছিল সেটা গঙ্গাপ্রসাদ বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি ছুটির আবেদন পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে চীফ সেক্রেটারি মঞ্জুর ক'রে দিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের বিদায় উপলক্ষে লক্ষ্মীচন্দ একটা পার্টি দিলেন। শহরের প্রধান ব্যবসাদার, মিলমালিক, জমিদার আর সরকারী অফিসারদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ চলে যাচ্ছেন বলে

সবাই দুঃখ প্রকাশ করলেন। পার্টির শেষে সবাই যখন উঠে যাচ্ছেন, হ্যারিসন গঙ্গাপ্রসাদের কাছে এলেন। তাঁর মুখের ওপর খেলছিল একটা শয়তানি উল্লাস। গঙ্গাপ্রসাদের কানে -কানে নীচু গলায় বললেন, "মিষ্টার গঙ্গাপ্রসাদ; যেন আর কোনো দিন কোনো ইংরেজের সঙ্গে বাদবিবাদ করার ধৃষ্টতা দেখিও না," এই বলে হাসতে হাসতে ক্ষিপ্র বেগে চলে গেলেন।

হ্যারিসনের বিদ্রূপ শোনা মাত্রই গঙ্গাপ্রসাদের মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, চীফ সেক্রেটারির 'দায়দফার' কারণটা তিনি বুঝে নিলেন।

বর্ষা শেষ হয়েছে। পরিবেশ অসহ্য গুমোটে ভরা। গঙ্গাপ্রসাদ ঠিক্ করে নিয়েছিলেন যে আগস্ট মাসটা এলাহাবাদে কাটিয়ে জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে দক্ষিণাত্য-ভ্রমণে যাবেন। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের মনে যে আগুন জ্বলছিল সেটা যেন ক্রমশঃ বেড়েই উঠছিল। তিনি মনে মনে বেশ অনুভব করছিলেন, শুধু ভারতীয় বলেই একটা অসভ্য ও দুর্দান্ত ইংরেজ তাঁকে পরাজিত করেছে। তাঁর পরাজয়ের মূল কারণটাই হ'ল ব্রিটিশ সরকারের বর্ণ-বিদ্বেষ। আপন অজ্ঞাত-সারেই তিনি যেন জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলেন। একজন গোলামের কাছে সত্য, ন্যায়, মানবতার কোনো মূল্যবোধই থাকতে পারে না। গোলাম হ'ল পোষা জানোয়ার। তাকে চলতে হয় মালিকের ইশারায়। তার না আছে কোনো চেতনা, না আছে কোনো অনুভূতি। এই ভেবে অন্তরের বিদ্রোহটাকে যতই তিনি দমন করবার চেষ্টা করছিলেন, ততই যেন সেটা প্রচণ্ড হয়ে উঠছিল।

সেদিন শহর থেকে বেড়িয়ে ফিরে দেখলেন, জ্ঞানপ্রকাশ ও ফরহতুল্লা বারান্দায় বসে কথা বলছেন। গঙ্গাপ্রসাদ এগিয়ে এসে বললেন, "আদাব হ্যায় ফরহতুল্লা সাহেব, কখন পায়ের ধূলো পড়ল?"

ফরহতুল্লা উঠতে উঠতে বললেন, "সেলাম মেহেরবান।" এই বলে গঙ্গাপ্রসাদের করমর্দন করলেন, "এখন আমি এলাহাবাদেই

আছি। এসেছিলাম বাবু জ্ঞানপ্রকাশজির সঙ্গে মোলাকাত করতে।"

বসলেন দু'জনে। গঙ্গাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি জৌনপুর ছেড়ে এলেন বুঝি? কিন্তু কেন?"

ফরহতুল্লা মৃদু হাসলেন, "ছেড়ে আর এলুম কই, লোকেরা ছাড়তে বাধ্য করলে। ভাবলাম দু-চার মাস এলাহাবাদে থেকে কংগ্রেসের কাজকর্ম দেখাশোনা করি। আবদুল হক সাহেব আমার বিরুদ্ধে বহুত বিষ উদ্গার করেছেন, সেখানকার মুসলমানদের খুব উসকে দিয়েছেন, আমি হয়রান হয়ে গিয়েছি। ওর সঙ্গে আলিরজাও জোট বেঁধেছিল আর সে তো গুণ্ডামিতে মেতে উঠেছিল। যাক্‌গে, থাক্ এসব কথা। এই মাত্র বাবু জ্ঞানপ্রকাশের মুখে শুনলাম, আপনি নাকি লম্বা ছুটি নিয়েছেন।"

জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, "ফরহতুল্লা সাহেব, সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দূর ক'রে দেওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধী সামাজিক সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের, রাজনৈতিক আর সামাজিক দু'টো কার্যসূচীই যে রয়েছে সে তো আপনি ভালো ভাবেই জানেন।"

"আজ্ঞে, এইজন্যেই তো আমি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি আর গান্ধীজির নেতৃত্ব স্বীকার করেছি। কিন্তু মেহেরবান, আমি মুসলমান। আমার ধর্ম সত্য ও সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা ভুলি কি করে? মাঝেমাঝে মনে বিচিত্র দ্বন্দ্ব আসে। ভাবি যে পথ ধরেছি, সেটা কি ঠিক্? ইসলামের কোন্ বিপরীত নীতি সংশোধন করতে হবে? আবার ভাবি, এ চিন্তাই বা করছি কেন! আপন সাধুতা ও সততার ওপর অটল থেকেই খোদার খেদমত আমার ধর্ম! মেহেরবান, খোদার সেই খেদমত ধর্মপরায়ণতা থেকেই আমি খোদার খেদমত ক'রে থাকি; আমার অস্তিত্বের মুকুর হ'ল আমার ধর্ম," বলতে বলতে ফরহতুল্লা হেসে উঠলেন, "আরে মেহেরবান, এসব কথা ছেড়ে দিন। আমি যা করেছি

সেটা ঠিক্ না আবদুল হক আর আলিরজা যা কিছু করেছেন সেটা ঠিক্, তার বিচার করবেন স্বয়ং মালিক খোদা। আমি ন্যায় আর সাধুতা ছাড়তে পারব না, কারণ এগুলি হ'ল মহাত্মা গান্ধীর সহচর। তাঁর আর একটি শক্তি—অহিংসা। আমি অহিংসার পূজারী আর সেইকারণে কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ বা দ্বেষ নেই।"

ফরহতুল্লা চলে গেলে গঙ্গাপ্রসাদ জ্ঞানপ্রকাশকে বললেন, "চাচাজান, তোমারই পরামর্শ চাই। তুমি তো জান কানপুর থেকে বদলী করার জন্যে আমি লম্বা ছুটি নিয়েছি। কিন্তু তুমি জান না, কেন আমি বদলি হলুম।"

"বাবা, তুমি আমাকে কোনোদিনই তো বলনি আর আমিও জিজ্ঞেস করা উচিত মনে করিনি।"

"তাহলে আজ বলি তোমাকে। একটা অসভ্য ইংরেজ মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে অপমানকর কথা বলায় আমি পাল্টা নিয়েছিলাম, তাই।" গঙ্গাপ্রসাদ হ্যারিসনের কেচ্ছাটা জ্ঞানপ্রকাশকে সবিস্তারে শোনালেন।

"ঠিক্ করেছ বাবা। তুমি এখন বুঝেছ কেন আমি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি।"

"জানি কাকা, এখন আরও বুঝছি, তোমাকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করাটা আমার ভুল হয়েছিল। এখন ভাবছি,......বরঞ্চ এটাই বলা উচিত সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেসে জয়েন করব।"

জ্ঞানপ্রকাশ চমকে উঠলেন, "কী প্রলাপ বকছ! ইস্তফা দেবার পরে তুমি কি করবে শুনি? তোমার স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে, তাদের ভাবনা তোমাকেই ভাবতে হবে। আর দু'বছর পরে নবল কলেজে ভর্তি হবে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। আমার ধারণা, এই চাকরি থেকে সঞ্চয় তুমি কিছু করতে পারনি।"

"হ্যাঁ, সকল্যে দু-আড়াই হাজার মতো ব্যাঙ্কে আছে আর বাপ্পার

কাছেও থাকতে পারে হাজার তিন-চার। আমি ভাবছি এই পাঁচ-ছ'হাজার দিয়েই এলাহাবাদে কোনো ব্যবসাট্যবসা শুরু করব।"

জ্ঞানপ্রকাশ হেসে উঠলেন, "কায়স্থের ছেলে ব্যবসা করবে, জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করার পরে! যা কিছু পুঁজিপাট আছে তাও যাবে বাপধন।"

"আচ্ছা, কারবার দরকার নেই। আমাদের যে সব গয়নাটয়না আছে, সেগুলো বিক্রি করে দিলে হাজার সাত পাওয়া যাবে। আমার এই হীরের আংটিটাও ছ'সাত হাজার টাকায় বিক্রি হবে। তাহলে দশ বার হাজার টাকা দিয়ে একটা বাংলো করিয়ে নিই। তা থেকে একশ' টাকার মাসে ভাড়া আসবে। বসবাসের জন্যে তো এই বাংলোটাই রয়েছে। বাপ্পার পেন্সন আর বাংলোর ভাড়া মিলিয়ে ভালোভাবেই সংসার চলে যাবে।"

"হ্যাঁ, আর যদি মদটা একেবারেই বন্ধ করতে পার বা আমাদের মতো সাদাসিধে ভাবে থাকতে পার, জ্ঞানপ্রকাশ বললেন। "কম-সে-কম দু-চার বছর নইলে ছ'-সাত বছর একটু কষ্ট হবে, তারপরে স্বরাজ এসে গেলে মৌজ করবে।"

গঙ্গাপ্রসাদের সিদ্ধান্তে জ্বালাপ্রসাদ অন্তরে ব্যথা পেলেন। তিনি গঙ্গাপ্রসাদকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন। গঙ্গাপ্রসাদের পক্ষ নিয়েছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ, তবে চুপে চুপে। বাড়িতে দু দিন মন কষাকষির পর্ব চলল, কিন্তু তৃতীয় দিনে জ্বালাপ্রসাদকে সায় দিতে হ'ল।

গঙ্গাপ্রসাদ আর জ্ঞানপ্রকাশ সন্ধ্যেবেলা বসে মিঠে-কড়া ভাষায় ইস্তফাপত্র লিখে ফেললেন। জ্বালাপ্রসাদের পরামর্শে ইস্তফাপত্রে সামান্য রদবদলও করা হ'ল। তারপর জ্ঞানপ্রকাশ টাইপ করলেন। গঙ্গাপ্রসাদ অবিকম্পিত হস্তে ইস্তফাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। গঙ্গাপ্রসাদ ইস্তফাপত্রে দস্তখত করবার সময়ে জ্বালাপ্রসাদ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর চোখ ছলছলিয়ে উঠল। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জ্বালাপ্রসাদ ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র ফরহতুল্লা বারান্দায় ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলেন, "জ্ঞানপ্রকাশজি বাড়িতে আছেন কি?"

ফরহতুল্লার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন আর তাঁর হাতে ছিল 'পায়োনিয়রের' বিশেষ সংস্করণের একটা পৃষ্ঠা। কিন্তু জ্বালাপ্রসাদ সে দিকে খেয়াল করলেন না, অন্যমনস্কভাবে বললেন, "ভিতরে আছেন, আসুন।" জ্বালাপ্রসাদ ফরহতুল্লাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন।

ফরহতুল্লা চৌকাঠ থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, "দারুণ ঘটনা ঘটেছে জ্ঞানপ্রকাশজি, মূলতানে কাল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে গেছে।"

"এঁ্যা, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা, মূলতানে? বলছেন কি আপনি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, 'পায়োনিয়রের' বিশেষ সংস্করণ বের হয়েছে। এবার কী যে হবে, হে খোদা!"

একে একে সবাই সংবাদটা পড়লেন। ঘরের পরিবেশ হতাশায় ভরে উঠল। সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

ফরহতুল্লা বললেন, "মুসলমানদের মধ্যে এ আগুন কে জ্বালাল? আজ রাত্রের গাড়িতেই আমাকে মূলতানে যেতে বলা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত পড়ল।"

জ্ঞানপ্রকাশ বলে উঠলেন, "তাহলে সরকার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ভাঙ্গবার জন্যে মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করলেন।"

গঙ্গাপ্রসাদের সাবেকি ও সুপ্ত ব্যক্তিত্ব হঠাৎ যেন জেগে উঠল, "কাকা, তুমি ভুল করছ। ঐক্য কোনোদিনই ছিল না। কৃত্রিম উপায়েই এটা বিনষ্টও হয়ে যাবে।"

ফরহতুল্লা অবাক্ হয়ে গঙ্গাপ্রসাদের দিকে তাকালেন, "একী বলছেন মেহরবান!"

গঙ্গাপ্রসাদের ঘাড়ে যেন ভূত চাপল, "আমি ঠিক্ই বলছি ফরহতুল্লা সাহেব, এই দাসত্ব থেকে আমাদের আশু মুক্তির পথ তো দেখছি না। আমার মনে হচ্ছে এই দাঙ্গাহাঙ্গামা এখন বেড়েই চলবে। এই তো কলির সন্ধ্যে। সেদিন আপনি বলেছিলেন

হিন্দু মুসলমানের ভেদটা মৌলিক, আর আমি আজ সে কথাটা শুধু স্বীকার করলাম। এই মৌলিক ভেদাভেদের মনোভাব দূর করতে এখনও হাজার হাজার বছর লেগে যাবে। ততদিন আর কে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকবে। চাচাজান, আমি আজ খুব বেঁচে গেছি। গোলামিটা যখন ভোগ করতেই হবে, তখন আরামে হেসে-খেলে ভোগ করাই ভালো নয় কি!" বলতে বলতে গঙ্গাপ্রসাদ নিজের হাতের ইস্তফা পত্রখানাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

তৃতীয় অধ্যায়

এক

নবল চোখ মেলে সামনের টেবিলে এলার্ম টাইমপীসটার দিকে তাকাল। সাড়ে তিনটে বাজে। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। উঠতে ইচ্ছে করছিল না তবুও সে উঠে বসল। সহসা তার মনে পড়ল আজ সকালে সে বি.এ. পরীক্ষার শেষ পেপার দিয়ে এসেছে। আর তাকে পরীক্ষার জন্যে রাত জেগে পড়তে বসতে হবে না। হষ্টেলের কুঠরীর মধ্যে বন্ধ থাকতেও হবে না। তার মন এক ধরণের আনন্দ আর উৎসাহে ভরে উঠলো। কুঠরীর দরজা খুলে দিয়ে অলসভাবে সে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

চোখের সামনে মার্চ মাসের মিঠে সোনালি রোদ। সবুজ দুর্বায় ভরা মখমলী লনের কিনারে কিনারে নানা রঙের ফুলের সমারোহ। কিন্তু এত ফুল এ'ল কোথা থেকে! রঙের কত বিচিত্রতা! এর উৎসই বা কোথায়—এই ছোট ছোট বীজের মধ্যে, না এই মাটিতে, এই জলে, না এই ঋতুতে?

ফুলগুলি ফোটে আবার ঝরে যায়। এই ফুল ফোটা আর ফুল ঝরে যাওয়ার তাৎপর্যই বা কি!

এই সব ফুল সম্পর্কেই বা এত প্রশ্ন, এত শঙ্কা কেন? বিশ্বসৃষ্টির মূলেই তো এই প্রশ্ন। মানুষ জন্মগ্রহণ করে আবার মরে যায়। ভাঙ্গা আর গড়া প্রকৃতির নিয়ম। পরীক্ষা দিতে যাবার আগে টেবিলের ওপর খুলে রেখেছিল ইতিহাসের বইএর পাতা। হঠাৎ নবলের দৃষ্টি তার ওপর পড়ল। বইটা দেখে নবলের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন ছিল, "মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কী?"

সেই প্রশ্নটি লেখার সময় নবল কিছুক্ষণ ভেবেছিল। একবার মনে হ'ল লেখে—"মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন।" কিন্তু লিখলে না ; বই-এ যা পড়া ছিল সেইগুলোই লিখলে। বই-এ যে কারণগুলো লেখা ছিল, নবলের মতে সেগুলি ভুল। ভাঙ্গা আর গড়া—পুরানো ভাঙ্গে, নতুন গড়ে ওঠে ; কিন্তু এটা হল দর্শনশাস্ত্রের কথা, ইতিহাসের নয়।

এই ফুলগুলির কথা তো আর ইতিহাসের বই-এ লেখা নেই। প্রতি বছর বসন্তের সময় অগুনতি ফুল ফোটে আর গ্রীষ্ম আসতে না আসতেই সব শুকিয়ে ঝরে যায়। কিন্তু এই অসীম সৌন্দর্যের সৃষ্টি অনাবশ্যক, আর অকারণই তার বিনাশ ; নবল এর রহস্যটা ঠিক্ বুঝে উঠতে পারছিল না।

নবল হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। ঘরের কোনে স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিল। তারপর আবার চেয়ারে বসে লনের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা কোকিলের 'কুহু কুহু' ডাক শুনতে পেল। কত মধুর কোকিলের স্বর—যেন বসন্ত তার মাদকতার সঙ্গীত কোকিলের স্বরে ঢেলে দিয়েছে! কোকিলের স্বরে উষার সুমধুর সঙ্গীত!

উষা! যেন সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে এসেছে! কতই না মধুর তার স্বর! উষা সামনে এলে সে যেন আত্মহারা, আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে! আর উষা নবলকে অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করে বসে—"আপনি কি ভাবছেন?" নবল সাবধান হয়ে বলে ওঠে, "উষা, আমি ভাবছিলাম, তোমার মতন সুন্দরী ভগবান কি আর কাউকে করেছেন!" নবলের এই উত্তরে উষা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, যেন অথংখ্য ফুল এক সঙ্গে ঝরে পড়ে, "যান, আমাকে আপনি উপহাস করছেন." বলে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। তবে দূরে নয়, একটু গিয়েই থেমে যায়। আবার মুখ গম্ভীর ক'রে ফিরে আসে, একটু তফাতে বসে, কখনো ইতিহাস, কখনো বা সাহিত্যের প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রে নবলকে নিজের চেতনার মধ্যে অভিভূত ক'রে ফেলে।

উষা এ বছরে ইণ্টরমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। এক সপ্তাহ হ'ল তার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রায় এক মাস নবল আর উষার দেখা হয়নি, তার নিজেরও পরীক্ষা ছিল। আজ তার পরীক্ষা শেষ।

উষা রায়বাহাদুর কামতানাথের মেয়ে। রায়বাহাদুর কামতানাথের সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি নবলকিশোরকে বাড়ির ছেলের মতো দেখতেন। নবল জানত রায়বাহাদুর কামতানাথ নবলের সঙ্গে নিজের মেয়ে উষার বিয়ে দিতে চান, উষাও একথা জানত। নবলের মুখের ওপর মৃদু হাসি দেখা দিল। এমন সময় তার দৃষ্টি সামনের স্টোভের ওপর পড়ল—জল ফুটছিল।

নবল উঠে চা তৈরি করে তার অভ্যাস মতো সেখান থেকেই ডাক দিল, "প্রেমশঙ্কর, ও ভাই প্রেমশঙ্কর! চা তৈরী হয়ে গেছে।"

পাশের ঘরের দরজা খোলার আর বন্ধের শব্দ সে শুনতে পেল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমশঙ্কর এসে ঘরে ঢুকল।

"কি নবল আজ তোমার পরীক্ষা কেমন হ'ল?" প্রেমশঙ্কর ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলে।

"ভালোই হয়েছে, হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে যাব," নবল বললে, "ফাস্ট ক্লাস হবে না।"

"এই তো মুসকিল। পরিশ্রম করলে ফাস্ট ক্লাস' তুমি পেতে পারতে। যাক্‌গে, কি আর হবে।" প্রেমশঙ্কর চেয়ারে বসে পড়ল।

প্রেমশঙ্কর চা খেতে খেতে বললে, "নবল, তুমি পরিশ্রম করতে পার কিন্তু তোমার উদ্যম নেই। চেষ্টা ছাড়াই তুমি সব পাচ্ছ।" তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে, "এবার তোমার প্রোগ্রাম কি?"

"প্রোগ্রাম! এখন পর্যন্ত তো কিছুই বলতে পারি না। তবে, সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসে বিলেত যাচ্ছি। সেখানে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেব। পাস পোর্ট হয়ে গেছে, সেখানে থাকবার বন্দোবস্ত করার জন্যে বাবা লেখালিখি করছেন।"

প্রেমশঙ্কর মুচ্‌কে হাসলে, "তুমি আই. সি. এস. হয়ে যাবে, তা

আমি বেশ বলতে পারি। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছিলাম উপস্থিত প্রোগ্রাম কি। তোমার দৌলতে বিকেলের চা-টি পাচ্ছিলাম, এবার থেকে তাও বন্ধ হবে মনে হচ্ছে।”

প্রেমশঙ্কর এল. এল. বি. ফাইনালের ছাত্র। বয়সে নবলের চেয়ে যথেষ্ট বড়ো। কিন্তু দেখলে তাকে নবলের সমবয়সী মনে হয়। গৌর বর্ণ, সুন্দর, মাঝারি চেহারার যুবক, চোখ টানা টানা কালো, মাঝখানে সিঁথি কাটা চুল। প্রেমশঙ্করের সমগ্র ব্যক্তিত্বে এক ধরণের কোমলতা। তার স্বর মিষ্টি আর দৃষ্টি আত্মহারা। প্রেমশঙ্কর ফার্স্ট ডিভিশনে এম. এ. পাশ করে ওকালতি পড়ছিল।

নবল বললে, “এখন সপ্তাহখানেক তো আমি এখানেই আছি। ঠাকুরদাদা লিখেছেন, ফতেপুরে আমার খুড়তুত ভাই-এর বিয়ে, তাঁর সঙ্গে যেন আমিও ফতেপুর যাই। যাবার সময় চায়ের সরঞ্জাম আমি এখানেই রেখে যাব। তুমি সুখইকে দিয়ে চা করিয়ে নেবে, আমি তাকে বলে দেব। তুমি যখন যাবে, এসব জিনিষ সুখইকে দিয়ে যেও। সে আমার বাংলোতে পৌঁছে দেবে।”

প্রেমশঙ্কর মৃদু হাসল, “এসব আমার দ্বারা হবে না। চায়ের অভ্যাস তুমিই করিয়েছিলে। তুমি চলে গেলে এ অভ্যাসটা আমি ছেড়েই দেব।”

হঠাৎ নবলের মনে পড়ে গেল, “কাল সন্ধ্যেবেলা সিভিল লাইন্সে একজন ইংরেজের সঙ্গে তুমি বেড়াচ্ছিলে—আজ দুপুরবেলা জীবন আমাকে বললে। কে ছিল সে ? তোমার বন্ধুর সঙ্গে আমাদেরও আলাপ করিয়ে দাও।”

প্রেমশঙ্কর বললে, “একজন টুরিস্ট। সিভিল লাইন্সে দেখলাম, আলাপ হয়ে গেল।” সে মুচ্‌কে হাসল, “কোনো সামান্য ব্যাপারও লোকের দৃষ্টি এড়ায় না, তারপর সেগুলো অতিরঞ্জিত ক’রে প্রচার করা হয়।”

নবল স্পষ্ট বুঝতে পারল প্রেমশঙ্কর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাচ্ছে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করা সে উচিত মনে করলে না। প্রেমশঙ্করের চা

খাওয়া শেষ হলে নবল বললে, "এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। কিন্তু পরীক্ষার পর তোমার প্রোগ্রাম কি ?"

প্রেমশঙ্কর পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালে, "আমার প্রোগ্রাম, আমি নিজেই জানি না। আমার না আছে ঘর-বাড়ি, না আছে আস্তানা। যেদিন পরীক্ষা শেষ হবে সেদিন ভাবব কোথায় যাব, কি করব," বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। "তুমি বোধ হয় আজ বেড়াতে বেরুবে, তোমার দেরি হচ্ছে। আমি গিয়ে তো আবার বইএর মধ্যেই ডুবে যাব।"

প্রেমশঙ্কর একটি পাতলা মলমলের পাঞ্জাবি পরেছিল। তিন-চার দিন থেকে বদলানো হয়নি বলে জামাকাপড় বেশ ময়লা হয়ে গিয়েছিল। পায়জামাটাও তথৈবচ। নবল বলল, "তা তো ঠিক্, তবে পোষাক তো বদলাও।"

"আরে ! জামাকাপড় পাল্টানোর কথা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।" প্রেমশঙ্কর হাস্‌লে, "আজকাল জীবন বড়ই জটিল। পরিষ্কার জামাকাপড় যেমন চাই, তেমন কাজে মন বসাতে হলে চাই সিগারেট ! আরো না জানি কত সব চাই ! সর্বোপরি চাই টাকা। আর এই টাকাটাই হ'ল আজকের দিনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। যাক্ এসব কথা, তোমার বোধ হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমিও চলি।" বলে প্রেমশঙ্কর চলে গেল।

নবল স্নান সেরে জামাকাপড় পড়ে দেখল পাঁচটা বেজে গেছে। সে দেওয়ালে ঝোলান টেনিস র‍্যাকেটটা নামাল। একমাস হ'ল সে র‍্যাকেট স্পর্শ করেনি। র‍্যাকেট নিয়ে সাইকেল বের করে অ্যালফ্রেড পার্কের দিকে রওনা হ'ল।

দু'সেট্ টেনিস খেলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, মাস খানেকের অনভ্যাস কিনা। কিন্তু খেলাতে তার কোনো হেরফের হয়নি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে রায়বাহাদুর কামতানাথের বাড়ি গেল।

রায়বাহাদুর কামতানাথের বাড়ি মুট্‌ঠিগঞ্জে। বাইরে থেকে দেখতে বাড়িটা অতি সাধারণ—একটা লম্বা দেওয়ালের গায়ে

কতকগুলি সারি সারি খোপ খোপ দোকান। দেওয়ালের মাঝ বরাবর বড়ো ফটক আর ফটকের ভেতরে বাগান। ভেতরে রায়বাহাতুরের দোতলা বাড়ি, সামনেটা পাথর দিয়ে গাঁথা। মূল বাড়িটারও আলাদা একটা ফটক ছিল, তার দু'দিকেই বড়ো বড়ো দালান। গেটের মধ্যে লন আর লনের শেষ প্রান্তে অন্দর মহল। বাইরের অংশটা হল বহির্মহল।

কামতানাথ নবলকে বসতে বললেন, "কি নবল, অনেক দিন পরে এলে, পরীক্ষা কেমন হ'ল ?"

"ভালোই হয়েছে, হাই সেকেণ্ড ক্লাস থাকবে।"

"তাহলে বিলেত কবে যাচ্ছ ?" হঠাৎ যেন কামতানাথের মনে পড়ল, "আরে হ্যাঁ, তুমিও আমাদের সঙ্গেই সুইজারল্যাণ্ড চল না। তুমি তো বিলেতেই যাবে, তাহলে এখনই আমাদের সঙ্গে চল।"

রায়বাহাতুর কামতানাথের প্রস্তাবে নবল চমকে উঠল, "আজই তো আমি শেষ পেপার দিলাম, পাপা! আগে আমার রেজাল্ট বের হোক তারপরে তো বিলেত যাবার কথা।"

রায়বাহাতুর কামতানাথের মনের ইচ্ছা চাপা রইল না, "আরে, পাস তো তুমি করবেই। রেজাল্টটা কেব্‌ল্ করে সুইজারল্যাণ্ডে আনিয়ে নিও। আমরা যাচ্ছি এপ্রিলের শেষাশেষি। এখনও একমাস সময়।"

এমন সময় উষা হাতমুখ ধুয়ে এসে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে পড়ল। রায়বাহাতুর কামতানাথ উষাকে বললেন, "আমি খুব দূরদর্শী হয়েছি। আই.সি.এস. পড়তে নবল বিলেত যাচ্ছে। আমি ওকে আমাদের সঙ্গেই সুইজারল্যাণ্ডে যেতে বলছি। অক্টোবর মাসে আমরা ভারতবর্ষে ফিরব আর ও চলে যাবে ইংল্যাণ্ড।"

উষার বিষণ্ণতা বিলীন হয়ে গেল, "বাঃ পাপা! কী চমৎকার আপনার পরিকল্পনা। নবল বাবু, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। আপনি আর 'না' বলতে পারবেন না।"

তক্ষুনি কামতানাথের স্ত্রী বললেন, "বাবা নবল, তুমি সঙ্গে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। এঁকে তো তুমি জানই, আর উষা তো একেবারে বাচ্চা। তুমিই ভরসা!"

এবার নবল খুব ঝামেলায় পড়ে গেল। না চাইতেই তার সামনে যে প্রস্তাব এল, তার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। চাপা গলায় বললে, "পাপা, এ বিষয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। বাবার অনুমতি পেলে আপনাদের সঙ্গে যাব।"

কামতানাথের স্ত্রী কামতানাথকে বললেন, "শোনো গো, তুমি কালকেই কালেক্টার সাহেবকে চিঠি লিখে দাও। তোমার কথায় তিনি না করবেন না। নবল ঠিক্ই বলেছে, বিলেত যাবার ব্যাপার, বাবাকে তো অবশ্যই জিজ্ঞেস করা দরকার।"

"ওগো, চিঠিপত্র আর লেখা কেন, আমি নিজেই কাল পরশু একবার মির্জাপুর ঘুরে আসব। এখান থেকে কতদূরই বা। বাবু গঙ্গাপ্রসাদকে তো আর টাকাকড়ির ব্যবস্থা করতে হবে না, নবল তো আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। আমি তিন জনের প্যাসেজ বুক করিয়ে নিচ্ছি।"

রায়বাহাদুর কামতানাথের এহেন দাক্ষিণ্য নবলের ভালো লাগছিল না। সে আর একবার বললে, "আগে বাবার অনুমতি নিয়ে নিই তারপর আপনি প্যাসেজ বুক করবেন। আপনি ইচ্ছে করলে বাবাকে চিঠি লিখতে পারেন বা নিজে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখাও করতে পারেন।"

"গঙ্গাপ্রসাদের অনুমতি তুমি পেয়ে গেছ মনে করতে পার," কামতানাথ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন। "আর তুমি কালকেই উষাকে নিয়ে সিভিল লাইন্সে ডেভিডসানের কাছে যেও। স্যুট তৈরী করিয়ে নাও আর উষার জন্যেও জামাকাপড়ের অর্ডার দিয়ে দিও।"

"বেশ তাই হবে," নবল উত্তর দিলে। তারপর উষার দিকে ঘুরে বললে, "এই সব কথাবার্তার মধ্যে তোমাকে জিজ্ঞেস করতেই

ভুলে গেছি, তোমার পরীক্ষা কেমন হ'ল ? নিজের পরীক্ষার জন্যে তো আমি আসতেই পারিনি।"

উষা কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বললে, "আপনি আসতে পারেন নি তাতে আর কি হয়েছে, আমাকে পড়িয়ে তো দিয়েছিলেন। এবারে মনে হয় সেকেণ্ড ডিভিশন পাব। কিন্তু বি.এ.তে আমাকে পড়াবে কে ?" বলে সে খিলখিল করে হেসে উঠল, "বইপত্তর নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে যাব, সেখানে আপনি পড়াবেন আমাকে।"

নবল মৃদু হাসল, "সেখানে আমাদের ঘোরাঘুরির ফাঁকে কি ফুরসত হবে ? আচ্ছা, উষা কাল বিকেলে তৈরী থেক। এখন চলি, অনেক দেরী হয়ে গেছে।" এই বলে সে উঠে দাঁড়াল।

"বাঃ, না খেয়ে আপনি কি করে যাবেন ?" উষা নবলের হাত ধরে বসালে।

রায়বাহাদুর কামতানাথের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে নবল যখন মিওর হস্টেলে ফিরল, রাত তখন এগারটা। আজ তার আনন্দের দিন। রুমের কাছে এসে দেখলে, প্রেমশঙ্করের ঘরের দরজা খোলা, সে পড়ছে। নবলকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, "কি হে, মনে হচ্ছে আজকের সন্ধ্যেটা খুব আনন্দেই কাটিয়েছ।"

প্রেমশঙ্করের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সে সন্ধ্যেবেলায় বাইরে বেরিয়েছিল। নবল বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু, তুমিও তো বাইরে বেরিয়েছিলে মনে হচ্ছে।"

প্রেমশঙ্কর গম্ভীর হয়ে উঠল, "নবল, বিকেলে আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। সেই সাহেবের সঙ্গে আজ আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর কথাই তুমি বিকেলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে। লোকটি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। এমন সব কথা বলেন বোঝা যায় না, আবার ভুল বলাও মুশকিল। ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও সে ব্রিটিশ সরকার আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘোরতর শত্রু।"

নবলের কৌতূহল জেগে উঠল, "আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই ; প্রেমশঙ্কর, আমার সঙ্গে তাঁর মোলাকাত করিয়ে দাও না ভাই।"

প্রেমশঙ্কর মাথা নাড়ালে, "না, আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না আর সেই জন্যেই বিকেলে আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম। ওরা কম্যুনিষ্ট অথবা ব্রিটিশ স্পাই। উভয়ের বন্ধুত্বই সাংঘাতিক হতে পারে, অন্ততঃ তোমার পক্ষে।"

নবল প্রেমশঙ্করকে খুটিয়ে দেখলে, "কিন্তু তুমিই বা এই বিপদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছ কেন, প্রেমশঙ্কর?"

"কারণ আমি সারাটা জীবন লড়াই করেছি। বাবা কবে মারা গেছেন, আমার মনে নেই। মা আমাকে পড়িয়েছেন। আমাকে পড়াবার জন্য কতই না অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তাঁকে, তুমি সে কল্পনাও করতে পারবে না। আমার কাকা কত যন্ত্রণা দিয়েছেন। শেষে মা আমাকে নিয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি শিক্ষিতা ছিলেন; অধ্যাপিকা হয়ে তিনি আমাকে পড়ালেন। আমার ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার সময় তিনি মারা গেলেন। তিনি আমাকে দু'হাজার টাকা নগদ দিয়ে যান আর তাঁর গয়না ছিল দেড় হাজার টাকার মত। সেই থেকেই আমি হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করছি। সংসারে আমার কেউ আপন জন নেই। সাড়ে তিন হাজার টাকার আর মাত্র ছশ' টাকা বাকী আছে। তাও শেষ হয়ে যাবে একদিন।"

নবল বললে, "কিন্তু তোমার এই কাহিনীর সঙ্গে তো আমার প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই।"

"আছেও বটে আবার নেইও। তুমি জান আমি এম. এ. পাশ করেছি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে। কত জায়গায় আবেদন করেছি, কিন্তু চাকরি জুটছে না কোথাও। দু-একটা প্রাইভেট স্কুলে চাকরি পেয়েছিলুম, কিন্তু শর্ত ছিল নব্বুই টাকায় সই করে নিতে হবে পঞ্চাশ। বিরক্ত হয়ে আমি এল. এল. বি. পড়া শুরু করেছি। আমি জানি ওকালতিতেও আমাকে ভীষণ লড়াই করতে হবে। এমনি করে বিপদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়াতে আমি আনন্দ পাই।"

নবল খানিক চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, "আমি বুঝতে পারছি, প্রেমশঙ্কর। কিন্তু আমি আবার বলছি, তুমি জীবনে

সফল হবে। নিরাশ হয়ে বিপদের মুখে ঝাঁপ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ কর।"

প্রেমশঙ্কর হেসে উঠল, "পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন তো আমি পা বাড়িয়েই আছি। আরে হ্যাঁ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার ঠাকুর্দা তোমাকে খুঁজতে এসেছিলেন। দুবার এসেছিলেন—সাড়ে ন'টায় আবার সাড়ে দশটায়। বলে গেছেন, তুমি এলেই তোমাকে তাঁর বাংলোতে পাঠিয়ে দিতে, কোনো জরুরী কাজ আছে।"

নবল ঘড়ি দেখে বললে, "এখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে, কাল সকালে দেখা করব।"

"না, এক্ষুনি যাও তুমি। তিনি বিশেষ করে বলে গেছেন আসা-মাত্রই যেন তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

নবল চিন্তিত হয়ে উঠল, "কী ব্যাপার? খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন বুঝি? কিছু বলেননি তিনি?"

"কিছু বলেননি তবে তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তুমি গিয়ে দেখ কি ব্যাপার।"

নবল আর ঘর খুলল না। হস্টেল থেকে বাংলোর দিকে রওনা হ'ল। তার বুক ধড়ফড় করছিল, একটা অজানা আতঙ্ক মনের মধ্যে জেগে উঠল।

বাংলোয় পৌঁছিয়ে দেখলো জ্বালাপ্রসাদ বিষণ্ণ মনে বারান্দায় বসে আছেন। নবলকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন "নবল, অনেকক্ষণ তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। আমাদের মহা বিপদ।"

"সব কুশল তো?" নবল জিজ্ঞাসা করলে।

"না, গঙ্গা খুব অসুস্থ। চারদিন আগে হঠাৎ তার রক্ত বমি হয়; এখন ১০৩° ডিগ্রী জ্বর। সিভিল সার্জেনকে ডাকলাম, তিনি দেখে বললেন দুটো লাংগস্‌ই খারাপ হয়ে গেছে। এক্সরে করতে হবে। মির্জাপুরে চিকিৎসা সম্ভবপর নয়।"

নবল ঘাবড়ে গেল, "দাদু, আপনি আমাকে আগে খবর দেননি কেন? কি করা যায়?"

"তোমার পরীক্ষা চলছিল কি না। আজ তোমার পরীক্ষা শেষ হ'ল। এখানে ডাক্তার শেরউডকে নিতে এসেছি। রোগ ধরা সিভিল সার্জেনের অসাধ্য।" তারপর জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "আজ আমি ডাক্তার শেরউডের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি কাল দুপুর বারোটার সময় যাবেন। তুমিও তৈরী হয়ে নাও।"

নবলকিশোর স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "নবল, মাথার ওপর বড়ো সঙ্কট। ঠাকুরের কি ইচ্ছে জানি না, কোথা থেকে যে কি হ'ল?"

জ্বালাপ্রসাদের মুখের বলিরেখা ঝুলে পড়েছিল, চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ। নবল দেখল, তাঁকে হঠাৎ যেন কতই না বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। সে বললে, "ধৈর্য ধরুন দাদু। কাল ডাক্তার শেরউড গেলে রোগ ধরা পড়বে।"

জ্বালাপ্রসাদ কাতরে উঠলেন, "নবল, শুধু বুকটাকে পাথর ক'রে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ভাই। এখন যাও, ভোরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে এস। বোধ হয় তোমাকেই ডাক্তার শেরউডের কাছে যেতে হবে। আমি আর যেন বল পাচ্ছি না।"

ডাক্তার শেরউডকে নিয়ে নবল আর জ্বালাপ্রসাদ যখন মির্জাপুর পৌঁছলেন তখন দুটো বেজে গেছে। বিদ্যা গঙ্গাপ্রসাদের ঘরে বসেছিল। সে বাইরে এসে তাঁদের ভেতরে নিয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ চোখ বুজে চুপচাপ শুয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখের ওপর অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ। ডাক্তার শেরউড গঙ্গাপ্রসাদকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। ইত্যবসরে নবলকিশোর মির্জাপুরের সিভিল সার্জেনকেও নিয়ে এসেছিল।

দুই ডাক্তারে পরামর্শ করে জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "এঁকে এলাহাবাদ নিয়ে যেতে হবে। মির্জাপুরে তো এক্সরের কোনো ব্যবস্থা নেই। এলাহাবাদেই চিকিৎসা হতে পারে।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন "গভর্ণমেন্টের অর্ডার না পেলে কালেক্টার হেড্‌কোয়ার্টার ছাড়তে পারেন না।"

সিভিল সার্জেন বললেন, "আপুনি ডাক্তার শেরউডের সঙ্গে এলাহাবাদে চলে যান। আমি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি। কমিশনারের কাছে এঁর ছুটির আবেদন দিয়ে দিন। এঁর মির্জাপুর থেকে এলাহাবাদ যাওয়া বিশেষ জরুরী।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জ্বালাপ্রসাদ ডাক্তার শেরউডের সঙ্গে এলাহাবাদ রওনা হয়ে গেলেন।

ডাক্তারের সঙ্গে দাদুকে রওনা করিয়ে দিয়ে নবলকিশোর বাবার ঘরে এল। গঙ্গাপ্রসাদের জ্বর খুব বেড়ে গিয়েছিল। নবলকে দেখেই নিজের কাছে বসবার জন্যে ইশারা করলেন। তিনি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে নবলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার শেরউড কি বললেন ?"

নবলের মনে হ'ল যেন গঙ্গাপ্রসাদের স্বর কাঁপছে, তাঁর চোখে ছিল আতঙ্ক। নবল উত্তর দিল, "তিনি বলছিলেন এলাহাবাদেই চিকিৎসা হতে পারে, সেখানেই আপনি সেরে উঠবেন।"

"এলাহাবাদে গিয়ে সেরে উঠব, সত্যি বলছ তুমি ! আমার তো মনে হচ্ছে, অসাধ্য রোগে আমাকে ঠেসে ধরেছে। ডাক্তার শেরউড কি বলেছেন যে, আমি ভালো হয়ে যাব ? তিনি কি রোগ বললেন ?" গঙ্গাপ্রসাদ যেন চারিদিকে নিরাশার অন্ধকার থেকে একটি আশার আলো খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিলেন। নবল দেখলে গঙ্গাপ্রসাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তার সম্পুর্ণ ব্যক্তিত্বই সহসা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। নবলকে মিথ্যে বলতে হ'ল, "রোগ তো কিছু বলেননি, তবে বলছিলেন এলাহাবাদে গিয়ে এক মাস তাঁর চিকিৎসায় থাকলে আপনি সেরে উঠবেন। দাদু আপনার ছুটির দরখাস্ত দিতে গেছেন।"

গঙ্গাপ্রসাদ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন, "আমার ছুটির দরখাস্ত দিতে

গেছেন! ভালো, ছুটি তো আমাকে নিতেই হবে। বোধ হয় চিরকালের জন্যেই!"

বিদ্যা ঘরের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা সব শুনছিল। সে এগিয়ে এসে বললে, "বাবা যখন থেকে অসুস্থ হয়েছেন এই সব কথাই বলছেন দাদা। তুমি বোঝাও, এরকম নিরাশ হওয়া উচিত নয়।"

গঙ্গাপ্রসাদের মুখের ওপর করুণ হাসির রেখা দেখা দিল, "নবল শোন, এই বিদ্যা, ষোল-সতের বছরের খুকী, আবার আমাকে বোঝাচ্ছে!" বিদ্যাকে বললেন, "যাও, তোমার মাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। তোমাদের এই দিনরাত সেবা আর পরিশ্রম!" নবলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার ঘুম আসছে, তোমরাও একটু বিশ্রাম করে নাও। সেবা তো তোমাদের আরো কিছুদিন করতেই হবে!" গঙ্গাপ্রসাদ চোখ বুজলেন।

নবলকিশোর বিদ্যার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিদ্যা নবলের চেয়ে বছর দুয়ের ছোট। লম্বা হৃষ্টপুষ্ট বালিকা, চোখদুটি বড়ো বড়ো, তার মধ্যে ছিল দৃঢ় কাঠিন্য। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এবছর সে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা শেষে মির্জাপুর এসেছে। বিদ্যা নবলকে বললে, "দাদা, আমাদের মহা বিপদ্ উপস্থিত।"

"তাতো দেখছি বিদ্যা, তবে এই বিপদের সম্মুখীন তো হতেই হবে।"

বিদ্যা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবছিল, তারপর দাদার দিকে তাকাল। ছিপছিপে গড়নের লম্বা যুবক, মুখের ওপর আত্ম-বিশ্বাসের জলুস। নবলকে সুন্দর বলা যেতে পারে। আঁটসাঁট, সবল দেহ। বিদ্যা বললে, "দাদা, বাবার পরে তো তুমিই আমার সব—তুমি যা বলবে—আমি তাই করব। এই বিপদের সঙ্গে তো লড়তেই হবে।" বিদ্যার চোখ ছলছল করে উঠল। "যাই, মাকে গিয়ে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিই," বিদ্যা চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

বাড়ির ভেতরের উঠনে নবলের ঠাকুমা মলিন মুখে বসেছিলেন। নবল ঠাকুমার কাছে এসে বসল। যমুনা অসাড় হয়ে চুপ করে বসেছিলেন—যেন জড়বৎ হয়ে গেছেন। নবলকে দেখেও যেন দেখেন নি। নবল ডাকলে, "ঠাকুমা!"

যমুনার তন্দ্রা ভাঙ্গল, "নবল, তুমি এসেছ। ডাক্তার কি বললেন?"

"তিনি বাবাকে এলাহাবাদে নিয়ে যেতে বলেছেন। সেখানে চিকিৎসা করবেন।"

"এখন গঙ্গার কাছে কে আছে?" যমুনা জিজ্ঞেস করলেন।

"মা আছেন। বাবার ঘুম আসছিল তাই আমাদের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।"

"তবে আমিও তার কাছে যাই।" নবলের সঙ্গে আর বেশী কথা না বলে তিনিও গঙ্গাপ্রসাদের ঘরে চলে গেলেন। কিন্তু যমুনার ধড়ে যেন প্রাণ নেই, থরথর ক'রে তাঁর পা কাঁপছিল।

নবল সেখান থেকে উদাস মনে ফিরে এসে বাইরের বারান্দায় বসল। রাত হয়ে আসছে, হ্যারিকেন টিম টিম করে জ্বলছে। চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। সে চুপচাপ বসে ভাবছিল—অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যে যোগাযোগ কোথায়? যা কিছু ঘটছে, সে কোন বিধানে? বিদ্যা এসে কখন যে তার পাশের চেয়ারে বসেছে সে জানতেও পারেননি।

বিদ্যা আর থাকতে না পেরে ডাকলে, "দাদা।"

নবল যেন চমকে উঠল। "বিদ্যা তুমি! বাবার শরীর কেমন? ঘুমচ্ছেন না জেগে আছেন?"

"তাঁর চোখে ঘুম কোথায়!" বিদ্যা বললে, "প্রবল জ্বরের ঘোরে তাঁর চোখ বুজেই থাকে।"

"বাবার ঘরে এখন কে আছেন?"

"ঠাকুমা আছেন, মা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে উঠে গেলেন।"

"তাহলে আমিও ওখানেই যাই, দেখি কি অবস্থা।"

"দাদা বসো, অবস্থা তো সেই রকমই। তুমি পরীক্ষা সম্পূর্ণ দিয়েছ তো?"

নবলের মুখের ওপর ব্যঙ্গের হাসির রেখা দেখা দিল, "বিস্তা, পরীক্ষা সবে তো শুরু হচ্ছে, বি. এ. পরীক্ষাটা মাত্র খেলা ছিল। তুমি নিজের বিষয় তো কিছু বললে না?"

"আমার আর কি বলার আছে দাদা। বি. এ. ফাষ্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছি।"

এমন সময় রুক্মিনী এসে বললেন, "বাবা নবল, উনি তোমাকে ডাকছেন।"

"যাই মা," বলে নবল গঙ্গাপ্রসাদের ঘরে চলে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ নবলকে বললেন, "বাবা নবল, ভালো ছিলে তো? পরীক্ষা কেমন হ'ল?"

"পরীক্ষা ভালো হয়েছে, খুব সম্ভব এবার ফার্ষ্ট ক্লাস পাব," নবল বললে। গঙ্গাপ্রসাদ খানিকক্ষণ একদৃষ্টে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে মৃদুস্বরে বললেন, "লণ্ডনে তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তোমাকে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে।"

নবল বললে, "এমন কি তাড়া? আগে আপনি ভাল হয়ে উঠুন, তারপর যাব।"

"আমার রোগ! নবল, আমি জানি এ রাজ রোগ—এতে কেউ কখনো ভালো হয়ে ওঠে না। আমার চিকিৎসার জন্যে অপেক্ষা করা বৃথা। আমি ভেঙ্গে পড়ছি। ইচ্ছে ছিল, আমি ভেঙ্গে পড়ার আগে তুমি গড়ে ওঠ।"

গঙ্গাপ্রসাদের কথার মধ্যে ছিল চাপা বেদনা আর অসহায় ভাব। প্রভুত্ব, মর্যাদা, অহঙ্কার,—সব যেন হঠাৎ গঙ্গাপ্রসাদকে ছেড়ে চলে গেল। নবল গঙ্গাপ্রসাদের কথার কোন উত্তর দিল না। একটু থেমে গঙ্গাপ্রসাদ আবার বললেন, "নবল, আমার জীবন ভয়ানক

নিষ্ফল। এপদ, উন্নতি, মান শুধু আড়ম্বর, এতে কিছুই নেই। কিন্তু 'কি' যে কোথায় তাও তো আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না।"

নবল স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, গঙ্গাপ্রসাদের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। সে বললে, "বাবা আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন। এরকম কথা-বার্তায় আর নিরাশায় কষ্ট বেড়েই যাবে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার দিক থেকে আপনার কোনো অতৃপ্তি থাকবে না। এই নিন, ওষুধটা খান, সময় হয়ে গেছে।"

"দাও, ওষুধ খাওয়া তো আমার ধর্ম, কারণ আমি জানি ওষুধে কোনো উপকার হচ্ছে না। ওষুধ খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টাও করতে হবে। আমি জানি ঘুম আসবে না। যদি আসেও তো একটানা নয়, দুঃস্বপ্নে ভরা।"

গঙ্গাপ্রসাদকে ওষুধ খাইয়ে আর পথ্য দিয়ে নবল যখন ঘর থেকে বের হ'ল, তখন অনেক রাত। খুব গরম পড়েছে, বিদ্যা বারান্দায় দাদার অপেক্ষায় বসে আছে। নবল আসা মাত্র বিদ্যা বললে, "দাদা, খেতে চল।"

"যাচ্ছি," বলে নবল বসে পড়ল। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। পঞ্চমীর চাঁদটা ধীরে ধীরে আকাশের নীচে ঢলে পড়ার সময় দূরে বটগাছটার ওপর কিছুক্ষণের জন্য যেন থেমে গিয়েছিল। নবল বিদ্যার দিকে চেয়ে বললে, "বিদ্যা, তাকিয়ে দেখ চাঁদটা কত নিস্তেজ, নিষ্প্রভ আর অসহায়! ধীরে ধীরে আকাশের নীচে নামছে, ওর আলো কত ক্ষীণ!"

"দেখছি দাদা," বিদ্যা উত্তর দিলে, "এই চাঁদকে তো ডুবতেই হবে, কিন্তু তাতে হয়েছে কি? কাল আবার এই চাঁদ উঠবে—এর প্রভা বাড়বে। আলো আরো উজ্জ্বল হবে।"

নবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, "হ্যাঁ, কিন্তু এসব হবে কাল! আমার সামনে তো আজকের প্রশ্ন! এখনকার প্রশ্ন!"

"দাদা, সারা জীবন কালকের ওপরই তো আমরা ভরসা করে

থাকি। কালকের ভাবনা যদি আমরা না ভাবতাম তা হ'লে আজকের দিনটা কতই না অসহ্য হয়ে উঠত।"

"তুমি বোধ হয় ঠিক্‌ই বলছ বিদ্যা," নবল আকাশের দিকে তাকালে। ততক্ষণে চাঁদ বটগাছের উঁচু ডালে এসে পড়েছে। নবল দেখলো গোটা চাঁদটা ধীরে ধীরে ওই বটগাছটার নীচে ঢলে পড়ল। বটগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ আলো, আস্তে আস্তে আলোর রেখাটাও বিলীন হয়ে গেল। তার সামনে গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার। নবল উঠে দাঁড়াল, "বিদ্যা, চল।"

দুই

গঙ্গাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "নবল, জ্ঞানকাকার কোনো খবর জান নাকি? তিনি কবে বিলেত থেকে ফিরবেন?"

"মে মাসের শেষ সপ্তাহে ফেরবার কথা। কেন, কোনো দরকার আছে কি?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। তাঁকে বছর দুই দেখিনি, মাঝে মাঝে তাঁর কথা মনে পড়ে।"

এমন সময় জ্বালাপ্রসাদ ডাক্তার শেরউডের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন। ডাক্তার শেরউড রোগী পরীক্ষা ক'রে গম্ভীর হয়ে বললেন, "বিশেষ কিছুই উন্নতি হয়নি। গরমও খুব পড়েছে। রোগীকে পাহাড়ে নিয়ে যেতে হবে।"

গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "ঠিক্‌ বলেছেন ডাক্তার সাহেব, এত গরম আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

ডাক্তার শেরউড জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালেন, "ভবালি স্যানাটোরিয়মে আমি লিখে দিচ্ছি, সেখানে একটা কটেজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সেখানে থাকলে ইনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

জ্বালাপ্রসাদ চাপা গলায় বললেন, "ভবালি স্যানাটোরিয়ম! সেখানে নিয়ে যেতে হবে? অন্য কোনো জায়গায় গঙ্গার ব্যবস্থা হতে পারেনা?"

"সব পাহাড়েই নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু অন্য জায়গায় চিকিৎসা তেমন ভাল হবে না।"

গঙ্গাপ্রসাদ চুপ ক'রে নিরাসক্ত ভাবে জ্বালাপ্রসাদ আর ডাক্তার শেরউডের কথা শুনছিলেন। এঁরা যাবার পর তিনি নবলকে বললেন, "নবল, তোমার দাদুকে বলে দিও ভবালিই ঠিক হবে। সেখানে চিকিৎসার ভালো বন্দোবস্ত আছে আর সেখানে আমার সঙ্গে কারো যাবারও দরকার হবে না।"

"বাবা, আপনি সেখানে একলা কি করে থাকবেন? ডাক্তার শেরউড তো একটা কটেজের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন বলেছেন। আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে? না নবল, তোমাকে ইংল্যাণ্ড যেতে হবে। তোমার দাদু না হয় আমার সঙ্গে যাবেন।"

"বাবা, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি না," নবল দৃঢ়স্বরে বলল।

গঙ্গাপ্রসাদ আর কথা বাড়ালেন না। তিনি চোখ বুজলেন। উদাস মনে নবল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার বাবা ঠিক্ই বলেছিলেন, তাঁর রাজরোগ হয়েছে। মির্জাপুর থেকে এলাহাবাদ, আবার এলাহাবাদ থেকে ভবালি।

গঙ্গপ্রসাদের এলাহাবাদে প্রায় মাস খানেক কেটে গেছে, কিন্তু ক্রমশঃ অবস্থা আরো অবনতির দিকেই যাচ্ছে। তাঁর শরীর শুকিয়ে পাঁজরা বেরিয়ে গেছে। উঠে হেঁটে বেড়াতেও তাঁর কষ্ট হয়। গঙ্গাপ্রসাদের অবস্থা দেখে নবলের প্রাণ গুমরে কেঁদে ওঠে। কিন্তু কিছুই তো তার ইচ্ছাধীন নয়। সে ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এল, রোদ খুব চড়া। বারান্দা থেকে জ্বালাপ্রসাদকে আসতে

দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল। জ্বালাপ্রসাদ ডাক্তার শেরউডকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছিলেন।

"দাদু, কি হয়েছে?" জ্বালাপ্রসাদের মুখের ওপর চিন্তার গভীর ছায়া দেখে নবল জিজ্ঞাসা করলে।

ভারি গলায় জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "বাবা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। গঙ্গাকে ভবালি যেতেই হবে, কিন্তু সেখান থেকে ভালো হয়ে কম লোকেই ফেরে। ডাক্তারও বেশী ভরসা দিতে পারছেন না।"

"দাদু, ভবালি কবে যেতে হবে?" নবল প্রশ্ন করলে।

"আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমাদের রওনা হয়ে যাওয়া দরকার। কাল পরশুর মধ্যেই কটেজ ঠিক্ হয়ে যাবে। গঙ্গা ঘুমোচ্ছে বুঝি?"

"না, শুয়ে আছেন। চলুন।"

ওঁরা দু'জনে এলে গঙ্গাপ্রসাদ চোখ খুললেন। জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "ডাক্তার বলছেন আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ভবালি যাওয়া উচিত্। তিনি কটেজের ব্যাপারে লিখে দিয়েছেন আর একটি 'তার'ও ক'রে দিয়েছেন।"

"বেশ", গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "কিন্তু আমার সঙ্গে কারো যাবার দরকার নেই। আমার সঙ্গে যাবে কেবল ভিখু।"

"বাবা, তা কি ক'রে হবে," বললেন জ্বালাপ্রসাদ। "সেখানে তোমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবে কে? তোমার মা আর আমি তোমার সঙ্গে যাব, বৌমা ছেলে মেয়েদের দেখা শোনার জন্যে এখানেই থাকবেন।"

নবল বলে উঠল, "না দাদু, ঠাকুমার সঙ্গে আমি যাব। আপনি বাড়ির দেখাশোনার জন্যে এখানেই থাকবেন।"

গঙ্গাপ্রসাদ নবলের দিকে তাকালেন—শক্ত-সামর্থ, আত্ম-বিশ্বাসী ছেলে, ভবিষ্যৎ বংশধর। তিনি মুচ্‌কে হাসার চেষ্টা করে জ্বালা-প্রসাদকে বললেন, "আজ্ঞে, নবল ঠিক্ই বলছে। এখন আমার

সঙ্গে এরই যাওয়া ঠিক্ হবে। জুলাই মাসে আপনি চলে আসবেন, সে সময় নবল ফিরে এসে নিজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করবে।"

জ্বালাপ্রসাদ নিরুত্তর রইলেন। তাঁর আদৌ ইচ্ছে নয় সংক্রামক রোগে ভরা স্যানাটোরিয়মে গিয়ে নবল থাকে, কিন্তু বলতে তাঁর সাহসে কুলোচ্ছিল না। তাঁর পুত্রই তো মারাত্মক সংক্রামক রোগী। কি বলবেন, কাকেই বা বলবেন। চুপচাপ উদাস মনে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তিনি চলে গেলে গঙ্গাপ্রসাদ নবলকে বললেন, "নবল, ভবালি যাবার ব্যবস্থা ক'রে নাও। এখানকার গরম আর আমার সহ্য হচ্ছে না। যদি মরতেই হয় আরামেই মরি।"

"বাবা, ও কথা মুখে আনবেন না। আপনি ওখানে গিয়ে সেরে উঠবেন। এত হতাশ হচ্ছেন কেন?"

গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "না, হতাশার কথা নয়, আশার পাথায় ভর করেই সংসার চলছে! এমনিই মুখে এল।"

তৃতীয় দিনে গঙ্গাপ্রসাদের ভবালিতে থাকার আর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেদিন সকাল থেকেই লু বইছিল। গঙ্গাপ্রসাদেরও অস্থিরতা বেড়ে উঠেছিল। গঙ্গাপ্রসাদ নবলকে বললেন, "সোমবারের মধ্যে সেকেণ্ড ক্লাসে বেরেলি পর্যন্ত রিজার্ভেশন করিয়ে নাও, আর বেরেলি থেকে কাঠগোদাম পর্যন্ত রিজার্ভেশনের জন্যে তার করে দিও। বিকেলে পাঁচটা-ছ'টা নাগাদ স্টেশনে গিয়ে এই কাজটা করিয়ে নাও। আর এখানে বেশী দিন থাকা বৃথা।"

বিকেলবেলা নবল স্টেশনে গেল। স্টেশন থেকে যখন সে রিজার্ভেশন করিয়ে বেরিয়ে এল, তখন ওর মন কিছুটা হাল্কা হয়েছে। সে সাইকেল রায়বাহাদুর কামতানাথের বাড়ির দিকে ঘোরালে।

রায়বাহাদুর কামতানাথ ভেতরের দিকের বাগানে একা বসে পড়ছিলেন। তিনি নবলকে দেখেই বলে উঠলেন, "আরে নবল! তুমি! অনেক দিন পরে এলে। তোমার বাবার শরীর কেমন?"

"ডাক্তার ওঁকে ভবালি নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। এখানে ওঁর অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি।"

"উন্নতি হবে কোথা থেকে। দেখছ না কী ভীষণ গরম পড়েছে। ৬ই মে জাহাজে জায়গা পাওয়া গেছে। আমরা ৩রা মে এখান থেকে বোম্বাই রওনা হব। আজ হ'ল ২২শে এপ্রেল। তুমিও ৩রা মে এখান থেকে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নাও। আমার, তোমার আর উষার জন্যে তিনটি বার্থ।"

"আমি তো আপনাদের সঙ্গে যেতে পারব না; সোমবারে আমি বাবার সঙ্গে ভবালি যাচ্ছি।"

"তুমি যাচ্ছ ভবালি! গঙ্গা তার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে কি বলে?" রায়বাহাদুর কামতানাথ বিস্মিত হয়ে বললেন, "অত্যন্ত অন্যায় কথা! তুমি আমার সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড যাচ্ছ। গঙ্গার সঙ্গে বাবু জ্বালাপ্রসাদের যাওয়া উচিত।"

এমন সময় উষা ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। নবলকে দেখামাত্র সে বলে উঠল, "আপনি এসেছেন, নবলবাবু। কালকেই বাবা বোম্বাই থেকে চিঠি পেয়েছেন, আমরা ৬ই মের জাহাজটায় যাব। ৩রা মে আমাদের এখান থেকে বোম্বাই রওনা হয়ে যাওয়া উচিত।"

নবল উদাস স্বরে বললে, "উষা, আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না। বাবার অসুখের জন্যে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ডাক্তারেরা তাঁকে ভবালি নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁর সঙ্গে ভবালি যাচ্ছি।"

"তুমি কোনোমতেই ক্ষয়রোগের জীবাণুপূর্ণ ওই ভবালি স্যানাটোরিয়মে যেতে পারবে না। আমি অবাক হয়ে ভাবছি—গঙ্গা তোমাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে বলছে কি করে। তোমাকে তো ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়ে আই. সি. এস.-এর পরীক্ষা দিতে হবে।"

"তারজন্যে এখনও অনেক সময় পড়ে আছে," নবল বললে। "গোটা মে আর জুন মাস আমি বাবার সঙ্গে থাকব, তারপর দাদু যাবেন সেখানে।"

উষা নবলকে বোঝাবার চেষ্টা করলে, "আমি তো কত আশা ক'রে বসেছিলাম আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। বিপদ আর

কার হয় না, কিন্তু এই বিপদের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাটা ঠিক কিনা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার এখানে থাকাতে বা বিলেত যাওয়াতে আপনার বাবার অসুখের তো কোনো তারতম্য ঘটবে না। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত না যান তাহলে খুব সম্ভব পরে আপনার আর যাওয়াই হয়ে উঠবে না।"

নবল উষার দিকে তাকালে। তার মুখ ভাবলেশহীন। নবল যে বিপদে পড়েছে তার জন্যে তার কোনো সহানুভূতি নেই। নবল তিড়বিড়িয়ে উঠল। সে বললে, "হ্যাঁ, উষারানী, খুব সম্ভব আমার যাওয়া আর হবে না, সে আমি জানি। কিন্তু নিজের পিতাকে অসুস্থ অবস্থায় ছেড়ে আমি কি ক'রে যাই। এসময় যদি তাঁর কাছে আমি না থাকি তাহলে তাঁর কত কষ্ট হবে, তুমি একটু ভেবে দেখ। আবেগ কি করে ঝেড়ে ওঠা যায়?"

রায়বাহাদুর কামতানাথ উত্তর দিলেন, "এই আবেগই তোমাকে নষ্ট করবে নবল, আমি বলছি। আমি জানি বাবু জ্বালাপ্রসাদ বা গঙ্গাপ্রসাদ কখনই তোমাকে ভবালি যেতে বলেন নি, তাঁরা বরং বারণই ক'রে থাকবেন। আমি ঠিক্ বলছি কি না?"

"দাদুর ইচ্ছে নয় আমি যাই, কিন্তু বাবা বারণ করেন নি।"

তিক্ত স্বরে রায়বাহাদুর কামতানাথ উত্তর দিলেন, "তোমার বাবার মতিভ্রম হয়েছে! অসুস্থতায় তাঁর বিবেকে মর্চে ধরেছে। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখব। তুমি আমার সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড যাও বা না যাও, কিন্তু তোমার ভবালি যাওয়া উচিত হবে না। অন্ততঃ এটা বন্ধ করবার চেষ্টা আমি করবই। এটা ছোঁয়াচে রোগ, তোমার বাবার কাছ থেকে তোমার দূরে থাকাই উচিত।"

রায়বাহাদুর কামতানাথের কথায় নবল মর্মাহত হ'ল। 'নিজের পিতার কাছ থেকে তার দূরে থাকা উচিত কারণ তাঁর রোগটা ছোঁয়াচে।' কে তার বাবাকে সঙ্গ দেবে যদি পুত্রই পিতাকে সঙ্গ দিতে রাজী না হয়? এরই নাম কি সংসারী বুদ্ধি, এটাই কি সংসারের বিধান? সে হতাশার সুরে বললে, "পাপা, আমি নিজের

পিতার কাছ থেকে পৃথক থাকি, এটাই কি আপনি বলতে চান ?" আপনি আমাকে এই জঘন্য পাপ কর্মের পরামর্শ দিচ্ছেন ? তবে তো সংসারে আর কেউ আপন জন বলে থাকবে না, তাহলে এ সংসারটা নরক হয়ে যাবে ! না, তা হবে না, আমি শেষ পর্যন্ত বাবার সঙ্গেই থাকব। সোমবারে আমি বাবার সঙ্গে যাচ্ছি, এটা বলতেই আমি এসেছি। এখন বাড়ি যাই, বাবা আমার পথ চেয়ে আছেন।"

উষা নবলকে আটকালে, "একটু বসুন না, কতদিন পরে এসেছেন আপনি। বিদ্যাও এসেছে বোধ হয়। কাশীতে পড়তে যাওয়ার পর থেকে তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তাকে দেখতে বড়ো ইচ্ছে করে।"

"বাবার অসুস্থতার জন্যে সেও ভারি ব্যস্ত—চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করছে। আমি তাকে বলে দেব। রোগীর বাড়িতে যাওয়া পাপা তো উচিত মনে করেন না। সোমবারে আমরা চলে গেলে বিদ্যার ফুরসত হবে।"

নবলের কথার মধ্যে ব্যঙ্গের ইঙ্গিত উষা ধরতে পারল না। কিন্তু রায়বাহাদুর কামতানাথ বুঝলেন, "আমি কাল বা পরশু উষাকে নিয়ে যাব, বিদ্যাকে বলে দিও, উষা তার কথা খুব বলছিল।" তারপর তিনি উষাকে বললেন, "দেখ তো মা, রান্না হয়েছে কি না। নবলকে খাইয়ে তবে যেতে দেবে।"

রায়বাহাদুর কামতানাথের বাড়িতে নবলের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে উঠে পড়লো। "মাফ করবেন, পাপা বাবা আমার পথ চেয়ে আছেন, এখানে এখন আমি খেতে পারব না," বলেই সে চলে গেল।

নবল যখন বাড়ি ফিরল, তার মুখ একেবারে শুকনো। কামতানাথের বাড়িতে তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হলো। মনে মনে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তার মলিন মুখ দেখে বিদ্যা জিজ্ঞেস করলে, "দাদা, কি হয়েছে, এত উদাস কেন ? কোথায় গিয়েছিলে ?"

"উষার বাড়ি গিয়েছিলাম, বিত্তা। সে তোমার নাম করছিল। বলছিল, অনেক দিন তোমাকে দেখেনি।"

"দাদা, কি আর বলব, যখন থেকে এসেছি, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ কি রকম ঝামেলায় পড়েছি। তোমাদের ভবালি যাবার পরে সময় পেলে দেখা করে আসব। কিন্তু এতে উদাস হবার কি আছে?"

"বিত্তা, আমার উদাস হবার অন্য কারণ আছে।" একটু ভেবে নিয়ে নবল বললে, "জান বিত্তা, কামতানাথ বলছিলেন, বাবাকে ছেড়ে তার সঙ্গে বিলেত যেতে। তিনি আমার জন্যে সুইজারল্যাণ্ডের টিকিটও কেটেছেন।"

বিত্তা চমকে উঠল, "তুমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছ নাকি?"

"পাগলি!" নবল মৃদু হাসল। "আমি বাবাকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে বিলেত যাব! আমি 'না' বলে এসেছি। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছি না, তিনি নিজের কথায় এতো জোর দিচ্ছেন কেন।"

বিত্তার চোখ ছলছল করে উঠল, "দাদা, তুমি 'না' করে দিয়েছ তো? তোমার কাছে এটাই আশা করছিলাম। আমাদের বাবা অসুস্থ, আমাদের মহা বিপদ। তাঁরা আমাদের মনের অবস্থা কি করে বুঝবেন? তুমি ওদের বাড়িতে নিশ্চই খেয়ে আসনি, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। দাদা, খেতে চল।"

নবল ভবালি যাত্রার জন্যে দরকারী জিনিষপত্র কিনতে শনিবারে সকাল সকাল বাজারে গেল। কেনাকাটার বেশী কিছু ছিল না, তাই দশটা বাজতে না বাজতেই সে ফিরে এল। বাড়ি ফিরে ড্রইংরুম থেকে রায়বাহাদুর কামতানাথের গলার স্বর শুনতে পেল। তিনি জ্বালাপ্রসাদকে বলছিলেন, "আপনার মতো বয়স্ক লোক এরকম ছেলেমানুষী কি ক'রে করছেন? নবলকে গঙ্গার সঙ্গে আপনি ভবালি পাঠাচ্ছেন? আপনি এর পরিণাম ভেবেছেন কি?"

জ্বালাপ্রসাদ ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তাকে আমি তো অনেক বার নিষেধ করেছি রায়বাহাদুর সাহেব, কিন্তু সে কিছুতেই শুনছে

না। গঙ্গারও জানি না কেন এত মায়া। গঙ্গাকে আমি এসব শোনাতে চাই না।”

“আজ্ঞে, আপনি ভীরু হয়ে এসব বলতে না চাইলে নিজের বংশের সর্ব্বনাশ ডেকে আনবেন। আমি বলছি নবলের কিছুতেই ভবালি যাওয়া উচিত নয়। একটা বিপদ্ যখন ঘাড়ে এসে পড়েছে তখন অন্যটাকে তো এড়ানর চেষ্টা করা উচিত।”

“আমি বুঝতে পারছি না বিপদ্ কি ভাবে এড়ান যায়,” অসহায় ভাবে জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন।

“তাই বলছি। আমরা সুইজারল্যাণ্ড যাচ্ছি। নবলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, সেখান থেকে সে ইংল্যাণ্ডে চলে যাবে।”

জ্বালাপ্রসাদ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, “রায়বাহাদুর সাহেব, গঙ্গার অবস্থা তো আপনি জানেনই। ইংল্যাণ্ড যাওয়ার খরচার কথা এখন তাকে কিছু বলা উচিত হবে না।”

রায়বাহাদুর কামতানাথ জোরে হেসে উঠলেন, “ডেপুটি. সাহেব, নবল যেমন গঙ্গার ছেলে তেমনি আমারও ছেলে। আপনি মনে করছেন, আপনারা টাকা দিলে তবে তাকে আমরা নিয়ে যাব? তার ইংল্যাণ্ড যাওয়া-আসার যাবতীয় খরচা তো আমার।”

জ্বালাপ্রসাদের ধড়ে প্রাণ এল, “তাহলে আপনি গঙ্গার সঙ্গে কথা বলে নিন। আমার কথা তো নবল শুনবে না। যদি গঙ্গা জোর করে, তাহলে সে 'না' করতে পারবে না। আমি গঙ্গাকে আপনার আসার খবর পাঠাচ্ছি।”

রায়বাহাদুর কামতানাথ জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের ঘরে গেলেন। গঙ্গাপ্রসাদ ক্ষীণ হেসে রায়বাহাদুর কামতানাথকে স্বাগত জানালেন, “আসুন, রায়বাহাদুর সাহেব! বড়ো অনুগ্রহ আপনারা!”

রায়বাহাদুর গঙ্গাপ্রসাদের খাট থেকে একটু দূরে চেয়ারে বসলেন। তারপরে গলা পরিষ্কার ক'রে বললেন, “শুনলাম আপনি নাকি পরশু ভবালি যাচ্ছেন? আমার মতে আপনার আরো আগে চলে যাওয়া উচিত ছিল। এত গরমে ওষুধ খেয়ে আর কি হবে?”

"ডাক্তারও তাই বলছেন", গঙ্গাপ্রসাদ উত্তর দিলেন। "সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সেখানেই থাকতে বলেছেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্ততঃ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তো বটেই," কামতানাথ বললেন। "ভালো হয়ে যাবার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত প্রতি বছরই গরমের সময়টা পাহাড়েই কাটাতে হবে। বড়ো কঠিন রোগ, এর ওষুধ হ'ল পাহাড়ের বিশুদ্ধ হাওয়া আর বিশ্রাম।"

কামতানাথ আবার বললেন, "কালেক্টার সাহেব, আমি নবলের বিষয় ভাবছিলাম। আমরা সুইজারল্যাণ্ড যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে নবলকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই। আই. সি. এস. পড়ার জন্যে তাকে ইংল্যাণ্ডে তো যেতেই হবে, ওখান থেকেই ইংল্যাণ্ডে চলেযাবে। তার পড়াশুনার খরচের জন্যে আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। নবল যেমন আপনার, আমারও তেমনি। তার যাবতীয় খরচা আমিই বহন করব।"

অসুস্থ হবার পর থেকে আজ প্রথমবার কামতানাথের কথা শুনে গঙ্গাপ্রসাদের মুখের ওপর প্রসন্নতার জলুস দেখা গেল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় নিজের পরিবার সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। যা কিছু উপার্জন করেছেন, মুক্তহস্তে তা খরচও করেছেন। মৃত্যুর ছায়া মাথার উপর ঘনিয়ে আসায় নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন।

তিনি হতাশ সুরে রায়বাহাদুর কামতানাথকে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি নবলকে সঙ্গে নিয়ে যান। বাপ্পা তো আমার কাছে আছেনই। যে দিন আপনি উষার সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা-পাকি করেছেন সেদিন থেকেই সে আপনার হয়ে গেছে।" তারপর গঙ্গাপ্রসাদ বাবার দিকে ফিরে বললেন, "নবলকে এখানে একটু ডেকে দিন, তাকে বলে দিই।"

জ্বালাপ্রসাদ নবলকে ডেকে আনলেন। নবল চুপচাপ মাথা নিচু করে বাবার সামনে এসে দাঁড়াল, "বলুন, কি বলছেন?"

গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "নবল, রায়বাহাদুর কামতানাথ আর উষা সুইজারল্যাণ্ড যাচ্ছেন। তোমার জন্যেও প্যাসেজ বুক করেছেন।"

"আজ্ঞে, আমি জানি," নবল উত্তর দিল।

"তুমি এঁদের সঙ্গে চলে যাও। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ড যাবে।"

"আজ্ঞে, আমি একথাও শুনেছি। শুধু তাই নয়, আমার বিলেতের খরচও রায়বাহাদুর সাহেব বহন করবেন। কিন্তু আমাকে তো এখন আপনার সঙ্গে ভবালি যেতে হচ্ছে। আপনি সেরে উঠলে, ভাবব, কি করব।"

নবলের কথা গঙ্গাপ্রসাদের খারাপ লাগল না। তিনি কামতানাথের দিকে তাকালেন, "শুনছেন আপনি এর কথা, আপনিই একে বোঝান।"

কামতানাথ নবলের দিকে তাকালেন, "নবল, এরকম জেদ ধরা উচিত নয়। এটা তোমার কেরিয়রের প্রশ্ন।"

নবল শান্তভাবে উত্তর দিল, "পাপা, মানুষের জীবনে কেরিয়র, স্নেহ আর আবেগের চেয়ে বড়ো নয়। বাবাকে এই অবস্থায় ছেড়ে আমি কোনো জায়গায় যাবার কল্পনাও করতে পারি না। আপনি অযথাই আমাকে কর্তব্য থেকে বিরত করতে চাইছেন। আমি যখন বলে দিয়েছি, 'যাব না' তখন কিছুতেই যাব না।"

নবলের জেদে কামতানাথ রেগে উঠলেন, "নবল, শাস্ত্রে ঠিক্‌ই বলেছে, 'বিনাশকালে মতিভ্রম ঘটে'। আমার যা বলবার বললাম," বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

নবল কামতানাথের কথার কড়া উত্তর দিতে পারত। একবার তার মনেও এল, কিন্তু সে নিজেকে সংযত ক'রে নিলে, "আপনি ঠিক্ বলেছেন। কিন্তু এই বিপদ্‌কালে আমার বিবেককেই আমি যথার্থ বলে মনে করি। আমার জন্মদাতা পিতার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। ভবিষ্যতের

প্রশ্নের উত্তরে বলি—আই. সি. এস. না হয়েও আমি বেঁচে থাকতে পারি," বলে ক্ষিপ্রগতিতে সে ভেতরে চলে গেল।

গঙ্গাপ্রসাদ কামতানাথকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, "ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, রায়বাহাদুর সাহেব। ও আমাকে বড়ো বেশী ভালবাসে। আমি তাকে জুলাই বা অগাস্টে অতি অবশ্যই ইংল্যাণ্ড পাঠিয়ে দেব, আপনি বিশ্বাস করুন।"

নবল সারাদিন ধরে ভবালি যাবার জন্যে গোছগাছ করছিল। সন্ধ্যেবেলা নবল গঙ্গাপ্রসাদের ঘরে গেলে তিনি বললেন, "বস নবল, আজ আমার শরীর বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে।"

নবল গঙ্গাপ্রসাদের কাছে চেয়ার টেনে বসল।

একটু থেমে গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "নবল, তুমি শুনে আশ্চর্য হবে, আজ বাবু কামতানাথের সামনে তোমার যে রূপ দেখলাম, আমি তাতে বিস্মিত হয়ে গেছি!"

"যদি আমি কিছু ধৃষ্টতা ক'রে থাকি তার জন্যে ক্ষমা করবেন, বাবা।"

গঙ্গাপ্রসাদ হেসে উঠলেন—করুণ বা বিপন্ন হাসি নয়, বরং নিজের পুরাণো স্বাভাবিক হাসি, "না নবল, ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। তোমার ওই রূপ দেখে গর্ব অনুভব করলাম! আমার মনে যে ভয়ানক ভয় হয়েছিল, তা যেন কোথায় মিলিয়ে গেল!"

"বাবা, আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না," নবল একটু ইতস্ততঃ করেই বলল।

"আমার কথা বোঝনি? তাহলে শোন নবল। তুমি তো জানই আমার 'গ্যালপিং থাইসিস', এর কোনো চিকিৎসা নেই। যেদিন আমার রক্ত বমি হয়েছিল, আমি সেদিনই টের পেয়েছিলাম। তখনই আমার ভীষণ ভয় হ'ল। আমি ভাবছিলাম তোমাদের কথা—তোমার, বিদ্যার, সুধা আর কেবলের কি হবে। তুমি এখন পড়ছ, বিদ্যার বিয়ে দিতে হবে আর সুধা ও কেবল তো এখন শিশু। আমার ভয় তুমি বুঝে উঠতে পারবে না। বাপ্পা তো

বুড়ো হয়েছেন, তাঁর ওপর ভরসা নেই। সেইজন্যেই আমি মরতে চাইছিলাম না। জীবনে আমি কিছু সঞ্চয় করিনি, তোমাদের জন্যে আমি কোনো সুব্যবস্থাও করতে পারিনি। আমি ভাবতেই পারছি না যে আমার ছেলেমেয়েদের কি হবে—আমার প্রাণ সেই ভয়েই ছটফট করছিল।"

নবল চুপ করে গঙ্গাপ্রসাদের কথা শুনছিল। গঙ্গাপ্রসাদ দম নিয়ে বললেন, "আমাকে এক গেলাস জল দাও তো। কথা বলার শক্তিও আর নেই।"

নবল উঠে গঙ্গাপ্রসাদকে জল খাওয়াল।

জল খেয়ে গঙ্গাপ্রসাদ আবার বলতে শুরু করলেন, "আজ যখন তোমার ঐ রূপ দেখলাম, তখন আমার ভয়ডর কোথায় চলে গেল! বুঝলাম, তুমি অভিমানী আর শক্তিমান, সুখসুবিধা পায়ে ঠেলতে পার। তুমি আপত্তির পাহাড় মাথায় তুলতে পার।"

আত্মপ্রশংসা শুনতে নবলের ভালো লাগছিল না। সে বলল, "বাবা, এখন আপনি চুপ করুন, বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

গঙ্গাপ্রসাদ নবলকে ধমকে উঠলেন, "আমার কথা শোন! কথার মাঝে কথা বলো না। তুমি বুঝতে পারছ না আমার ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আমার আর কোনো ভাবনা চিন্তা নেই। আমি এবার শান্তিতে মরতে পারব। তুমি সব সামলে নেবে, আমি বুঝেছি। আমার চেয়ে তুমি অনেক ভালোভাবে সংসার সামলাতে পারবে।" তিনি আবার বললেন, "নবল তুমি জান না আমি কেন বা কি ভাবে ভেঙ্গে পড়লাম। তুমি শুনে অবাক্ হবে, আমি নিজেই নিজেকে ভেঙ্গেছি। আমার অন্তরের ভীরুতাই আমাকে ভেঙ্গে দিয়েছে।"

নবলের কৌতূহল জেগে উঠল। সে জিজ্ঞেস করলে, "কি ভাবে বাবা?"

"সেইটেই বলছি। একদিন নিজের চাকরি, গোলামী আর বাধ্যবাধকতার প্রতি বিদ্রোহ করেছিলাম। আমার সেই

বিদ্রোহটাই ছিল যথার্থ। জ্ঞানকাকা একথা জানেন। আমি ঠিক করেছিলাম, চাকরিতে ইস্তফা দেব। কিন্তু আমার অন্তরের ভীরুতা সহজেই একটি ছোট্ট অবলম্বন পেয়ে আমাকে চেপে ধরল। আমি পদত্যাগ পত্রখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম। ফলে অমর্যাদা হজম ক'রে নিলাম। কিন্তু সেই অপমানের বিষটা ছিল তেতো, তার পরিণাম মারাত্মক। যখন পদত্যাগপত্র ছিঁড়ে ফেললাম, তখন থেকেই ভেঙ্গে পড়া শুরু হ'ল। গত আট-দশ বছর আমি শুধু জোয়াল টেনে যাচ্ছি। এখন তার অবসান হ'ল। আজ আমার আনন্দের সীমা নেই।"

নবল জ্ঞানপ্রকাশের মুখে এই ঘটনাটি বিশদ শুনেছিল। সেই ঘটনার প্রভাব বাবার ওপর এত প্রগাঢ়, ভাবতে পারেনি। গঙ্গাপ্রসাদ আবার বললেন, "নবল, একটি কথা মনে রাখবে। তুমি ভগবান ছাড়া কারো কাছে কোনো দিন নত হয়ো না, আত্মচেতনার বিরুদ্ধ কোনো কাজ করো না, আর নিজেকে ভোলবার জন্যে কোনো দিন মদ স্পর্শ করো না।"

ভাবাবেগে নবল বলল, "আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি বাবা, আমি এই তিনটি কাজই কোনোদিন করবো না! আপনি এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।"

"হ্যাঁ, আজ আমার খুব হাল্কা বোধ হচ্ছে আর ক্ষিদেও পেয়েছে একটু, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। আজ ঘুমটাও ভালো হবে।"

পরের দিন সকালে গঙ্গাপ্রসাদকে বেশ সুপ্রসন্ন দেখাচ্ছিল। তার জ্বরটাও এক ডিগ্রী কমে গিয়েছিল। তিনি নবলকে বললেন, "নবল, আমার মনে হচ্ছে আমার শরীরটা এখানেই সেরে উঠবে ; ভবালি যাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।"

"আমি যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। ওখানে গেলে আপনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবেন," নবল উত্তর দিল।

"হ্যাঁ, সেখানে যেতে তো হবেই, আর এখানে গরমটাও প্রচণ্ড।

আমার মনে হচ্ছে ভবালি থেকে আমি একেবারে সুস্থ হয়ে ফিরব,” গঙ্গাপ্রসাদের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো।

নবল গঙ্গাপ্রসাদের মুখে একটা দীপ্তি লক্ষ করলে। সে খুশী মনে ড্রইংরুমে এসে বসল। জিনিষপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন ভোরে গঙ্গাপ্রসাদকে নিয়ে সে ভবালি রওনা হবে। এমন সময় সত্যব্রত আর মায়া ড্রইংরুমে ঢুকল।

মায়া এসেই বললে, “হায়! হায়! কি হল নবল? কী বজ্রাঘাতই না হল? তিনি কোথায়? আমরা অনেক দেরিতে তার অসুস্থতার খবর কানপুরে পেলাম। সেখান থেকে সোজা গেলাম মির্জাপুর। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম এলাহাবাদে চলে গেছেন। বল নবল, তাঁর শরীর কেমন?”

নবল উভয়কে বসতে বললে, “ডাক্তারেরা ভবালি যাবার কথা বলেছেন। কাল ভোরে তিনি ভবালি যাচ্ছেন।”

“হে ভগবান! তাঁর এমন অবস্থা হয়েছে যে তাঁকে ভবালি যেতে হচ্ছে।” মায়া চীৎকার করে উঠল, “নবল, তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চল, একবার দেবতাকে দর্শন করে আসি।”

নবল বললে, “দেখি ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা। কাল বিকেল থেকে শরীরটা একটু ভাল। আপনারা বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি।”

নবল ফিরে এসে বললে, “চলুন আপনাদের তিনি ডাকছেন।” মায়া আর সত্যব্রতকে নবল গঙ্গাপ্রসাদের ঘরে দিয়ে এল।

গঙ্গাপ্রসাদকে দেখেই মায়া চীৎকার করে উঠল, “হায়! হায়! একী হ'ল আপনার! এ দিনটা দেখাও ভাগ্যে লেখা ছিল!” সে ছুটে গিয়ে গঙ্গাপ্রসাদের পা দুটো জড়িয়ে ধরল আর ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল।

গঙ্গাপ্রসাদ বড়ো কষ্টে মায়াকে ছাড়ালেন। তারপর বললেন, “বস মায়া দেবী, কেমন আছো? ছেলেপুলেরা ভালো তো? এলে কবে?”

কিন্তু মায়া কেঁদেই চলেছিল আর পাগলের মত বলছিল,

"আপনার একী হ'ল ? কী করে হ'ল বলুন। আমাদের অসুখের কোনো খবর পর্যন্ত দিলেন না তো। আমরা মির্জাপুর গেলাম। কানপুরে উড়ো খবর শুনেছিলাম, আপনি অসুস্থ। মির্জাপুর থেকে সোজা এখানে চলে আসছি। হে ভগবান ! একী দেখছি !"

সত্যব্রত চুপচাপ একদৃষ্টে গঙ্গাপ্রসাদকে দেখছিলেন। তিনি যেন গঙ্গাপ্রসাদকে চিনতেই পারছিলেন না। চামড়া দিয়ে ঢাকা শুধু হাড় ক'খানা তার সামনে পড়েছিল—দুর্বল, শিথিল, অসমর্থ। এ কী সেই মানুষ যার দাপটে লোকে কাঁপত, বড়ো বড়ো ইংরেজের সামনা সামনি যে লড়তে পারত, যে হাজার হাজার লোকের মধ্যে থেকে মায়াকে উদ্ধার করে এনেছিল ? সেই উদ্যম, উৎসাহ, শক্তি আর কর্ম-ক্ষমতা, যার সামনে সে শ্রীহীন আর নিষ্প্রভ হয়ে যেত, সে সব কোথায় গেল ? তার জায়গায় এই রুগ্ন আর সামর্থ্যহীন লোকটি শুয়ে আছে। এই লোকটিকে চিনতেও পারছে না। এমন সময় সত্যব্রত শুনতে পেলেন গঙ্গাপ্রসাদের পুরানো পরিচিত স্বর, "কি হে সত্যব্রত, ভাবছ কি ? তোমরা সাইমন কমিশনকে তো নিখুঁত ভাবে হটালে ; এবারে তোমাদের কর্মসূচি কি ?"

সত্যব্রতর মনে হল এখনও এই লোকটির মধ্যে চেতনা রয়েছে। বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে আছে। তিনি উত্তর দিলেন, "এখন আমাদের সামনে তো তেমন কোনো কাজ নেই। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আমাদের রাজনৈতিক জীবন জর্জরিত ক'রে দিয়েছে। কিন্তু দেশের দারিদ্র্যটা বড়ো বেশী বেড়ে গেছে আর তার সঙ্গে বেড়েছে অসন্তোষ।"

গঙ্গাপ্রসাদ মৃদু হাসলেন, "সবচেয়ে বড়ো হ'ল স্বদেশ-চেতনা, সত্যব্রত। তুমি কি মনে কর অদূর ভবিষ্যতে কোনো আন্দোলন শুরু হবে ?"

হতাশ স্বরে উত্তর দিলেন সত্যব্রত, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এত দরিদ্র আর বেকার—কিন্তু কারো মধ্যেই তো বিদ্রোহের

ভাব দেখি না। আমার মন তো নিরাশায় ভরে গেছে। আমার চার দিকে যেন দম বন্ধ-করা বাতাস আর তাতে গলা-পচা দুর্গন্ধ।”

“সত্যব্রত, এই দম আটকানো আর গলা-পচা পরিবেশের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে বিদ্রোহের বীজ; কাজ করাই জীবনের ধর্ম। আর যেখানে ক্রিয়া, সেখানেই আছে প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়াটাকে তো খতম করতেই হবে।” এবার গঙ্গাপ্রসাদ মায়ার দিকে ঘুরলেন, “কি মায়াদেবী, তুমি কংগ্রেসনেত্রী হতে পারলে না, ব্যাপারটা কি? এই খবরের কাগজগুলোতে কোথাও যে তোমার নামটাম ছাপেনি। মনে হয় সত্যব্রত তোমাকে হিংসে করে।”

“মুখে আগুন এই নেতাগিরির! আমার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে মুখ ফেরাবার ফুরসত কই। ঘর-সংসার থেকে যদি একটু আধটু সময় পাই তো চরখা চালাই। কিন্তু আমার এখন মনে হয় এ সব বৃথা। যাক্‌গে এসব কথা, আপনি নিজের কথা বলুন।”

“নিজের কথা আর কি বলব, তোমরা তো আমাকে দেখছই। কাল থেকে শরীরটা একটু ভালো মনে হচ্ছে, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আমি একেবারে সেরে উঠব। কাল ভোরের গাড়িতে ভবালি যাচ্ছি। এখানকার প্রচণ্ড গরমে শরীর একেবারে সারবে না।”

“আমরা কাল সকালে স্টেশনে আসব,” উঠতে উঠতে সত্যব্রত বললেন। “এখন আপনি বিশ্রাম করুন, কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।”

সত্যব্রত ঠিকই বলেছিল, গঙ্গাপ্রসাদ যথার্থই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পাশ ফিরে তিনি বললেন, “হ্যাঁ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বড়ো দুর্বল হয়ে গেছি। বেশ, কাল ভোরে ষ্টেশনে দেখা করো।” বলেই তিনি চোখ বুজলেন।

লোকজন দিনভোর গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছিল। রাত প্রায় আটটার সময় গঙ্গাপ্রসাদ নবলকে ডেকে পাঠালেন, “নবল কাল ভোরে আমাদের ভবালি কি যেতেই হবে?”

নবল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, “কেন বাবা, হ’ল কি?

াজানষপত্র সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে, শুধু ভোরে বিছানাটা বেঁধে নিতে হবে।"

"ভাবছিলাম, কাল আর আজ এই দুদিনেই আমার শরীরটা বেশ সেরে উঠেছে। বোধ হয় এখানেই সেরে উঠব।" একটু ভেবে বললেন, "না, ওখানেই যাওয়া উচিত। আসলে, বিদ্যার বিয়ের চিন্তা করছি। নবেম্বর মাসে তার বিয়ে দিতে হবে, আমি ভবালি থাকলে এখানে বিয়ের ব্যবস্থা করবে কে? মির্জাপুর থেকে বাবু বিন্দেশ্বরীপ্রসাদের চিঠি এসেছে, তিনি 'নবরাত্রে' তিলকের (আশীর্ব্বাদ) দিন ঠিক করতে বলছেন।"

"আপনি সে জন্যে চিন্তা করবেন না। আমি জুলাই মাসে এখানে এসে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলব। আর বিয়ের দিন তো পেছনোও যেতে পারে। আপনার শরীর ভালো নেই, এ খবর তো তাঁরা পাবেনই।"

গঙ্গাপ্রসাদ ভেবে বললেন, "আমি এখন তাঁদের কোনো উত্তর দিইনি। ভবালি পৌছে চিঠি দেব।" হঠাৎ গঙ্গাপ্রসাদের মুখ বিকৃত হয়ে গেল, "একটু পিকদানীটা দাও তো।"

নবল তাড়াতাড়ি পিকদানী তুলে ধরল, কিন্তু তার আগেই গঙ্গা-প্রসাদের কাশির বেগ এল। কাশির সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত বমি শুরু হ'ল। বিছানাটা সব ভিজে গেল।

নবল ঘাবড়ে গিয়ে ডাক দিলে, "দাদু, এখানে আসবেন একবার।"

গঙ্গাপ্রসাদ তক্ষুনি আবার বমি করলেন, মাংসপিণ্ড আর রক্ত। গঙ্গাপ্রসাদের মুখ কালি হয়ে গিয়েছিল, চোখ উল্টে গিয়েছিল। জ্বালাপ্রসাদ যখন এলেন তখন গঙ্গাপ্রসাদ তৃতীয়বার বমি করলেন —তেমনি কাল, পচা, দুর্গন্ধযুক্ত মাংসপিণ্ড। গঙ্গাপ্রসাদ সংজ্ঞা হারালেন।

সারা পরিবার ঘরের মধ্যে এসে জড় হ'ল। জ্বালাপ্রসাদ ডাক্তার শেরউডকে ডাকতে ছুটলেন।

ডাক্তার শেরউড এসে গঙ্গাপ্রসাদকে পরীক্ষা করলেন। তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে তিনি বললেন, "আর কিছু করার নেই, যে কোন সময় এর মৃত্যু ঘটতে পারে। বড় জোড় সকাল পর্যন্ত টিকতে পারেন।"

জ্বালাপ্রসাদ কাতর হয়ে বললেন, "একে যে কোনো উপায়ে বাঁচান, ডাক্তার সাহেব। ওষুধ দিন।"

"ওষুধের বদলে আপনি এঁকে গঙ্গাজল দিন। যার গ্যালপিং টি.বি. হয়েছে তাকে বাঁচানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সব শেষ হয়ে গেছে," বলে ডাক্তার শেরউড চলে গেলেন।

বাড়িময় কান্নার রোল উঠল। জ্বালাপ্রসাদ আর নবল মিলে গঙ্গাপ্রসাদকে খাট থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণকে ডেকে গোদান করান হ'ল। বাইরে পণ্ডিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠে বসলেন। নবলের মনে হচ্ছিল বাড়ির ওপর মৃত্যুর ছায়া নামল। ঘরের বাইরের বারান্দায় যমুনা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, রুক্মিণী মাথা ঠুকছিলেন। ঘরের মধ্যে জ্বালাপ্রসাদ আর নবল এমনভাবে বসেছিলেন যেন মৃত্যুর প্রহার থেকে গঙ্গা-প্রসাদকে বাঁচাতে চাইছেন। বিদ্যা, কেবল আর সুধাকে নিয়ে বাইরের উঠানে চলে গিয়েছিল আর ভিখু দৌড়-ঝাঁপ করছিল।

ভোর প্রায় তিনটের সময় গঙ্গাপ্রসাদ চোখ মেললেন। তাঁর দৃষ্টি সোজা নবলের ওপর পড়ল। "তুমি...তুমি!" তারপর বাবার দিকে তাকালেন, "বাপ্পা, আপনি নবলের ওপর ভরসা করতে পারেন। বিদ্যার বিয়ে এই-ই দেবে।" তারপর চারদিকে তাকালেন। ইশারায় যমুনাকে কাছে ডাকলেন, "নিজের পা আমার হাতে স্পর্শ করিয়ে দাও।" তারপর দেখলেন রুক্মিণীর দিকে, "তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, ক্ষমা কর।" তারপর দৃষ্টি গেল বাচ্চাদের ওপর, কিন্তু কথা বলার শক্তি বোধ হয় নিঃশেষ হয়েছিল। নবলের দিকে তাকিয়ে বাচ্চা দু'টির দিকে সঙ্কেত করলেন, যেন বলতে চাইছেন, "এদের দেখো"। তারপর

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি বিদ্যার ওপর গিয়ে পড়ল। সেই সময় হিক্কা এল আর মাথা ঢলে পড়ল।

সারাটা বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল।

তিন

তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হবার পর আজ আকাশটা অনেক পরিষ্কার। বিকেলে চা খেয়ে নবল বারান্দায় এসে দেখলো অস্তপ্রায় সূর্যের ম্লান রক্তিম আভা বারান্দায় এসে পড়েছে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। চারিদিক সবুজে ঢাকা। ইউনিভার্সিটি থেকে নবল একটু আগেই ফিরেছে; ক্লান্ত লাগছে। ক্লাসের শেষে বন্ধুদের সঙ্গে সেও আটকে পড়েছিল। কারণ তখনও টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ইউনিভার্সিটির গেটের কাছে আসতে না আসতেই তার সাইকেলের টায়ার ফেটে গেল। সাইকেল সারাতে তার কর্ণেলগঞ্জে যেতে হয়েছিল।

নবলের ক্লান্তি মানসিক। এক সপ্তাহ আগে সে বিদ্যাকে কাশীতে বোর্ডিংয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। বিদ্যার এবছর বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা। তার বি.এ. পাস করার ইচ্ছা। জ্বালাপ্রসাদ বিদ্যাকে আর পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যার জেদ সে বি.এ. পাস করবেই করবে। নবলও বিদ্যাকে সমর্থন করেছিল। উভয়ের আগ্রহের কাছে জ্বালাপ্রসাদকে হার মানতেই হলো। বিদ্যার অনুপস্থিতিতে নবলের একা একা বোধ হতে লাগল। বিদ্যা নবলের চেয়ে মাত্র বছর দুইএর ছোট কিন্তু বিদ্যাই নবলের ভরসা। নবল চুপচাপ বারান্দায় এসে বসল। সে ভাবছিল—কিন্তু কি ভাবছিল তা সে নিজেই জানে না। এলোমেলো ভাবনাগুলো তার মস্তিষ্কে আনাগোনা করছিল। গত তিন মাসে

তাদের সংসারটা অনেক পাল্‌টে গেছে, দৃষ্টিকোণ রূপান্তরিত হয়েছে। নবল নিজেও অনেক বদলে গেছে।

এমন সময় নবল জ্ঞানপ্রকাশের গলা শুনতে পেলে, "কি গো নবল, কি ভাবছ?"

নবল চমকে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে জ্ঞানপ্রকাশ মুচ্‌কি হাসছিলেন। জ্ঞানপ্রকাশের মুখের সেই সৌম্যভাব, সাত্বিক মনের দৃঢ়তা নবল সর্বদাই দেখে আসছে। "কিছু ভাবছি না জ্ঞানদাত্থ, মনটা উদাস হয়েছিল, সেইজন্যেই এখানে বসে আছি। আজ ক'দিন পরে রোদ উঠেছে। ভাবছিলাম কতদিন বাড়ি থেকে বের হয়নি, পারলে একটু হেঁটে আসতাম। আজ আপনি তাড়াতাড়ি কংগ্রেস অফিস থেকে ফিরে এলেন যে?"

"আজ দিনভোর অসম্ভব কাজ করতে হয়েছে। বড়ো ক্লান্ত বোধ করছি, তাই চলে এসেছি। চা-টা খাওয়া হয়ে গেছে না কি?"

"আজ্ঞে, এই মাত্র খেয়ে এলাম। আপনি বসুন, আমি এক্ষুণি চা নিয়ে আসছি," এই বলে ভেতরে গিয়ে ভিখুকে বললে, "জ্ঞানদাত্থ এসেছেন, তাঁর জন্যে চা নিয়ে এস বারান্দায়।"

"এক্ষুনি আনছি। দাদাবাবুও ঘুম থেকে উঠেছেন, তাঁকেও ডেকে আন।"

জ্বালাপ্রসাদ নিজের ঘরে বসে গীতা পড়ছিলেন। নবল গিয়ে বলল, "দাত্থ, চা তৈরি হচ্ছে। জ্ঞানদাত্থ এসেছেন। আপনি দশ-পনের মিনিটের মধ্যে আসুন, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"তুমি চল, আমি এই অধ্যায়টি শেষ করেই আসছি," বললেন জ্বালাপ্রসাদ।

নবল গিয়ে জ্ঞানপ্রকাশের পাশে বসল।

জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এল.এল.বি.-তে ভরতি হলে যে? বিলেত যাবার ইচ্ছা নেই বুঝি?"

"একেবারেই নেই জ্ঞানদাদু। বাড়ির অবস্থা তো আপনি সবই জানেন। তাছাড়া এবছর বিদ্যার বিয়ে দিতে হবে। বিয়েতে অনেক খরচা হবে। জানি না, কি করে বিয়েটা মিটবে।"

"নবল, যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বলি। তুমি টাকা-কড়ির কথা চিন্তা করো না। আমার মতে তুমি বিলেত চলে যাও। এটা তোমার কেরিয়রের প্রশ্ন। কি বলব, গঙ্গাপ্রসাদের অসুস্থতার সময় আমি বিলেতে ছিলাম। তোমরা আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলে না।"

"দাদু, আপনাকে কি করে খবর দেবো। এ্যাপেণ্ডিক্স অপারেশন করিয়ে আপনি তখন হাসপাতালে পড়েছিলেন যে।"

"যাক্, যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। তোমার পাসপোর্ট তো তোমার কাছেই আছে। তোমার যাবার কথাও তো ছিল সেপ্টেম্বর মাসেই। এখন কি হয়েছে। আমি বলছি, তুমি কোনো কিছুর জন্যে চিন্তা না করে বিলেত চলে যাও।"

নবল একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, "না জ্ঞানদাদু, আমাকে এখানে থেকেই পরিবারের দেখাশোনা করতে হবে। বাবা বিদ্যার বিয়ে ঠিক্ করে গেছেন। ওর বিয়ে এই নবেম্বর মাসেই দিতে হবে। আমার আর আই.সি.এস. হবার সখ নেই।"

এমন সময় জ্বালাপ্রসাদ বারান্দায় এলেন। তাঁকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। ভিখু বারান্দায় চা রেখে চলে গেল। জ্বালাপ্রসাদ আসামাত্র বললেন, "জ্ঞানু জান, আজ বাবু বিন্দেশ্বরীপ্রসাদের চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন বিয়ের দিন আর পেছনো যাবে না। 'নবরাত্রে' তিলক (আশীর্বাদ) হয়ে যাওয়া উচিত।"

জ্ঞানপ্রকাশ উত্তর দিলেন, "যখন বিয়ে দিতেই হবে, তখন আর পেছিয়ে লাভ কি! আমিও ভাবছি 'নবরাত্রে' তিলক (আশীর্বাদ) করে নবেম্বরে বিয়ে দিয়ে দিন।"

জ্বালাপ্রসাদ মৃদু স্বরে বললেন, "সে তো ঠিক। কিন্তু 'তিলকে'

আট হাজার পাঠাতে হবে, তারও তো ব্যবস্থা চাই। 'তিলক' পাঠানো তো তামাশা নয়।"

জ্ঞানপ্রকাশ চেয়ারে লাফিয়ে উঠলেন, " 'তিলকে' আট হাজার! আপনি কি পাগল হলেন দাদা! বাড়ির এই হাল আর আট হাজারের 'তিলক'!"

"কি আর বলব, এ সবই গঙ্গা ঠিক্ করেছিল। সিদ্ধেশ্বরী পি.সি.এস.-এর জন্যে নির্বাচিত হয়েছে। মে মাসে বাবু বিন্দেশ্বরীর 'সান্ত্বনা' পত্রে বিয়ের উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছিলেন, "রাজা যশোবন্ত রায়ের কাছ থেকে সিদ্ধেশ্বরীর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, তাঁরা পঁচিশ হাজার পণ দেবেন। কিন্তু গঙ্গার সঙ্গে পাকা কথা আর তার সামনেই পাকা দেখা হয়ে গেছে বলেই আমি ওদের সম্বন্ধ এখনও স্বীকার করি নি।' নবলকে সে চিঠি আমি দেখিয়েছিলাম।"

"আজ্ঞে, তাহলে আট হাজার 'তিলকের' মানে হল, পনেরো হাজারের পণ। কি নবল, বাবু বিন্দেশ্বরীর ওখানে পনেরো হাজারের পণ দিয়ে তুমি সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে বিদ্যার বিয়ে দেবে?"

নবল উত্তর দিলে, "জ্ঞান দাদু, বাবা এই বিয়ে পাকা ক'রে গেছেন। যেমন করেই হোক্ এ বিয়ে দিতে হবেই।"

চা খেতে খেতে জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "জ্ঞানু, তুমি তো বাবু বিন্দেশ্বরীকে খুব ভালো করেই জান। তাঁকে বল পণ কিছু কম ক'রে নিতে। পনেরো হাজার পণে, আরো দু-চার হাজার উপরি খরচা। আঠার-কুড়ি হাজার খরচা বড়ো বেশী! আর বিয়ের দিন পেছতেও তিনি রাজী নন।"

জ্ঞানপ্রকাশ রুক্ষ স্বরে বললেন, "দাদা, বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ মানুষ নয়, অর্থপিশাচ! ফৈজাবাদের ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেশন জজ, মোটা মাইনে। ছেলে ডেপুটি কালেক্টার হয়েছে। তবুও তার পয়সা-অন্ত প্রাণ! আমি তো মনে করি ও সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। এর চেয়ে অনেক ভালো ভালো ছেলে জুটে যাবে।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "জ্ঞানু, আর তো সম্বন্ধ ভাঙ্গা সম্ভবপর

নয়। আমি যদিবা রাজি হয়ে যাই, নবল কিছুতেই রাজী হবে না। গঙ্গা যা ঠিক্ করে গেছে সেটা সে শিলালিপির মতোই আঁকড়ে রয়েছে।"

জ্ঞানপ্রকাশ নবলের দিকে তাকালেন। নবল মাথা হেঁট করে চুপ চাপ বসেছিল। একটু ভেবে জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কাছে কত টাকা আছে?"

"আমার কাছে ব্যাঙ্কে মোট দু'হাজার আছে। গঙ্গার ধারটার শোধ ক'রে তার কাছ থেকে বারশ' মতো পেয়েছি। গঙ্গার আঙ্গুলে যে হীরের অংটি ছিল সেটা কলকাতায় বিক্রি ক'রে সাড়ে পাঁচ হাজার পেয়েছিলাম। সব সমেত পৌনে ন'হাজার হল।"

"ধরুন ন'হাজার", জ্ঞানপ্রকাশ বললেন। "তাহলে পনের হাজার টাকার এখনও, ছ'হাজার কম পড়ছে। মনে করুন 'তিলক' আপনি পাঠিয়ে দিলেন। তাহলেও বিয়ের জন্যে আট-ন' হাজার যোগাড় করতেই হবে। এ বিষয়ে আপনি কিছু ভেবেছেন কি?"

"এখনও পর্যন্ত কিছুই ভাবিনি, এবার ভাবতে হবে। গঙ্গার মোটর গাড়ীটা বিক্রি করলে এক হাজার আরো হবে। বাকি ছ'-সাত হাজার টাকা ধার করতে হবে।" তিনি জ্ঞানপ্রকাশকে বললেন, "জ্ঞানু, সত্যপ্রকাশকে লিখে তুমি দু'হাজারের ব্যবস্থা কর। আমার ধারণা হাজার পাঁচেক লক্ষ্মীচন্দের কাছ থেকে পেয়ে যাব। যে করেই হোক্ বিয়েটা তো দিতে হবে।"

জ্ঞানপ্রকাশ জ্বালাপ্রসাদের কথার কোনো উত্তর দিলেন না। চা-খেয়ে চুপচাপ নিজের ঘরে চলে গেলেন।

জ্ঞানপ্রকাশ যাবার পরে জ্বালাপ্রসাদ নবলকে জিজ্ঞেস করলেন, "নবল, তুমি কি বল, কি করা যায়?"

" 'তিলক' তো পাঠাতেই হবে দাদু, আমরা যখন কথা দিয়েছি, যেমন করেই হোক্ বিদ্যার বিয়েটা ওখানে দিতে হবে।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "বেশ, তা হলে আমি ওদের লিখে দিচ্ছি,

ওরা যেমন 'নবরাত্রে' আট হাজার টাকার 'তিলক' পাঠাতে বলেছেন —আমরা তাই পাঠাব।"

বেলা পড়ে এসেছে। নবল ঘরে গিয়ে বাইরে বেরোবার পোষাক বদলে নিল। সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে শুনতে পেল জ্ঞানপ্রকাশ ডাকছেন, "নবল, একবার এখানে এস তো।"

নবল গিয়ে দেখল, জ্ঞানপ্রকাশ ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করছেন। নবলকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "নবল, আমার কাছে এখন তিন হাজার টাকা আছে, তুমি দু'হাজার নিয়ে নাও। কিন্তু দাদুকে এখন এ টাকা দেবে না, তোমার মায়ের কাছে রেখে এস। তবুও আমি সত্যপ্রকাশদাদাকে লিখব। কিন্তু সময় মতো যে তিনি টাকা পাঠাবেন আদৌ সে ভরসা নেই।"

"জ্ঞান দাদু, এখনই এত তাড়া কিসের?"

জ্ঞানপ্রকাশ বিরক্তির স্বরে বললেন, "যা বলছি, তাই কর। আমারও কি ঠিক্ আছে নাকি, কখন কিভাবে টাকাটা আবার খরচ হয়ে যাবে। তোমার মায়ের কাছে টাকাটা রেখে এসে বাইরে যেও। আচ্ছা, এখন যেতে পার।" তিনি পূর্ববৎ পায়চারি করতে লাগলেন।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিদ্যার 'তিলক' যাবার কথা। পূজার ছুটিতে বিদ্যা কাশী থেকে এলাহাবাদে এসেছে, কিন্তু তার মন খুবই ভারাক্রান্ত। 'তিলক' যাবার আগের দিন বিকেলে বিদ্যা নবলকে বললে, "দাদা, চল একটু আল্‌ফ্রেড পার্ক পর্যন্ত ঘুরে আসা যাক্। বাড়িতে বন্দী থেকে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।"

বিদ্যার এই প্রস্তাবে নবল অবাক্ হ'ল। সে বিদ্যাকে নিয়ে আল্‌ফ্রেড পার্কের দিকে গেল। সেখানে বিদ্যা বললে, "দাদা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমার বিয়েতে কত টাকা পণ দেওয়া হচ্ছে?"

নবল জিজ্ঞেস করল, "সে খোঁজে তোমার কি দরকার? বাবা যা ঠিক্ ক'রে গেছেন তাই দেওয়া হবে।"

"পণটা আমার বিয়েতে দেওয়া হচ্ছে বলেই আমার জানা দরকার। না দাদা তোমাকে বলতেই হবে।"

" 'তিলক' যাচ্ছে আট হাজার টাকার, চার হাজার নগদ আর বাকি জিনিষপত্র।"

" 'চার হাজার নগদ আর চার হাজারের জিনিষপত্র' !" বিদ্যা পুনরাবৃত্তি করল। "তার মানে পনের হাজার টাকার পণ ঠিক্ হয়েছে।"

"হ্যাঁ, বাবা এই পণই ঠিক্ ক'রে গেছেন," নবল উত্তর দিলে।

"তুমি কেন বিলেত যাচ্ছ না এখন বুঝলাম। দাদা, বাবা তো কিছু রেখে যাননি, এত টাকা আসবে কোথা থেকে ?"

নবলের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পেল, "ওকালতি পড়ছি আমি, আর জেরা করছ তুমি! এ সব কথা ছেড়ে দাও। দাদু বেশ কিছু টাকার ব্যবস্থা করেছেন, আরও করবেন। এই সব জিজ্ঞাসাবাদের জন্যেই আমাকে এখানে টেনে আনলে বুঝি ?"

"হ্যাঁ, দাদা। তার মানে আমার বিয়ের জন্যে তোমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। শুনলাম দাদু নাকি বাবু বিন্দেশ্বরীপ্রসাদকে পণ কিছু কমাবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু উত্তর এসেছে 'না'। একথা কি ঠিক্ দাদা ?"

নবল মুচ্‌কে হাসল, "শ্বশুরের নাম করতে লজ্জা করছে না ! হ্যাঁ, খবরটা ঠিক্।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বিদ্যা আবার বললে, "দাদা, আমার বিয়ে ওখানে দিও না, আমি বিয়ে করতে চাই না।" বলেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

নবল বিদ্যার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, "বিদ্যা, আমরা যে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। বাবা যা কথা দিয়ে গেছেন তা তো রাখতেই হবে। আর নিঃশেষ হবার কথা যা বলছ—ভাঙ্গা-গড়ার মালিক তো তিনিই। বিশ্বাস কর, এই বিয়েতে পরিবারও ফতুর হবে না আর আমিও নিঃশেষ হব না।"

"কিন্তু আমি যে নিঃশেষ হয়ে যাব দাদা! তোমার পায়ে পড়ছি, ওই অর্থপিশাচদের বাড়িতে আমাকে ঠেলে পাঠিও না, এখনও সময় আছে।"

ত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠার নেশায় মগ্ন নবল বিদ্যার আন্তরিকতা বুঝতে পারল না। সে ধমকে উঠল, "বিদ্যা, আর কোনোদিন এরকম কথা ব'ল না। এ যে বাবার দেওয়া কথা। বাবা তোমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার ওপর দিয়ে গেছেন। আমি সত্যি বলছি, আমি বিলেত যেতে চাই না। নইলে তো জ্ঞানদাদু। আমাকে নিজের খরচায় পাঠাতে চাইছেন। চল বাড়ি ফিরি, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আর একটি কথাও মুখ দিয়ে বের করবে না।"

বিদ্যা চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "দাদা, তুমি আমার কথা বুঝলে না, আর বুঝতেও পারবে না।" সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, "তুমি যা বলবে দাদা, তাই করব। কিন্তু, এবছর আমার বি.এ. ফাইনাল। বিয়ের পরে আমার পড়াশুনা যেন বন্ধ না হয়। আমাকে তুমি কথা দাও, আমাকে বি.এ. পাস করাবে।"

নবলের মন বিদ্যার মুখ দেখে গলে গেল, "বিদ্যা তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে বি.এ. পাস করাবোই।"

নবমীর দিন সকালে নবল 'তিলক' নিয়ে ফৈজাবাদ পৌঁছল। নবলকে আনতে বাবু বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ নিজেই ষ্টেশনে গেলেন। কী সৌম্য চেহারা! বিন্দেশ্বরীপ্রসাদকে নবল এই প্রথম দেখল। বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "কুশলে এসেছ, পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদের ব্যবহারে নবলের মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। বিকেলে 'তিলক' চড়াবার আগে বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ নবলকে বললেন, "'তিলকের' জিনিষগুলো একবার দেখি।"

নবল বাক্স খুলে জিনিষপত্র বের করলে। বড়ো থালায় ক'রে

জিনিষপত্র সব সাজান হ'ল। সে সব দেখে বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ মুখ বাঁকিয়ে বললেন, "নগদ চার হাজার তো ঠিক্ই আছে, কিন্তু জিনিষপত্র চার হাজার টাকার তো হবে না। এটা খুব অন্যায় কথা।"

নবল হিসেবের ফর্দটা বাবু বিন্দেশ্বরীপ্রসাদের হাতে দিয়ে বললে, "আজ্ঞে, দাদু এটা আপনাকে পাঠিয়েছেন।"

"হিসেব নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব।" বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "আমি জানি, প্রতি জিনিষের দাম শতকরা পঁচিশ টাকা বাড়িয়ে লেখা হয়েছে।" নবল বিন্দেশ্বরীপ্রসাদের আর একটা রূপ দেখল। "সামর্থ যখন নেই আমাদের এখানে বিয়ে ঠিক্ করার দরকারই বা কি ছিল?"

নবল জানত, প্রত্যেকটি জিনিষের দাম শতকরা পঁচিশ টাকা বাড়িয়ে হিসেবের কাগজে লেখা আছে। তবু সামর্থের কথাটা শুনে তার খারাপ লাগল। সে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে, কন্যাপক্ষের সামর্থ্যই বা কি? যার সামর্থ্য ছিল সে কি বেঁচে আছে? আমরা তো আগেই জানিয়েছিলাম। ঈশ্বরের খেলা, কি বলব!"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদের কাছে নবলের বিনয়ের কোনো ফল হল না, "তুমি আমাদের নাক কাটিয়ে ছাড়লে। লোকেরা 'তিলক' দেখে কি বলবে? আমি বড়ো বড়ো অফিসার, তালুকদার আর ধনী মানীদের নিমন্ত্রণ করেছি। তোমার দাদুকে বলবে আমার সঙ্গে এসব ছলচাতুরি চলবে না। বিয়েতে আমার নগদ চার হাজার টাকা চাই, এসব জিনিষপত্রের দরকার নেই। আমার এখানে এসব জিনিষ অনেক আছে।"

নবল গ্লানি আর ক্রোধ বেমালুম হজম ক'রে নিল। 'তিলক' চড়িয়ে পরের দিন সকালেই সে এলাহাবাদে ফিরে এল। জ্বালা-প্রসাদকে 'তিলকের' সব বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললে, "দাদু, কোথাকার এক অর্থপিশাচের ফাঁদে আমরা পড়েছি! জ্ঞানদাদু ঠিক্ই বলে-

ছিলেন। ওই বংশে বিদ্যার বিয়ে ঠিক্ করে আমরা খুব ভুল করেছি।"

জ্বালাপ্রসাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। জ্বালাপ্রসাদের কাছে মাত্র তিন হাজার টাকা ছিল। বিয়ের আর মাত্র দু'মাস বাকী। তিনি চিন্তিত স্বরে বললেন, "নবল, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখনও আমাদের মাথার ওপর ন'হাজার টাকার খরচা ঝুলছে। আমার কাছে মাত্র তিন হাজার টাকা রয়েছে। ছ'হাজারের আরো ব্যবস্থা করতে হবে।"

নবল হতাশার সুরে বললে, "হ্যাঁ দাদু, ছ'হাজারের ব্যবস্থা তো করতেই হবে। তা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই।"

জ্বালাপ্রসাদ অসহায় ভাবে বললেন, "কি আর বলব, জ্ঞান-প্রকাশকে বলেছিলাম সত্যপ্রকাশের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা আনিয়ে দিতে। আমিও সত্যপ্রকাশকে দুখানি চিঠি দিয়েছি। কিন্তু সে চিঠির কোনো উত্তরই এল না, আর জ্ঞানপ্রকাশও সে বিষয় পরে আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা করল না।"

নবল জ্ঞানপ্রকাশের টাকাটার কথা ভুলে গিয়েছিল। সে বললে, "দাদু, দু'মাস আগেই জ্ঞানদাদু আমাকে দু'হাজার টাকা দিয়ে-ছিলেন, মায়ের কাছে রেখে দিয়েছি। এখন শুধু চার হাজারের ব্যবস্থা করলেই হবে।"

জ্বালাপ্রসাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "ভগবানের ইচ্ছা থাকলে সেটাও হয়ে যাবে। আমি আজই লক্ষ্মীচন্দকে চিঠি লিখছি। পাঁচ হাজার বোধ হয় তার কাছ থেকে পেয়ে যাব।"

এমন সময় জ্বালাপ্রসাদ জ্ঞানপ্রকাশের গলা শুনতে পেলেন, "দাদা, আপনি লক্ষ্মীচন্দের কাছে কিছু আশা করবেন না; অন্য কোথাও দেখুন। সত্যপ্রকাশদাদাও আমাকে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন।"

"জ্ঞানু, তুমি তো দু'হাজার টাকা দিয়েই দিয়েছ। খুব বড়ো সাহায্য করেছ। আমার খুব আশা, এই সময়ে লক্ষ্মীচন্দ অবশ্যই

আমাকে সাহায্য করবে। আমি ভাবছি আমি নিজেই কানপুরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রব।"

"হ্যাঁ, আপনি যদি নিজে গিয়ে দেখা করেন, তাহলে বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরে পাঁচশ' কি হাজার দিতেও পারে।"

সেদিন বিকেলে বিদ্যা নবলকে বললে, "দাদা, আমি আর তোমাকে কিছু বলব না। যা হ'ল তা তো তুমি দেখলেই। যা হবে তাতে আমিই তো ভুগব। তুমি আমাকে কাল কাশী পৌঁছে দিয়ে এস।"

নবলের প্রাণ যেন কেঁদে লঠল, "বিদ্যা, আমাকে ক্ষমা কর, আমরা ভারি ভুল করেছি।"

"ভুল তো হয়েছেই দাদা, কিন্তু সে ভুল আর শোধরাবার নয়। কিন্তু আমি তোমাকে তোমার কথা স্মরণ করাচ্ছি। তুমি কথা দিয়েছ, আমাকে বি.এ. পাস করাবেই।"

"হ্যাঁ বিদ্যা, আমি নিজের কথা রাখবই," নবল বলল। "আমি তোমাকে কালই কাশী পৌঁছে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার পড়া-শুনায় কোনো বাধা পড়বে না, এটা আমার দায়িত্ব।"

হাতে আর বেশী সময় নেই। জ্বালাপ্রসাদ এখনও টাকার ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারেন নি। জ্ঞানপ্রকাশ যা বলেছিলেন ঠিক্ তাই। ধার দেবার সামর্থ নেই জানিয়ে লক্ষ্মীচন্দ বললেন, "কাকাবাবু, আমার অবস্থা ভালো নয়। মেয়ের বিয়েতে কন্যা-দানের জন্যে এক হাজার দিচ্ছি। বিয়েতে আমি বোধ হয় যেতে পারব না," বলে হাজার টাকা জ্বালাপ্রসাদকে দিলেন। তিন হাজার টাকা আরও কম পড়ছিল। সামাজিক লোকাচারে এক হাজারের মতো পাওয়া যাবে, জ্বালাপ্রসাদ জানতেন। কিন্তু তাও অনিশ্চিত।

নবেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হয়েছে। জ্বালাপ্রসাদের আত্মীয়-স্বজনেরা আসতে শুরু করেছেন। বাড়িতে হৈ চৈ। বিদ্যাকে আনতে নবল কাশী গেছে। বিদ্যাকে নিয়ে ২৩শে নবেম্বর সে ফিরল। বিদ্যার গায়ে হলুদ হ'ল।

বরযাত্রীদের দেখাশোনার ভার ছিল নবলের ওপর। নবল এসেই কাজে লেগে গেল। সে নিখুঁতভাবে সব ব্যবস্থা করলো। জ্ঞানপ্রকাশ বাড়ীর যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করছিলেন, তবে নামে মাত্রই, কারণ সব ভার ছিল ভিখুর ওপর। বাইরে থেকে জিনিষপত্র আনা নেওয়া করতে নবল ভিখুকে সাহায্য করছিল। সেদিন জিনিষপত্র ঠেলায় চাপিয়ে নবল যখন ফিরল, ভিখু বললে, "বাইরের ঘরে দাদাবাবু জ্ঞানুদাদার সঙ্গে কথা বলছেন। আমার তো মনে হ'ল তাঁদের মধ্যে যেন ঝগড়া হচ্ছে। তুমি বাবা একটু গিয়ে দেখে এস তো।"

নবল ড্রইংরুমে গেল। জ্ঞানপ্রকাশ বলছিলেন, "আমি কোনো অবস্থাতেই আপনাকে ধার নিতে দেব না। কন্যা বিদায়ের সময় বাটি ভরে টাকা দেওয়ার নিয়ম রক্ষার জন্যে দু'হাজার টাকা দেবেন না। বলে দেবেন এটাকাটা পরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

"জ্ঞানু, তাহলে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যাবে, তুমি জান না," জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন। "এই দু'হাজার টাকার ব্যবস্থা আমাকে যে কোনো প্রকারে করতেই হবে।"

"পরশু বিয়ে আর আজ আপনি ব্যবস্থা করতে চলেছেন," জ্ঞানপ্রকাশ বললেন। "বাজারে টাকার কি হরিলুট হচ্ছে যে গেলেন আর কুড়িয়ে তুলে নিয়ে এলেন। যতটা কাছে আছে, তাই দিয়েই কাজকর্ম সমাধা করুন। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন বলে তো আর নিজের মান ইজ্জত বিক্রি করতে পারেন না।"

জ্বালাপ্রসাদ তিক্ত হাসি হাসলেন, "মেয়ের বিয়ে দেওয়া আর নিজের মান ইজ্জত বেচা—একই কথা জ্ঞানু। এই বাংলোটা বন্ধক রেখে দু'হাজার টাকা তো পাওয়া যাবে। জ্ঞানু, কারো সঙ্গে ঠিক করে দাও না।"

"বাংলোটা বন্ধক রাখা, কাগজপত্র প্রস্তুত করা, মহাজন খোঁজা—' দাদা, আপনার মতিভ্রম হয়েছে না কি? যা নয় তাই সুদ দিতে

হবে। না, এসব দিয়ে কাজ হবার নয়। আমাদের যে আর সময়ও নেই।"

জ্বালাপ্রসাদ একটু ভাবলেন, তারপর নবলকে বললেন, "একটু তোমার ঠাকুমাকে ডাক তো।"

নবল যমুনাকে ডেকে আনল। যমুনা বললেন, "কি বলছ? উঠানে সব মেয়েরা জড়ো হয়েছে, দেবীর পূজা হচ্ছে, আমার তাড়া আছে।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "কথাটা হচ্ছে—বিয়ের জন্যে হাজার দুই টাকা কম পড়েছে। কোনো রকমে ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।"

"এতে আমি আর কি করতে পারি। এ তো পুরুষদের কাজ। তুমি রয়েছ, জ্ঞানু ঠাকুরপো রয়েছে......।"

জ্বালাপ্রসাদ বিরক্ত হয়েই বললেন, "যদি আমরাই করতে পারতাম তাহলে আর তোমাকে ডেকে পাঠাতাম নাকি!"

যমুনা শঙ্কিত হয়ে বললেন, "তাহলে ডেকেছ কেন বলই না?"

"তাই বলছি, তোমার আর বৌমায়ের কিছু গয়না দাও। সেগুলি বন্ধক রেখে টাকা আনতে হবে।"

যমুনা কাতরে উঠলেন, "হায় ভগবান! কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে!"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "অন্য কোনো উপায়ই তো আর দেখছি না। আমার কাছে যা ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে। এখন হাতে সময়ও নেই যে বাড়ি বন্ধক রাখি। শুধু এই একটা পথই খোলা। আমাকে কাল সকালে গয়না দিয়ে দিও, পরশু বরযাত্রী আসছে।"

যমুনার চোখ জলে ভরে এল, "কোন্ মুখে বৌমাকে বলব। আমি নিজে না হয় গয়না নাই পরলাম। কিন্তু বৌমার মেয়ের বিয়ে, ওর গায়ে একটাও গয়না থাকবে না। হায় ভগবান! বড়ো নিন্দে হবে যে!"

"নিন্দে-সুখ্যাতির প্রশ্নই ওঠে না। একাজটা তো উদ্ধার করতেই হবে। কাল সকালের মধ্যেই গয়না এনে দেবে।"

ছলছল চোখে যমুনা চলে গেলেন। উঠানে মেয়েরা বিবাহ

মঙ্গল গাইছিলেন, হাসি ঠাট্টা চলছিল। যমুনা চুপচাপ পুতুলের মতো গিয়ে যোগ দিলেন। রুক্মিনী যমুনার অবস্থা দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মা কি হয়েছে? শরীর ভালো তো?" যমুনা রুক্মিনীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা বললেন।

সেই থেকেই বাড়িটা উদাস ভাবে ভরে উঠল। বিয়ের সব আচার-অনুষ্ঠানই পালন করা হচ্ছিল। কিন্তু সবার মন থেকেই উৎসাহ, আনন্দ যেন হঠাৎ উবে গেল। এটা কেন বা কি করে হ'ল, কেউই তা জানতে পারলো না। কিন্তু প্রত্যেকেই মনে মনে একটা বিচিত্র অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলেন।

বিকেলে বাড়ির পরিবেশ অনেকটা পাল্টে গেল। পরিবেশের এই পরিবর্তন সব চেয়ে বেশী অনুভব করলে ভিখু। সে বুঝতে পারছিল না—এসব কেন হল। সে আর থাকতে পারলে না। ভাঁড়ারে গিয়ে যমুনাকে জিজ্ঞেস করলে, "বৌদি, এ সব হচ্ছে কি? হঠাৎ হাসি খুশী কোথায় উবে গেল?"

যমুনার চোখ ছলছলিয়ে এল। "সবই ভগবানের খেলা ভিখু, তিনি আমাদের সর্বস্বান্ত করবার জন্যেই দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছেলে কেড়ে নিলেন, এবার অঙ্গের অলঙ্কারও কাড়ছেন," যমুনা ভিখুকে সব খুলে বললেন।

"ব্যস্, এই কথা!" ভিখুর মুখের ওপর মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, "তোমার গয়না আর যাবে না। যাও, খুশী মনে গিয়ে নাতনির বিয়ের শুভ কাজ সমাধা কর। দাদাবাবু কি ঘরে আছেন?"

"হ্যাঁ, জ্ঞানঠাকুরপো আর নবলের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছেন।" যমুনা চলে গেলেন।

নবল আর জ্ঞানপ্রকাশ বসে, "দ্বারপূজার" অবসরে পার্টির বিষয় আলোচনা করছিলেন। একশো জন বরযাত্রী আসছে। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধব মিলে প্রায় চারশ' মতো হবে। জ্বালাপ্রসাদ একটু তফাতে চুপচাপ বসে এদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তাঁর মনে কোন উৎসাহ ছিল না। এমন সময় ভিখু হাতে একটা টিনের

বাক্স নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকলো। বাক্সটি জ্বালাপ্রসাদের সামনে রেখে বললো, "দাদাবাবু, বিদ্যা মায়ের জন্যে এ আমার কন্যাদান!"

জ্বালাপ্রসাদ চমকে উঠলেন, "তোমার কন্যাদান! কি বলছ? এতে আছে কি?"

"আমি গুনতে তো জানি না। তবে এতে অনেক টাকা আছে। সেজন্যে বৌদি আর বৌমায়ের গয়না বন্ধক রাখবার কোনো দরকার হবে না। বিদ্যা মায়ের ওপর আমারও তো অধিকার রয়েছে। তাকে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছি।"

জ্ঞানপ্রকাশ আর নবল ভিখুর কাছে উঠে এলেন। জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলেন, "এতে কত টাকা হবে?"

"বললাম তো আমি গুনতে জানি না। তবে আমার সব জমা টাকা এরই মধ্যে আছে। সারা জীবনটা তো এই বাড়িতেই কাটল। যখন যা পেয়েছি এতেই জমা করেছি। মা যা কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন সে সব তো তোমরা দেখেছ।"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "ভিখু, এ তোমার সারা জীবনের সঞ্চয়, এ আমি নিতে পারব না।"

ভিখু উত্তর দিলে "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের থেকে আলাদা মনে করছ কেন? আমার আর আত্মীয় কুটুম্ব কেউ নেই। এই ছেলেপুলেরাই তো আমার সব। এদের কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছি।" ভিখু কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, "দাদাবাবু, গঙ্গা আমাকে তোমার চেয়ে বড়ো ক'রে দেখত। তার জন্যে আমার কতই না গর্ব ছিল। নির্দয় ভগবান তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন।" ভিখুর গলা ধরে এল। "গঙ্গার মেয়ের বিয়ে দেখার কতই না সাধ ছিল। ভগবান আজকে সেদিন দিলেন। আমি বিদ্যা মায়ের জন্যে সংকল্প করে রেখেছি, এই বাক্সটি সামলে রাখ—এই আমার কন্যাদান।"

জ্বালাপ্রসাদেরও চোখ ছলছল ক'রে উঠল। তিনি ভিখুর দিকে তাকালেন। অসীম মমতা আর করুণায় ভরে উঠলো বুড়োর

মুখ। কম্পিত স্বরে তিনি নবলকে বললেন, "নবল, আমার তো এই বাক্সটা স্পর্শ করার অধিকার নেই, তুমিই এটা খোল।"

নবল বাক্স খুললে। ছিনকির কিছু রূপোর গয়না, পঞ্চাশটি গিনি আর প্রায় পনের শ' নগদ টাকা ছিল।

জ্ঞানপ্রকাশ বারশ' টাকা আর পঞ্চাশটি গিনি আলাদা বের করে রাখলেন। তারপর ভিখুকে বললেন, "কন্যাদানে এইগুলো কম পড়ছিল। বাকিটা তুমিই রাখ। কিছু নবলের বউকেও তো দিতে হবে। আবার সুধার কন্যাদানও তো রয়েছে।"

ভিখুর মুখে তৃপ্তির মৃদু হাসি দেখা দিল, "নিশ্চয়ই, বেঁচেবর্তে থাকলে দিতে তো হবেই।" ভিখু বাক্সটি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

যেন কোনো অজানা ইন্দ্রজালে সারা পরিবেশ আবার হাসিখুশীতে ভরে উঠল।

তিরিশ তারিখে এল বরযাত্রীরা আর সুষ্ঠুভাবেই বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হয়ে গেল। বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ কোথাও কোনো অভিযোগের ছিদ্র খুঁজে পেলেন না। কনে-বিদায়ের দিন ভোরবেলায় নবল মজলিসে বিন্দেশ্বরীপ্রসাদের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বললেন, "অতিথি সৎকারে যদি কোন ত্রুটি ঘটে থাকে নিজগুণে ক্ষমা করবেন।"

বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়নে বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ বিশেষ প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "নবল, আমরা তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন। তুমি তোমার পিতার যোগ্য পুত্র। উদার ও সাহসী।"

"আপনার কাছে আমার একটি ছোট্ট অনুরোধ আছে। বিদ্যা এ বছর বি. এ. ফাইনালে পড়ছে। সে বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিক।"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, "আরে, ওকে কি আর চাকরি-বাকরি করতে যেতে হবে যে বি. এ. পাস করতেই হবে।"

"আজ্ঞে, আপনার পুত্রবধু হয়ে ও চাকরি করতে যাবে কোন্ দুঃখে? কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীবাবু হচ্ছেন ডেপুটি কালেক্টার, ভবিষ্যতে

কালেক্টর হবেন। তাই তাঁর স্ত্রী যদি গ্রাজুয়েট হয় তা হ'লে আরো বেশী সামাজিক সম্মান পাবেন।"

নবল ঠিক্ কথাই বলেছিল। বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ সিদ্ধেশ্বরীর দিকে তাকালেন, "শুনছ, নবল কি বলছে? তোমার মত কি?"

"আপনি যা ভালো বোঝেন তাই হবে। তবে সে যদি বি. এ. পাস করে তো ভালই, চার-পাঁচ মাসের ব্যাপার তো।"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ হাসলেন, "নতুন যুগ কি না! সবাই একই ধারায় ভাবে। আচ্ছা বেশ, এক সপ্তাহ পরে আমি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু মেয়ে তো কাশীতে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ", নবল উত্তর দিল।

"তাহলে বোর্ডিংয়ের খরচটা তোমাদেরই। কি সিদ্ধেশ্বরী, ঠিক তো?"

সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিল, "বাবা এটা কি আর বলার কথা। এতদিন যখন নিজের বোনকে পড়ালেন তখন পাঁচ-ছ'মাস আর কি পড়াতে পারবেন না।" বলে সে জোরে হেসে উঠল।

ভয়ানক বিশ্রী সিদ্ধেশ্বরীর সে দেঁতো হাসিটা আর বিন্দেশ্বরী-প্রসাদের ছেঁদো আর স্বার্থসর্বস্ব কথাবার্তা। কিন্তু নবল তার বোনকে যে কথা দিয়েছিল সেটা রাখতে পারায় তার মন তৃপ্তিতে ভরে উঠল।

চার

"হু তারা স্বরাজ দিতে এল আর এরা কথাটা পর্যন্ত বললে না, এটা কত বড়ো মূর্খতা!" রায়বাহাদুর কামতানাথ চড়া স্বরে বললেন, "হিন্দুস্থান স্বরাজ পাবে, না কচু!"

জ্ঞানপ্রকাশ মুচকে হাসলেন, "রায়বাহাদুর সাহেব, পেলে তো কচুই পাবে। সেইজন্যেই তো আমরা সাইমন কমিশনকে তাড়িয়ে

দিলাম। ওদের সঙ্গে দেখা ক'রে যদি কোনো লাভ হত তাহলে আমরা নিশ্চয় দেখা করতাম।”

“ওহে শোন, আমরা যে আমাদের চিরাচরিত ভদ্রতাটাই হারিয়ে ফেলেছি। মশাই, সাত সমুদ্র পেরিয়ে কমিশন দল এল আমাদের দেশে। আমাদের সেক্ষেত্রে কর্তব্য ছিল তাদের খানাপিনা করানো, ঘোরানো, খুব ভালো ভালো কথাবার্তা বলা। সমস্যার সমাধান চট্ করে হয়ে যেত। আপনারা চাইতেন এক, তারা দিত তারও বেশী। এসব তো দূরের কথা, উল্টে কংগ্রেসীরা তাদের গালমন্দ করতে লাগল। আমাদের বুদ্ধি খুলবে এই আশায় তারা এখানে বছর কাটিয়ে দিলে। আশা করেছিল তারা নিজেদের কথা বলবে, আর তাদের কথা আমরা শুনব। কিন্তু এটা আর কোনো মতেই হল না। বেচারীরা লজ্জিত হয়ে চলে গেল। তারাও বোধ হয় মনে ভেবে নিল যে কোথাকার জঙ্গলী আর গোঁয়ারদের পাল্লায় পড়া গেল বাবা!”

রায়বাহাদুরের কথাবার্তায় জ্ঞানপ্রকাশের মজা লাগছিল। তিনি বললেন, “রায়বাহাদুর সাহেব, আপনাকে এই কমিশনের সামনে কেন ডাকা হয়নি, আমি অবাক্ হয়ে ভাবছি। আপনার এত ধন-দৌলত, মান-সম্মান, ভদ্রতা আর সর্বোপরি এত বড়ো খেতাব, কিন্তু আপনাকে কেউ গ্রাহ্যই করল না।”

“কি আর বলি বল। এই হারামজাদা ইংরেজ অফিসারেরা হাজার হাজার টাকা চাঁদা দুয়ে নিয়ে যায় আর কমিশনের সঙ্গে দেখা করবার বেলায় খোসামদ করে বেড়ায় কংগ্রেসীদের। আমি গেলে কমিশনকে স্বরাজ দিতে রাজী করাতাম নিশ্চয়ই। আমি লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ গবর্ণরকে লিখেও ছিলাম। কিন্তু আমার চিঠির তারা উত্তর পর্যন্ত দিলে না। এবার চাঁদা চাইতে আসুক না বেটারা, একটা কানাকড়িও দেব না ইতরগুলোকে।”

“ইউরোপ থেকে ফিরতে আপনি এতো দেরি করলেন যে? আপনার তো অক্টোবর মাসে ফেরার কথা ছিল, ফিরলেন ডিসেম্বর

মাসে। মনে হয় গোটা ইউরোপটা ঘুরে এসেছেন," বললেন জ্বালাপ্রসাদ।

রায়বাহাদুর কামতানাথ মুচ্‌কে হাসলেন, "কি আর বলব, ঊষা মা জেদ ধরল। সে তো ইউরোপ থেকে ফিরতেই চাইছিল না। কিন্তু ইউরোপের ঠাণ্ডা আমার সহ্য হচ্ছিল না। এখানে ফিরেও এতদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার ফুরসৎই হয়নি। ঊষার একটা বছর নষ্ট হ'ল। আসছে বছর সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হবে।"

এমন সময় নবল এসে ঘরে ঢুকল। তার সঙ্গে ভিখু ট্রে ক'রে চার গেলাস সরবৎ নিয়ে এল।

জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলেন, "এবার গরমে কোথায় যাওয়া স্থির করছেন?"

"মুশৌরীতে একটা বাংলো কিনেছি। ভাবলাম ফি বছরই তো গরমে কোথাও না কোথাও যাওয়া হয়, তাই একটি বাংলোই কিনে রাখি না কেন। খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম, বারো হাজারে।" তার-পর তিনি জ্বালাপ্রসাদকে বললেন, "আপনার নিমন্ত্রণ রইল। মে মাস শুরু হয়েছে, দু-চার দিনের মধ্যেই আমি একা যাব, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না কেন?"

জ্বালাপ্রসাদ মুচ্‌কে হেসে বললেন, "আমি আর কি মুশৌরী যেতে পারব? আমার এলাহাবাদে একটুকুও কষ্ট হয় না।"

কামতানাথ সরবৎ খেতে খেতে বললেন, "নবল, আজকাল তো তুমি আমাদের বাড়ি যাওয়া আসা একেবারে ছেড়েই দিয়েছ। কেন, হয়েছে কি? তুমি বিলেত যাচ্ছ কবে? এবছরটা তো তোমার নষ্টই হ'ল।"

"আজ্ঞে, এখন তো বিলেত যাবার কোনো কথাই নেই। এল.এল.বি. প্রিভিয়স পরীক্ষা দিয়েছি, পরীক্ষাটা ভালোই হয়েছে।"

"তাহলে ওকালতি করবার ইচ্ছে নাকি?" কামতানাথ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।"

উত্তর দিলেন জ্ঞানপ্রকাশ, "কেন, ওকালতি করতে আপত্তিটা কি? আপনার ছেলে গৌরীনাথও তো ওকালতি করছে।"

"ওহে, ওকালতি আর করছে কি, বৃথা সময় নষ্ট করছে," কামতানাথ বললেন। "মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজগার। না নবল, ওকালতি-ফোকালতি বৃথা। আমি বলছি তুমি বিলেতে চলে যাও।" তারপর তিনি জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালেন, "আমার ইচ্ছে ছিল আমাদের বংশে একজন অন্ততঃ বড়ো অফিসার হবে। গৌরীনাথ তো একটা আস্ত গাধা। কষ্টে-স্বষ্টে, কেঁদে-কোকিয়ে সে ওকালতিটা পাস করলে। তিন বছর পরে এখন পঞ্চাশ-একশ' মতো পায়। সীতানাথ ব্যবসা দেখে, আর আসলে সংসার সেই সামলে রেখেছে। এ বছর সওয়া লাখ টাকা লাভ হয়েছে। আমি ভাবছিলাম ছেলে হল না তো জামাই-ই কালেক্টার হোক্। আমার মনের একটি সাধ মেটে। খরচার জন্যে কোনো চিন্তা নেই।"

কামতানাথের এই কথাবার্তায় নবল বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সে বললে "এল.এল.বি. ফাইনাল আমাকে পাস করতেই হবে। তাছাড়া আমি সরকারী চাকরীর পরম্পরাটা শেষ করে ফেলতে চাই। আমি মনে করি যে আইন ব্যবসায়ে আমি সফল হতে পারব।"

কামতানাথ উঠে দাঁড়ালেন, "আমার কর্তব্য করবার জন্যে আমি তৈরীই আছি। পরে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে আমার কথাটা ভেবে দেখ। আপনারাও বোঝাবেন ওকালতিতে কিছুই নেই। আমি দু'মাসের জন্যে মুশৌরী যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, নবল, উষা তোমার কথা প্রায়ই বলে, মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে গেলে তার ভালোই লাগবে। আচ্ছা, উষাকে ডেকে দাও তো, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।"

উষা বিদ্যার সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করছিল। বিদ্যা তিন দিন আগে

বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে কাশী থেকে ফিরে এসেছে। উষাকে মোটরে এগিয়ে দিয়ে নবল যখন বিদ্যার সঙ্গে ফিরল, বিদ্যা বললে, "দাদা, তুমি বিলেত চলে যাও না এখন? উষা বলছিল তোমাকে জোর করতে।"

নবল বিরক্তির সুরে বলল, "আমি যাব না, যাব না, যাব না। কামতানাথের কন্যাকে পরিগ্রহ করতে পারি তবু কামতানাথের গোলামি করব না।"

"তাহলে তুমি কামতানাথের মেয়েকে বিয়েও করতে পারবে না দাদা। উষার স্বপ্ন আর উচ্চাশা রয়েছে।" বিদ্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে, "দাদা, চিন্তায়, বিচারে ও মর্যাদায় অসমান পরিবারের মধ্যে বিবাহ বড়ো ভয়ানক। আমার কথাই ভাবনা কেন! আমার দ্বিরাগমনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ততই যেন আতঙ্ক বেড়ে যাচ্ছে।"

বিদ্যার কথা শুনে নবল চিন্তিত হল, "বিদ্যা, তোমার শ্বশুরবাড়ির কথা তুমি আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলনি। সেখানে তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে কি না সত্যি কথা বলবে?"

বিদ্যা হাসল, "মাত্র সপ্তাহ খানেক তো সেখানে ছিলাম, দাদা। বলার মতো এমন কিছু তো নেই। তবে একটা কথা অবশ্যই বলব। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের আমি ঘৃণা করি। যারা আমাদের সংসারটাকে তছনছ ক'রে দিয়েছে, তাদের প্রতি আমার মনে অনুরাগ জাগবে কি করে। সে পরিবারের প্রত্যেকটি লোক আমার কাছে পিশাচরের মতো। মনের এই ভাবটাকে আমি দূর করবার অনেক চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। ঐ পরিবারের ওপর আমার মনে প্রবল একটা ঘৃণা জন্মেছে।"

বিদ্যার কথা শুনে নবল শঙ্কিত হ'ল, "বিদ্যা, জীবনটাই একটা বোঝাপড়ার ব্যাপার। এই ভাবটাকে মন থেকে সরিয়ে ফেলো। আমাকে কথা দাও, আবেগের বশে তুমি কোনো অনুচিত কাজ ক'রে বসবে না।"

"দাদা, আমার ওপর তোমার কোনো দিন কোনো অভিযোগ থাকবে না—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। জানি জীবনটা একটা বোঝাপড়ার ব্যাপার। কিন্তু প্রত্যেক বোঝাপড়ার দুটো দিক আছে। আমার সাধ্যমতো আমি আপন মর্যাদায় অটল থাকতে চাই, বলে বিদ্যা ঘরের ভেতরে চলে গেল।

বিদ্যার দ্বিরাগমন জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে স্থির হ'ল। সিদ্ধেশ্বরী উন্নাও জেলায় নিয়োগ হয়েছিল। সে জন্যে তার আগে ছুটি পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। ঠিক্ হয়েছিল যে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যাকে দ্বিরাগমনের পর সোজা এলাহাবাদ থেকে উন্নাও নিয়ে যাবে। বিদ্যাকে ফৈজাবাদ যেতে হবে না জেনে নবল খুশী হয়েছিল। বাবু বিন্দেশ্বরীপ্রসাদকে সে ঘৃণা করত।

বিদ্যা উন্নাও চলে গেল। এদিকে নবল মনটাকে দেশের রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে। এখন তার অধিকাংশ সময় জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে দেশের রাজনীতি চর্চায় কাটত। দেশময় দমন নীতি ব্যাপক ভাবে চলছিল। দেশের নানা জায়গা থেকে গ্রেপ্তারের খবর আসছিল। নবল আগে কখনও রাজনীতিতে মন দেয়নি, আজকাল মজা পাচ্ছে।

জুলাই মাস। খুব বৃষ্টি হচ্ছে। নবল এল.এল.বি. প্রিভিয়স ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। বিদ্যাও বি.এ. তে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। আগের দিন বিদ্যার চিঠি এসেছে। তাতে সে প্রকাশ করেছে অসীম দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা। উন্নাওয়ে সিদ্ধেশ্বরীর এক বিধবা পিসি বাড়ির গিন্নী। বাড়িতে তাঁরই শাসন চালু। বিদ্যার মনে হচ্ছেনা যে এ বাড়ি তার। কিন্তু তবুও সে খুব ধৈর্যের সঙ্গে সংসার চালাচ্ছে। সে যেন ঐ বাড়িতে বন্দিনী। ডেপুটি কালেক্টারের স্ত্রী—তবুও সাধারণ স্ত্রীলোকদের মতো তাকে পর্দার আড়ালে থাকতে হয়।

সেদিন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নবল ঘুম থেকে উঠলো। জ্ঞানপ্রকাশ বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। নবল

জ্ঞানপ্রকাশের কাছে এসে বসল। 'লীডার' কাগজটি হাতে নিল। বিশেষ কোনো খবর নেই। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলছে। এ্যাসেম্বলিতে সরকারী আর বেসরকারী পক্ষের মধ্যে তুমুল তর্ক হচ্ছে। নবল কাগজখানা রেখে দিয়ে জ্ঞানপ্রকাশের দিকে তাকাল, "জ্ঞানদাদু, আপনি কি মনে করেন এসব করে হিন্দুস্থানের কোনো লাভ হবে? দমননীতি এমন ব্যাপকভাবে চলছে যে বিনা আন্দোলনেই লোকেদের ধরে ধরে ফাটকে আটক করা হচ্ছে। জনতা তবুও অসাড়।"

জ্ঞানপ্রকাশ মুচকে হাসলেন, "হ্যাঁ নবল, একথাটা তো স্পষ্ট যে এদেশের চেতনা সজাগ হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বিশ্রী রকম বেড়ে গেছে। তারা নিজেদের কেরামতি তো দেখাবেই!"

"মধ্যবিত্তের বেকার হওয়ার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার যোগসূত্রটি আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না দাদু।"

"নবল, এটা খুবই সহজ কথা। তুমি তো জানই এ যে দেশের শতকরা নব্বইজন অশিক্ষিত। তারা ভাবতে যেমন পারে না, তেমন বুঝতেও পারে না। তারা চায় নেতৃত্ব, আর নেতৃত্ব সব সময় শিক্ষিতদের হাতে থাকে। যারা শিক্ষিত তারাই সমৃদ্ধ, বড়ো জমিদার, উঁচু পদে প্রতিষ্ঠিত। তাদের স্বার্থ আর কৃষকদের স্বার্থ এক নয়। বুঝেছ?"

নবল বলল, "আজ্ঞে, এটা স্পষ্ট।"

"কিন্তু আজকাল দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক গরীব আর বেকার। এই আইন অমান্যকারীদের আন্দোলনটা বেকারত্বের অভিশাপ! ইংরেজরা শিক্ষিত বেকারদের অসন্তোষকে অনেকদিন পর্যন্ত দাবিয়ে রেখেছিল। হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন খাড়া ক'রে তারা তাদের পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়েছে। তবে বাস্তব সমস্যার সমাধান তো আর অবাস্তব উপায়ে সম্ভব নয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদের প্রশ্নটা তো আজ চাপাই পড়ে গেছে। বেকারী আর

অসন্তোষ যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে রয়েছে এটা ঘটনাচক্রে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এই ঘুণ বেশী দিন স্থায়ী হবে না।"

"তবে আপনি কি মনে করেন ইংরেজরা হিন্দুস্থানকে আরো বেশী শোধরাতে চাইবে?"

জ্ঞানপ্রকাশ খানিক ভেবে বললেন, "নবল, সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, জোরে চেপে না ধরলে ব্রিটিশ সরকার হিন্দুস্থানকে কিছুই দেবে না। অদূর ভবিষ্যতে দেশকে বড়ো একটা আন্দোলন চালাতে হবে।"

"আমার তো মনে হচ্ছে আমাদের দেশ কোনো আন্দোলনের জন্যেই প্রস্তুত নয়," নবল উত্তর দিলে। "দাদু, সব জায়গায় অসহায়তা আর চাপা বেদনা দেখতে পাচ্ছি। মহাত্মা গান্ধী প্রথম আন্দোলনটাকে বন্ধ করে দিয়ে ভারি ভুল করেছেন।"

"কে জানে নবল। আমার তো মনে হয় তিনি ঠিকই করেছেন। সেদিন আমাদের গ্রামগুলোতে বিদ্রোহের চেতনা ছড়িয়ে পড়েনি। কংগ্রেসের প্রভাব শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে গত সাত আট বছরের মধ্যে কংগ্রেসের শিকড় গ্রামের গভীরে গেড়েছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের আন্দোলন কি আর সফল হতে পারে? সাধারণ মানুষ যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোকাবিলা করতে কাতারে কাতারে বেরিয়ে পড়ে তবেই আন্দোলন সফল হবে।"

নবল চুপ করে রইল। জ্ঞানপ্রকাশ আবার বললেন, "কিন্তু নবল, এই অসংখ্য মানুষের জন্যে নেতৃত্ব চাই—সৎ আর সচ্চরিত্র মানুষের সহযোগিতা দরকার। আমাদের দেশে কিন্তু চরিত্র আর সততার বড়োই অভাব।"

নবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে "দাদু, আপনি ঠিকই বলেছেন," বলে চা খেতে লাগল।

পাঁচ

লর্ড আরউইন বিলেত থেকে ফিরে ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর যে ঘোষণা করলেন, চারদিকে শুধু তারই আলোচনা। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নে কনভোকেশন সপ্তাহে বিতর্ক সভার বিষয় ছিল, "ঔপনিবেশিক স্বরাজ দ্বারা দেশের সমস্যার সমাধান সম্ভবপর কি না"। নবল এই বিষয়ে একটা বক্তৃতা তৈরি করছিল। বিষয়টা কঠিন। তাই এ সম্পর্কে জ্ঞানপ্রকাশের পরামর্শ নেওয়া সে অতি আবশ্যক মনে করল।

ভোরেই সে জ্ঞানপ্রকাশকে ধরলে। তিনি প্রাতরাশ সেরে কংগ্রেস কমিটির দফতরে যাচ্ছিলেন। জ্ঞানপ্রকাশ বসলেন। তিনি নিজের মতামত নবলকে বললেন। হঠাৎ জ্ঞানপ্রকাশের আরও নতুন কিছু মনে পড়ে গেল। তিনি নবলকে বললেন, "আরে হ্যাঁ, নবল, জান কি এলাহাবাদে ১৬ই নভেম্বর সর্বদলীয় সম্মেলন হবে? কংগ্রেস কর্মীসভার বৈঠকও সেই সময় ওখানে হচ্ছে। তখনই এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে।"

"আজ্ঞে জ্ঞানদাদু, ওখানে আমার যাবার সুযোগ কি করে হতে পারে?" প্রশ্ন করলে নবল।

"আমি সেইটেই বলছি। সর্বদলীয় সম্মেলনে দেশের সব জায়গা থেকেই লোক আসবে। আমাদের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান স্বেচ্ছা-সেবকের দরকার। তুমি ইউনিভার্সিটির প্রায় পনের-কুড়িজন ছাত্রকে স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্যে রাজী করাতে পারবে কি?"

নবল উৎসাহের সঙ্গে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ জ্ঞানদাদু, পারবো। আপনি আমাকে আগে বলেন নি কেন? কাল বিকেলের মধ্যেই আমি আপনাকে এই স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা দিয়ে দেব। কিন্তু এদের কোনো বিশেষ পোষাক থাকবে কি?"

জ্ঞানপ্রকাশ ভেবে উত্তর দিলেন, "পোষাক সম্পর্কে তো এখনও কিছু ভাবিনি। তবে খদ্দরের ধুতি বা পাজামা পাঞ্জাবি আর গান্ধী

টুপি পরা উচিত। হ্যাঁ, এখন একটু শীত পড়েছে, তাই পট্টুর জহর কোট হলে বেশ ভালই হয়। এ পোষাক পাঁচ-ছ'টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। তাই এরকম ছাত্র হওয়া দরকার, যারা এ খরচটা তাদের নিজেদের পকেট থেকে করতে পারবে।"

সর্বদল সম্মেলন বসলো নৈরাশ্যজনক পরিবেশের মধ্যে। ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সব আলোচনা হয়েছিল আর ব্রিটিশ মন্ত্রীরা যে ভাবে ঘোষণার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করলেন তাতে দেশের যুবকদল ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দেশের যুবকদল ব্রিটিশ শাসকদের কপট নীতির শিকার হতে রাজী হল না। তাদের মধ্যে ছিল উদ্যম, উৎসাহ, সংঘর্ষের প্রতি মোহ আর প্রাণ উৎসর্গ করার আত্মবল। এই যুবক দলের নেতৃত্ব করছিলেন জহরলাল নেহরু আর সুভাষ চন্দ্র বোস।

নবল সব দেখল। তার ভেতরে নতুন করে চেতনার মোড় ঘুরল। সে অনুভব করল সংঘর্ষ অনিবার্য। আগে গিয়ে তাকেও সংঘর্ষে যোগ দিতে হবে। ধীরে ধীরে নবলের অজান্তেই তার বিচারবুদ্ধি কর্মপ্রচেষ্টার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ, বেশ শীত পড়েছিল। জ্বালাপ্রসাদ বাড়ির জন্যে গরম জামাকাপড়, লেপ আর তোষকের ব্যবস্থা করলেন। তিনি নবলকে ডেকে বললেন, "বাবা নবল, গত বছর তো বিদ্যার বিয়ের জন্যে তোমার জামাকাপড় কিছুই করাতে পারিনি। দেখছি তোমার জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে। এবছর তুমি সার্জের একটা সুট করিয়ে নাও।" জ্বালাপ্রসাদ নবলের হাতে টাকা দিলেন।

নবল জিজ্ঞাসা করলে, "দাদু, জামাকাপড় আমি আমার পছন্দ-মতো তৈরী করাব। আপনার আপত্তি নেই তো?"

জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "নবল, আজকের দুনিয়ায় যে যার নিজের ইচ্ছামতই চলছে। কারো আপত্তিতে কারো কিছু এসে

যাচ্ছে না। আমি তোমার ওপরই সব ছেড়ে দিলাম, জামাকাপড় তুমি পরবে, আমি নয়।"

টাকা নিয়ে নবল বাজারে গেল। মনে চিন্তা পাক খাচ্ছে। খাদি ভাণ্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নবল। নিজেরই অবাক লাগছে। একবার ভাবলো এখান থেকে চলে যায়, কিন্তু তার পা সরল না। দোকানদার বললে, একটা থানে একটা কোট আর একটা জহর কোট হবে। তার দরকারও ছিল তাই। আর দু'থান। খদ্দর নিল—ছখানা পাঞ্জাবি আর দু'খানা পাজামা। চারখানা ধুতিও কিনলে। এতেও তার কুড়ি টাকা বাঁচল। দোকানদার জিজ্ঞাসা করলে, "কাপড়জামা সেলাই করাবেন না? দর্জি দোকানেই আছে—সেলাই করতে দশ টাকা লাগবে।" নবল জামাকাপড় সেলাই করাতে দিল।

খাদি ভাণ্ডার থেকে সে কংগ্রেস কমিটিতে জ্ঞানপ্রকাশের কাছে গেল। কংগ্রেসের বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দিয়ে জ্ঞানপ্রকাশ চা খাচ্ছিলেন। নবলকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "নবল, আজ কংগ্রেস কমিটিতে এসে পড়লে যে? বসো চা খাও। কিছু কাজ টাজ আছে না কি?"

নবল বসে নিজের জন্যে চা তৈরী ক'রে নিলে। "জ্ঞানদাদু, আমি আজ একটা বড় কাজ ক'রে ফেলেছি।"

"তা তো তোমার গম্ভীর মুখ দেখেই বুঝছি। বল তো কি ব্যাপার?"

"আজ থেকে আমি খদ্দর পরতে শুরু করলাম। দাদু সার্জের স্যুটের জন্যে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলেন। আমি সেই টাকায় খদ্দরের জামাকাপড় করাতে দিয়ে এসেছি। চল্লিশ টাকাতে ছখানা পাঞ্জাবি, দুখানা পাজামা, চার খানা ধুতি, একটা পট্টুর কোট আর একটা পট্টুর জহর কোট, গান্ধী টুপি ছটা। এর মধ্যেই সেলাই খরচাও আছে। খুব সস্তা।"

জ্ঞানপ্রকাশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "এ সব ঠিক্ আছে, তবে

তোমার এল.এল.বি.-টা তো আগে পাস ক'রে নেওয়া উচিত। মনে রেখ, তুমি যতক্ষণ না ওকালতি পাস করছ আমি তোমাকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে কিছুতেই ঢুকতে দেব না। নইলে দাদা আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করবেন।"

"আপনি বিশ্বাস করুন, এখনও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করার ইচ্ছা আমার একটুও নেই, কিন্তু খদ্দর পরা তো শুরু করতে পারি।"

"হ্যাঁ, তা পার। কিন্তু সি.আই.ডি.র নজরে পড়বার আশঙ্কা রয়েছে। তবে যতক্ষণ তুমি রাজনীতিতে কোনো সক্রিয় অংশ না নিচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ তোমার কিছুই করতে পারবে না। তুমি তো আর সরকারী চাকরি করবে না!"

ডিসেম্বরের গোড়াতেই জোর শীত পড়ল। শনিবার বিকালে রায়বাহাদুর কামতানাথ জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। জ্বালাপ্রসাদ কামতানাথকে ড্রইংরুমে বসিয়ে বললেন, "ব্যাপার কি, রায়বাহাদুর সাহেব, এত গম্ভীর কেন?"

"এমন কিছুই নয়, তবে কাজকর্মের বড়ো ঝঞ্ঝাট চলছে। সীতানাথ কারবারটা বড়ো বেশী ছড়িয়ে ফেলেছে। আমাকেও দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়। আজ সারাদিনই কাজ করেছি। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে যাই। অনেক দিন আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।"

জ্বালাপ্রসাদ ভিখুকে চা আনতে বলে কামতানাথকে বললেন, "রায়বাহাদুর সাহেব, ব্যবসাতে মেহনত তো করতেই হবে। তবে এ কিরকম ব্যবসা যে মাথার ওপর খাঁড়া ঘুরছে?"

"ডেপুটি সাহেব, এই জীবনটাই একটা মস্তো ঝঞ্ঝাট। ভেবেছিলাম আমরা যথেষ্ট উপার্জন করেছি, আটটি মৌজাও কিনে নিয়েছি, শহরে আমাদের পাঁচটি বাংলো আছে। কিন্তু সীতানাথ ......কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারে না। জমি-জায়গা আর বিষয়-সম্পত্তি—গৌরীর ওপর, আর কারবার—সীতানাথের ওপর

ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু সীতানাথ যে কারবার এতটা ছড়িয়ে বসবে সেটা আমি ভাবিনি। মাসখানেক আগে সে একটি আটার মিলও কিনেছে।”

কামতানাথের নিজের বৈভবের গুণগান করার সখ আছে, জ্বালাপ্রসাদের সেটা ভালোভাবেই জানা ছিল। কখন কখনও তাঁর এ স্বভাব বড়ো বিশ্রী লাগত। তিনি বললেন, “ছাড়ুন এসব কথা। এটা হ'ল ব্যবসারই যুগ। তালুকদারি আর জমিদারিতে কিছুই নেই, সব জমিদার আর তালুকদাররা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছেন।”

কামতানাথ চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, “ডেপুটি সাহেব, আপনি নবলের বিষয় কিছু ভেবেছেন কি ?”

জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, “আমি এখন ভাবা-টাবা ছেড়েই দিয়েছি, কারণ মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। তাছাড়া নবল এখন বড়ো হয়েছে, সে আমার কথা শোনেই বা কই ! বরং বলা যায় সে আমাকে কখনও কিছু জিজ্ঞেসই করে না। যা মন চায় তাই করে।”

“এটা তো খুব অন্যায় কথা”, কামতানাথ বললেন। “শুনলাম সে কংগ্রেস দলের স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিল, আর এখন খদ্দর পরে।”

“হ্যাঁ, সর্বদল সম্মেলনে সে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিল। আমি তাকে বারণ করিনি, কারণ সে তো কোনো অন্যায় করেনি। উপরন্তু এটা হ'ল নতুন যুগ। নতুন যুগের সভ্যতাও নতুন। নিষেধ করলেও সে যদি আমার কথা না শোনে তাহলে আমার বড়ো দুঃখ হবে। তবে আমি খুশী কারণ তার ভালোর দিকেই ঝোঁক। সে সচ্চরিত্র আর সৎ। আমার নিজের ধারণা সচ্চরিত্র আর সততাই হচ্ছে সংসারের শ্রেষ্ঠ বৈভব।”

“আজ্ঞে, আপনার কথা ঠিকই, কিন্তু আজকাল এসব আর চলে না। সংসারে থাকতে গেলে সংসারে আর দশ জনের মতোই হতে হয়। নচেৎ সততা আর সাধুতার ওপর নির্ভর করে টাকা উপার্জন করা যায় না। আপনি বোধ হয় জানেন না, সি. আই.

ডি.-র খাতায় নবলের নাম উঠেছে। আমি অনেক কষ্টে তার নামটা কাটিয়ে দিয়েছি। সে জন্যে আমাকে দুশ' টাকা ঘুষও দিতে হয়েছে।"

জ্বালাপ্রসাদ চিন্তিত হয়ে উঠলেন, "তবে কি নবলের ওপর সি. আই. ডি.দের নজর পড়েছে? সে তো কখনও সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেনি।"

"যাক্‌গে, ভুলে যান এ সব কথা। আমি তো বললাম তার নাম কাটিয়ে দিয়েছি। আমি নবলকে বোঝাতে এসেছিলাম, সে যেন বুঝে-সুঝে চলে। ব্রিটিশ সরকার খুব কড়াকড়ি নীতি চালাছে। মিলিটারিকে প্রস্তুত থাকবার জন্যেও সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে। ঐ কর্নেল ডিগ্‌উই, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন, গত পরশু আমাকে দু'লাখ টাকার ঠিকে দিয়েছেন। বলছিলেন, ইংল্যাণ্ড থেকে আরো দু'লক্ষ সৈন্য আসছে; কামান, মেশিনগান.........কলকাতা, বোম্বাই, করাচিতে অনেক জমে গেছে।"

জ্বালাপ্রসাদ শঙ্কিত হলেন, "রায়বাহাদুর সাহেব, আপনি তো অশুভ সংবাদ শোনালেন। যদি ইংরজরা এতটা প্রস্তুত হচ্ছে তবে তারা এই ঔপনিবেশিক স্বরাজের কথা বলছে কেন?"

"আরে এসব হল পুরোপুরি ধাপ্পা, ছল, প্রতারণা। আসল কথা হ'ল যে কিছুই পাওয়া যাবে না, আর হিন্দুস্থানের অন্ততঃ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কিছু পাওয়াও উচিত নয়। ডেপুটি সাহেব, পঞ্চাশ বছর পরে কি হবে, কে তা বলতে পারে!"

জ্বালাপ্রসাদ কামতানাথের কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

কামতানাথ আবার বললেন, "আমি নবলের বিয়ের কথা বলতে এসেছিলাম। ঊষাও আঠার বছর পার হ'ল, উনিশ চলছে। আমি ভাবছি এ বছর গরমের সময় বিয়েটা দিয়ে দিই। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?"

"আপনি নিজের সুবিধা-অসুবিধা দেখুন—কন্যাপক্ষ কিনা।

আমাদের আর কি। বরযাত্রী নিয়ে আপনাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেই হ'লো!

"কি আর বলি, মনে যা সাধ ছিল সেটা পূর্ণ হবে বলে তো আশা নেই। ইচ্ছে ছিল নবল আই.সি.এস. হবে, কিন্তু সে তো গোঁ ধরে বসেছে। নবলের এই জেদ গৌরী খুবই অপছন্দ করছে। তার বিলেত যাতায়াতের আর পড়ার যাবতীয় খরচা, সবই তো আমি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু নবল কিছুতেই শুনছে না।"

"সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে", জ্বালাপ্রসাদ বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ডেপুটি সাহেব। যে বলেছে সে ঠিকই বলেছে, 'লাভ-লোকসান, জীবন-মরণ, যশ-অপযশ সবই বিধাতার হাতে'।"

এময় সময় জ্বালাপ্রসাদের নজর বারান্দার দিকে পড়ল। তিনি নবলকে কাপড়ের বড়ো বাণ্ডিল হাতে আসতে দেখলেন। জ্বালা-প্রসাদ জোরে হাঁক দিলেন, "নবল একটু শোনো তো, জামাকাপড় সেলাই করিয়ে আনলে?"

নবল কামতানাথকে দেখতে পায়নি, তাহলে বোধ হয় সে বাণ্ডিল নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকত না। জ্বালাপ্রসাদ বাণ্ডিলটা নবলের হাত থেকে নিলেন। "দেখি তো তোমার জামাকাপড়। বেশ অনেকগুলো করিয়েছ মনে হচ্ছে," বলে বাণ্ডিলটা খুলে ফেললেন।

জামাকাপড় দেখে জ্বালাপ্রসাদ চমকে উঠলেন, কিন্তু তাঁর চেয়েও বেশী চমকালেন কামতানাথ। তিনি বললেন, "আরে তুমি খদ্দরের এতগুলো জামাকাপড় সেলাই করিয়েছ। মনে হচ্ছে তুমি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছ।"

নবল ঘরের মধ্যে কামতানাথের উপস্থিতি জানতে পারল, "না পাপা, কংগ্রেসে যোগ দিইনি। কিন্তু খদ্দর পরা আরম্ভ করছি।"

মুখ বেঁকিয়ে কামতানাথ বললেন, "এই মোটা খদ্দর শরীরে কি কাঁটার মত ফোটে না। তোমার আবার খদ্দর পরার খেয়াল চাপল কেন?"

"এমনি। ভাবলাম মোতিলাল আর জহরলাল যদি খদ্দর পরতে পারেন আমিও পারব না কেন! আচ্ছা, এগুলো ভিতরে রেখে আসছি।" বলে নবল ভেতরে চলে গেল।

কামতানাথ মর্মাহত হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর বললেন, "ডেপুটি সাহেব, ছেলেটা হাত থেকে ফসকে গেছে।"

জ্বালাপ্রসাদ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন, "মনে তো হচ্ছে সেরকমই। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মানুষ আর কি করতে পারে!"

কামতানাথ জ্বলে উঠলেন! "ঈশ্বরের মুখে আগুন! আমিই একে পথে আনবো। বিয়েটা এপ্রিল মাসেই হওয়া উচিত, জানুয়ারী মাসে ভালো দিন নেই। বিয়ের পরে উষার সঙ্গে ওকে বিলেতে পাঠিয়ে দেব। উষার নামে আমি ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করে দিয়েছি। মশাই একবার যদি মায়ার ফাঁদে পড়েন, তাহলে দেশভক্তিটক্তি সব হাওয়া হয়ে যাবে।"

কামতানাথের কথা জ্বালাপ্রসাদের ভালো লাগল না। কামতানাথের বাবা রামসজীবন কমিসেরিয়েটের ষ্টোর-কীপার ছিলেন। বেইমানী ও জালিয়াতিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বর্মা-যুদ্ধে আর আফগান যুদ্ধে তিনি দু'হাতে টাকা কামিয়েছেন। ছেলে কামতানাথকে মিলিটারি কনট্রাক্টরের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে কামতানাথ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছিলেন। আর রায়বাহাদুর খেতাবও পেয়ে গেলেন।

মুন্সী রামসজীবন জ্বালাপ্রসাদের কাছে হামেশা হাত-জোড় ক'রে আসতেন। আজ তাঁরই পৌত্রকে কামতানাথ কড়ি দিয়ে কিনতে চাইছেন! কামতানাথের কথা শুনে জ্বালাপ্রসাদ মর্মাহত হলেন। তিনি কামতানাথের কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

কামতানাথ উঠে দাঁড়ালেন, "আচ্ছা, আজ তবে আসি। গৌরী-নাথের সঙ্গে কথা বলে আমি বিয়ের দিন ঠিক্ করব। আপনি প্রস্তুত থাকবেন।"

কামতানাথের সঙ্গে জ্বালাপ্রসাদের যেসব কথাবার্তা হ'ল তিনি

তা নবলের কছে উল্লেখ করলেন না। শুধু বললেন "নবল, রায়বাহাত্বর কামতানাথ বলছিলেন, তিনি ঊষার বিয়ে এপ্রিল মাসে দিতে চান। দিন ঠিক্ ক'রে তিনি পরে বলবেন।"

"দাত্ব, এত তাড়া কিসের? আমি আগে এল.এল.বি. পাসটা তো ক'রে নিই।"

আপাদমস্তক খদ্দর পরে নবল বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। জ্বালাপ্রসাদ কিছুক্ষণ নবলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখে মৃত্ব হাসি ফুটে উঠলো, "তোমাকে এই পোষাকে সুন্দর মানিয়েছে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন!"

পরের দিন সকালে জ্ঞানপ্রকাশ নবলকে বললেন, "দেশের যুবকদের লাহোর কংগ্রেসে গিয়ে জহরলালের শক্তি বৃদ্ধি করা উচিত। তুমি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে দশজন ছেলেকে যাবার জন্য রাজী করাতে পারবে কি?"

"আমার নামটা লিখেই নিন, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দশ জনের নাম আপনার কাছে দেব," নবল উৎসাহের সঙ্গে বলল।

"নবল, কাজটা এতো সহজ ভেবো না। লাহোর যাবার জন্যে প্রত্যেকের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা ক'রে খরচ করতে হবে। যাদের খরচা করবার সামর্থ্য আছে তারা যাবে না, আর যারা রাজী হবে তাদের হাত খালি। আমার কাছে একটা নিজস্ব ফাণ্ড আছে, তা দিয়ে আমি তাদের অর্ধেক খরচা বহন করব।"

"তাহলেই তো কাজ হাসিল হয়ে যাবে," নবল বললে।

"না নবল, তবুও মুশকিল হবে। সে জন্যে আজ থেকেই ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা শুরু ক'রে দাও। লাহোর অধিবেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। লর্ড আরউইনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী আর পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে আলোচনা হবার কথা আছে, দেখ তার কি ফল হয়। সব দিক্ দিয়েই লাহোর কংগ্রেস হবে গুরুত্বপূর্ণ।"

নবল জ্ঞানপ্রকাশের কাজে বের হ'ল। কাজটা সত্যিই খুব

কঠিন। সেদিন অনেক কষ্টে মাত্র দু'জন ছাত্রকে লাহোর যাবার জন্যে রাজী করাতে পারল। ছুটাছুটিতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে প্রায় নটায় বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে সে এক বিচিত্র পরিবেশ দেখতে পেল। গোটা পরিবার ড্রইংরুমে এসে জড়ো হয়েছে। জ্বালাপ্রসাদের হাতে ছিল একটা 'তার' আর যমুনা কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, "কোন্ কসাইয়ের ঘরে তোমরা বিদ্যাকে পাঠালে! তারা আমাদের সর্বস্বান্ত করলে, তার ওপর আবার এই সব! নবলকে না পাঠিয়ে তুমি গিয়ে দেখ কি ব্যাপার।"

নবল আসা মাত্র জ্বালাপ্রসাদ তার হাতে 'তার'-টা দিলেন। উন্নাও থেকে সিদ্ধেশ্বরী 'তার' করেছে। 'তার' নবলের নামে, লিখেছে, শীঘ্র এসে বোনকে নিয়ে যাও।"

নবল দু-তিন বার 'তার'-টা পড়ে বললে, "কিছু বুঝতে পারছি না।"

রুক্মিণী বললেন, "এর মধ্যে আর বোঝবার কি আছে। ওরা বিদ্যাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিচ্ছে। বিদ্যার কাল চিঠি এসেছে —গোটা পরিবার উন্নাওতে গেছে। সবাই যমদূত হয়ে আমার মেয়েকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।"

জ্বালাপ্রসাদ নবলকে বললেন, "কাল ভোরের গাড়িতে চলে যাও। বিদ্যাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রেখে এস। মেয়ে উগ্র স্বভাবের। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে সবই তো সহ্য করতে হবে।"

রুক্মিণী বললেন, "বাবা নবল, তুমি বিদ্যাকে নিয়ে চলে এস। বিদ্যার কোন দোষ নেই। ওরা চণ্ডাল। ওরা বিদ্যার প্রাণ নিয়ে তবে ছাড়বে! হায় ভগবান!" বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় জ্ঞানপ্রকাশ ঘরে ঢুকলেন। রুক্মিণী মুখে ঘোমটা টেনে এক দিকে সরে গেলেন। জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা, ব্যাপার কি, কান্নাকাটি কিসের?"

নবল জ্ঞানপ্রকাশকে 'তার'টা দিল। 'তার' পড়ে তিনি বললেন, "হুঁ, ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে। নবলকে পাঠান ঠিক হবে না দাদা, আপনারই যাওয়া উচিত।"

জ্বালাপ্রসাদ ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলেন, "জ্ঞানু, আমাকে পাঠিও না। নবলের যাওয়াই ঠিক হবে। কাল ভোরের গাড়িতে নবলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"কাল ভোরের গাড়িতে নয়, নবল এখুনি রাত্রের গাড়িতেই যাবে। এখন তো মাত্র ন'টা। রাত এগারোটার সময় কানপুর যাওয়ার একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি আছে। এই সব ব্যাপারে মোটে দেরি করা উচিত নয়। নবল, যাও, তৈরী হয়ে নাও।" বলে জ্ঞানপ্রকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নবল তৈরী হয়ে বেরিয়ে দেখল জ্ঞানপ্রকাশও বিছানা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে আছেন। "নবল, তুমি একা গিয়ে ব্যাপারটা সামলাতে পারবে না, তাই আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। তুমি ছেলেমানুষ, ওদের সঙ্গে পারবে কেন?"

জ্ঞানপ্রকাশ আর নবল যখন উন্নাও স্টেশনে নামলেন, তখন রোদ উঠেছে। মালপত্র ওয়েটিং রুমে রেখে দু'জনে এক্কা চড়ে রওনা হলেন। সিদ্ধেশ্বরীপ্রসাদের বাংলোতে পৌঁছে জ্ঞানপ্রকাশ চৌকিদারকে বললেন, "সিদ্ধেশ্বরীবাবুকে বল যে এলাহাবাদ থেকে লোক এসেছে।"

"ছোট সরকার তো ঘুমোচ্ছেন, বড় সরকারকে খবর দিচ্ছি," বলে চৌকিদার ভেতরে চলে গেল।

দু'জনে বারান্দায় গিয়ে বসলেন। দু' মিনিটের মধ্যেই বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন, "যাক্, আপনারা এসে গেছেন। খুব তাড়াতাড়ি এলেন, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।"

চৌকিদারকে বললেন "ড্রইংরুমটা খোল।" তারপরে উভয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের মালপত্র কোথায়?"

"স্টেশনে রেখে এসেছি," নবল বললে।

"ভালোই করেছ। অনর্থক মালপত্তর বওয়াই সার হত। এখন তোমার এই ডাইনী বোনটিকে নিয়ে গিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচাও।"

"হ'ল কি?" জ্ঞানপ্রকাশ প্রশ্ন করলেন।

"ওর মুখেই সব শুনবেন। কাল থেকে ঘর বন্ধ ক'রে পড়ে আছে। মরতে আর মারতে উদ্যত।" এই বলে তিনি ডাক দিলেন, "সিদ্ধেশ্বরী, এঁরা এলাহাবাদ থেকে এসে পড়েছেন।"

এমন সময় বিদ্যা ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল, "দাদা, এই পিশাচদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। দাদু, আপনি এসেছেন, আমার প্রাণ বাঁচল!"

জ্ঞানপ্রকাশ দেখলেন, বিদ্যার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত। বিন্দেশ্বরী-প্রসাদ গর্জে উঠলেন, "নবল, এই হারামজাদীকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ওর জিনিষ-পত্র বেঁধেছেঁদে নাও। ততক্ষণ আমি জ্ঞান-প্রকাশের সঙ্গে কথা বলি।"

নবল বিদ্যার হাত ধরে তাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। সিদ্ধেশ্বরী এসে ঘরে ঢুকল। জ্ঞানপ্রকাশ সিদ্ধেশ্বরীকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন, ব্যাপারটা কি সিদ্ধেশ্বরীবাবু?"

সিদ্ধেশ্বরী খুব উত্তেজিত ছিল, "আমার মা ও বোনকে যখন ও গালমন্দ করছিল, তখনও আমি চুপ করেই ছিলাম। কিন্তু যখন বাবা একে বকলেন আর ওঁকেও গালাগালি শুরু করলে—তখন রাগে আমার হাত উঠে গেল।"

"আরে, এ শুধু একটা চড় বসিয়েছিল," বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুধু একটা চড়েই তার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল! তারপর কি হ'ল, বলুন।" জ্ঞানপ্রকাশ বললেন।

"তারপর সে নিজেই হাত-পা আছড়াতে লাগল আর বাড়ি মাথায় তুলল। তাই সিদ্ধেশ্বরী আর একটা চড় কষালে। তারপর তো যেন প্রলয়কাণ্ড বেধে গেল। সে গর্জে উঠে সিদ্ধেশ্বরীকে একটা

চড় বসালে। মেয়েমানুষ হয়ে পুরুষের গায়ে হাত তোলে আমি তো জীবনে এই প্রথম দেখলাম। এ রকম মেয়েমানুষকে তো গুলি ক'রে মারা উচিত।"

"কি আর বলি, ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল, তা, না হলে তো হারামজাদীকে শেষ করে ছাড়তাম। আপনারা একে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান, নইলে অনর্থ ঘটে যাবে।"

জ্ঞানপ্রকাশ খুব শান্তভাবে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো আমরা এসেছি। একা এরই প্রাণ যেত না, আপনাদেরও ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হত। এ হ'ল গঙ্গাপ্রসাদের মেয়ে!"

"গঙ্গাপ্রসাদ তো জাহান্নমে গেছে আর এই হারামজাদীকেও আমরা জাহান্নমে পাঠিয়ে দিতাম," বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ বললেন।

জ্ঞানপ্রকাশ একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন, "বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ, মুখ সামলে কথা বল। গঙ্গাপ্রসাদ নেই বলে যেন মনে কর না এই মেয়েটা অনাথ হয়ে গেছে।"

সিদ্ধেশ্বরী বাবাকে থামালে, "বাবা, এদের সঙ্গে কথা বলাই বৃথা।"

নবল বিদ্যার দুটো বাক্স ড্রইংরুমে নিয়ে এল। নবল বললে, "বিদ্যা এই জিনিষগুলোই নিয়ে যেতে চাইছে। আমাদের এবার রওনা হওয়া উচিত।"

জ্ঞানপ্রকাশ সিদ্ধেশ্বরীর দিকে তাকালেন, "তোমার কোনো যানবাহন আছে বা আনিয়ে দিতে পারবে কি?"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ এতক্ষণে শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চাকরকে হাঁক দিলেন, "ভবানী, ড্রাইভারকে বল মোটর আনতে।" তার-পরে বিদ্যার দিকে তাকালেন, "আর এ বাড়িতে পা রাখতে পাবে না, মনে রেখো। আর গয়নাগুলো বের করে এখানে রেখে যাও।"

বিদ্যা গর্জে উঠল, "তোমাদের বাড়ি নরক কুণ্ড। আর যদি কোনো দিন এ বাড়িতে পা দিই তাহলে আমি বাপের বেটী নই। নিয়ে নাও তোমার গয়না।" এই বলে বিদ্যা বাক্সের চাবিকাঠি

সিদ্ধেশ্বরীর সামনে ছুঁড়ে দিলে। সিদ্ধেশ্বরী চাবি তুলে নেবার আগেই জ্ঞানপ্রকাশ চাবি তুলে নিলেন, "গয়না মেয়ের, তার ওপর আপনাদের কোনো অধিকার নেই।"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ গর্জে উঠলেন, "আমাদের মধ্যে কথা বলতে এসেছ যে ভারি, কে তুমি? চাবি আমাকে দাও।"

জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, "আমি মেয়ের পিতা, গার্জেন!" এই বলে তিনি চাবিকাঠি নিজের পকেটে রাখলেন।

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ সিদ্ধেশ্বরীকে বললেন, "দেখছ কি, গয়নার বাক্সটা তুলে নিয়ে যাও।"

জ্ঞানপ্রকাশ গর্জে উঠলেন, "খবরদার যদি বাক্সে হাত দাও। বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ, তুমি পনের হাজার টাকা পণ নিয়েছ আর এখন মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ। যদি কেউ বাক্স স্পর্শ কর তো ভালো হবে না।" জ্ঞানপ্রকাশ পকেট থেকে পিস্তল বের করে বাগিয়ে ধরলেন, "তুমি পুলিশ ডাকতে পার বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ। তুমি ডিষ্ট্রিক্ট জজ, তুমি আইন কানুন সবই জান। বাক্সটা তুলে মোটরে নিয়ে চল। কি বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ, পুলিশ ডাকতে চাও তো বল, আমি দাঁড়াই। এখানকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঠাকুর কুশল সিংহ, গঙ্গাপ্রসাদের বিশেষ বন্ধু, মনে রেখ।"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন "আমি তোমাকে দেখে নেব, আমি তোমাকে সর্বস্বান্ত ক'রে ছাড়ব।"

"আমি তোমাকে বোঝবার অবসর দিচ্ছি, বুঝে নাও। আবার আবার বলছি, যদি সাহস থাকে তো পুলিশ ডাকো আর ডাকাতির অভিযোগে আমাকে গ্রেফ্‌তার করাও। পাপী কোথাকার!"

সিদ্ধেশ্বরী বললে, "বাবা, ভেতরে চলুন। কেন ছোটলোকদের সঙ্গে লাগছেন।" এই বলে সিদ্ধেশ্বরী বিন্দেশ্বরীপ্রসাদের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল।

জ্ঞানপ্রকাশ আর নবল বিদ্যাকে নিয়ে পরের ট্রেনে উন্নাও থেকে এলাহাবাদ রওনা হলেন।

ছয়

"মোট কজন হ'ল ?" জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাকে নিয়ে সাত জন" বললে নবল। "জ্ঞানদাদু, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, যা ভেবেছিলাম কাজটা তত সোজা নয়। আমাদের কবে যেতে হবে ? ২৫শে ডিসেম্বর কংগ্রেস শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে তিন জনকে আরো রাজী করাতে পারব।"

জ্ঞানপ্রকাশ মৃদু হেসে বললেন, "না, যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে তো দু'দিন আগে পৌঁছতে হবে, সেজন্যে আমি ২২শে ডিসেম্বর এখান থেকে রওনা হবো। তোমরা ২৪শে রওনা হয়ো। তোমাদের থাকার ব্যবস্থা আমি ক'রে রাখব।"

বিদ্যা কাছে বসে সেদিনকার খবরের কাগজ পড়ছিল। খবরের কাগজ বন্ধ করে রাখতে রাখতে বললে, "দাদা, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। তাহলে জ্ঞানদাদু, সাত থেকে আটজন হ'ল।"

বিদ্যা উন্নাও থেকে ফেরবার পর থেকে বড়ো চুপচাপ থাকত। খুব কম কথা বলত, ঘর থেকে বাইরে খুবই কম বেরোত। ঘরেতে চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে ভাবত। বিদ্যার কথা শুনে নবল আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বিদ্যার দিকে ফিরে তাকাল, "তুমি যাবে কংগ্রেসে ! বলছ কি ?"

"হ্যাঁ দাদা, আমিও যাব। এই নিষ্ক্রিয় আর বদ্ধ জীবনে হাঁপিয়ে উঠছি। জ্ঞানদাদু, লাহোর কংগ্রেসে আমার যাওয়াতে কোনও বাধা আছে কি ? বলুন না, চুপ ক'রে আছেন কেন ?"

জ্ঞানপ্রকাশ বিদ্যার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তার মুখে ছিল দৃঢ়তা আর কঠোরতার ছাপ, দৃষ্টিতে সংকল্পের সীমাহীন গাম্ভীর্য। কত শান্ত, আর কতই না সুন্দর ! জ্ঞানপ্রকাশের মনে সহসা ম্যাডোনার ছবির রূপ ভেসে উঠল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, "না মা, তুমি গেলে কোনো ক্ষতি নেই। তবে

তোমার লাহোর যাওয়া এখন বোধ হয় উচিত হবেনা। লোকে বলবে কি?"

বিদ্যা চুপ ক'রে রইল। তারপর করুণ সুরে বললে, "দাদু, লোকের কথায় কি এসে যায়? কিন্তু আমি আপনাকে জোর করব না। আপনি যদি চান আমি তিলে তিলে যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহলে তাই হোক। মেয়েদের জীবনটাই তো গোলামির, কি দাদা, ঠিক কি না?"

বিদ্যার স্বরে অসহায়তার যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ছিল সেটা এসে জ্ঞানপ্রকাশের বুকে বিঁধল। তিনি আপন ভীরুতায় হতাশ হলেন, তাঁর দৃষ্টি নত হ'ল। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন, "না মা, তোমাকে, গোলামিও করতে হবে না, আর চাপা বেদনাও সহ্য করতে হবে না। তুমি যাবে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। আমার সঙ্গেই যাবে। এরা যাবে থার্ড ক্লাসে, এদের সঙ্গে গেলে তোমার কষ্ট হবে।"

বিদ্যা মৃদু হাসল, "জ্ঞানদাদু, তুমি কতো ভালো! তুমি আর নবল দাদা.........আমার কতো বড়ো অবলম্বন! কিন্তু দাদু, আমি নবল দাদার সঙ্গে থার্ড ক্লাসেই যাব। যখন জীবনে সংঘর্ষকেই বেছে নিয়েছি তখন আর এই ছোটখাটো সুবিধের জন্যে মোহ রাখি কেন? নবলদাদা, তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাবে তো? আমি তোমাদের খাওয়াদাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে পারব।"

বিদ্যা লাহোর যাবে খবর শুনে বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গেল। যমুনা রুক্মিণীকে বললেন, "বৌমা, বিদ্যাকে লাহোর যেতে নিষেধ কর। উন্নাওয়ের লোকেরা বলবে কি? তাদের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের যে ক্ষীণ আশাটুকু রয়েছে, সেটাও তাহলে শেষ হয়ে যাবে। ভদ্রঘরের মেয়ে বেপরদা হয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াবে, পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, কথাবার্তা বলবে—এটা তো ভালো নয়। লোকে যে গায়ে থু থু দেবে।"

"হ্যাঁ মা, বিদ্যার লাহোর যাওয়া আমারও ভালো ঠেকছে না।

কিন্তু বিদ্যা যদি আরও কিছুদিন এই রকম অবস্থায় থাকে তবে সে আর বেশী দিন বাঁচবেও না। দেখছই তো তার শরীর শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে," চোখ ছলছলিয়ে রুক্মিণী বললেন।

"তা তো জানি, তবে কুলের মর্যাদাটাও তো দেখতে হবে। অভাগী জন্মেই কেন মরে গেল না, তা হলে ভালো হত। এখন তো বংশে সে কলঙ্ক ঘটাবে," যমুনা কড়া স্বরে বললেন।

"মা, আপনার পায়ে পড়ছি, এ সব কথা বলবেন না! যদি বিদ্যা এ সব শুনতে পায় তাহলে আবার কিছু না করে বসে! আমি জানি বিদ্যা কোনো দিন কোনো অনুচিত কাজ করবে না!"

"অনুচিত কাজ করবে না! নিজের স্বামীর গায়ে হাত তোলা—এটা কি উচিত কাজ হয়েছে?"

রুক্মিণী উত্তর দিলেন, "তবে কি ওখানেই প্রাণ দেওয়া ভালো ছিল। দেখলেন তো, তার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। গোটা পরিবার মিলে তাকে মেরেছিল। কসাইদের বাড়ি মেয়ে দেওয়া হয়েছে। বেঁচে এসেছে—এই কি কম ভাগ্যের কথা!"

যমুনা রাগ ক'রে বললেন, "তাকে এবার মাথায় তুলে বসে থাক। তার সারা জীবনটা তুমিই কি পার করাবে? আমি এসব দেখতে পারব না। ওঁকে গিয়ে বলছি, উনিই ওকে আটকাতে পারবেন।" যমুনা জ্বালাপ্রসাদের কাছে গেলেন।

পূজা সেরে জ্বালাপ্রসাদ ড্রইংরুমে এসে বসেছিলেন। বিদ্যার লাহোর যাবার খবর তাঁরও ভালো লাগেনি। তিনি জ্ঞানপ্রকাশকে বলছিলেন, "বিদ্যার লাহোর যাওয়া কোনো মতেই উচিত হবে না। ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের জিজ্ঞেস করা উচিত।"

জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, "কিন্তু দাদা, ওর শ্বশুরবাড়ির লোক বলতে আপনি কাদের বলছেন? যারা ওকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়েছে—তারাই কি ওর বাড়ির লোক?"

জ্বালাপ্রসাদ সমস্যায় পড়লেন, "তারা নয় তো কি আমরা?"

"আজ্ঞে, কোনোদিন আপনি ছিলেন, কিন্তু আজ নয়। কারণ

ওকে আপনারা পিশাচের হাতে সোঁপে দিয়েছেন। দাদা, এ সংসারে ওর আপনজন বলতে আর কেউ নেই, কারো ওপর ওর অধিকার নেই, কোনো অবলম্বন নেই। এখন তো ওকে ভিখারিণীর মতোই লোকের দয়ার ওপর বেঁচে থাকতে হবে। তার সামনে আছে দুটো পথ—হয় গোলামি, না হয় মৃত্যু !"

এমন সময় যমুনা এসে ঘরে ঢুকলেন, "জ্ঞান ঠাকুরপো, বিদ্যাকে লাহোর যাবার পরামর্শ কি তুমি দিয়েছ ?"

"না বৌদি, আমার মনে হয়, এ পরামর্শ তাকে দিয়েছে তার জীবন। সে আজ দশ-বারো দিন ক্রমাগত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। তুমি দেখনি কি, উন্নাও থেকে আসার পর থেকেই মৃত্যুর ঔদাসীন্য নিয়ে সে মুখ ঢেকে চুপচাপ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে। তার মুখে কোনো দিন কেউ হাসির রেখা পর্যন্ত দেখেনি, তার চোখের জল এক মুহূর্তের জন্যেও শুকোয়নি। আজ যখন জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে সে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত, তখন তার জীবনে এই প্রথম চাঞ্চল্য দেখা দিল। তার জীবন অবলম্বনের জন্যে নবলের কাছে আর আমার কাছে হাত বাড়াল। তুমিই বল বৌদি, আমরা কি করতে পারি ? সে লাহোর যেতে চাওয়াতে আমরা রাজী হলাম। আজ এতদিন বাদে তার মুখে হাসি আর চোখে জলুস ফিরে এল। বৌদি, তুমি কি চাও যে মেয়েটা মরে যাক্ ?"

যমুনা কেঁদে উঠলেন, "বাছা আমার, কত সাধ করেই না মানুষ করেছিলাম, আর শেষে কিনা গিয়ে পড়ল এক চণ্ডালের হাতে ! জ্ঞান ঠাকুরপো, আমি ওকে বাধা দেব না, তার যা প্রাণ চায় করুক।" বলতে বলতে যমুনা সেখান থেকে চলে গেলেন।

এর পরে জ্বালাপ্রসাদ আর কথা বাড়ালেন না।

তেইশে ডিসেম্বর সন্ধ্যেবেলা এলাহাবাদ শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। 'লীডার' আর 'পায়োনিয়ার' দু'টো খবরের কাগজই বিশেষ সংখ্যায় খবর ছাপিয়েছে যে সকালবেলা ভাইসরয় যখন দিল্লী ফিরছিলেন, পুরান কেল্লার কাছে তাঁর স্পেশাল ট্রেনের নীচে

একটি বোমা ফেটেছে। তিনি খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন, তবে ট্রেনের ডাইনিং কারটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; একটি চাকর আহত হয়েছে।

এই খবরে জ্বালাপ্রসাদ বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। রাত্রে তিনি নবল ও বিদ্যাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজকের খবর পড়েছ তো ? এই বিষয়ে তোমাদের অভিমত কি ?"

নবল উত্তর দিলে, "দাদু, খবর খুবই খারাপ। বোধ হয় এর পরিণামও ভালো হবে না। আমার মনে হয় লর্ড আরউইন আর মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে আলোচনায় একটা বোঝাপড়ার সম্ভাবনা ছিল, সেটাও আর সফল হবে না।"

"আমি একথা জিজ্ঞেস করছি না," জ্বালাপ্রসাদ বললেন। "আমি জানতে চাই এই পরিস্থিতিতে তোমার আর বিদ্যার লাহোর যাওয়া উচিত কি না ?"

"আজ্ঞে, সরকার কংগ্রেসের ওপর তো এখন পর্যন্ত কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেন নি, তাহলে সে খবরটাও এসে যেত। আর যতদূর মনে হয়, সরকার কংগ্রেসের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করবে না। এটা নিশ্চয় হিংসায় বিশ্বাসী আইন অমান্যকারীদের কাজ। মহাত্মা গান্ধী আর কংগ্রেসের পথ অহিংসার পথ।"

"তাহলে মনে হচ্ছে তোমাদের লাহোর যাওয়া সুনিশ্চিত," জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"এই ঘটনার পরে তো লাহোর কংগ্রেস দেখবার মতোই হবে দাদু। খুব মজা হবে।"

"মজা যা হবে সে তো আমি বুঝতেই পারছি, কিন্তু তোমাদের বলছে কে ! যাক্, নিজেদের সঙ্গে যথেষ্ট জামা কাপড় নিয়ে যেও, এ বছর ভয়ঙ্কর শীত। আর লাহোর তো ঠাণ্ডার জন্যই প্রসিদ্ধ। তুমি গঙ্গার ওভারকোটটা সঙ্গে নিয়ে যেও। বিদ্যা, আসল ভাবনা তোমার জন্যেই।"

বিদ্যা মৃদু হেসে বলল, "বাবা আমার জন্যে একটা ফারের কোট

তৈরি করিয়েছিলেন, আপনি আমার জন্যে মোটেই চিন্তা করবেন না।"

চব্বিশে ডিসেম্বর ভোরে বিদ্যা আর নবল যখন স্টেশনে পৌছল, তখন ভয়ানক শীত। রাতভোর বৃষ্টি পড়েছে। এখন বৃষ্টি থেমেছে তবে উত্তুরে বাতাস প্রচণ্ড বেগে বইছে। নবল স্টেশনে গিয়ে দেখল তার দলের আট জনের বদলে রয়েছে মাত্র পাঁচ জন।

গাড়ি বেশ ফাঁকা। অত শীতে কম লোকেরই বের হবার সাহস আছে। থার্ড ক্লাসে মাত্র পাঁচজনে বেশ আরামেই বসল।

জ্ঞানপ্রকাশ আগের কথা মতো লাহোর স্টেশনে এসেছিলেন। তিনি নবলকে বললেন, "এখানে প্রচণ্ড শীত। আগে জানলে তোমাদের আসতে বলতাম না।"

নবল মৃদু হাসল, "দাদু, এখন তো আমরা এসেই পড়েছি। শীতটা একটু উপভোগ করাই যাক্ না।"

একটা তাঁবুতে নবল আর তার সঙ্গীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল আর অপরটিতে বিদ্যা রইল জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে।

সন্ধ্যেবেলা অধিবেশন যখন শেষ হ'ল, তখন হাড় কাঁপানো শীত। কিন্তু বিদ্যার এসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে প্রত্যক্ষ করলো একটি নতুন জগৎ—সে জগৎ কর্ম ও সংঘাতময়। এই কর্ম আর সংঘাতই হ'ল তার জীবনের অঙ্গ। সে দেখলে হাজার হাজার নর-নারী সব কিছু ছেড়ে আত্মবলি দেবার জন্যে সমবেত হয়েছে। তার নিজের জীবনের দুঃখটা যেন অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হ'ল। কংগ্রেস অধিবেশন থেকে ফিরে বিদ্যা নবলকে বললে, "দাদা, এখনও রাত বেশী হয়নি। আমাকে লাহোর শহরটা ঘুরিয়ে আনবে চল। এ শহরের খুব নাম ডাক শুনেছি।"

প্রচণ্ড শীতের রাতে নবলের বের হতে সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু বিদ্যার মুখের প্রফুল্লতা দেখে আর 'না' বলতে পারল না। তবুও বললো, "দেখছ না বিদ্যা, কী প্রচণ্ড শীত!"

"হ্যাঁ দাদা, তবে এই ঠাণ্ডায় দম বন্ধ হয়ে আসছে না তো।

ওভারকোটটা পরে নাও। কী মধুর রাত! জীবনের প্রতি আমার কেমন যেন একটি মোহ জাগছে! চল না দাদা, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।"

নবল বিদ্যার আগ্রহের কাছে হার মানল। এটা ঠিক, সময়টা বেড়াবার উপযোগী ছিল না। নির্জন রাস্তাঘাট—রাস্তায় লোকজন কচিৎ কখনও নজরে পড়ে। অবশ্য সিনেমা হলের সামনে একটু হৈ চৈ ছিল। কিছু লোক হোটেলে বসে খাওয়াদাওয়া করছে। নবল আর বিদ্যা মালরোডের কাছে টাঙ্গা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলে।

নবলের কাছে বিদ্যার অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, অনেক কথা জানবার ছিল। এখন মনে হ'ল, তার আর কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার বা জানার নেই। জীবনের রূপ তো সে দেখতেই পাচ্ছে। জীবনের এ রূপ এই ভীষণ ঠাণ্ডা রাতের মতোই তাকে বিদ্ধ করছে, দংশন করছে। বিদ্যার শীত করছে না। তার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ রক্তধারা। হিমেল হাওয়ার স্পর্শে মনটা পুলকিত হয়ে উঠছে। হৃদয়ের উত্তাপ ধমনীতে প্রবাহিত। এই ক্ষতবিক্ষত হিমশীতল জীবনের সঙ্গে বিদ্যা এখন মোকাবিলা করতে সক্ষম।

সেদিন কংগ্রেসে যুবনেতা জহরলালের দেওয়া সভাপতির ভাষণ সে মন দিয়ে শুনেছিল। রাজনৈতিক জটিলতার জন্যে সে বক্তৃতার অনেক কিছুই বুঝতে পারেনি, আবার অনেক কিছু বুঝতেও পেরেছিল। মানুষ স্বাধীন, অন্যায়ের সক্রিয় বিরোধ তার পবিত্র কর্ত্তব্য। জীবনটা সংগ্রাম ও কর্মের জন্যেই নিবেদিত। বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হলো বিদ্যা।

পাশাপাশি চলতে চলতে বিদ্যা দাদার দিকে তাকাল। দাদার মুখে দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ। সেও কি জহরলালের মতো হতে পারবে?

বিদ্যার মুখ ম্লান হয়ে গেল। জহরলাল পিতার কাছ থেকে মনবল পেয়েছেন। কিন্তু নবল পিতৃহীন! এত অল্প বয়সে এত বড়ো

পরিবারের বোঝা তার ঘাড়ে এসে পড়েছে। হঠাৎ সে নবলের হাত জড়িয়ে ধরলে, "দাদা, তুমি কি কখনো ভেবে দেখছ, সারা জীবনের মতো আমি শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ ক'রে এসেছি। তোমার ঘাড়ে কত বড়ো বোঝা হয়ে আছি?"

নবল মৃদু হাসল, "বিদ্যা, কি পাগলের মতো বকছ! তুমি আবার বোঝা হতে যাবে কেন! তোমার মধ্যে সাহস আছে, শক্তি আছে। তুমিই তো অন্যের অবলম্বন হবে। নিজের বিষাদের ছায়ায় তুমি তোমার স্বরূপ দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি তো বুঝি।"

বিদ্যার সমস্ত ক্ষোভ আর বিষাদ যেন উবে গেল। সে মুহূর্তের জন্য হিম-শীতল জীবনের যন্ত্রণা অনুভব করছিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনটা তার আনন্দে ভরে উঠলো, "দাদা, তুমি কি সত্যিই মনে কর যে আমি নিজের বোঝা নিজেই বইতে পারব? এই ঘৃণ্য আর দাসত্বের শিকল ছিঁড়ে আমি নিজের পথ কি নিজেই খুঁজে বের করতে পারব? তুমি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে তো, বল না দাদা! তোমাকে সহায় হতেই হবে।"

"বিদ্যা, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। এবার ফেরা যাক্, দারুণ শীত!"

"চল দাদা, সত্যিই প্রচণ্ড শীত। আমি এক্ষুনি ফিরে গিয়ে চা তৈরী করব। জ্ঞানদাদুও ফিরে এসেছেন নিশ্চয়ই।"

লাহোর কংগ্রেসের সারা পরিবেশ উদ্বেগজনক ছিল। মহাত্মা গান্ধী আর লর্ড আরউইনের মধ্যে বোঝাপড়া আর হল না। নিরাশা আর ক্রোধের ঝড় দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। লড়াই চালাতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। ভিক্ষা চাইলে কিছুই পাবে না—যা পেতে চাও জোরজবরদস্তি ক'রে কেড়ে নাও। কিন্তু নেতা কই!

গান্ধী চুপ ক'রে আছেন—শান্ত, দৃঢ় আর অটল। গান্ধীই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। তাঁর কিন্তু শর্ত আছে কতকগুলো। বড়ো কঠিন সেই শর্ত। সেই শর্ত পালন করা কি সম্ভবপর? প্রেম,

অহিংসা আর ত্যাগ। ঘৃণা করবে না, অথচ প্রচণ্ড লড়াই করবে; হিংসা করবে না, অথচ জীবন পণ ক'রে যুদ্ধ করবে; সব কিছু ত্যাগ করবে—এই ভাবে নিজের অধিকার জোর করে ছিনিয়ে নাও। এই শর্তগুলো কি পালন করা সম্ভবপর? প্রশ্ন এই, এসব পালন করবে কে? জেলে যাও, লাঠি খাও, গুলি খাও, কিন্তু 'টু' শব্দটি করো না। এ কী সম্ভবপর? এ কী হতে পারে?

হাজার হাজার মানুষ—স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক। প্রত্যেকের মুখে দৃঢ়তা, বিশ্বাস আর সংকল্প প্রতিফলিত। তারা কি গান্ধী নির্দেশিত পথে চলতে পারবে? গান্ধীর প্রশ্ন—"এ কি হতে পারে?"

গান্ধীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল। তিনি বলেন এসব সম্ভব হবে, সম্ভব হতেই হবে। হিংসার দ্বারা কাজ চলবে না। যেখানে হিংসাত্মক সংঘর্ষ সেখানে সবলতর শক্তির জয়। গান্ধীর একথা নীতি আর নৈতিকতার। বিশৃঙ্খল চরিত্রহীন দেশে হিংসার দ্বারা সংগঠন অসম্ভব। কংগ্রেসের এই প্যাণ্ডেলে, আমাদের মধ্যে না জানি কত সি.আই.ডি., গোয়েন্দা উপস্থিত। আমরা তাঁদের চিনতে পারছি না, তাঁরা আমাদেরই আপনজন, ভাই-বন্ধু।

জহরলাল বলেন, আমাদের অহিংসাকে বিশ্বাস রূপে নয়, নীতি রূপে গ্রহণ করতে হবে। জহরলাল বাস্তবকে চেনেন। তিনি দেশের অন্তরাত্মা আর চেতনার প্রতিনিধিস্বরূপ। তিনি গান্ধীর মতো দেবতা নন। অতীতের পুনরাবৃত্তিতে তাঁর আস্থা নেই। তিনি মুনি ঋষিদের আপ্তবচন স্বীকার করেন না। যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেটা নিশ্চয় ত্রুটিপূর্ণ, তা না হলে নষ্ট হত না। জহরলাল বর্তমান জগতের মানুষ। তিনি সমাজতন্ত্রবাদ ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছেন। এই সাম্যবাদের ওপরই গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের প্রাসাদ। জহরলালের মন ভারতীয় সংস্কৃতি আর পরম্পরায় পরিপুষ্ট। হিংসার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা। অহিংসপথে তাঁর বিশ্বাস এবং তাঁর কাছে অহিংসা একটা নীতিও বটে। জহরলাল হলেন গান্ধীজীর পরিপূরক। উদ্দীপ্ত, কর্মরত, উষ্ণ রুধীর যুব সমাজের প্রতিনিধি জহরলাল। দেশের

মুক্তি আন্দোলনে এই যুব সমাজই অহিংসা যুদ্ধের হোতা। তারাই দেখছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর সেই স্বপ্নকে সার্থক ক'রে তোলবার কামনা ও ক্ষমতা রয়েছে তাদেরই।

আশাভঙ্গ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ক্ষোভ ফেটে পড়েছে। কি হবে, কেউ জানে না। কিছু তো অবশ্যই ঘটবে, ঘটতেই হবে। লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনটা পরিকল্পনামূলক। নেতাদের সামনে কোনো সুচিন্তিত আদর্শ নেই, সংঘাত অনিবার্য। কিন্তু এই সংঘর্ষের রূপটা কি রকম হবে, কেউ জানে না।

লাহোর কংগ্রেস থেকে প্রস্তাব আসে, আলোচনা চলে, বক্তৃতা হয়, আর দেশের খবরের কাগজগুলোতে এ সব ফলাও ক'রে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু প্রস্তাব পেশ, বক্তৃতাবাজি আর প্রচার, এ সমস্ত কংগ্রেসের চিন্তাধারার পরিপন্থী। লাহোর কংগ্রেসে কোনো স্পষ্ট কর্মসূচী নেই। দেশ অনেক আশা নিয়ে চেয়ে আছে লাহোরের দিকে। কিন্তু লাহোরে যা কিছু হচ্ছে তাতে দেশের মানুষের হতাশাই বাড়ছে।

কিন্তু লাহোরের পরিবেশে নিরাশার কোনো স্থান নেই কারণ সেখানে আছে যেমন আবেগের দৃঢ়তা তেমনি ভাঙ্গা-গড়ার সংকল্প। হাড় কাঁপুনি শীতে যেন সবাই জমে যাচ্ছে। কিন্তু সবার প্রাণেই উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত, প্রত্যেকের নিঃশ্বাসে গতির বেগ।

নবল সব কিছুই দেখলে, বিদ্যাও দেখলে—নতুন জগৎ, নতুন পরিবেশ আর নতুন দৃষ্টীভঙ্গী।

নবল আর বিদ্যা দিল্লী হয়ে এলাহাবাদে ফিরল। জ্ঞানপ্রকাশকে কিছুদিনের জন্যে দিল্লীতে থেকে যেতে হ'ল। তারা বাড়ি ফিরে দেখল যমুনা অসুস্থ। প্রথমে সর্দি-কাশি তারপর নিউমোনিয়া। যমুনার অসুখের খবর শুনেই নবল আর বিদ্যা যমুনার ঘরে ঢুকল। খুব জ্বর, যমুনা চোখ বুজে কাতরাচ্ছেন। রুক্মিণী যমুনার কাছে বসে আছে আর জ্বালাপ্রসাদ ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। রুক্মিণী

যমুনাকে বললেন, "মা, নবল আর বিদ্যা লাহোর থেকে ফিরে এসেছে। দেখ, তারা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।"

রুক্মিণীর গলা শুনে যমুনা চোখ মেললেন। মনে হচ্ছিল যেন একটা গভীর শান্তি পেলেন। ওদের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "তোমরা ফিরেছ? কবে থেকে তোমাদের পথ চেয়ে আছি। ভাবছিলাম তোমাদের না দেখেই আমাকে চলে যেতে হবে।"

বিদ্যা বলে উঠল, "না ঠাকুমা, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না, তুমি ভালো হয়ে উঠবে!"

যমুনা ম্লান হেসে বললেন, "কে জানে মা! এখানে আমার মাথার কাছে এসে বস, আমার মাথায় হাত রাখ। আঃ, বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে।" যমুনা চোখ বুজলেন।

রুক্মিণী নবলের হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন, "নবল শুনেছ, বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ সিদ্ধেশ্বরীর আবার বিয়ে দিচ্ছেন। ২৮শে জানুয়ারি বিয়ে। মা যে দিন এই খবর শুনলেন সেদিন থেকেই অসুস্থ।" একটু থেমে বললেন, "বাবা নবল, এ সব কি হচ্ছে? কোনো রকমে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া হতে পারে না কি?"

এই খবর শুনে নবলও উদাস হ'ল। ভেবে বললে, "মা, কি রকম বোঝাপড়া! এ সব তো হতোই। আর যা হচ্ছে তা তো ভালোই হচ্ছে।"

"হায় ভগবান! তুমি কি বলছ? এই মেয়েটার যে সারা জীবনটা পড়ে রয়েছে। কে দেখবে একে?"

"কেউ নয় মা, ভগবান দেখবেন! ঈশ্বরই একে শক্তি দেবেন। ও নিজেকে নিজেই সামলে নেবে! দাদু কোথায়?"

"ডাক্তার আনতে গেছেন। ওঁর হৃদয় বড়ো শক্ত। বাধার পাহাড় তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে। নিঃশব্দে চুপচাপ আপন কর্তব্য ক'রে চলেছেন। মায়ের শরীরের এক বিন্দুও উপকার হয়নি।

চার-পাঁচ দিন ধরে ঘুমোন নি। আচ্ছা এখন যাও, ভিখুর কাছে গরম জল নিয়ে চানটান সেরে নাও, ক্লান্ত হয়ে এসেছ।"

রুক্মিণী যমুনার ঘরে ফিরে গেলেন। বিদ্যা ঠাকুমার কপালে হাত রেখে চুপ ক'রে বসেছিল আর যমুনা চোখ বুজে ছিলেন, যেন ঘুমোচ্ছেন। রুক্মিণী বিদ্যাকে বললেন, "চানটান সেরে নাও, আমি বসে আছি।"

যমুনা চোখ মেললেন, "না বউমা, বাছা আমার! আমার কাছে একটু বসুক।" রুক্মিণী দেখলেন, যমুনার চোখ ছলছল করছে। "বাছা আমার, আমরা তোর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি। আমাদের ক্ষমা কর্ মা! তা না হলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না। আমার বড়োই অপরাধ হয়েছে। বল্, আমাকে ক্ষমা করেছিস্।"

বিদ্যা অবাক্ হয়ে মায়ের দিকে তাকাল, "মা, ব্যাপারটা কি! ঠাকুমা কি বলছেন এ সব?"

রুক্মিণী মাথা নীচু ক'রে বললেন, "সিদ্ধেশ্বরী আবার বিয়ে করছে! ২৮শে জানুয়ারি বিয়ে।"

বিদ্যার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল, "তুমি সত্যি বলছ, মা? তা হলে আমার বাঁধনটা সত্যিই কেটে গেল। আমি মুক্তি পেলাম।" এই বলে যমুনার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল, "ঠাকুমা, এটা তো অতি সুখবর। আমি মুক্তি পেলাম, আমার বাঁধন খুলে গেল। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ! এতে দুঃখ পাবার কি আছে, ঠাকুমা?"

যমুনা করুণ সুরে বললেন, "তুই বুঝবি না মা; অন্ততঃ এখন বুঝবি না। হায়, এ সব কি হল!"

"ঠাকুমা, নতুন কিছুই হয়নি। এসব তো রোজই হচ্ছে। এতে কারো কোনো দোষ নেই। ভগবানের লীলা! এ খবরে আমি খুবই খুশী।"

যমুনা কাতরে উঠলেন, "মা, একবার নিজের মুখে বলে দে, তুই আমাকে ক্ষমা করলি।"

রুক্মিণী বিদ্যাকে বললেন, "বিদ্যা। বলে দে না, মা শান্তি পাবেন।"

বিদ্যা যমুনার হাত চেপে ধরলে, "ঠাকুমা, ঈশ্বর সাক্ষী! তোমরা যা কিছু করেছ আমার মঙ্গলের জন্যে। এমন কি আমার জন্যে তোমরা সর্বস্বান্ত হয়েছ। তোমাদের অজ্ঞান্তে যদি আমার কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, তুমি সেরে ওঠ।"

ভাবাবেশে হিক্কায় যমুনার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হ'ল, তিনি সংজ্ঞা হারালেন। তাঁর আর জ্ঞান ফিরে এল না।

জ্ঞানপ্রকাশ দিল্লী থেকে বোম্বাই চলে গিয়েছিলেন। বোম্বাই থেকে এলাহাবাদ যখন ফিরলেন, রাত তখন অনেক। নবল নিজের ঘরে বসে পড়ছিল। জ্ঞানপ্রকাশের টাঙ্গার শব্দ পেয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। টাঙ্গাওয়ালাকে দিয়ে মালপত্র বারান্দায় নামালেন। টাঙ্গাটা চলে গেলে নবলকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়ি নিঝুম কেন? তুমিই বা এত উদাস কেন?"

নবল বললে, "জ্ঞানদাদু, ঠাকুমা আজ আট দিন হ'ল মারা গেছেন।"

"কি বললে? বৌদি নেই? কি হয়েছিল তাঁর?"

"আমাদের যাবার পর তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছিল! তিনি যেন আমাদের পথ চেয়েই বসেছিলেন। যেদিন আমরা ফিরেছি, সেই রাত্রেই মারা গেছেন।"

জ্ঞানপ্রকাশ নিজের ঘরে মালপত্র তুললেন। তারপর নবলের সঙ্গে জ্বালাপ্রসাদের ঘরে গেলেন। জ্বালাপ্রসাদ কম্বল বিছিয়ে মেজের ওপর শুয়েছিলেন। এখনও দশ দিনেব 'ওষুধ' ফুরায়নি। জ্বালাপ্রসাদ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তবে ঘুম গাঢ় নয়। জ্ঞানপ্রকাশ আর নবলের পায়ের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল! জ্ঞানপ্রকাশকে দেখেই জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "জ্ঞানু, ফিরতে বড়ো দেরী করে ফেললে যে। তোমার বৌদি তো চলে গেলেন। এসব তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। আমি কত বোঝালাম, ধৈর্য ধরতে বললাম, কিন্তু তিনি সাহস হারিয়ে ফেললেন।"

জ্ঞানপ্রকাশ নিঃশব্দে একটু তফাতে মাটিতেই বসে পড়লেন। কোন কথাই যেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "সিদ্ধেশ্বরী আবার বিয়ে করছে খবর এসেছে। এই খবরটাই যেন তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিল। সেদিন থেকেই বিছানা নিলেন আর উঠলেন না।" জ্বালাপ্রসাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

একটু চুপ করে থেকে জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, "দাদা, ধৈর্য ধরুন। আপনি ধৈর্য হারালে কোনো কাজই হবে না।"

জ্বালাপ্রসাদ যেন জোর করে নিজের কান্নাকে চাপলেন, "জানি জ্ঞানু, সবই জানি। ধৈর্য তো ধরতেই হবে। কিন্তু সে যে সারা জীবনের মতো ছেড়ে চলে গেল। ঈশ্বর তাকে শান্তি দিন !"

নবল জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালে। কত গভীর বেদনা মেশানো ছিল তাঁর প্রত্যেকটি শব্দে। সাতষট্টি বৎসরের বৃদ্ধের মুখমণ্ডল বলিরেখায় পূর্ণ....না জানি জীবনে তিনি কতই না সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন দেখেছেন। জ্বালাপ্রসাদ বলে যাচ্ছিলেন, "জ্ঞানু, সে ভাঙ্গন দেখল আর নিজে ভেঙ্গে পড়ল। ভাঙ্গার পরে আবার তো গড়তে হবে, কিন্তু সে তা বুঝলে না।" আর সহসা যেন জ্বালাপ্রসাদের চেতনা ফিরে এল, "মনে হচ্ছে যেন তুমি ষ্টেশন থেকে সোজা চলে এসেছ। যাও মুখ-হাত ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নাও। নবল, জ্ঞানুর জন্যে খাবার আছে তো ? না থাকে তো তোমার মাকে জানাও।"

"দাদু, বিদ্যা লুচি ভাজছে, আপনি এখন ঘুমোন," উঠতে উঠতে সে বলল। "জ্ঞানদাদু চলুন, জল গরম হয়ে গেছে বোধ হয়, ইচ্ছে হলে স্নান ক'রে নিন। ততক্ষণে খাবার তৈরি হয়ে যাবে।"

সকালে যখন জ্ঞানপ্রকাশ ঘুম থেকে উঠলেন, সপরিবারে জ্বালা-প্রসাদ তখন গঙ্গাস্নানে বের হচ্ছেন। সেদিন ঘাটকামানের দিন। জ্ঞানপ্রকাশও ওঁদের সঙ্গেই গঙ্গাস্নানের জন্যে যাত্রা করলেন। দুপুরে

ত্রিবেণী থেকে সবাই ফিরল। জ্বালাপ্রসাদ বিকেলে বেড়াতে বের হলেন। নবল আর জ্ঞানপ্রকাশ বসলেন চা খেতে।

বিদ্যাও ছিল সেখানে। চা খেতে খেতে জ্ঞানপ্রকাশ বিদ্যার দিকে তাকালেন, সে চুপচাপ বসেছিল। জ্ঞানপ্রকাশ মৃদু হাসলেন, "বিদ্যা, এখন তুমি কি করবে? তুমি মুক্তি পেলে তো?"

বিদ্যার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে জ্ঞানপ্রকাশকে বললে, "সত্যি দাদু। আমি সত্যই যে মুক্তি পেয়েছি আপনি কি বিশ্বাস করেন না?"

"হ্যাঁ বিদ্যা, অন্ততঃ নরপিশাচদের হাত থেকে এই মুক্তিতে তোমার খুসী হওয়া উচিত। কিন্তু তুমি উদাস কেন? এটা তো ঠিক্ নয়।"

"কি করি দাদু, আমার জন্যেই ঠাকুমা চলে গেলেন," বিদ্যা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে।

জ্ঞানপ্রকাশ মুচ্‌কে হাসলেন, "কেউ কারো জন্যে যায় না বিদ্যা, যায় যেতে হবে বলেই। তোমার দাদুও যাবেন, আমিও যাবো। তারপর একদিন তুমিও যাবে। যা চলে আসছে তাকে উজানে ঠেলা যাবে না, আর যা ঘটতে যাচ্ছে তাকেও স্তব্ধ করা যাবে না। এখন আমাকে বল তুমি কি করতে চাও? কংগ্রেসের কাজ করবে? আমি বোম্বাই থেকে ফেরার পথে এই কথাটাই ভাবছিলাম। লাহোরে তুমি দেখলে তো কত মহিলা এই আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন।"

বিদ্যা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বললে, "না দাদু, এসব আমার দ্বারা হবে না।"

"এসব তোমার দ্বারা হবে না কেন? তোমার দ্বারা তাহলে হবেটা কি? এ ভয় তোমাকে ছাড়তেই হবে।"

বিদ্যা একটু সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিল, "দাদু, আসল কথাটা কি জানেন। আমি পুরুষদের সঙ্গে বসে কাজ করতে পারব না। আমি যে পুরুষদের দেখে লজ্জা বা ভয় পাই তা মোটেই নয়। আসলে আমার ভয় নিজেকে। আমি কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন বরণ করেছি যে।" বিদ্যার স্বরে ঝরে পড়লো অসীম করুণা।

জ্ঞানপ্রকাশের হৃদয় ব্যাথায় গুমরি উঠলো। তিনি আবার বিদ্যার দিকে তাকালেন। সৌম্য, শান্ত, সাত্ত্বিকতার সীমাহীন সৌন্দর্য! বিধির এ কি বিড়ম্বনা,—জবরদস্তি তাকে বৈধব্য বরণ করতে হচ্ছে। জ্ঞানপ্রকাশ বললেন, "মা, তুমি ঠিক্ই বলেছ। এখানে শহরে 'নারী শিক্ষা সদন' নামে একটি মেয়েদের স্কুল আছে। তার ম্যানেজিং কমিটির আমি সদস্য। একজন অধ্যাপিকা পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন। পয়লা মার্চ থেকে সে পদটা খালি হবে। একখানা আবেদনপত্র পেশ করে দিও। এ কাজটা তো করতে পারবে?"

"হ্যাঁ দাদু, এ কাজটা পারব। আপনি যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে ওখানে কাজে লাগিয়ে দিন। দাদু, এই প্রকাণ্ড অবকাশটা আমাকে যেন কখনও কখনও গিলতে আসে। অন্ততঃ কাজের মধ্যে তো নিজের মনটাকে ডুবিয়ে রাখতে পারব।"

ছাব্বিশে জানুয়ারি সারা দেশে 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের কথা। ক'দিন আগে পর্যন্ত কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বরাজ চাইছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। স্বরাজের জন্যে যদি লড়তেই হয়, তাহলে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যেই লড়া উচিত। কলকাতা কংগ্রেসে প্রথমবার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হল। লাহোর কংগ্রেস এই প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করবার দুর্জয় সংকল্প গ্রহণ করল। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরী করা হল। ২৬শে জানুযারি দেশের আনাচে কানাচে প্রত্যেকটি লোককে স্বাধীনতার ব্রত নিতে হবে। জ্ঞানপ্রকাশ স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তাবটা বিতরণ করতে এবং সারা দেশে এই দিবস পালন করবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই কাজে জ্ঞানপ্রকাশকে সাহায্য করতে নবলও উৎসাহ পাচ্ছিল।

যমুনার শ্রাদ্ধের পর জ্বালাপ্রসাদ গীতা পাঠ শুরু করলেন। গীতা পাঠে বিদ্যা সঙ্গ দিত। নবলের সারাদিন কাটত বাড়ির বাইরে বাইরে। দুপুরবেলা সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেত। বাকি

সময় তার কংগ্রেস কমিটির দফ্তরে কাটত। ছেলে দুটো স্কুলে চলে যেত আর রুক্মিণী বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন।

সেদিন বিকেলে ড্রইংরুমে বসে জ্বালাপ্রসাদ বিদ্যার কাছে গীতা শুনছিলেন, এমন সময় একটি টাঙ্গা এসে গাড়িবারান্দার সামনে দাঁড়াল। জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "দেখ তো মা, কে এল ?"

বিদ্যা বারান্দায় বেরিয়ে দেখল, বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ টাঙ্গা থেকে নেমে বারান্দায় উঠছেন। বিদ্যা শান্ত ভাবে বললে, "দাদু বৈঠকখানায় আছেন, আপনি আসুন।"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ বিদ্যার কথার কোনো উত্তরই দিলেন না। কঠোর মূর্তিতে ড্রইংরুমে ঢুকলেন।

জ্বালাপ্রসাদ উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন, "আসুন, আসুন, বসুন।"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ চুপচাপ চেয়ারে এসে বসলেন। জ্বালাপ্রসাদ বিদ্যাকে বললেন, "মা, ভিখুকে চা আনতে বল।"

এবার বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ মুখ খুললেন, "না, চা-টা খেয়ে বেরিয়েছি। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে, সেই জন্যেই এসেছি। একে এখান থেকে যেতে বলুন।"

জ্বালাপ্রসাদ বিদ্যার দিকে তাকালেন, "শুনছ মা, একটু ভেতরে যাও।"

বিদ্যা উঠে দাঁড়াল। তারপরে একটু ভেবে সে থেমে গেল। সে বলল, "কথাটা আমার বিষয়ে হবে, সেজন্যে আমার এখানে থাকাটা বিশেষ জরুরী। আমিও একটু শুনতে চাই, ইনি আমার সম্পর্কে কি বলতে এসেছেন।"

বিন্দেশ্বরী কড়া স্বরে বললেন, "তোমার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বাবু জ্বালাপ্রসাদের সঙ্গেই কথা বলতে চাই। তোমার মুখও আমি দেখতে চাই না।"

বিদ্যা গর্জে উঠল, "আমার বিরুদ্ধে যে বিষোদগার করবেন, সেটা আমার সামনেই করুন। আমি সে হলাহল পান করে নিতে পারব।

আপনার মনের এই বিষটা ছড়িয়ে দিয়ে অপরকে হত্যা করবেন না। আমার ঠাকুমা তো আপনাদের বিষের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত প্রাণপাত করলেন।"

জ্বালাপ্রসাদ বিন্দেশ্বরীপ্রসাদকে বললেন, "এর এখানে উপস্থিত থাকাটা আমিও দরকার মনে করি। কারণ এটা এর ভাগ্য আর জীবনের প্রসঙ্গে আলোচনা। উপরন্তু এ সাবালিকা। নিজের ভালোমন্দ একেই বুঝতে হবে। আমার আর কি, যে কোন মুহূর্তে ঈশ্বরের ডাক আসতে পারে। অমর হয়ে তো আর আসিনি।"

"বেশ কথা, আপনার যা খুশী," ব্যাঙ্গের সুরে বললেন বিন্দেশ্বরী-প্রসাদ। "তাহলে এও শুনুক। আমি আপনাকে একখানি চিঠি দিয়েছিলাম যে সিদ্ধেশ্বরীর বিয়ে হবে আগামী সপ্তাহে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার সে চিঠি আমি পেয়েছিলাম। হিন্দু ল' অনুযায়ী সিদ্ধেশ্বরীর সম্পূর্ণ সে অধিকার আছে। সে যত খুশী বিয়ে করতে পারে। এর পরে আপনার আর কিছু বলবার আছে কি?"

"আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এ বিয়েতে ও যাবে কি না?"

জ্বালাপ্রসাদ কিছু বলার আগেই বিদ্যা বলে উঠল, "বিয়ের আগেও নয় আর পরেও নয়। তোমাদের সঙ্গে বাস করা নরকবাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

"শুনছেন এই বজ্জাত মেয়েমানুষটার কথা," বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ বললেন। "এবার আপনারা ভালো করে বুঝুন যে আমাদের কাছ থেকে খোরপোষের খরচা পাবার ও কোনো অবস্থাতেই অধিকারিণী নয়। আমি আপনাদের এই বিষয়ে জানাতে এসেছি, বিশেষ করে জ্ঞানপ্রকাশ সাহেবকে বলতে এসেছি। তিনি নিজেকে বড়ো আইনজ্ঞ বলে মনে করেন।"

"তোমাদের অধর্মের ধন থেকে আমি কানা কড়িরও প্রত্যাশী নই," বিদ্যা উত্তর দিল। "এ সম্পর্কে দাদু বা জ্ঞানদাদুর সঙ্গে কথা বলা অনাবশ্যক। আমি তোমাদের লিখে দিতে পারি।"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ জ্বালাপ্রসাদের দিকে তাকালেন, "শুনলেন তো

আপনি। আমাকে আর কোনো দোষ দেবেন না যেন। আমরা ওর ভরণপোষণ দিতে রাজী, একে বাড়িতে নিয়ে যেতেও প্রস্তুত —কিন্তু এ নিজেই যেতে চাইছে না।”

জ্বালাপ্রসাদ বলেন, “ও তো বলেই দিয়েছে আপনাদের কাছ থেকে কোনো রকম খরচ-খরচা নিতে চায় না।”

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ হাতের ফাইল থেকে একটি কাগজ বের করে বললেন, “আমরাও ঠিক এই ভেবেছিলাম, সেই জন্যে এই কাগজটা লিখে এনেছি। এতে এ দস্তখত করে আমাকে দিয়ে দিক্। আমি চাইনে যে ভবিষ্যতে এ মামলা আদালতে যায়, এতে দু'পরিবারেরই দুনার্ম।” তিনি কাগজটি জ্বালাপ্রসাদের হাতে দিলেন।

জ্বালাপ্রসাদ কাগজখানা পড়লেন তারপর সেটা বিদ্যার হাতে দিয়ে বললেন, “বয়ানটা তো ঠিক্ই আছে। তুমিও পড়ে দেখ মা।”

বিদ্যা পড়ে দেখে বললে, “এটা একটু বদলাতে হবে। দাদু, এতে লেখা হয়েছে, আমি স্বেচ্ছায় এদের সঙ্গ ত্যাগ করছি। এর বদলে আমি লিখব যে—এদের অমানুষিক আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে আমি নিজেই এদের বাড়ি ছাড়ছি।”

“তা লেখা হবে না। আমরা তোমাকে তোমার কলহ আর অভদ্রতার জন্যে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়েছি।”

বিদ্যা কড়া স্বরে বললে, “লিখব তো আমি। আমি যা উচিত মনে করব তাই লিখব। তুমি যদি লেখাতে চাও তো আমি যেমন বলছি, তেমনি লিখে নাও, অন্যথায় এখান থেকে চলে যাও।”

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, “এই কাগজটা তো আপনার কাছেই থাকবে। আপনি নিজে থেকে কাউকে দেখালে বা আদালতে পেশ করলে অন্য কথা। এই অবস্থায় ও যা বলছে তাই লিখে নিন।”

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ একটু ভাবলেন। মামলাটা এত সহজে নিষ্পত্তি হবে বলে তিনি আশা করেন নি! মোলায়েম স্বরে বললেন, “উভয় পরিরারের মান রক্ষার জন্যেই আমি এসব করছি। যেমন খুশী লেখাটাকে ও বদলাতে পারে।”

ওই বয়ানে নিজের কথাগুলো যোগ করে বিদ্যা কাগজটা জ্বালাপ্রসাদের হাতে দিলে। জ্বালাপ্রসাদ পড়ে দেখলেন, "ঠিক্ আছে। এই নিন বাবু বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ, আপনার কাজটা সহজেই বিনা ঝঞ্ঝাটে হাসিল হয়ে গেল। এক কাপ চা খান এবার।"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ কাগজটি ফাইলে রেখে দিলেন, "না, আমার আর এ বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।" তারপর বিদ্যার দিকে ঘুরে বললেন, "মনে রাখিস 'হিন্দু ল'তে বিবাহ বিচ্ছেদ নেই। তাই তুই সারাজীবন সিদ্বেশ্বরীর স্ত্রীই রইলি। যদি কোনোদিন তোর বদমাইশী বা বে-চালের কথা আমরা শুনতে পাই তো তোকে সোজা শ্রীঘরে পাঠিয়ে ছাড়বো।"

বিদ্যা বিন্দেশ্বরীর কথা সহ্য করতে পারলে না। পা থেকে চটি খুলে বিন্দেশ্বরীকে তাড়া করলো। "শয়তান কোথাকার!"

বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ ঘর থেকে চট্ করে বাইরে বের হয়ে গেলেন। জ্বালাপ্রসাদ বিদ্যার হাত ধরে ওকে থামাতে গেলেন। বিদ্যা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চটি হাতে বিন্দেশ্বরীর পিছু ধাওয়া করল। জ্বালাপ্রসাদ বিদ্যার পিছু পিছু ছুটলেন। ততক্ষণে বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ টাঙ্গাতে উঠে পড়েছেন। টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন, "শিগ্গীর টাঙ্গা হাঁকাও।"

টাঙ্গা চলল আর বিদ্যা থমকে দাঁড়াল, "ভীরু কোথাকার!" সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সাত

১৯৩০ সালের ২রা মার্চ মহাত্মা গান্ধী লর্ড আরউইনের নামে একখানা পত্র প্রকাশ করলেন। এই পত্র প্রকাশের ফলে সারা দেশে সাড়া পড়ে গেল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ঘোষণাপত্র। সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ব্রিটিশ সরকার স্বরাজ দেবার জন্যে আদৌ

রাজী নয়। মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে সত্যাগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোনোও উপায়ই ছিল না। যুক্তি, সততা ও সুদৃঢ় সংকল্পে ভরা এই চিঠি।

নবলের লেখাপড়া ভালোই চলছিল কিন্তু সে দিন তার ইউনিভার্সিটিতে মন বসল না। সেখান থেকে সে সোজা কংগ্রেস কমিটির দফ্তরের দিকে রওনা হল। জ্ঞানপ্রকাশ এলাহাবাদের জন্যে সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা রচনা করছিলেন। নবলকে দেখে বললেন, "নবল, সময় উপস্থিত। যুদ্ধের সূচনায় শ্রীদুর্গা ফাঁদা হল।"

"হ্যাঁ জ্ঞানদাদু, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আপনি কখন বেরবেন ?"

"আমার তো পুরো দিনটাই এখানে লেগে যাবে, সামনে কাজের পাহাড়। মনে হয় ছ'টা/সাতটার আগে তো নয়ই। বিকেলের চা-টা বাড়িতে গিয়েই খেতে পারব। আরে হ্যাঁ, আজ সকালে 'নারী শিক্ষা সদনের' মিটিং ছিল, বিদ্যাকে সেখানে ১৫ই মার্চ থেকে নিয়োগ করা হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে বলব সব।"

"আচ্ছা বেশ দাদু। আজ ইউনিভার্সিটিতে মন লাগল না সেজন্য বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।"

নবল রওনা হল। তার মন প্রসন্ন। বিদ্যা কাজ পেয়েছে, এখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। বিদ্যার একটা হিল্লে হয়ে গেল, খুব বড়ো একটা সমস্যার সমাধান হল। বিদ্যাকে এই সুখবরটা দেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ছুটে গেল। বিদ্যা ড্রইংরুমে বসে জ্বালাপ্রসাদকে রামায়ণ শোনাচ্ছিল। নবল এসেই বিদ্যাকে বললে, "বিদ্যা, তোমার একটা বড়ো সুখবর আছে, মিষ্টি খাওয়াও। জ্ঞানদাদু বললেন ১৫ই মার্চ থেকে 'নারী শিক্ষা সদনে' তোমাকে নিয়োগ করা হয়েছে।"

বিদ্যা বলে উঠল, "সত্যি দাদা!" তারপর যেন নিজের অধীরতায় লজ্জিত হল। জ্বালাপ্রসাদকে বললে, "দাদু, এই দোহাটির পর রামায়ণ পড়া এখন বন্ধ ক'রে দিই।"

জ্বালাপ্রসাদ মুচ্‌কে হাসলেন, "হ্যাঁ মা, আর এখন তোমার মন এতে বসবে না। ঈশ্বরের কৃপায় কাজটা পেয়ে গেছ। এক মনে ঈশ্বরের নাম কর।"

বিদ্যা রামায়ণ পাঠ বন্ধ করে নবলের দিকে তাকাল, "হ্যাঁ দাদা, ভগবান রামচন্দ্রের কৃপা হয়েছে আমার ওপর। তাহলে ১৫ই আমাকে ওখানে যেতে হবে।"

নবল বিদ্যাকে কোনো উত্তর দেবার আগেই জ্বালাপ্রসাদ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে যেন আপন মনেই বললেন, "এদিন দেখাও ভাগ্যে লেখা ছিল! বাড়ির মেয়ে বাইরে বেরিয়ে চাকরি করবে, পরের গোলামি করবে!"

নবল চুপ করে রইল। কিন্তু বিদ্যা আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না, "দাদু, গোলামি থেকে মানুষের মুক্তি আর কোথায় বলুন? বাড়িতে পড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কষ্ট সহ্য করা, জোর-জবরদস্তি করে নিজেকে চেপে রাখা—এটা কি কম গোলামি?"

জ্বালাপ্রসাদ চোখ নামিয়েই উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মা, তুমি বোধ হয় ঠিক্‌ই বলছ। কিন্তু বাড়িতে স্নেহ মমতা বলে জিনিষ আছে তো!"

বিদ্যার স্বর কঠোর হয়ে এল, "মমতা! কেমন মমতা—আর কার জন্যেই বা মমতা! এক ঘৃণার রাজ্যে আমাকে গুমরে গুমরে মরতে হয়েছে! ওই অর্থপিশাচরা আমার বাপ মায়ের, সারা পরিবারের রক্ত শুষে খেয়েছে। এদের জন্য আবার মায়া হবে?"

জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "তুমি বুঝবে না মা। জগতে নিঃসঙ্গ থাকাটা বড় কঠিন—এই নিঃসঙ্গ ভাবটা দূর করবার জন্যেই পরিবারের সৃষ্টি।"

বিদ্যা হাসল, "দাদু আপনি, দাদা, মা রয়েছেন আর সারা দুনিয়াই তো রয়েছে। এত বড়ো পরিবার থাকতে আমার কিসের চিন্তা! কি নবল দাদা, তুমি আমাকে নিজের কাছে রাখবে তো? আমি বৌদিকে তোমার মতোই ভালবাসব। তোমার সন্তানদের মাথায় করে রাখব।"

নবল কান্না চেপে বললে, "বিদ্যা, কি সব আজে বাজে বকছ? তুমি যদিও আমার ছোট বোন কিন্তু বুদ্ধিতে, বীরত্বে তুমি আমার শ্রদ্ধেয়।"

নবল ঘড়িতে দেখলে, মাত্র তিনটে বেজেছে। বাড়িতে তার মন লাগছিল না। মনের মধ্যে বিচিত্র চাঞ্চল্য। তার কারণ জানে না আর স্বরূপও চেনে না। বিদ্যা নবলকে জিজ্ঞেস করলে, "আজ তোমাকে বড়ো উদাস দেখাচ্ছে দাদা, কি হয়েছে?"

নবল মৃদু হাসল, "আমিও বুঝতে পারছি না। আমার কোথাও মন লাগছে না।"

বিদ্যা উঠে দাঁড়াল, "অনেক দিন উষার সঙ্গে দেখা হয়নি। তিন-চার দিন থেকে ভাবছিলাম উষার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার সঙ্গে চল, সেখানে গেলে মনটা হাল্কা লাগবে।"

উষার নাম শুনে নবল যেন একটু চমকে উঠল। কয়েকদিন যাবৎ সে উষার কথা একেবারেই ভাবেনি। বিদ্যার প্রস্তাবে হঠাৎ উষার কথা মনে পড়লো। কিন্তু এই আকর্ষণের মধ্যে আছে আশঙ্কা আর অজানা ভয়। সম্ভবতঃ এই ভাবনা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই মনটা উষার প্রতি উদাসীন ছিল। হঠাৎ আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই এলো ভয় আর শঙ্কা।

ভয় আর শঙ্কা......এগুলো দূর করতে হবে, এদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, এদের কাছ থেকে পালালে চলবে না। নবল বললে, "বেশ বিদ্যা, তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তাড়াতাড়ি কর, দশ মিনিটের ভেতরে তৈরী হয়ে নাও। ছ'টা সাতটার মধ্যে ওখান থেকে ফিরে আসতে হবে। জ্ঞানদাদু বলেছেন তিনি ফিরে এসে বাড়িতেই চা খাবেন। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তাও তো বলতে হবে।"

নবল বিদ্যাকে নিয়ে যখন রায়বাহাদুর কামতানাথের বাড়ি গিয়ে পৌছল তখন চারটে বেজে গেছে।

উষা কলেজ থেকে ফিরে চা খাবার আয়োজন করছিল। নবল

আর বিদ্যার সঙ্গে সে বাইরের বৈঠকখানাতেই বসল আর চা নিয়ে আসতে বললো।

বিদ্যা জিজ্ঞেস করল, "কি উষারানী, লেখাপড়া কেমন চলছে ?"

উষা মুচ্‌কে হাসল, "ভালোই চলছে। কি বলি, এক বছর ইউরোপের পিছনে নষ্ট হল। আমার সঙ্গীরা বি. এ. ফাইনালে উঠে গেছে। আমার লজ্জা করে।"

"এতে লজ্জার কি আছে ?" নবল বলল। "তুমি তো আর ফেল করনি। আগামী বছর বি. এ. পাস করে যাবে।"

"হ্যাঁ, আগামী বছর তো বি. এ. পাস আমি করবই। জানি না কেন মনটা অধীর হয়ে উঠেছে। কোনো কিছুর জন্যেই আর প্রতীক্ষা করতে ইচ্ছা করে না। কখন কখন ভাবি মিছামিছি এই লেখাপড়ার ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিয়েছি। আমি বি. এ. পাস করেই বা করবটা কি। চাকরি তো আর করব না।"

নবল বলে উঠল, "চাকরি করবে না ঠিকই, তবে বি. এ. টা তো পাস করে নাও। শুধু চাকরির জন্যেই তো লেখাপড়া নয়। জগতের মূল্যবোধ বড় তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ কি রকম কি হবে, কিছুই বলা যায় না।"

উষা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, "হ্যাঁ নবলবাবু, ভবিষ্যতে কি যে হবে কারো জানা নেই, কোনো অবস্থাতেই জানা যেতে পারে না।" তারপর কথাটা শেষ করবার জন্যেই বোধ হয় বিদ্যার দিকে ফিরল, "কি গো বিদ্যারানী, দিন কেমন কাটছে ?"

"খুব আনন্দেই কাটছে। খাই দাই, লেখাপড়া করি আর দিব্যি ঘুম দিই," বিদ্যা হাসতে হাসতে বললে, "কিন্তু দেখছি এই আরামের জীবন আর বেশী দিন চলবে না। বসে বসেও ভালো লাগছে না। জীবনে কাজও চাই।"

"যদি কাজ করতে চাও তাহলে কাজের অভাব হবে না," উষা বললে।

"জীবিকার জন্যেই কাজ। 'নারী শিক্ষা সদনে' আমি অধ্যাপিকার কাজ পেয়েছি, ১৫ই মার্চ থেকে সেখানে কাজ শুরু করব।"

উষা চমকে উঠল, "কী চাকরি করবে? লোকে বলবে কী? আর তোমারও কী রকম লাগবে না?"

"আমার খুবই ভালো লাগবে। কাজ পাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলাম। পরনির্ভর, পরাশ্রিতা না হয় নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াব এ সম্ভাবনায় আমি তো গর্ব বোধ করছি। লোকে কি বলবে না বলবে তা ভেবে কি হবে? আমার জীবনের সঙ্গে অন্যের কি সম্পর্ক। তারা আমাকে কিছু দেবে না আর কেড়েও নেবে না।"

নবল বিদ্যার কথার সমর্থন করল, "অন্যদের সময়ই বা কোথায় উষারানী, তারা তো টীকা-টিপ্পনী ক'রে বেড়াবে। যারা বিদ্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবে তারা হল সেকেলে মানুষ—পুরনো জগতের—সে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নতুন জগতের লোক কাজ করাটাকে ঠিক্ মনে করবে। তারা বিদ্যাকে সম্মানের চোখেই দেখবে। স্ত্রীলোকেরও নিজস্ব একটা জগৎ রয়েছে।"

নবলের কথায় উষা তিড়বিড়িয়ে উঠল, "আপনি ঠিক্ই বলছেন নবলবাবু, আপনাদের নতুন জগতে মেয়েদেরও একটা নিজস্ব জগৎ আছে। সে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গোলামি করুক, পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করুক, পরিবার আর বাড়ির মর্যাদা ভেঙ্গে ফেলুক—আপনার এই নতুন জগৎ আপনারই থাক। কিন্তু আমি বলছি এই নতুন জগৎ বেঠিক পথে চলেছে, তাই এ টিকতে পারবে না। স্ত্রী-পুরুষ, দুর্ব্বল-সবল, ধনী-নির্ধন এই বৈষম্যের মনোভাব তো অনাদিকাল থেকেই চলে আসছে আর অনন্ত কাল চলবে। যে মূল্যায়নের দোহাই আপনি দিচ্ছেন সে সব ডাহা মিথ্যে। পাগলের স্বপ্ন মাত্র! আমি বিশ্বাস করি না।"

নবল অবাক্ হয়ে উষাকে দেখল। এ কি সেই উষা, যাকে সে ভালবাসে? এ কি সেই যাকে সে নিজের জীবন সঙ্গিনী ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করবে? উষা এ সব কি বলছে? তার সব

শিক্ষা দীক্ষা ব্যর্থ হল? উষা তো ইউরোপ ঘুরে এসেছে। স্বাধীন দেশগুলোতে ভ্রমণ ক'রে এসেছে। বিদেশে গিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গীটা যেন আরো সঙ্কুচিত হয়ে গেছে! নবল আর একবার চেষ্টা করলে, উষা তার কথাটা বুঝুক, "উষা তুমি তো ইউরোপ ঘুরে এসেছ। তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই সেখানে মেয়েরা কত স্বাধীন। এসব তুমি কী বলছ?"

উষা হেসে উঠল, কিন্তু তার হাসিতে ছিল ব্যঙ্গ, "হ্যাঁ, আমি ইউরোপ ঘুরে এসেছি আর আমি সেখানকার মেয়েদেরও দেখেছি। কিছু মেয়েরা সেখানে কাজ করছে বাধ্য হয়ে, যেমন আমাদের এদেশে ছোটলোকের মেয়েরা কাজ করে। কিন্তু যাদের কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই তারা আরামে রয়েছে, মুক্তহস্তে খরচা ক'রে চলেছে। তাদের আছে দাস দাসী, জমকালো গাড়ি, বড়ো বাড়ি। তারা যাচ্ছে থিয়েটার, সিনেমা, কার্নিভাল আর সর্বত্র। হীরে-মুক্তায় তাদের অঙ্গ মোড়া আর দামী পোষাকে গা ঢাকা। সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা-পরাধীনতার দোহাই দেয় না। এ সব ভেদ তো ধনী দরিদ্রের।" উষা তারপরে বিদ্যার দিকে ফিরল, "বিদ্যারাণী, তুমি যদি নিজের বাড়ি ছেড়ে না চলে আসতে, তাহলে কি আর চাকরি করতে হত? অন্য কোন অবলম্বন না থাকার জন্যেই তো তোমাকে চাকরি করতে হচ্ছে।"

বিদ্যার সম্পর্কে উষা ঠিক বলেছিল। উষার কথা বিদ্যার ভালো লাগল না, কিন্তু সে কথার কোনো প্রতিবাদ করার ছিল না বলে সে চুপ করেই রইল।

বিদ্যার উত্তরের জন্য একটু প্রতীক্ষা ক'রে উষা আবার বললে, "স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে সে গোলামী করবার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে। স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ হল যে, বাড়ির ঘেরা প্রাচীর থেকে বাইরে যেতে পারে, বাড়ির বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, বাইরে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে, পর্দা থেকে বেরিয়ে

সভা সমিতিতে লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে।' আর এই স্বাধীনতা পেতে হলে সম্পদ চাই, নবল বাবু।"

সীতানাথ বাইরে বেরিয়ে এ'ল। নবলকে দেখেই বললে, "আরে নবল, তুমি! অনেক দিন পরে দেখছি যে! তুমি যে আপাদমস্তক খদ্দর পরেছ, পুরোপুরি কংগ্রেসী বনে গেছ যে!"

নবল উত্তর দিলে, "পোষাকের দিক থেকে তো কংগ্রেসী হয়েছি ঠিকই। তবে এখন সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে যোগ দিইনি আর দেবার কোনো ইচ্ছেও নেই।"

"হয়তো তাও কোনোদিন হয়ে যাবে। আমি তো বলি সেটা কিছু মন্দ কাজ হবে না।" তারপর উষাকে বললেন, "গৌরী-দাদাকে বলে দিও আমার কর্নেল গ্রাহমের সঙ্গে জরুরী কাজে দেখা করবার কথা ছিল, সেজন্যে মোটর নিয়ে বের হলুম। আমার ফিরতে দেরি হলে উনি যেন টাঙ্গা আনিয়ে নেন।"

উষা বললে, "ছোড়দা, আপনি টাঙ্গা ক'রে চলে যান না কেন?"

"আমাকে কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে, টাঙ্গাতে বড়ো দেরি হবে। আচ্ছা, কর্নেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার পরেই আমি মোটরটা পাঠিয়ে দেব, সাড়ে ছ'টা নাগাদ। সেখান থেকে না হয় আমি টাঙ্গা ধরে নেব।" তারপর নবলকে বললে, "যাবে না কি নবল, আমি চেথম লাইন্সে যাচ্ছি। পথে তোমাদের দু'জনকে নামিয়ে দিতে পারি।"

বিদ্যার আরো একটু বসবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নবল উঠে দাঁড়াল, "চলুন সীতানাথদা! চল বিদ্যা এখন বাড়ি যাওয়া যাক্। জ্ঞানদাদুরও ফেরার সময় হল।"

সীতানাথ নবলের বাংলোতে বিদ্যাকে নামিয়ে দিয়ে নবলকে বললে, "চল নবল, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে চল। তোমার সঙ্গে কিছু কথাও ছিল।"

"চলুন, কিন্তু আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে," নবল উত্তর দিলে।

চেথম লাইন্সে সীতানাথের মাত্র মিনিট দশেকের কাজ ছিল। সেখান থেকে দুজনে গেল সিভিল লাইন্সে। একটি রেস্তোরাঁর সামনে মোটর দাঁড় করালে। নবলের সঙ্গে মোটর থেকে নেমে ড্রাইভারকে বললে, "গাড়িটা বাড়ি নিয়ে যাও।"

সীতানাথ চা আনালে। তারপরে নবলকে জিজ্ঞেস করলে, "নবল, রাজেন্দ্রকিশোরকে তুমি দেখেছ কি? তার সম্পর্কে তোমার কি মত?"

নবল একটু ভেবে বললে, "আমি তাঁকে ভালোভাবে জানি না। মাত্র দুবার তাঁকে দেখেছি সেও আপনাদেরই বাড়িতে। এমনিতে লোকটিকে গোছানো ফিটফাট বলেই মনে হয়। কেন, ব্যাপার কি?"

"তুমি জান, রাজেন্দ্রকিশোর বিবাহিত?"

"এতে আশ্চর্যের আর কি আছে! তাঁর বয়সও তো যথেষ্ট হয়েছে," নবল মুচ্‌কে হাসল।

"না, আশ্চর্যের কথা নয়। বিলেত যাবার আগেই তার বিয়ে হয়েছিল। কথাটা হ'ল এই গৌরীদার ইচ্ছে উষার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। আমার মনে হয় সেই নিজে এ কথাটা গৌরীদাকে বলেছে।"

নবল যেন আকাশ থেকে পড়ল, "রাজেন্দ্রকিশোর আবার বিয়ে করতে ইচ্ছুক? কেন?"

"কারণ তার স্ত্রী কুশ্রী, অশিক্ষিতা, পর্দানশীনা আর গ্রাম্য গরীব ঘরের মেয়ে। একজন আই.সি.এস. অফিসারের সুন্দরী আর শিক্ষিতা স্ত্রী থাকা দরকার।"

দু'জনে চুপচাপ চা খেতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নবল জিজ্ঞেস করল, "এই প্রস্তাবে গৌরীদা বোধ হয় খুশীই হয়ে থাকবেন। কারণ উচ্চপদ আর মান মর্য্যাদার প্রতি তাঁর বিশেষ মোহ।" এখন নবলের কাছে উষার মধ্যে পরিবর্তনের কারণটা সুস্পষ্ট হল, "সীতানাথদা, উষার বিয়ে আপনারা রাজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে দিলে আমার একটুও আপত্তি নেই। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, উষার সঙ্গে বিয়ের কথা আমার আর ভাবাই উচিত নয়।"

"কিন্তু রাজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে উষার বিয়েতে আমার মত নেই," সীতানাথ বললে। "বাড়িতে শুধু বাবা গৌরীদাদার পক্ষে আছেন।"

"আর উষা এ সম্বন্ধে কি বলছে?"

"সেটাই তো মুশকিল, উষা এই বিষয়ে মৌন রয়েছে। তবে এই মৌনতার অর্থ সম্মতিসূচক বলা যেতে পারে। এই মাত্র আমি যে মোটর পাঠালাম তার কারণটা হ'ল সন্ধ্যের গাড়ীতে রাজেন্দ্রকিশোর আসবে। গৌরীদাদা তাকে ষ্টেশনে আনতে যাবেন। খুব সম্ভব উষাও তাঁর সঙ্গে যাবে।"

নবলের চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে এল। সে উঠে দাঁড়াল "সীতানাথদা, আপনি আমার অবস্থা সম্পর্কে যেভাবে আমাকে সচেতন করালেন, তার জন্যে ধন্যবাদ।"

সীতানাথ নবলের হাত ধরলে, "তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। উষার ওপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর এ অধিকারটা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। আমি রাজেন্দ্রকিশোরকে পছন্দ করি না। স্ত্রী বর্তমান থাকতে যে লোকটা আবার বিয়ে করতে চায়, সে যত বড়োই পদমর্যাদায় আসীন হোক্ না কেন, আমি তাকে অত্যন্ত নীচ মনে করি।"

নবল উদাস স্বরে উত্তর দিল, "সীতানাথদা, কারো ওপর কারো কোনো অধিকার নেই। উষার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই আর উষারও আমার ওপর কোনো অধিকার নেই। অধিকার মানুষের শুধু নিজের ওপরই থাকতে পারে।"

সীতানাথের মুখের উপর হতাশার ছায়া নেমে এল, "না, এ হতে পারে না। মনে হচ্ছে যেন সব কিছু হাতের বাইরে। আমি জানি এসব গৌরীনাথদার কেরামতি। তাঁর পদমর্যাদা, ভোগ বিলাসের প্রতি মোহ। অপরে পরিশ্রম করুক, সংঘর্ষ করুক আর উনি বসে বসে মজা লুটবেন—এই হ'ল ওঁর দৃষ্টিভঙ্গী। আমি ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে সাহায্য পাবো। কিন্তু তুমি

আদর্শবাদী—বাস্তববাদের বীভৎসতা থেকে দূরে থাকতে চাও। বাবার সঙ্গে আমার এই নিয়ে আলোচনা করতেই হবে।"

নবল সিভিল লাইন্স থেকে বাড়ি ফিরল। জ্ঞানপ্রকাশ কংগ্রেস কমিটি থেকে ফিরে ড্রইংরুমে সোফার ওপর গা এলিয়ে বসে আছেন। জ্বালাপ্রসাদ আর বিদ্যা চেয়ারে বসেছে। রুক্মিনী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। জ্বালাপ্রসাদ বললেন, "তোমরা যা ঠিক্ মনে কর, তাই কর। আমার মতে আশি টাকা তো কিছু কম নয়। হ্যাঁ, একটা টাঙ্গা রাখতে হবে, না হলে বিদ্যার যাওয়া আসার কষ্ট হবে।"

"দাদু, টাঙ্গার কি দরকার। নবলদাদা মাসিক দশ টাকায় একটা ঠিকে টাঙ্গা ঠিক্ করে দেবে। সকালে আমাকে স্কুলে পৌঁছে দেবে আর বিকেলে বাড়ি নিয়ে আসবে। জ্ঞানদাদু, ঠিক্ কি না?"

"হ্যাঁ, এটা ঠিক্। তবে আমি কিছুদিন থেকে নতুন মোটর কেনবার কথা ভাবছি। পুরনোটা বিক্রিও হয়ে গেছে। কিন্তু আমার তো কিছু ঠিক্ নেই। আন্দোলন শুরু হতে যাচ্ছে। জেলযাত্রীদের মধ্যে আমার নামটাই থাকবে সবার আগে।"

এমন সময় নবল ঘরে ঢুকল। তার মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যা তাকে দেখেই বলে উঠল, "আরে দাদা, তোমার কি হয়েছে? শরীর ভালো তো?"

নবল চেয়ারে বসে চোখ বুজল, "হ্যাঁ শরীর ভালো। বিদ্যা, এক গেলাস জল দাও তো।"

জল খেয়ে নবল যেন সুস্থ হল। জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে নবল উত্তর দিল, "কিছু নয়, জ্ঞানদাদু। একটু আগে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। তাই মনে একটু ধাক্কা লাগল। কিন্তু সে স্বপ্নটা এল আর চলে গেল। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।"

"এই দিনের বেলায় জেগে স্বপ্ন দেখাটা কি রকম"? জ্ঞানপ্রকাশ প্রশ্ন করলেন।

"এমনি ঠাট্টা করছিলাম," কথাটা এড়াবার জন্যে বললে নবল।

তারপর জ্ঞানপ্রকাশের দিকে ফিরল, "আচ্ছা জ্ঞানদাদু, মহাত্মা গান্ধীর ঐ পত্রের কি প্রতিক্রিয়া হলো ?"

"প্রতিক্রিয়াটা খুব স্পষ্ট নয়। মনে হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর পত্রে কোনো ফল হবে না। সত্যাগ্রহ করতে হবে। সাবরমতীতে কিছু বাছাই করা সত্যাগ্রহী আসছেন। ১২ই মার্চ তাঁরা গান্ধীজীর সঙ্গে দাণ্ডীতে লবণ আইন অমান্যের জন্যে যাত্রা করবেন। সাবরমতী থেকে দশ' মাইল দূরে হল দাণ্ডী। সত্যাগ্রহীরা হেঁটে যাবেন সেখান পর্যন্ত।"

নবলের মনের সমস্ত বিষাদ ততক্ষণে দূর হয়ে গিয়েছিল, "আপনারও তো মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সত্যাগ্রহ করতে যাবার কথা ছিল ?"

"হ্যাঁ, আমি তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিষেধ করলেন। বোধহয় ৫ই এপ্রিল তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করবেন। আর সেই দিনেই সারা ভারতে সর্বত্র লবণ আইন ভঙ্গ করা হবে। আমাদের নিজের নিজের এলাকায় সত্যাগ্রহ করবার আদেশ দেওয়া হয়েছে।"

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর জ্বালাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "জ্ঞানু, তাহলে তুমি সত্যাগ্রহ করবে না কি ?"

"হ্যাঁ দাদা, এলাহাবাদে প্রথম দিনের লবণ আইন ভঙ্গকারীদের তালিকাতেই আমার নাম! এটা হল এই যুদ্ধের সূচনা।"

"তারপর ?" জিজ্ঞেস করলেন জ্বালাপ্রসাদ।

জ্ঞানপ্রকাশ হাসলেন, "তারপর জনসাধারণ আইন ভাঙ্গবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের ধর্ম। কিন্তু এ বিরোধ হবে অহিংস। আমরা নতুন রকমের লড়াই-এ নেমেছি।"

খাওয়া দাওয়ার পর বিদ্যা নবলকে জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা, সত্যি করে বলবে, সীতানাথের সঙ্গে তোমার কি কথাবার্তা হল ? তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরলে কেন ?"

নবল করুণ সুরে বললে, "আর এক নৈরাশ্যের সম্মুখীন হয়েছি।

আর একবার ধাক্কা খেলাম। উষা আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।”

“দাদা, তুমি উষার কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়েছ, এটাই কি ঠিক্ না? এটা তোমার পরাজয়, না বিজয়?”

নবল পাগলের মতো হেসে উঠল, “জয়! পরাজয়! বিছা, কে জানে এর অর্থ কি! আমি তো শুধু এটুকুই জানি, আমি ক্রমাগত হেরে যাচ্ছি আর ভেঙ্গে পড়ছি!”

বিছা কঠোর দৃষ্টিতে নবলের দিকে তাকাল, “দাদা, তুমি ভেঙ্গে আবার গড়ে উঠছ, হারিয়ে আবার নতুন করে নিজেকে পাচ্ছ। তবে এ অবিশ্বাস আর ভীরুতা কেন? সাহস সঞ্চয় কর, নিজেকে সামলে চল।”

নবল অবাক্ হয়ে ছোট বোনটির দিকে তাকাল আর বিছার হাত ধরে সে হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, “তুমি ঠিক্ বলেছ বিছা, যা ভেঙ্গেছে তা ছিল অসৎ। কিন্তু সত্য কি, এখন তাকেই খুঁজতে হবে।”

আট

“তুনিয়া কোথায় চলেছে আর এর পরেই বা যাবে কোথায়?” জ্বালাপ্রসাদ নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন। তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠল, গলার স্বর কাঁপছিল। সামনে মাথা হেঁট করে রুক্মিণী দাঁড়িয়ে ছিলেন। জ্বালাপ্রসাদ রুক্মিণীকে বললেন, “সে আমার কথা শোনে না। আমাকে অবোধ, অজ্ঞানী মনে করে। আমি তাকে বুঝতে পারছি না। জানি না আমার বোধশক্তি নষ্ট হয়েছে, না নবলের বুদ্ধি বেশী হয়েছে।”

“নবল পরীক্ষাটা তো দিয়ে দিতে পারত,” রুক্মিণী বললেন। “আপনি তাকে বকুন, ভালো মন্দ বোঝান।”

জ্বালাপ্রসাদ হতাশার সুরে বললেন, "বৌমা, বকব আর ভালো মন্দ বোঝাব কাকে? যে খারাপ কাজ করে তাকে লোকে বকে, কিন্তু খারাপ কাজ তো সে কিছু করেনি। তাছাড়া কি ভালো আর কি মন্দ, সেটাও আজকাল বোঝা যে ভার হয়ে উঠেছে। তুমিই দেখ না কেন, আগে লোকেরা জেলের নামে ভয় পেত, আর আজ সেই জেলকেই কৃষ্ণমন্দির মনে করে বড়ো বড়ো লোক সব জেলে যাচ্ছেন। না বৌমা, তাকে ভালো মন্দ বুঝিয়ে আমি হার মেনেছি।"

রুক্মিণী চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "বাপ্পা, এ সব কি হচ্ছে? কোনো একটা উপায় খুঁজে বের করুন না।"

জ্বালাপ্রসাদ রুক্মিণীকে কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর উত্তর দেবার মতো অবস্থাও ছিল না। 'এসব কি হচ্ছে'—এটা কোনো নতুন প্রশ্ন নয়। সারা জীবনভোর এই প্রশ্নটাই তাঁর সামনে রয়ে গেছে, আর এ প্রশ্নের তিনি কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। কোনো বস্তুর ওপর কারো কোনো অধিকার নেই, কেউ কিছুই করে না আর করতেও পারে না! সব কিছু যেন আপনিই হয়ে চলেছে!

রুক্মিণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি জ্বালাপ্রসাদের উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিলেন—নিরীহ, অসহায় দুর্বল নারী, তিনি সব কিছু লুণ্ঠিত হতে দেখছিলেন, কোথা থেকে যেন কার সাহায্য চাইছিলেন। তিনি কাতর স্বরে বললেন, "বাপ্পা, যে কোনো উপায়ে তাকে আটকান। সে জেলে থাকবে কি করে! সেখানে তাকে জাঁতা ঘোরাতে হবে, দড়ি পাকাতে হবে!"

জ্বালাপ্রসাদ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন, "বৌমা, জাঁতা আর দড়ির ভাবনা আমি ভাবি না, কিন্তু.........কিন্তু.........এই জেলে যাওয়াটা.........অদ্ভুত ঠেকছে আমার! এর উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে জ্ঞানুর।" জ্বালাপ্রসাদের স্বরে তিক্ততা এসে পড়েছিল, "নিজে তো ভুল পথ ধরে নিজের জীবনটা নষ্ট করলে, এখন এই ছেলেটার মাথাও খাচ্ছে।"

"ওকথা বলবেন না বাপ্পা! মানুষের এতে কোনোই দোষ নেই. এসব তো ঈশ্বরের মার। যেন আমাদের শেষ করে ফেলবার জন্যেই তিনি কোমর বেঁধেছেন।" রুক্মিণী চোখ মুছতে মুছতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

নবল ড্রইংরুমে বসে জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে কথা বলছিল; বিদ্যাও সেখানে বসেছিল। জ্ঞানপ্রকাশ বলছিলেন, "নবল, প্রথম দলে আমার নাম দিয়েছি, দ্বিতীয় দলে থাকবে তুমি।"

নবল মৃদু হাসল, "না জ্ঞানদাদু, আমিই যাব প্রথম দলে। আপনার তো এখনো অন্ততঃ এক সপ্তাহ জেল থেকে বাইরে থাকা দরকার। এই আন্দোলনটাকে চালাতে হবে। বিদ্যা, তুমি কি বল?"

বিদ্যা নবলের কথার সমর্থন করলে, "হ্যাঁ, জ্ঞানদাদু, প্রথম দলে দাদার যাওয়াই ঠিক্ হবে।"

জ্ঞানপ্রকাশ মুচ্‌কে হাসলেন, "আর বিদ্যা, তুমি নুন তৈরি করবে না?"

"না দাদু, আমাকে এসব থেকে তফাতেই রেখে দিন। এই জেলে যাওয়া, লড়াই ও ঝগড়া করা পুরুষদেরই শোভা পায়।" একটু থেমে বললে, "কে জানে, যদি দরকার হয় তাহলে বোধ হয় আমাকেও বাইরে বের হতেই হবে।"

"না বিদ্যা, তোমাকে বাইরে বের হতে হবে না। আমি এমনিই ঠাট্টা করছিলাম।"

এমন সময় জ্বালাপ্রসাদ এসে ড্রইংরুমে ঢুকলেন। তাঁকে খুব গম্ভীর দেখা গেল। তাঁর আসামাত্রই কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। জ্বালাপ্রসাদ অনেকক্ষণ ধরে তিনজনকেই একদৃষ্টে দেখে নবলকে বললেন, "নবল, আমি শুনলাম, পরশু যে লবণ সত্যাগ্রহ হবে, তার সত্যাগ্রহীদের মধ্যে তোমারও না কি নাম আছে। তুমি কি লেখাপড়া ছেড়ে শেষে জেলে যাওয়াই স্থির করেছ?"

"হ্যাঁ দাদু, আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি আমার জীবনের পথ

কি। আমার মনে হচ্ছে ওকালতিতে আমি সফল হব না। মিথ্যা, খোসামদ, ধোঁকা দেওয়ার ক্ষমতা—ওকালতির অপরিহার্য গুণ। আমার মধ্যে সেটার অভাব। আমার ওকালতি থেকে দূরে থাকাই ভালো। যখন ওকালতি করবই না, তখন পরীক্ষা দেওয়াটা বৃথা।"

"তাহলে তোমার এ দুবছর বৃথাই নষ্ট হল?" জ্বালাপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"না দাদু, এ দু'বছরে আমি অনেক কিছু দেখলাম, শিখলাম আর বুঝলাম। আপনি দেখছেন তো কত যুবক লেখাপড়া শিখে বেকার হয়ে ঘুরছে। তাদের মধ্যে তিক্ততা ভরে উঠেছে। হাজার হাজার যুবক উকিল হয়েছে, কিন্তু তারা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাচ্ছে না। হাজার যুবক বি.এ., এম.এ. পাস করে শুধু দপ্তরে দপ্তরে চক্কর মারছে, তাদের জন্যে কোনো কাজ নেই। আমি অন্ততঃ এই অসহায়তা, তিক্ততা আর নৈরাশ্য থেকে বেঁচে গেছি। জ্ঞানদাদু, আমি ভুল বলছি কি?"

জ্বালাপ্রসাদ একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, "জ্ঞানু তো তোমার কথায় সায় দেবেই, তুমি যে ওর চেলাগিরি করছ। সে নিজে বিয়ে করলে না, সারা জীবনে কোনো কাজই করলে না।"

জ্ঞানপ্রকাশ পাল্টা জবাব দিলেন, "বিয়ে-থা করেই বা কে কি পেয়ে গেল? আমি চিন্তা, ভয়, আশঙ্কা এসব থেকে তো অন্ততঃ রেহাই পেয়েছি। আর শিষ্যের কথায় বলি, কেউ কাকেও শিষ্য করতে যায় না, সবাই নিজের অনুপ্রেরণা থেকেই কাজ করে।"

"হ্যাঁ দাদু, জ্ঞানদাদু ঠিক্ই বলেছেন, গীতাতেও তো এই কথা লেখা আছে," বিদ্যা বললে।

জ্বালাপ্রসাদ দেখলেন যেন সারা দুনিয়াটা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে; কেউ তাঁর কথা শুনতে আর বুঝতে রাজী নয়। তিনি সামনের বারান্দায় এসে ক্লান্ত আর পরাজিতের মতো চুপচাপ বসে পড়লেন। পড়ন্ত রোদ আর বাতাসে গরমের আমেজ এখনও কমেনি। এমন সময় চায়ের ট্রে নিয়ে ভিখু ড্রইংরুমে ঢুকল।

সেখান থেকেই সে চেঁচিয়ে বললে, "দাদাবাবু, চা খেয়ে নিয়ে তবে বেড়াতে যেও। আমি ওখানেই চা আনছি, তোমাকে ঘরে আসতে হবে না।"

জ্বালাপ্রসাদ ভিখুকে কোন উত্তর দিলেন না। চুপচাপ দু'হাতের ওপর মাথা রেখে ভাবছিলেন, এসব কি হতে চলেছে? তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। নিজের চারদিকের পরিবেশ তার নিতান্ত অচেনা মনে হচ্ছিল। অতীতের চিত্রগুলি একের পর এক তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল—স্বপ্নের মতো আবছা আর অস্পষ্ট। শিউলাল, গঙ্গাপ্রসাদ, যমুনা, এরা সব একে একে চলে গেল, যেন এদের কোনো দিন কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তারপর একদিন তিনিও চলে যাবেন, এই রকম অস্তিত্বহীন হয়েই। তাহলে এই অস্তিত্ব......এটা কী ছলনামাত্র, শুধুই কি ভ্রম?

জ্বালাপ্রসাদের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। ভিখু তাঁর সামনে চায়ের পেয়ালা রেখে বললে, "দাদাবাবু নাও, চাটা খেয়ে নাও। ভাবছ কি?" ভিখু জ্বালাপ্রসাদের হাতে চায়ের পেয়ালাটা তুলে দিয়ে সেখানেই মাটিতে বসে পড়ল।

জ্বালাপ্রসাদ ভিখুর দিকে তাকালেন। ভিখু কাঁসার গেলাসে চা ঢেলে খাচ্ছিল আর চুপ করে লনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। জ্বালাপ্রসাদের তখন মনে হল যেন ভিখুই এখন তাঁর সবচেয়ে বেশী আপনজন। তিনি ভিখুকে বললেন, "ভিখু, তুমি শুনেছ কি, পরশু নবল নুন তৈরি করতে যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, দাদাবাবু, শুনেছি। তবে আমার বুদ্ধিতে আসছে না, আমার বাছা এত লেখাপড়া শিখে নুন তৈরি করতে যাচ্ছে কেন? আর এ নুন তৈরি করত তো নুনিয়ারা। যখন থেকে বিলিতি নুন আসতে লাগল তখন থেকে এ ধান্ধাটাও নষ্ট হয়ে গেছে, আর ওরা না খেতে পেয়ে ধুকঁছে। আর নবল অফিসারী ছেড়ে নুন তৈরি করতে যাচ্ছে, তুমি ওকে বারণ করছ না কেন?"

"ভিখু, তুমি বুঝলে না, ও নুন তৈরি করবার ধান্ধায় যাচ্ছে না,

জেলে যাবার জন্মে, নুন তৈরি করে আইন ভঙ্গ করতে যাচ্ছে,” জ্বালাপ্রসাদ বললেন।

ভিখু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলে, “তবে কি নবল বাছা জেলে যাবে? ওরে বাবা! জেলে যাবার পাগলামি ওর মাথায় ঢুকল কি করে? আর তুমি ওকে আটকাচ্ছই না বা কেন?”

“কি বলব ভিখু, ও যে আমার কথাই শোনে না। আর জ্বাম্নুও জেলে যাবার জন্মে তৈরী হয়ে আছে।”

ভিখু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে, “ওঁরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি! এখন কি হবে? হায় ভগবান্! আমার বাছাকে তুলে নিলেন, তা না হলে সে কি আর নবলকে জেলে যেতে দিত।” ভিখুর চোখ ছলছল ক’রে উঠল।

ভিখু যখনই গঙ্গাপ্রসাদের সম্বন্ধে কথা বলত তার চোখ জলে ভরে উঠত। জ্বালাপ্রসাদ বললেন, “ভিখু, কেউ কিছু করতে পারে না, দুনিয়ায় কেউ কাউকে আটকাতে পারে না।” জ্বালাপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন যেন অন্তরের সংঘর্ষ থেকে তাঁর মন খিঁচিয়ে উঠছে।

ভিখুও উঠে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে বললে, “হ্যাঁ দাদাবাবু, ঠিক্ই বলছ। যখন আমার বাছা নিজের মরণটাকেই আটকাতে পারল না, তখন অন্যকে আর কিভাবে আটকাত?” ভারি মনে ভিখু ভেতরে চলে গেল।

উদাস মনে জ্বালাপ্রসাদও বেড়াতে বের হলেন। তাঁর মন উদ্বিগ্ন, মনের ক্লান্তিতে পা-দু’টাও চলেছে না। আজ তিনি ত্রিবেণীর ধারে না গিয়ে কটরার দিকে পা বাড়ালেন। ‘আনন্দভবনের’ সামনে হাজার হাজার লোকের ভিড় জমে ছিল আর ‘ভারত মাতার জয়’ ‘মহাত্মা গান্ধীর জয়’, ‘মোতিলাল নেহরুর জয়’, ‘জহরলালের জয়’, ধ্বনি দিচ্ছিল। সেদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহী সঙ্গীদের নিয়ে দাণ্ডীর কাছে পৌঁছেছেন। তাঁরা পরশু নুন তৈরি ক’রে সত্যাগ্রহ করবেন, আর পরশুই সারা দেশে লবণ সত্যাগ্রহের সূচনা হবে।

এই সত্যাগ্রহ পরশুই এলাহাবাদেও শুরু হবে। আর নবল প্রথম দিনেই সত্যাগ্রহে অংশ নেবে। প্রথম দিনেই যারা সত্যাগ্রহ করবে তাদের গ্রেফ্‌তার করা হবে, তারপর দ্বিতীয় দিন, আবার তৃতীয় দিন। একটানা দীর্ঘ রেখায় এই আন্দোলন চলতে থাকবে। এই আন্দোলনটা ১৯২০-২১এর আন্দোলনের মতোই হবে। কত সহজেই সে আন্দোলনটা দমন করা হয়েছিল। সেই রকম সহজে এই আন্দোলনটাও দমন করা হবে। ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিন্ত আছে, অফিসারদের মধ্যে কোনো আবেগ, কোনো উত্তেজনা নেই।

জ্বালাপ্রসাদের দৃষ্টি হাজার হাজার গ্রামবাসীদের ওপর পড়ল যারা সত্যাগ্রহ দেখবার জন্যে দূর দূর গ্রাম থেকে এসেছে। সেই গ্রামবাসীরাই জয়ধ্বনি দিচ্ছে। তাদের মধ্যে শুধু কৌতূহলই নয়, আরো কিছু ছিল। তারা উৎসাহ আর উল্লাসে কাজেও এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত।

জ্বালাপ্রসাদের মনে অন্য চিন্তা ভীড় ক'রে এলো। তাঁর মনে হল স্বাধীনতার আহ্বান ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে পৌঁছে গেছে। অসংখ্য গ্রামবাসী সম্ভবতঃ এই আন্দোলনে যোগ দেবে। তাদের যোগদানটা অবশ্য মানসিক। তখন আন্দোলন দমন এত সোজা হবে না। এর দমনের জন্যে সেনাবাহিনীর সাহায্যের দরকার হবে। সেনা, বন্দুক, মেশিনগান......এর বিরুদ্ধে আন্দোলন টিকবে কি করে?

জ্বালাপ্রসাদ আর এগুতে পারলেন না, তিনি বাড়ির দিকে ফিরলেন। ফিরে দেখলেন জ্ঞানপ্রকাশ নিজের ঘরে বসে লিখছেন, কিন্তু নবলের কোনো পাত্তাই নেই। তিনি বিদ্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, "নবল কোথায় গেছে?"

"এই মাত্র শহরের দিকে গেল, বোধ হয় রায়বাহাদুরের বাড়ি গেছে, এই রকমই বোধ হয় বলছিল।"

জ্বালাপ্রসাদ ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আশার যেন একটি আলোক রেখা দেখতে পেলেন। শুধু মনের মোহ নবলের পদক্ষেপকে

রুখতে পারে! উষার প্রতি নবলের মোহ! সে কি নবলকে আটকাতে পারবে?

পরশু সকাল পর্যন্ত নবল মুক্ত। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়বে সংঘর্ষের মধ্যে। এই সংঘর্ষের ভবিষ্যতের স্বরূপ সে খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু সবটা নয়। এই সংঘর্ষের মধ্যে ডুবে যাবার আগে সে উষাকে দেখতে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। উষা তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, তা জেনেও উষার কাছেই গেল।

উষাদের বাড়িতে গৌরীনাথ আর সীতানাথের মধ্যে মন কষাকষি চলছে। এর মধ্যে রায়বাহাদুর কামতানাথের বিচিত্র ভূমিকা। কখনো তিনি গৌরীনাথের পক্ষে আবার কখনো বা সীতানাথের দিকে। কিন্তু উষার ওপর বড়দাদারই প্রভাব ছিল বেশী সেইজন্যেই রায়বাহাদুর কামতানাথ গৌরীনাথের দিকেই বেশী ঝুঁকে ছিলেন।

নবল যখন রায়বাহাদুরের বাড়ি পৌছল, তিনি তখন বৈঠকখানায় চুপচাপ চিন্তামগ্ন হয়ে বসেছিলেন। সেদিন দুপুরেই তাঁর দুই ছেলের মধ্যে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হয়েছিল। নবলকে দেখা মাত্র রায়বাহাদুর সাহেব বললেন, "এস নবল, তোমাকে অনেক দিন পরে দেখছি। লেখাপড়া কেমন চলছে?"

"ভালোই।"

"এল-এল-বি-র পরীক্ষা দিয়ে, মুনসেফীর পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল," রায়বাহাদুর বললেন। "হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসের ওপর আমার প্রভাব আছে, তুমি নির্বাচিত হয়ে যাবে।"

"আজ্ঞে, আপনি তো সব কিছুই করাতে পারেন, কিন্তু আমার মুনসেফীর পরীক্ষা দেবার আদপেই ইচ্ছা নাই।"

রায়বাহাদুর কামতানাথ চটে উঠলেন, "তুমি অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির, গৌরী বলে ঠিক্‌ই। তাহলে কি ওকালতিই করবে? ওকালতির আজকাল চরম দুরাবস্থা, গৌরী নিজেই হয়রান হয়ে যাচ্ছে।"

নবল মৃদু হাসল, "পাপা, আমি কি করব, আমি নিজেই জানি

না। মানুষ কিছুই করে না, যা হয় তা আপনা থেকেই হয়। কে জানে আমি হয় তো এসবের চেয়ে বেশী ভালো কোনো কাজ করতে পারি।”

“তুমি যে খুব দার্শনিক হয়েছ দেখছি,” কামতানাথ জোরে হেসে উঠলেন। তারপর জোরে ডাক দিলেন, “ঊষা, দেখ নবলবাবু এসেছেন।”

ঊষা বোধ হয় বৈঠকখানার দিকেই আসছিল। সে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, “আরে নবল বাবু, আপনি! আজ অনেকদিন পরে যে। চলুন, বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসা যাক্। আজ ভীষণ গরম, না পাপা!”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানেই বস গিয়ে। আমি এখানেই বসে থাকি। আমার সঙ্গে দেখা করতে অনেকের আসার কথা আছে,” কামতানাথ বললেন।

ঊষা নবলকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল. “বসুন, আজকাল লেখাপড়া বোধ হয় জোর চালাচ্ছেন।”

“চলছে আবার চলছেও না,” নবল বসতে বসতে বললে। “আজ লেখাপড়ায় মন বসল না তাই ভাবলাম তোমার কাছে হয়ে আসি, কেমন আছ? লেখাপড়া কেমন চলছে?”

“খুব ভালো তো নয়ই। সত্যি কথা বলতে কি লেখাপড়ায় আমার মন লাগে না।” তারপর একটু নীরব থেকে সে বললে, “শুনলাম, আপনি নাকি আজকাল বেশীর ভাগ সময় কংগ্রেস অফিসেই থাকছেন।”

ঊষার কথা শুনে নবল আশ্চর্য হল। ঊষা তাহলে নবলের গতিবিধির পুরোপুরি খবর রাখে। এর অর্থ হল যে কামতানাথের বাড়িতে নবল সম্পর্কে এখনও এঁদের আগ্রহ আছে। সে উত্তর দিল, “তুমি ঠিক্ই শুনেছ। তোমাকে একথা কে বললে?”

“গৌরীদাদা বলছিলেন,” ঊষা উত্তর দিল। “তাঁর অনুমান আপনি কংগ্রেস নেতা হতে যাচ্ছেন।”

"কংগ্রেস নেতা হওয়াতে ক্ষতি কি?" নবল কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞেস করলে!

"তা আমি কি জানি। কিন্তু কংগ্রেস নেতা হলে জেলে যেতে হয় শুনেছি।"

নবল উষার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে বললে. "উষা, আমি এখন এখানে কেন এসেছি জান?"

"হ্যাঁ, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বোধ হয় কিছু বলতেও চান। ঠিক্ নয় কি?"

"কথাও ছিল আর দেখা করতেও চেয়েছিলাম। উষা, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি।"

নবলের কথায় উষা তিড়বিড়িয়ে উঠল, "আমাকে মুক্ত তো আপনি বহু আগেই করে দিয়েছেন, কিছু না বলে-কোয়েই। এখন সে কথা তোলার দরকার কি ছিল। আর সত্যি বলতে কি আমি নিজেই মুক্ত হয়ে আছি।"

উষা যা বললে তা সত্যই, কিন্তু এ সত্য উষার মুখে শুনে নবলের ভালো লাগল না। "উষা আমি জানি তুমি মুক্ত হয়েছ আর এও জানি এই মুক্তির পরে তুমি অন্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছ। কিন্তু সে বন্ধন হবে ভয়ানক আর বীভৎস।"

উষা কড়া স্বরে বললে, "এবিষয়ে আপনার মতামত কে চাইছে? আপনি অভিমত দেবার কে?"

নবল মৃদু হাসলে, "হ্যাঁ, আমার মত চাওয়া হয়নি, এটা ঠিক্। কিন্তু আমি মনে করি মত দেবার অধিকার আমার আছে আর সর্বদাই থাকবে। কারণ তুমি আমার আপনজন। আপনজনকে ভুল পথে যেতে দেখলে প্রাণে ব্যথা লাগে। তুমি তো জানই যে রাজেন্দ্রকিশোর বিবাহিত।"

উষা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

নবল উঠে দাঁড়াল, "তোমাকে এসব বলার জন্যে আমি দুঃখিত,

আমরা পরস্পরের কাছ হতে চিরদিনের জন্য দূরে সরে যাচ্ছি। আমি তোমাকে কি বলতে এসেছিলাম আর কি বলে বসলাম।”

“আপনি তো আমাকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন,” তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বরে বললে উষা। “সে তো আপনি বলেই দিয়েছেন। এর পরেও কি আপনার কিছু বলার আছে?”

“হ্যাঁ, আমি পরশু দিন লবণ-সত্যাগ্রহ করতে যাচ্ছি। পরশু দুপুরের মধ্যে আমি বোধ হয় জেলে চলে যাব। এসেছিলাম—জেলে যাবার আগে একবার তোমাকে দেখতে, প্রাণভরা শুভকামনা জানাতে। কিন্তু এখানে এসে তিক্ততার মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। তার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর,” এই বলে নবল যাবার জন্যে উদ্যত হল।

উষা ছুটে গিয়ে নবলের হাত চেপে ধরলে, “কি বললেন? পরশু আপনি জেলে যাচ্ছেন?” নবলকে টেনে সে চেয়ারে বসিয়ে দিলে, “না, এ কখনোই করবেন না, জেলে যাবেন না। আমার এই মিনতিটুকু রাখুন।”

“না, উষারাণী পা আগেই বাড়িয়েছি, এখন পেছনে হটা সম্ভব নয়। আমি সব তৈরী করে ফেলেছি।”

“আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। রাজেন্দ্রকিশোরের প্রতি আমার কোনো মোহ নেই, আমি তাকে ভালবাসি না। আপনি জেলে যাবেন না। এল. এল. বি. পাস করে নিন। আমি এক্ষুনি পাপাকে গিয়ে বলছি যে আমি তাকে বিয়ে করব না। বলুন, চুপ ক'রে আছেন কেন?”

“উষা, এ সব বৃথা। আমি নৈরাশ্যে জেলে যাচ্ছি না। যে পথ আমি বেছে নিয়েছি, এ তারই পরিণতি। সংঘর্ষ—সংঘর্ষ—সংঘর্ষ। আজীবন সংঘর্ষ। উষা, এ সংঘর্ষ আমার অন্তরের আহ্বান। আমি জানি এ সংঘর্ষে তুমি আমাকে সঙ্গ দিতে পারবে না। সেইজন্যে আমি এসেই তোমাকে মুক্তি দিলাম।”

নবলের কথা শুনে উষা যেন ধাক্কা খেল, “তবে কি আপনি আমার জন্যে জেলে যাচ্ছেন না?”

"মোটেই নয়," নবল বললে, "আমি শুধু নিজের জন্যে, নিজের প্রেরণায় জেলে যাচ্ছি।"

উষার নিজের ওপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জাগলো। নিজের গুরুত্বের, নিজের বিজয়ের যে ভাবটি তার ভেতরে জেগেছিল সেটা যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়লো, "ও বুঝেছি! আপনি আমায় বিদ্রূপ করতে এসেছিলেন। নিজের গুরুত্ব দেখিয়ে আমাকে অপমান করতে এসেছিলেন বুঝি?"

নবল আবার উঠে দাঁড়াল, "না উষা, আমি চিরদিনের মতো তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে আর শুভকামনা নিবেদন করতে এসেছিলাম। আর কোনো দিন বোধ হয় আমাদের দেখাও হবে না।"

উষা গর্জে উঠল, "নিজের শুভকামনা নিজের কাছেই তুলে রাখুন, আমার তাতে কোনো প্রয়োজন নেই। জেলে যান আর ভুগুন গিয়ে। আমার সম্পর্কে আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। আমি সবই পেয়ে গেছি আর পরেও পাব। আপনি যা করছেন সেটা যদি ঠিক মনে করেন তাহলে আমিও যা করছি, সেটাকেও ঠিক মনে করি! যান, চলে যান, আপনাকে আমি ঘৃণা করি।" কাঁদতে কাঁদতে উষা ভেতরে চলে গেল।

নবল চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনের মধ্যে তখন ভাবনার ঝড় বইছে। ধীরে ধীরে তার চেতনা ফিরে এল, সে শুনতে পেলে, রায়বাহাদুর কামতানাথ জিজ্ঞেস করছেন, "নবল, হল কি? তুমি বুঝি পরশু জেল খাটতে যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি পরশু জেলে যাচ্ছি," বলেই নবল বেরিয়ে এল।

সেখান থেকে সে বাড়িমুখো হাঁটতে শুরু করলে। কি মধুর রাত! চারদিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। সারা পরিবেশটাই কবিত্বময় আর কমনীয়। তার মনের সমস্ত উত্তেজনা যেন শান্ত হয়ে এল। সে মনের মধ্যে এক অসীম শান্তি অনুভব করলো।

বাড়িতে বিদ্যা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে জিজ্ঞেস করলে, "হয়ে এলে দাদা?"

"হ্যাঁ বিদ্যা, হয়ে এলাম আর সব ভেঙ্গেও এলাম। আমি যে নতুন যুগ নির্মাণ করতে চলেছি সেটা খুবই মহার্ঘ। যা কিছু পুরাতন সেগুলো নির্মমভাবে ভাঙ্গতে হচ্ছে।"

বিদ্যা মৃদু হাসলে, "না দাদা, পুরাতন তো নিজেই খসে পড়ছে, সেটা রক্ষা করতে গেলে তোমায় নিজেকেই ভাঙ্গতে হবে। সে জন্যে দুঃখ পাওয়া বৃথা। চল, এখন খেয়ে নাও।"

নবলের সে রাতটা স্বপ্নে ভরা ছিল। ভালো মন্দ নানারঙের স্বপ্ন। পরের দিন নবল দেরী করে ঘুম থেকে উঠল। সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য বোঝাতে ন'টার সময় কংগ্রেসের একটি সাধারণ সভা ছিল। জ্ঞানপ্রকাশ সভায় যাবার জন্যে তৈরী হয়েছেন। নবল তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে সভায় চলে গেল।

যখন তাঁরা দু'জনে সভায় পৌছলেন, সমবেত জনতা জয়ধ্বনির সঙ্গে তাঁদের স্বাগত জানাল। মঞ্চের ওপর সত্যাগ্রহীর দল বসেছিল, নবলও সেখানে গিয়ে বসল। হাজার হাজার লোক তাকিয়ে ছিল দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গীদের দিকে।

নবল নব-অভ্যুদয়ের আনন্দ-বেদনা অনুভব করতে লাগল। প্রথমে যখন সে মঞ্চের ওপর গিয়ে বসল তখন তার মন ছিল উদ্বিগ্ন। এখন সেই উদ্বেগ বিলীন হয়ে গিয়ে মনের মধ্যে এল নতুন এক দৃঢ়তা। তার মনে হল এক সীমাহীন উল্লাসে হঠাৎ সে যেন বদলে গেছে এক অটল সংকল্পে।

তখন তার জগৎটাই যেন বদলে গেল। সে ভুলে গেল জ্বালা-প্রসাদকে, রুক্মিণীকে, ছোট ভাই-বোনদের! কামতানাথ আর উষাকে! শুধু তাই নয়, তখন ভুলে গেল জ্ঞানপ্রকাশকেও! তার সামনে ছিল এক বিশাল জন-সমুদ্র,—তাদের সমর্থন সে পেয়েছিল, তাদের শুভকামনা ছিল তার সাথী। তাদের প্রত্যয়ের বাহক সে।

জ্ঞানপ্রকাশ আর নবল মিটিং থেকে সোজা বাড়ি ফিরলেন।

বাড়িতে একটা উদাসভাব অনুভব করলে নবল। বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের মুখ বিষণ্ণ, মন ভারাক্রান্ত। জ্বালাপ্রসাদ এদের অপেক্ষায় ছিলেন। সবাই খেতে বসলেন। কিন্তু জ্বালাপ্রসাদ ছিলেন মৌন, তিনি খেতে পারছিলেন না। নবল জ্বালাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলে, "দাদু, আপনি এত উদাস কেন?"

জ্বালাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "নবল, কিছুই যে আর ভালো লাগছে না। এ দুনিয়াটার হল কি! তুমি কাল জেলে যাবার জন্যে তৈরী। দু-চার দিন পরে জ্ঞানুও যাবে, আমি যে একা পড়ে যাব।"

বিদ্যা পরিবেশন করছিল, সে মৃদু হাসলে, "দাদু, আপনি আর একা কি করে? আমি তো রয়েছি আপনার কাছে। নবলদাদা বাড়িতে কতক্ষণই বা থাকে। আমি তো আপনাকে 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' শোনাচ্ছি।"

বিদ্যার কথায় জ্ঞানপ্রকাশ হেসে উঠলেন, "শাবাশ মা, ঠিক বলেছ। দাদা, এই মোহ ছাড়ুন আর খুশী মনে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করতে দিন। ভাবুন, আমাদের সঙ্গে ধর্ম আর ভগবান আছেন।"

"হ্যাঁ জ্ঞানু, তোমাদের সঙ্গে ধর্ম ও ভগবান আছেন তা আমি ভালো ভাবেই জানি। সেজন্যে আমি তোমাদের বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু নিজের মনটাকে নিয়ে কি করি বল?"

"মনটাকে শক্ত করুন দাদু। আমাদের খুব বেশী হয় তো ছ'মাসের জেল হবে। আমরা অহিংসার লড়াই করতে যাচ্ছি। বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নেই।"

জ্বালাপ্রসাদ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন, "আশঙ্কা তো নেই, কিন্তু, কিন্তু.........."

"কিন্তু কি?" জ্ঞানপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলেন।

"কিন্তু কিছু নয়। যাও নবল, যাও জ্ঞানু, মানুষের হাতে নেই কিছু, একেবারেই নেই কিছু; তবে আর কিসের জন্যে চিন্তা করব। যা হবার তা হয়েছে, তাকে আর থামানো যাবে না।" জ্বালাপ্রসাদ

যখন খেয়ে উঠলেন, তখন তাঁর মন হাল্কা। সারা পরিবারের উদাসী ভাবটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

৫ই এপ্রিল. তখন প্রায় ভোর সাড়ে চারটে, নবলের ঘুম ভাঙ্গল। চারদিকে অন্ধকার কিন্তু পূর্ব আকাশে অল্প আলোর রেখা ফুটে উঠেছে। নবল উঠে বসল। আর তারই সঙ্গে সারা বাড়ি জেগে উঠলো। ৫ই এপ্রিল ভোরে দাণ্ডীতে মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করছিলেন। স্থির ছিল যে সকাল ন'টায় কংগ্রেস অফিস থেকে একটি মিছিল বের হবে আর প্রত্যেকটি সত্যাগ্রহীর বাড়ি গিয়ে তাদের স্বাগত জানাবে। পরে মিছিলটি সারা শহর পরিক্রমা করবে। তারপরে সত্যাগ্রহীরা লবণ আইন ভঙ্গ করবেন।

মিছিলটি প্রায় সাড়ে দশটার সময় নবলের বাংলোতে এসে পৌছল। ততক্ষণে মিছিলে প্রায় কুড়ি হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছে। নবলের বাংলোর বাইরে রাস্তার ওপর মিছিলটি থামল। নানা জয়ধ্বনি হচ্ছিল।

ভোরেই বিদ্যা বড়ো সযত্নে আরতির থালা সাজিয়ে রেখেছিল। মিছিল আসামাত্রই সে নবলকে আরতি করে তাকে মালা পরালে। রুক্মিণী পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বিদ্যা রুক্মিণীর হাত ধরে নবলের কাছে টেনে আনলে. "মা, দাদার কপালে তিলক পরাও। উনি কৃষ্ণমন্দিরে যাচ্ছেন, ওঁকে বিদায় দাও।"

রুক্মিণীর সারা গা থরথর করে কাঁপছিল। অশ্রুসিক্ত চোখ। বিদ্যা জোর ক'রে মায়ের মুখের ঘোমটা খুলে দিল, "মা, এটা লজ্জা, দুর্বলতার সময় নয়!"

জনতা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল. "নবলকিশোর জিন্দাবাদ! নবল-কিশোর কী জয়!"

পেটের ছেলের জয়ধ্বনি রুক্মিণী শুনলেন আর দেখলেন অপার সমুদ্র তাঁর ছেলেকে বিদায় দেবার জন্য এগিয়ে আসছে। রুক্মিণী মনের মধ্যে আনন্দ অনুভব করলেন—তাঁর সমস্ত বিষাদ যেন

কোথায় মিলিয়ে গেল। তিনি চোখের জল আঁচলে মুছলেন। ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, তারপরে কম্পিত হস্তে তার কপালে তিলক এঁকে দিয়ে আরতি করলেন।

জ্বালাপ্রসাদ চুপচাপ বারান্দায় বসে সব দেখছিলেন। ভিখু তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। নবল জ্বালাপ্রসাদের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করলে। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু এই আশীর্বচন বের হল, "ভগবান তোমায় রক্ষা করুন!"

তারপর নবল ভিখুর দিকে ঘুরল, "ভিখু দাদু, নমস্কার! দাদুকে ভালো ক'রে দেখাশোনা করবে।"

"যাও বাছা, ভালো থাক। তাড়াতাড়ি ফিরে এস।"

নবল এবার মিছিলের দিকে অগ্রসর হল। বিদ্যা নবলকে এগিয়ে দিতে চলল, "দাদা, আমিও তোমার সঙ্গে একটু দূরে যাব। সেখান থেকেই আমি স্কুলে চলে যাব।" বিদ্যাও মিছিলে যোগ দিল।

মিছিল অগ্রসর হল। বাড়ির সবাই দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছিল। মিছিল এগতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। রুক্মিণী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না, জোরে কেঁদে উঠলেন। নিজের ছেলে তুটির হাত ধরে ভেতরে চলে গেলেন।

জ্বালাপ্রসাদ ভিখুর সঙ্গে ফটক পর্যন্ত এলেন। মিছিল অগ্রসর হচ্ছিল, তিনি একদৃষ্টে চেয়েছিলেন। ক্রমশঃ মিছিল চোখের আড়ালে চলে গেল। চারদিক খা-খা করে উঠল। জ্বালাপ্রসাদ ভিখুর দিকে তাকালেন, "ভিখু, এসব কি হচ্ছে?"

"দাদাবাবু, কিছুই বুঝতে পারছি না। নবল বাছা আপন খুশীতে জেলে যাচ্ছে, বিদ্যা মা চাকরি করতে শুরু করেছে! বুঝতে পারছি না দাদাবাবু, এসব কি হচ্ছে।"

জ্বালাপ্রসাদ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন, "হ্যাঁ ভিখু, কিছুই বুঝতে পারছি না। আজ এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কি থেকে কী যে হল? সবই বদলে গেছে, একেবারে বদলে গেছে। ভিখু, তুমি বদলেছ, আমিও

বদলেছি। না জানি কত নতন লোক এল, পুরানো কত লোক চলে গেল।" জ্বালাপ্রসাদের গলার স্বর কেঁপে উঠলো।

ভিখু জ্বালাপ্রসাদের হাত ধরলে, "চল দাদাবাবু, বিশ্রাম করবে চল। এসব ভগবানের লীলা! এর ওপর আমাদের কোনো হাত নেই। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছি না ভিখু, এসব কি হচ্ছে আর কেনই বা হচ্ছে। এই নানা রঙের চিত্রগুলি আপনিই অঙ্কিত হচ্ছে আবার মুছে মুছে যাচ্ছে, কেন ?"

দুই বৃদ্ধ যারা অনেক যুগ দেখেছে, জীবনের নানা উত্থান-পতন দেখেছে ; তাদের অন্তরে অনুভূতির অক্ষয় ভাণ্ডার, তারা বিবশ, নিরুত্তর। দূরে বহুদূরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে জীবনের আর গতির প্রেরণায়, নবোদ্যমে আর নবোল্লাসে একটা নতুন জগৎ রচনা করার সংকল্প নিয়ে।

সমাপ্ত